উত্তাল চল্লিশ
অসমাপ্ত বিপ্লব

অমলেন্দু সেনগুপ্ত

পার্ল পাবলিশার্স
২০৬ বিধান সরণী, কলিকাতা ৭০০ ০০৬।

মুখবন্ধ

যুদ্ধ আকাল দেশজোড়া গণ অভ্যুত্থান ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা দেশভাগ ও স্বাধীনতা —মাত্র দশ বছরের সময়-সীমায় এতগুলি যুগান্তকারী ঘটনার সমাবেশের কারণে চল্লিশের দশক আমাদের ইতিহাসে এক ব্যতিক্রমী অধ্যায়। ঢেউয়ের মাথায় ঢেউয়ের মতো একের পর এক অতিকায় ঘটনার অভিঘাতে সেদিন কেঁপে ওঠে জনজীবনের ভিত্তিমূল। অভ্যস্ত জীবনের ঘেরাটোপ থেকে মানুষ নিক্ষিপ্ত হয় এক অচেনা জগতের পরিবেশে। তার জন্যে বরাদ্দ সেদিন অশেষ দুঃখ ও অনেক মৃত্যু একদিকে ও অপরদিকে এক বিপুল প্রত্যাশার রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। এই দশকের খাঁজে খাঁজে নিহিত মানুষের সুগভীর প্রত্যাশা ও স্বপ্নভঙ্গের কাহিনী।

যুগসন্ধির সেই যন্ত্রণাবিদ্ধ সময়ে মানুষের বিশ্বস্ত সঙ্গী ছিলেন এদেশের কমিউনিস্টরা। জীবন-জীবিকা ও স্বাধীনতার লড়াইয়ের সীমানা পেরিয়ে মানুষের সামনে কমিউনিস্টরা তুলে ধরেছিলেন এক নতুন দিগন্ত—সমাজ-বিপ্লবের লক্ষ্য। এবং সমাজ-বিপ্লবের ব্যর্থ মহড়ার মাধ্যমে এই দশকের অবসান।

সেদিনের স্মৃতি প্রবীণ কমিউনিস্টদের কাছে এক পবিত্র সম্পদ। তাঁদের জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি সেই উদ্বেল সময়ের সঙ্গে ওতপ্রোত। কাহিনীর বাঁকে বাঁকে তাই তাঁদের অনিবার্য উপস্থিতি। যেহেতু চল্লিশের দশক ও আমার দেশের কমিউনিস্ট পার্টি নিয়ে এই ইতিবৃত্ত, সেই অসাধারণ যুগের পটভূমিতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিকাশ ও রূপান্তর বর্ণনাতেই আমার প্রয়াস সীমাবদ্ধ। স্মরণ ও মূল্যায়ন এই বইয়ের প্রধান বিষয়বস্তু।

প্রসঙ্গত আমার ইতিবৃত্তের মূল ঘটনাস্থল কলকাতা ও উপকণ্ঠ। সাম্রাজ্য-বাদ-বিরোধী শেষ লড়াই ও শ্রেণী-সংগ্রামের প্রধান রণক্ষেত্র সেদিন এই কলকাতা। এবং কলকাতার শ্রমজীবী মানুষের জীবিকার লড়াইয়ে সেদিন অবিসংবাদী নেতা কমিউনিস্টরা। কিন্তু সে-যুগে কমিউনিস্টদের শ্রেষ্ঠ কীর্তি নিশ্চয় তেলেঙ্গানা ও তেভাগার লড়াই। অল্প কথায় তার বর্ণনা সম্ভব নয়; অতএব সে চেষ্টা থেকে বিরত থেকেছি। তাছাড়া তেলেঙ্গানা ও তেভাগা নিয়ে লেখা বইপত্রের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। যা নিয়ে বিশেষ কিছু লেখা হয়নি, সেই আমার অভিষ্ট।

এই বই রচনা ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে আমি বহুজনের উদার সাহায্য পেয়েছি। আমি কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁদের কথা স্মরণ করছি। এই বই রচনার ক্ষেত্রে যাঁরা নানাভাবে সহায়তা করেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: অবন্তী কুমার সান্যাল, অলোক মজুমদার, কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, কেদার ভট্টাচার্য, গৌতম চট্টোপাধ্যায়, নীহারেন্দু দাশগুপ্ত, বিপ্লব চক্রবর্তী, মানস চট্টোপাধ্যায়,

রঞ্জন গুপ্ত, রমাকান্ত চক্রবর্তী, শান্তিশেখর সিংহ, শিবশংকর চক্রবর্তী ও শ্যামাপ্রসাদ বসু, এবং অজয় ভবন পাঠাগার (দিল্লী) ও মুজফ্ফর আহ্মদ পাঠাগার (কলকাতা)-এর কর্তৃপক্ষ।

বইখানি প্রকাশের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন আমার আকৈশোর বন্ধু শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়। প্রচ্ছদ অলংকরণের দায়িত্ব পালন করেছেন আমার বিশিষ্ট শুভানুধ্যায়ী অমলেন্দু চক্রবর্তী। অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে 'নির্দেশিকা' তৈরির পরিশ্রমসাধ্য কাজটি করেছেন শ্রীমতী ঝর্ণা চট্টোপাধ্যায়। বইয়ের অন্তর্গত কংসারি হালদারের ছবি তুলেছেন অংশু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাকি ছবিগুলি তুলেছেন আলোকচিত্রী মানা দে। এই শ্রম স্বীকারে তাঁরা কোন কুণ্ঠা বোধ করেননি।

চিত্তপ্রসাদের আঁকা ছবি ব্যবহার সম্ভব হয়েছে স্মরণ ঘোষালের আনুকূল্যে। সোমনাথ হোরের ছবি ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন শিল্পী স্বয়ং, ছবিটি পাওয়া গেছে সীগাল বুকস কোম্পানির কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে।

যাঁর সহায়তা ছাড়া এই বইয়ের প্রকাশ আদৌ সম্ভব হত না, তিনি হলেন রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। পাণ্ডুলিপি নির্মাণপর্ব থেকে প্রকাশনার প্রতিটি স্তরের সঙ্গে তিনি অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। যাবতীয় মেধা, বুদ্ধি ও শ্রম আমার এই অনুজপ্রতিম বন্ধুটি এ কাজে উজাড় করে দিয়েছেন।

ধন্যবাদ জানাই পার্ল পাবলিশার্স-এর কর্ণধার মদন ভট্টাচার্যকে। সমাজ-সচেতন পাঠককুলের কথা ভেবে তিনি বইখানি প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন।

পরিশেষে বইখানির পরিচ্ছন্ন মুদ্রণের জন্য 'তরু প্রিন্টিং' মুদ্রণালয়ের স্বত্বাধিকারী ও কর্মীবৃন্দকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার কথা শেষ করছি।

অমলেন্দু সেনগুপ্ত

বিষয় সূচি

চিত্র পরিচিতি

১. চিত্তপ্রসাদ অঙ্কিত

(ক) আজাদ হিন্দ বন্দীমুক্ত আন্দোলন (প্রচ্ছদ)
(খ) নৌ-বিদ্রোহ

২. সোমনাথ হোর অঙ্কিত

(ক) তেভাগা সংগ্রামের মিছিল
(খ) কর্মীদের সভা

৩. আলোকচিত্র :

মনোরঞ্জন হাজরা, কংসারি হালদার,
কমল চ্যাটার্জি, ধীরেন মজুমদার

৪. শহীদ স্মৃতি বেদী, ডুবির ভেড়ি

One of the Processions moving towards [illegible] to show condemnation of Soldiers Zoolum

উপরে : মনোরঞ্জন ঠাকুর ও কাঁসারি হালদার

নিচে : কমল চ্যাটার্জী ও ধীরেন মজুমদার
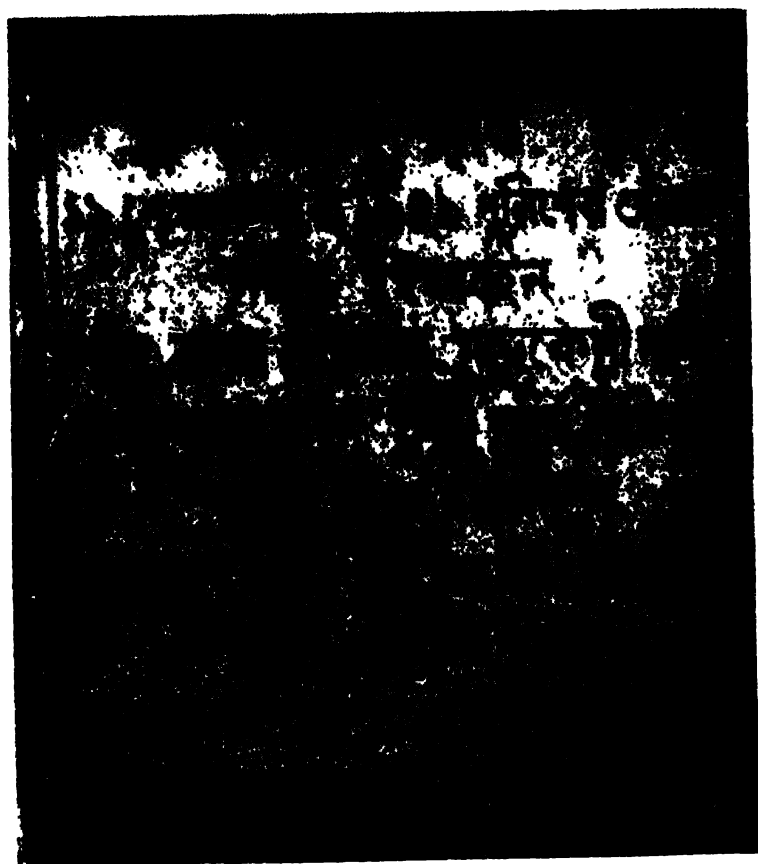
প্রথম পর্ব

কমিউনিজম আনবে গীতিময় আগামীকাল
—এসো তার জন্যে প্রস্তুত হই।
গ্যাব্রিয়েল পেরী

এক

রাজপথে আজ যেন লাল-এর ঢল নেমেছে। রক্তপতাকার ঢেউ তুলে কাতারে কাতারে চলেছে উদ্বেল মানুষ। তাদের মাথার ওপর যদিও অগ্নিবর্ষী আকাশ আর পায়ের নীচে গলন্ত পিচের করাল উত্তাপ। এবং জ্বলন্ত রোদে সেদিন কলকাতা ঝলসে যাচ্ছে। কিন্তু তাতে কী আসে যায়; বার্লিনের উপর উড়ছে লাল পতাকা। ফ্যাসিস্ট ঔদ্ধত্যের প্রধান ঘাঁটি চূর্ণ। আজ উৎসবের দিন—বার্লিন বিজয় উৎসব। তাই রুদ্র বৈশাখের গলে-পড়া সূর্যও তাদের উদ্দীপনার কাছে নিষ্প্রভ। সে দিনটা ছিল ৪ঠা মে, ১৯৪৫।

বিভীষিকার কালরাত্রি শেষ। ১লা মে লালফৌজ বার্লিন জয় করেছে—উড়িয়ে দিয়েছে রাইখস্টাগের মাথায় লাল পতাকা। ফ্যাসিবাদের হিংস্র থাবা থেকে লালফৌজ ছিনিয়ে নিয়েছে মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। নতুন করে প্রাণ ফিরে পেয়েছে সভ্যতা ও সংস্কৃতি। ইউরোপের ঘরে ঘরে তাই মুক্তির শিহরণ। স্বস্তির আমেজে ভরপুর বিশ্বের প্রতিটি দেশের মানুষ। মানব-ইতিহাসে এই পরম লগনের প্রতীক্ষায় এদেশের কমিউনিস্টরাও এতকাল প্রহর গুনেছে। কমিউনিস্টদের চোখে স্বদেশ ও পৃথিবী একাকার। ফ্যাসিবাদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ঘনিয়ে আসবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অন্তিমকাল আর ত্বরান্বিত হবে ভারতের মুক্তি—এই বিশ্বাসে কমিউনিস্টরা অবিচল। এবং তার ভিত্তিতেই অনুসিদ্ধান্ত :

'ভারতের জাতীয় স্বাধীনতার একমাত্র সংগ্রাম আজ ফ্যাসিস্ট-বিরোধী সংগ্রাম। স্বাধীনতা যুদ্ধ আজ সামগ্রিক জনযুদ্ধ।'

ফ্যাসিজমের পতনের সঙ্গে সঙ্গে তাই আজ নতুন যুগের অভ্যুদয়; মানব মুক্তির সিংহদুয়ার অর্গলমুক্ত। স্বদেশের বন্ধনমুক্তিরও আর দেরি নেই। তাই বিশ্বজনীন আবেগোচ্ছ্বাসের শরিক এই দেশের কমিউনিস্টরাও। পতাকা, ফেস্টুন, পোস্টার আর কার্টুনের সমারোহে তারা পার্টির ডাকে আজ হাজারে হাজারে সামিল এই উৎসব-মিছিলে!

পার্টির বাংলা সাপ্তাহিক মুখপত্র 'জনযুদ্ধ'র প্রতিবেদক লিখছেন :

'ওয়েলিংটন স্কোয়ার। শহরতলীর দূর দূরান্ত হইতে মজুররা আসিয়া হাজির হইয়াছে। হাজিনগর, মেটেবুরুজ, গৌরীপুর, ঘুসুড়ি, শিবপুর, কাশিপুর, আলমবাজার, পানিহাটি, বেলঘরিয়া, বজবজ, শ্রীরামপুর—সমস্ত অঞ্চল হইতে হাজার হাজার মজুর আসিয়াছে। ইহার উপর খিদিরপুর, বেলেঘাটা কলিকাতার মজুর তো আছেই—বারাসত ও সোনারপুর হইতে কৃষকরাও আসিয়াছে।

ছাত্ররাও আসিয়াছে দলে দলে। আসিয়াছে মেয়েরা, শিল্পী, সাহিত্যিক, সোভিয়েট সুহৃদ, মেডিকেল ইউনিটের ডাক্তার। কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য, দরদী সবাই আজ এই মহা উৎসবে আসিয়া মিলিয়াছে।' (জনযুদ্ধ, ১০. ৫. ১৯৪৫)।

কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপত্র 'পিপলস্ ওয়ার'-এর প্রতিবেদক লিখছেন :

মিছিলের আগে আগে চলেছেন বিশাল এক পতাকা হাতে দীর্ঘদেহী বঙ্কিম মুখার্জি। পরের সারিতে হাঁটছেন মুজফ্ফর আহমেদ, ভবানী সেন, আব্দুর রেজ্জাক খাঁ ও অধ্যাপক নীরেন রায়। তাঁদের সকলের হাতে লাল পতাকা। তাছাড়া সামনের সারিতে রয়েছেন কংগ্রেস নেতা অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও মুসলিম লীগ নেতা লালমিঞা। মিছিলের পথ প্রদর্শক একদল সাইকেল আরোহী এবং তাদের ঠিক পেছনে আসছে প্রায় পাঁচশ মহিলার এক সুশৃঙ্খল দল ও তারপর ইউনিয়নের ফেস্টুন ও লাল পতাকা হাতে দলে দলে শ্রমিক। মিছিল যখন চিত্তরঞ্জন এভেনিয়ুর রাস্তায় নামল, ছুটন্ত মিলিটারি লরি থেকে বহু ব্রিটিশ ও মার্কিন সেনা হাত নেড়ে অভিনন্দন জানায়।

কুড়ি হাজার লোকের মিছিল। ১৯৩৮ সালের পর কলকাতায় অত বড় মিছিল আর হয়নি। রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাতারে কাতারে লোক। থেমে গিয়েছে ট্রাম বাস। ট্রামে ট্রামে লাল পতাকা। বাসের সামনেও উড়ছে পতাকা। ট্রাম বাসের চালকরা অভিনন্দন জানাচ্ছে। জয়ধ্বনিতে সমস্ত পথ মুখরিত। বহুদিন পর কলকাতার প্রাণে যেন আবার সাড়া জেগেছে।' (পিপলস্ ওয়ার, ১৩. ৫. ১৯৪৫)।

মুগ্ধ ও বিস্মিত নিরঞ্জন সেনগুপ্ত ট্রাম থেকে নেমে পড়েন। তিনি আর. সি. পি. আই-এর ছাত্রনেতা। তাকিয়ে দেখেন, লাল পতাকা হাতে মজুররা চলেছে। এত লাল পতাকা! স্টালিনবাদী কমিউনিস্টরা তাহলে কলকাতাকে লাল করে দিয়েছে! তিনি দেখেন, গীতা মুখার্জি স্লোগান দিয়ে ছাত্র স্কোয়াডের নেতৃত্ব করছেন। অনুভব করলেন তিনি, ফ্যাসিজমের পতন ঘটেছে এবং ঘটেছে তা স্টালিনের নেতৃত্বে।

জীবনের সায়াহ্নে পৌঁছেও সেদিনটির কথা ভুলতে পারেননি সুবোধ দাশগুপ্ত। যে কটা মিছিল কখনো ভোলা যায় না, এটা তারই একটি। সমস্ত মন প্রাণ ঢেলে, সমস্ত বুদ্ধি উজাড় করে দিয়ে সাজানো এই মিছিল। উর্দি-পরা ট্রাম-শ্রমিক চলেছে সার বেঁধে। চলেছে ঝাঁকা মাথায় মুটে—এমনকি রিক্সাওয়ালারাও যোগ দিয়েছে রিক্সা নিয়ে। যাদের কথা কেউ ভাবে না—যাদের কমিউনিস্টরা ছাড়া অন্যরা মানুষ বলে ভাবে না—এই মিছিল তাদের মিছিল। মিছিল যেন বলতে চায়—দেখো, বার্লিন জয় করেছি আজ—কাল গোটা দুনিয়া জয় করব—আমরা কমিউনিস্টরা।

এই মিছিল যেন তারই সার্থক মহড়া।

মিছিল দেখে অভিভূত ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত চিন্মোহন সেহানবীশকে বলেন, 'আমায় একটা ঠিকা গাড়ি ভাড়া করে দিতে পারিস্? আমি বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের বলব—কী মশায়, এখন চাষী মজুরের জুতো কেমন লাগছে? অ্যাঁ, ব্রাহ্মণ সন্তানেরা! এরা এদ্দিন বলেছে, রাশিয়ার চাষী মজুর কি পারে খাঁটি আর্য হিটলারের সঙ্গে! দেখুন না কেমন 'নাইফ ইন বাটার' (মাখনের মধ্যে ছুরি)-এর মতো হিটলারের প্যানৎসার বাহিনী রাশিয়ার ঢুকে পড়েছে।

আমি এখন তাদের মুখগুলো একবার দেখতে চাই। সবাইকে আমি চিনে রেখেছি—কাউকে ভুলিনি। তাদের আমি বলব, আর বেশি দেরি নেই—এখানেও চাষী মজুরের জুতো খেতে হবে।'

দুই

ঐতিহাসিক মিছিলটির সাক্ষী অগণিত কলকাতাবাসী। কিন্তু দেখা মিলল না স্বতঃস্ফূর্ত সহর্ষ কোন অভ্যর্থনার আভাস। উচ্ছ্বাসের চিহ্নমাত্র ছিল না তাদের চোখে মুখে। স্থির বোবা চাউনি; ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু বিরূপ মন্তব্য: 'কমিউনিস্টরা এত লোক জোটাল কী করে! অন্তত দশ হাজার টাকা খরচ হয়েছে মিছিলটার জন্যে, কোথা থেকে পেল এরা এত টাকা!'

এই শীতল ঔদাসীন্যে সুশোভন সরকার মশায়ও বিস্মিত। তিনি লিখছেন:

'ফ্যাশিজম-এর উদ্ধত প্রাসাদ এতদিনে ধূলিসাৎ হতে চলেছে, ইয়োরোপে দিকে দিকে আজ মুক্তির উত্তেজনা, পৃথিবীর দেশে দেশে জনসাধারণের মনে উল্লাস, অথচ সেই আনন্দ আমাদের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজে প্রকাশ পাচ্ছে না এ-কথা অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন। ঘরে বাইরে, ট্রামে বাসে, অফিস আদালতে, স্কুলে-কলেজে চোখে পড়ে গভীর ঔদাসীন্য ও নির্জীব জড়ভাব, এমনকি মাঝে মাঝে একটা আতঙ্কের ছায়াও দেখা যায়, বললে অত্যুক্তি হবে না।' (ফ্যাশিজম-এর শেষ অঙ্ক, পরিচয়, বৈশাখ ১৩৫২)

আসলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে মানুষের অবস্থান কমিউনিস্টদের বিপরীত মেরুতে। যুদ্ধ চলাকালীন সাধারণ মানুষের চেতনা উল্টোখাতে বইছিল। ফ্যাসিজম নয়, তাদের কাছে একমাত্র সত্য—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন অস্তিত্ব! ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পদানত থেকেও বলতে হবে—এই যুদ্ধ, জনযুদ্ধ! যেহেতু রাশিয়া আক্রান্ত! এবং ইংরেজ সরকার ও সোভিয়েত রাশিয়া এখন একই শিবিরে—নিছক এই কারণে!

এতখানি বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি দেশের অগণিত সাধারণ মানুষের কাছ থেকে প্রত্যাশিত কি?

অতএব কমিউনিস্ট পার্টির 'জনযুদ্ধ' স্লোগান সেদিন মধ্যবিত্ত মনে বিশেষ দাগ কাটেনি। এ বিষয়ে সুমিত সরকারের মন্তব্য: কী করেই বা কাটবে। যে সব ব্রিটিশ মার্কিন ও অস্ট্রেলীয় ফৌজ ভারতে এসেছে জাপানকে রুখতে—তাদের বেশিরভাগের আচরণ মোটেই 'জনযুদ্ধে'র আদর্শ পতাকা-বাহীদের মতো নয়। (মডার্ন ইণ্ডিয়া, পৃ ৩৯২)।

যুদ্ধ চলাকালীন সৈন্যদের দাপাদাপিতে সাধারণ গৃহস্থের জীবন দুর্বিষহ। তাদের দৌরাত্ম্যের কথা বলতে গিয়ে খোকা রায় জানান, 'চট্টগ্রাম, ঢাকা, কুমিল্লা সর্বত্র—যেখানে ব্রিটিশ আর্মি—সেখানেই ত্রাস। লোকের চোখে তারা মূর্তিমান বিভীষিকা। যে অত্যাচার তারা লোকের উপর করেছে! সে সময় ব্রিটিশ সরকার আফ্রিকা থেকে এমন এক জাতের সৈন্য আমদানি করেছিল—যারা একেবারে বর্বর। ধরুন কুমিল্লায়—গোটা শহরে পাঁচ সাত ঘরের বেশি মেয়ে নেই। সবাই শহর ছেড়ে চলে গেছে। মেয়ের খোঁজে ঐ আফ্রিকান সৈন্যরা গোটা শহর চষে বেড়াচ্ছে। তারা শুধু একটা কথা জানে—বিবি! বিবি আর বিবি!! লোকে হৈচৈ করে তাদের তাড়া করে ফিরছে। পার্টি অফিসের নীচে একটা ঘড়ির দোকান। একদিন তারা জনাকয় মিলে সেখানে এসে হানা দিল। একটা কাপড় পেতে যত হাত-ঘড়ি পেল, সব পোঁটলা বেঁধে—দে দৌড়। লোকেরা চারধার থেকে ছুটে এল। কাছে যেতে সাহস করছে না কেউ—শুধু দূর থেকে ঢিল ছুঁড়ছে। কলকাতায় তো কেউ চৌরঙ্গী অঞ্চলে সন্ধ্যের পর যেতে ভরসা পেত না। এহেন অবস্থায় লোকে কী করে বুঝবে—এটা হচ্ছে অ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট আর্মি (ফ্যাসিবাদ-বিরোধী বাহিনী)?'

তাই দেশের মানুষ দিন গুনছিল, কবে ইংরেজ এ-যুদ্ধে হারবে। অন্নদাশংকর রায়ের 'ক্রান্তদর্শী' উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র সুকুমার দত্ত বিশ্বাস সদ্য বিলাত থেকে এসে অনুভব করছেন:

'এদেশে দেখছি হিটলারের অগণ্য ভক্ত। অনেকের বিশ্বাস হিটলার আসলে নিষ্ঠাবান হিন্দু। তার প্রমাণ হিন্দুদের স্বস্তিক হিটলার তাঁর বাহুতে ধারণ করেন। স্বস্তিক তাঁর নাৎসীদলের প্রতীক। ওরাও নাকি আসলে হিন্দু। জার্মানরা জিতলে আর্যরা ভারতে আসবে। এদেশের আর্যদের সঙ্গে হাত মেলাবে। এদের যা কিছু আক্রোশ তা ইংরেজের বিরুদ্ধে।' (ক্রান্তদর্শী, ২য় খণ্ড, পৃ ৩১)

সমর মুখার্জির মতে, 'যুদ্ধ চলাকালীন মধ্যবিত্ত মানসিকতার অদ্ভুত প্রকাশ। মধ্যবিত্ত মানুষ হিটলারের জয় কামনা করেছে—অথচ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চেতনা অত্যন্ত প্রবল।'

আসলে ব্রিটিশ-বিরোধী জাতীয়তাবাদী চেতনার ঊর্ধ্বে উঠে কেউই বিশ্বজনীন প্রেক্ষাপটে যুদ্ধের স্বরূপ বিশ্লেষণে রাজি নন। কি সুভাষ বসুর অনুগামীরা—কি দক্ষিণপন্থী গান্ধীভক্ত কংগ্রেসী বা জয়প্রকাশের কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট দল—এই যুদ্ধ সকলেরই চোখে এক সুবর্ণ সুযোগ। এই যুদ্ধে যে ইংরেজ হারছে—এ-বিষয়ে সবাই নিঃসংশয়। ইতিমধ্যে সিঙ্গাপুর-রেঙ্গুনের পতন ঘটেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নাভিশ্বাস উঠেছে। অতএব শেষ আঘাত হানো।

ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে, আন্তর্জাতিকতাবোধ ও জাতীয়তাবাদের দ্বন্দ্ব কমিউনিস্ট ও অন্যদের মধ্যে সৃষ্টি করল এক দুস্তর ব্যবধান। আন্তর্জাতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ কমিউনিস্টদের দৃষ্টিতে মূল শত্রু ফ্যাসিজম। এবং যুদ্ধে ফ্যাসিজমের জয় ও লালফৌজের পরাজয়ের অর্থ মানবসভ্যতার বিনাশ ও সমাজবিকাশের ধারায় ছেদ। অপরদিকে জ্বলন্ত বাস্তব হল—দেশের মাটিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন অস্তিত্ব। স্বদেশ ও বিশ্বকে মেলাতে গিয়ে এক সংকটের আবর্তে গিয়ে পড়ে ভারতের কমিউনিস্টরা।

প্রসঙ্গত, এ নিয়ে অন্তহীন বিতর্কের আজও অবসান ঘটেনি। যেমন, মনোরঞ্জন হাজরা মনে করেন, জাতীয় আন্দোলনের সংগ্রামী অংশ—সশস্ত্র সংগ্রামের উত্তরসূরি হচ্ছে কমিউনিস্টরা। ১৯৪২ সালের জনযুদ্ধ লাইন কমিউনিস্ট আন্দোলনকে সেই উত্তরাধিকার থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে।

আরও দেখা যাচ্ছে জীবনের শেষ অধ্যায়ে পেঁছে ড. গঙ্গাধর অধিকারীর মধ্যেও ঘটেছে দ্বিতীয় চিন্তার উন্মেষ। তিনি লিখেছেন:

'ফ্যাসিবাদ-বিরোধী যুদ্ধে আমাদের সাধারণ সমর্থন ঘোষণা সঠিক ছিল। তাছাড়াও জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে আমাদের দেশকে রক্ষা করতে হবে, এই কথা বলাও সঠিক ছিল। কিন্তু জাতীয় আন্দোলন ছাড়া কি কমিউনিস্ট পার্টি দেশকে রক্ষা করতে পারত? একথা কল্পনা করা কি বাস্তবানুগ ছিল যে আক্রমণের মুখোমুখি হয়ে দেশের জনসাধারণ, জাতীয় নেতৃত্ব ফ্যাসিবাদের পক্ষে চলে গেছে বলে তাদের ত্যাগ করবে এবং ফ্যাসিবাদ-বিরোধী দেশপ্রেমিক কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে মিলিত হবে?...একমাত্র পথ ছিল জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া—তার বিরোধিতা করা নয়। জাতীয় আন্দোলনের এই আবর্তের মুখে, সেই সম্পর্কে আমাদের ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি—প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদ সম্পর্কে আমাদের মতান্ধ উপলব্ধি ও জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উদ্ভূত হয়েছিল।' (কমিউনিস্ট পার্টি অ্যান্ড ইণ্ডিয়াজ পাথ, পৃ ৮১ ইং)

তিন

সুমিত সরকারের ভাষায়, ১৯৪২ সালের গ্রীষ্মকালে গান্ধীজী আকস্মিকভাবে জঙ্গী মেজাজের পরিচয় দিতে থাকেন। তিনি বারবার বলতে থাকেন—ইংরেজ তুমি এদেশ ছেড়ে চলে যাও। হয় ভগবানের কাছে নয়তো অরাজকতার কাছে আমাদের ছেড়ে চলে যাও। 'এই সুশৃংখল অরাজকতার তুলনায় কল্পনাহীন নৈরাজ্য বরঞ্চ শ্রেয়।'

১৯৪২ সালের ৯ই আগস্ট ভোর রাত্রিতে সংগ্রামের শীর্ষস্থানীয় নেতারা গ্রেপ্তার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় আন্দোলন প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আকার নেয়। সুমিত সরকার লিখেছেন :

'এতটা বোধহয় বড়লাট লিনলিথগো পর্যন্ত কল্পনা করতে পারেননি। এক অসম যুদ্ধের ময়দানে নামিয়ে কংগ্রেস নেতাদের আন্দোলনকে তিনি চূর্ণ করতে চেয়েছিলেন। তাঁদের হিসেবে, কংগ্রেস বড় জোর ১৯৩২ সালের মতো দেশের এখানে ওখানে অসহযোগ আন্দোলনের ধাঁচে কিছু সরকার-বিরোধী জমায়েত হয়তো গড়ে তুলতে পারবে। সরকার বিব্রত হলেও, তার দ্বারা যুদ্ধ-প্রচেষ্টা তেমন ব্যাহত হবে না। কিন্তু যা ঘটল তা অভাবনীয়। ১৯৪২ সালের ৩১শে আগস্ট বড়লাট ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলকে এক গোপন তার-বার্তায় জানাচ্ছেন : '১৮৫৭ সালের পর এতবড় বিদ্রোহ ভারতের বুকে ঘটেনি। এর ব্যাপ্তি ও মারাত্মক চেহারার কথা আমরা সামরিক নিরাপত্তার খাতিরে কারও কাছে প্রকাশ করিনি।' (মডার্ন ইণ্ডিয়া, পৃ: ৩৯১)

'নজিরবিহীন অত্যাচার চালিয়ে আগস্ট বিদ্রোহ দমন করা হয়। ১৯৪৩ সালের শেষাশেষি সরকারি বিবরণ থেকে জানা যায় যে, এ পর্যন্ত মোট ৯১ হাজার ৮৩৬ জন গ্রেপ্তার এবং পুলিশ ও মিলিটারির গুলিতে ১০৬০ জন প্রাণ হারিয়েছে। বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে লাঠি-গুলি-টিয়ার গ্যাস প্রভৃতি চিরাচরিত ব্যবস্থা অবলম্বন ছাড়া বিমান থেকে মেশিনগান চালানোর দৃষ্টান্তও রয়েছে। পিটুনি কর আদায় করা হয় ব্যাপকভাবে। তাছাড়া প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত ও নারীধর্ষণ প্রভৃতি ঘটনার সংখ্যাও কম নয়। অপর-দিকে বিদ্রোহীরা ২০৮টি থানা ও পুলিশ ফাঁড়ি, ৩৩২টি রেল স্টেশন এবং ৯৪৫টি ডাকঘর ধ্বংস করেছে। বিদ্রোহীদের হাতে ৬৩ জন পুলিশ প্রাণ হারিয়েছে এবং বিদ্রোহীদের দলে যোগ দিয়েছে ২১৬ জন পুলিশ। অন্তত ৬৬৪টি ক্ষেত্রে বিদ্রোহীরা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে।' (ঐ, পৃ: ৩৯৫-৯৬)

আগস্ট আন্দোলনের ব্যাপ্তি ও গভীরতার কথা কমিউনিস্ট নেতাদেরও অজানা নয়। সোমনাথ লাহিড়ী লিখেছেন :

'আজ পর্যন্ত দেশের ইতিহাসে এমন সর্ব্বগ্রাসী পদ্ধতিতে সংগ্রাম আর

কখনও হয় নাই। সত্যাগ্রহ হইতে আরম্ভ করিয়া হরতাল, রেললাইন উপড়ানো, যুদ্ধ ব্যবস্থা ধ্বংস, বোমা ফেলা প্রভৃতি যে-কোনো সম্ভব পদ্ধতিতে সংগ্রাম চলিয়াছে, যে-কোনো রকমে সম্ভব ব্রিটিশ সরকারকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা হইয়াছে।

আজ পর্যন্ত দেশের ইতিহাসে এমন তীব্র সংগ্রাম আর কখনও হয় নাই। যে-সমস্ত দেশভক্ত বাহিরে ছিলেন তাঁহাদের নির্দ্দেশে দেশবাসী অবহেলায় জীবন দিয়াছে; পাইকারী জরিমানা ও পাইকারী দমননীতি হাসিমুখে বরণ করিয়াছে। তাহাদের ঘর জ্বলিয়াছে, জমি শ্মশান হইয়াছে, তবুও তাহারা ত্যাগ ও বীরত্বের অতুলনীয় উদাহরণ দেখাইয়াছে। প্রধান প্রধান নেতা সকলেই বন্দী, যাঁহারা বাহিরে তাঁহাদেরও অতি সন্তর্পণে লুকাইয়া কাজ করিতে হয়—তবুও দেশবাসী অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে সংগ্রাম সংগঠিত করিয়াছে, আগের দিনের তুলনায় সংগঠনের অপূর্ব উদাহরণ দেখাইয়াছে।' (৯ই আগস্টের এক বছর, পৃ ২-৩)

কমিউনিস্ট পার্টির দৃষ্টিতে আগস্ট আন্দোলন ব্যাপকতায় ও তীব্রতায় নিঃসন্দেহে অভূতপূর্ব। কিন্তু তবুও তা লক্ষ্যভ্রষ্ট। কারণ বিশ্বের জনগণের ফ্যাসিবাদ-বিরোধী লড়াইয়ের আঙিনার বাইরে এই আন্দোলন। সোমনাথ লাহিড়ীর ভাষায়, 'কথা নয়, প্রত্যক্ষ কাজের মধ্য দিয়া দেখাও, ইউরোপ-আমেরিকার ফ্যাসিস্ট-বিরোধী জনগণের যুদ্ধ তুমিও লড়িতেছ—তাহা হইলে তোমার দাবীর পিছনে তাহাদের ক্রম-বর্দ্ধমান সমর্থন নিশ্চয়ই লাভ করিবে।' (ঐ, পৃ ২৮)

প্রসঙ্গত, পার্টি জনগণের আচরণের সমালোচনা করেনি—নিন্দা করেছে ব্রিটিশ সরকারকে—সরকারী চণ্ডনীতিকে। আগস্ট আন্দোলনের শুরুতেই পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপত্র, 'পিপলস্ ওয়ার'-এর সম্পাদকীয় নিবন্ধে লেখা হয় :

'সাম্রাজ্যবাদী আমলাতন্ত্র যে পাশবিক দমন ব্যবস্থাকে বিদ্যুৎগতিতে দেশের মধ্যে বিচরণ করিতে দিতেছে, তাহাই দেশে আগুন জ্বালাইয়াছে। জনগণের সঞ্চিত ক্রোধ ও অসন্তোষকে সংগঠনহীন ও স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভের পক্ষে ঠেলিয়া দেওয়ার চেষ্টাই উহারা করিয়াছে। তাহার পর সে বিক্ষোভকে উহারা লাঠি, বুলেট ও কাঁদুনে গ্যাস দিয়া ঠেকাইতে চাহিয়াছে।…

…তাহারা জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করিতে দেয় নাই। এখন তাহারা আমাদের একমাত্র সংগঠিত শক্তি কংগ্রেসকে চূর্ণ করিতে চাহিতেছে। কারণ একমাত্র কংগ্রেসই জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া উহাদের অনিচ্ছুক হস্ত হইতে জাতীয় সরকার ছিনাইয়া আনিতে পারে।' (পিপলস্ ওয়ার, ১৬. ৮. ১৯৪২)

১৯৪৩-এর মার্চে অনুষ্ঠিত পার্টির তৃতীয় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের

প্রতিনিধিদের ভবানী সেন জানাচ্ছেন, 'বাংলায় এই 'সংগ্রামে' জনগণ খুব ব্যাপকভাবে যোগ দেয়নি। তার বড় কারণ, এ প্রদেশের অধিকাংশ লোক মুসলমান, কংগ্রেসের 'সংগ্রামে'র হুমকি তাদের প্রভাবিত করতে পারেনি, কংগ্রেসের সাথে মুসলীম লীগের অনৈক্য তাদের সংগ্রাম থেকে দূরে রেখেছে।'

ভবানী সেনের মতে, বাংলার ছাত্রসমাজ প্রথম থেকেই কিন্তু আলোড়িত হয়েছে এবং এক মেদিনীপুর ছাড়া আর সর্বত্রই এই ছাত্রসমাজ অন্যান্য শ্রেণীর চেয়ে ঢের বেশি আলোড়িত হয়েছে।

আগস্ট আন্দোলনের পটভূমিতে কমরেডদের প্রতি পার্টির নির্দেশ—পুলিশ ও জনগণের মাঝখানে দাঁড়াও। স্বভাবতই ঐ বিষয়ে ছাত্র-ফ্রণ্টের কমরেডদের পার্টির প্রতি কঠিন আনুগত্যের পরীক্ষা দিতে হয়। সেদিনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা সূত্রে তদানীন্তন ছাত্রনেতা কমল চ্যাটার্জি বলেছেন :

'কলকাতায় আগস্ট আন্দোলনের চেহারা দেখে আমি অভিভূত। হাজার হাজার ছেলে পথে নেমেছে। প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে ছাত্রদের উপর লাঠি-চার্জ হল—ছেলেদের মাথা থেকে রক্ত ঝরছে। আমাদের কথা ছেলেরা শুনছে না। আমরা আটকাতে পারলাম না। পার্টি লাইন দেশপ্রেমের তোড়ে ভেসে গেল। এত ছেলেকে পথে নামতে আগে কখনো দেখিনি। মনে আমার সংশয়ের খোঁচা—রয়ইস্ট (মানবেন্দ্রনাথ রায়-পন্থী) হয়ে যাচ্ছি না তো ! ছাত্র ফেডারেশনের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ আমি ; নাহলে আমিও আগস্ট আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তাম। রিপন কলেজ সেদিন ঝড়ো বন্দর। আমি ছাড়া আরো তিনজন—সুকুমার (গুপ্ত), সিরাজ (আলি) ও অজিত। আমরা তিন-চার দিন ছেলেদের ঠেকালাম। আমাদের মনে হত, ছেলেরা যদি রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে তাহলে আমাদের পরাজয়। শেষ পর্যন্ত হার স্বীকার করতে হল।

আগস্ট আন্দোলনেই প্রথম কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের সামনে ট্রামে আগুন দেওয়া হল। রাস্তায় রাস্তায় পুলিশ ও ছাত্রদের লড়াই এই প্রথম দেখলাম। এই প্রথম আর্বান (শহুরে) গেরিলা লড়াই-এর ঘটনা কলকাতার বুকে।'

উত্তর কলকাতার টাউন স্কুলের গেটে অমিয় মুখার্জি ছাত্রদের ঠেকাতে গিয়ে মার খেলেন। শান্ত নিরুত্তেজ সৌম্যদর্শন অমিয় মুখার্জি পার্টির উত্তর কলকাতা শাখার সম্পাদক। তিনি শেষ পর্যন্ত উপলব্ধি করলেন : যুক্তির চেয়ে আবেগ বড়।

বরিশাল শহরের এক স্কুলের গেটে ছাত্ররা থুতুতে ভিজিয়ে দিল সুবাস-সিঞ্চন রায় ও অধীর চক্রবর্তীকে। তাঁরা সে স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র এবং সেরা ছাত্র।

ভবানী সেন তাঁর প্রতিবেদনে স্বীকার করেছেন—ছাত্রদের আগুনের মুখ থেকে রক্ষা করা গেল না। তারা ঝাঁপ দিল। তিনি বলেছেন, 'প্রায় সব

জেলাতেই ছাত্রদের মধ্যে চলেছে দীর্ঘকালব্যাপী ধর্মঘট। এইসব ধর্মঘটের সময় কর্তৃপক্ষ স্কুল-কলেজ বন্ধ করে ছাত্রদের জমায়েত ভেঙেছে।'

জাতির জীবন-সমুদ্রে উন্মাদ আলোড়ন জাগিয়ে অবশেষে আগস্ট আন্দোলন ঝিমিয়ে এল। সে সমুদ্র এখন নিস্তরঙ্গ জলাভূমি।

চার

ফ্যাসিজমের অমানবিক রূপ সাধারণ মানুষের অদেখা ও অজানা। তবুও সুদূরের যুদ্ধ এগিয়ে এসে গ্রাস করল তার দিন-রাত্রি। তার নিষ্প্রদীপ বিনিদ্র রাত সাইরেনের তীব্র আর্তনাদে খানখান হয়ে যায়। অসহায় চোখ মেলে সে দেখে বিদেশী সৈন্যদের দাপাদাপি আর রাজপথে ক্ষুধিত কঙ্কালের মিছিল। রুদ্ধ দুয়ারের ওপার থেকে শোনা যায় ক্ষুধাতুর শিশুর কান্না। যুদ্ধ হানা দিয়েছে আকাল আর মারী-মড়কের চেহারা নিয়ে।

আগস্ট আন্দোলনের ঠিক এক বছর পর সোমনাথ লাহিড়ী লিখছেন :

'দেশ জুড়িয়া ক্ষুধার করুণ ক্রন্দন, আর্তনাদের শক্তিও নিঃশেষ হইয়াছে। সমগ্র বাংলার জীবনই যেন আজ বিকীর্ণ কঙ্কালের মূর্তি ধরিয়া পথের ধারে ধারে ধুঁকিতেছে। মৃত্যুই তাহাদের একমাত্র গতি।' (৯ই অগাস্টের এক বছর, পৃ ৪৫)

১৯৪৩ ও ১৯৪৪—বছর দুটি যেন মানুষের জীবনে দুঃসহ অভিজ্ঞতার ঝাঁপি উপুড় করে দিয়েছে। আকাল মহামারী অবক্ষয় মৃত্যু—এই বুঝি তার বিধিলিপি। সর্বাত্মক ধ্বংসের কিনারায় এসে পৌঁছেছে গোটা দেশ ও সমাজ—তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। চেতনার স্পন্দনটুকুও কোথাও আর অবশিষ্ট নেই।

নৈরাশ্যের আঁধার কবি মঙ্গলাচরণকেও যেন গ্রাস করেছে। তিনি পালিয়ে যেতে চান দেশ সমাজ ও আত্মজনের কাছ থেকে দূরে—বহুদূরে। তিনি লিখছেন :

> অনেকদিন অনেক দূর রেললাইন ধরেই জীবন থেকে পালাই।
> উনিশশো তেতাল্লিশ · উনিশ শো চুয়াল্লিশ…শহর থেকে শহর।
> বাংলাদেশে হারিয়ে যাই, বাংলাদেশ ছাড়াই। পথের শেষে খবর :
> পিছন থেকে নরক তার হাত বাড়ায়—মড়ক, রুগ্নদেহ বালাই ;
> সামনে মন টলছে, ঘোর কুয়াশা দিক্সীমায়, সন্ধ্যা গোনে প্রহর।
> ('ভ্রমণ', মেঘ বৃষ্টি ঝড়, পৃ ১১)

যুদ্ধের গতি এখন মিত্রশক্তির অনুকূলে। জাপানীরা আসামের দরজা

পেরুতে পারেনি। স্টালিনগ্রাড রণাঙ্গনে দ্বিতীয় যুদ্ধের পরিণাম নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে। লালফৌজের পাল্টা আক্রমণ শুরু এবং এবার নাৎসী বাহিনীর পিছু হঠার পালা। কিন্তু এত বড় পটপরিবর্তন—এই যুগান্তকারী পালা-বদল—ক্ষুধা ও মহামারী কবলিত উলঙ্গ অর্ধ-উলঙ্গ মানুষের কাছে কতখানি অর্থবহ! সেদিন গ্রামবাংলার মানুষ নিছক বাঁচার জন্যে আর এক গৌরবহীন কঠিনতর লড়াইয়ে ব্যস্ত। ছিন্নভিন্ন গ্রামবাংলা সেদিন বাংলা গল্প উপন্যাস ও কবিতার চালচিত্র। সেকালের সংবেদনশীল কথাশিল্পীদের কলম ফুটিয়ে তুলেছে মানুষের চরম দুর্দিনের দিনলিপি। মর্মন্তুদ কিন্তু বিশ্বস্ত প্রতিলিপি।

'সাহেব ডাকল আম্মাকে, বললে, বুড়ী কি চাই তোমাদের?
—ভাত দাও, সাহেব, ভাত দাও, ফ্যান দাও, ফ্যান।
—কোথা থেকে সরকার তা দেবে?—লড়াইয়ের টাইম।'

লিখছেন গোপাল হালদার :

'শুনেই আম্মা ক্ষেপে গেলেন—লড়াইয়ের টাইম তোমাদের কোথা সাহেব? তোমাদের হাকিম চলছে, হুকুম চলছে, আলো জ্বলছে, পাখা চলছে, গাড়ী চলছে, ফূর্তি চলছে। লড়াইয়ের টাইম তো আমাদের—আমাদের ছেলে গেছে লড়াইতে, আমরা পাই না ভাত; হালিম গেছে ফৌজে, আর তার বাচ্চারা আজ না খেয়ে মরছে। ওয়ালী মরেছে ফৌজে—তার আউরাৎ সেদিন পেটের জ্বালায় ফাঁসি দিতে গেল। আমরাই গেছি লড়াইতে, আর আমরাই না খেয়ে মরছি—লড়াই তোমাদের কি? জান দিয়েছে লড়াইতে আমাদের ব্যাটারা—তোমরা ফ্যান দাও, ফ্যান—চাট্টি করে ফ্যান ভাত।' (তেরশ পঞ্চাশ, পৃ ১৮৭-৮৮)

১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসেও ধান বিক্রি হয়েছিল চৌদ্দ আনা মণ দরে। ১৯৪৩ সালে মাত্র তিন মাসের মধ্যে সেই চালের দর তিন টাকা মণ থেকে ছাপান্ন টাকায় গিয়ে পৌঁছাল। তারপর দেখা গেল শতাব্দীর করুণতম দৃশ্য। লক্ষ লক্ষ নিরন্ন মানুষের কলকাতামুখী মিছিল। ভাত নয়—তারা ফ্যান চাইছে শহরবাসীর কাছে।

গোপাল হালদার লিখছেন :

'গ্রাম খালি করে চলে গেল পুরুষেরা। যুদ্ধে গেছল তারা প্রথম খাটতে, গেছল সেবার কোরে তারপর; তারপর চেয়েছিল যেভাবে পারে বাঁচতে—বীজধান খেয়ে, জমি বিক্রি করে, গরু বিক্রী করে, ঘটিবাটি বন্ধক দিয়ে। তারপর এল গ্রামের বাইরে—ছুটল এখন ভাতের খোঁজে—শুধু নিজের প্রাণ বাঁচানোর চিরন্তন দায়ে। স্ত্রী নয়, পুত্র নয়, পিতা নয়—কেউ আর আপনার নয়। সবচেয়ে আদিম যে চেতনা প্রাণরক্ষা, তাই তাড়িত করে নিয়ে চলেছে তাদের—'বাঁচো — বাঁচো'। গ্রামে পড়ে রয়েছে নারী, বৃদ্ধ, শিশু, বালক।

বাঁচবার পথ আছে আর কিছু? আছে বৈকি—স্ত্রীলোকেরা এখনো তার বড় সম্পদ। তার দাম আছে—একমাত্র তারই দাম এখনো আছে। জোতদারের ঘরে ধান আছে, মহাজনের ঘরে অর্থ আছে, তার অনুগৃহীতদের পেটে খাদ্য আছে। আর মিলিটারির নানা কাজের টাকা আছে—সামরিক বেসামরিক নানা লোকের হাতে। স্ত্রীলোকের যৌবনের দাম দিতে ব্যগ্র তারা। যুবতী স্ত্রীলোকের বাঁচবার সুবিধা আছে, অধিকার আছে। ঘর, ধর্ম, মর্যাদা! কতক্ষণের তা? স্বামী? সন্তান?—সে সব তো মানুষের আবিষ্কার—সভ্যতার দান; জীব জগতের সবচেয়ে চরম তাড়না তো ক্ষুধা! ক্ষুধা! ক্ষুধা! জয়ী হচ্ছে জন্তু; পরাজয় হচ্ছে মানুষের।' (তেরশ পঞ্চাশ, পৃ ৩০৫)

গোপাল হালদার দেখছেন, 'নিরন্নের জোয়ার গ্রাম ছাপিয়ে এসে পড়েছে শহরে—রাসবিহারী এভিনু্য ছাপিয়ে বন্যা পেঁছেচে রসা রোডে—পেঁছেচে তা চৌরঙ্গীর সীমানায়। চব্বিশ পরগণা, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি—বুঝি সমস্ত বাঙলার হতভাগ্যরা দেখতে এসেছে তাদের রচিত ঐশ্বর্য—প্রাসাদপুরী কলকাতা।' (ঐ, পৃ ৩৩৭)

দৃশ্যান্তরে দেখা যাচ্ছে:

'চারদিকে ডাস্টবিনের ছাপিয়ে পড়া আবর্জনা, তার চারদিকে পাঁতি পাঁতি করে খুঁজছে মানুষ খাদ্য। বুড়ো, ছেলে, নারী-পুরুষ—শ্মশানের প্রেতের মূর্তি—খাদ্য খুঁজছে; ছক কেটে কেটে বসে আছে সারের পর সার এখনি—বিকাল চারটায় কণ্ট্রোলের দোকান খুলবে। আবার দলে দলে ছুটছে পথের উপর দিয়ে আরও মানুষ দুপুরের লঙ্গরখানার উদ্দেশ্যে। অসংখ্য তারা, হাতে সেই ভাঙা থালা, মাটির পাত্র, টিনের কৌটো। ঘুরছে দলে দলে —শিশু বুকে নিয়ে, ছেলের হাত ধরে। ফুটপাতে আর জায়গা নেই—পথে তাদের জন্য গাড়ী ট্রাম চলা দায়।

এরা মরীয়া হয়ে উঠেছে। লঙ্গরখানা এদের স্বর্গ, ফ্যান এদের অমৃত। এরা বাঁচতে চায়, বাঁচতে চায়।' (ঐ, পৃ ৩৩৯)

নিছক উপন্যাস নয়। গোপাল হালদারের রচনা এক যন্ত্রণাবিদ্ধ সময়ের সার্থক দলিল।

এই পটভূমিতে কবি সমর সেন দেখছেন:

> আজ তাম্রসীতা, উলঙ্গিনী দুর্ভিক্ষকন্যা আমাদের দেশ
> লঙরের সামনে অস্থি চর্মসার সন্তানের ভিড়ে নীরবে বসে।
>
> ('ক্লান্তি', সমর সেনের কবিতা, পৃ ১১০)

একমাত্র রাতের অন্ধকারই আজ গাঁ-ঘরের মেয়ে-বৌদের লজ্জার আবরণ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন:

'রাঘব উঠে দাঁড়িয়ে হুমড়ি খেয়ে গৌতমের পায়ে, দুহাতে দু'পা চেপে ধরে

বসে, আজ চলাচলি নাই বাবুঠাকুর ; কাপড়গুলো মোদের দিয়ে তুমি যাও গো। দানছত্তর করে যাও বাবুঠাকুর। মোদের ঘরে মেয়েগুলো ন্যাংটো হয়ে আছে গো। মেয়েগুলো ন্যাংটো বাবুঠাকুর। মা-বুনু ন্যাংটো, মেয়ে-বৌ ন্যাংটো—

'ন্যাংটো তো ঘরে ঘরে'। (রাঘব মালাকার, আজ কাল পরশুর গল্প, পৃ ৪৪১)

কোথা দিয়ে কী সব হয়ে গেল ! সব ছারে খারে গেল।

'পেটের দায়ে বামাপদর বৌ কোথায় গেল—আবার মাস কয় পর ফিরে এল। সমাজের পাঁচ জনার বিচার কি ?'

সমাজ ! মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দেখছেন, গোটা সমাজটা যেন বামাপদর ভাঙা ঘরের মতো—'খুঁটির অভাবে দাওয়ার চালাটা হুমড়ি খেয়ে পড়েছে কাত হয়ে।' (ঐ, পৃ ৩৩৫)

এই অমানবিক পরিবেশে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনে হচ্ছে, সাহিত্য সংস্কৃতি—সবই আজ অবান্তর। তিনি লিখছেন :

'বিশ্বব্যাপী ধ্বংস লীলার তাণ্ডব মহাতাণ্ডব চলছে আজ ছ'বছর ধরে। যুদ্ধ বাংলার দ্বারদেশে। ঝড় জলপ্লাবন দুর্ভিক্ষ মহামারী অব্যাহত গতিতে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। আজ বাঙলার চিত্রশিল্পীর মডেল হয়ে উঠেছে—নরকঙ্কাল, গলিত শব, তার চারিপার্শ্বে ক্ষুধার্ত মাংসভুক কুকুর শেয়াল শকুন ; সাহিত্যিকের দৃষ্টির সম্মুখ থেকে চিরন্তন মানবতার মহাপ্রকাশ আজ স্তব্ধ হয়ে গেছে। আজিকার দিনে সাহিত্যের সূক্ষ্ম এবং ললিত রসতত্ত্বের আলোচনা দীর্ঘকালের জন্যই স্তব্ধ হয়ে গেল।' (মন্বন্তর ও সাহিত্য, ভারতবর্ষ, চৈত্র ১৩৫০)

পাঁচ

এখনো ভুলতে পারেননি নৃপেন চক্রবর্তী সেই ছেলেটির কথা। তখন তিনি রাজশাহীর এক গ্রামে। তাঁর খেতে বসার সময় রোজ আসত ছেলেটি একটা বাটি হাতে। বলত, কমরেড—ভাত। বিচলিত নৃপেন চক্রবর্তী পার্টিকে লিখলেন, 'আমাকে এখান থেকে তোমরা সরাও। আমি না খেতে পেয়ে মরে যাব। ওদের মাঝে আমি কী করে খাব !'

মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়ে কমরেডরা যেন দিশেহারা। ১৯৪৩ এর ৩০শে ডিসেম্বরের পার্টি চিঠিতে ফুটে ওঠে এক সার্বিক সংকটের ছবি :

১. 'দুর্ভিক্ষের আঘাতে বাংলায় অনুমান দেড় কোটি লোক দুঃস্থ হইয়াছিল,

তাহাদের মধ্যে বোধ হয় পঞ্চাশ লক্ষ লোক মরিয়া গিয়াছে, বাকি এককোটি এখনও দুঃস্থাগারে। ইহাদের অধিকাংশই কৃষি মজুর কিন্তু কাজ করিতে তাহারা অক্ষম। অথচ সরকারের তরফ হইতে রিলিফের কাজ বন্ধ করিয়া দিবার কথা শুনা যাইতেছে।'

২. 'দুর্ভিক্ষের পর আসিয়াছে দুরন্ত সংক্রামক ব্যাধি, বিশেষত ম্যালেরিয়া। ব্যাপক অগ্নিকাণ্ডের মত এই ম্যালেরিয়া সারা বাংলায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রায় অর্ধেক লোক ম্যালেরিয়ায় শয্যাগত, এবং প্রায় এককোটি লোক মৃত্যুর সম্মুখীন। অথচ উপযুক্ত পরিমাণে কুইনিন সরবরাহের ব্যবস্থা নাই। লোভী মজুতদারেরা কুইনিন মজুত করিয়া চোরা কারবার চালাইতেছে। ত্রিশ টাকার কুইনিন তিনশত টাকায় বেচিতেছে।'

৩. 'অনাহারে এবং রোগের আঘাতে গ্রাম অঞ্চলে ভীষণ শ্রম সংকট বা মজুরের অভাব দেখা দিয়াছে। গ্রাম্য মজুরদের তিন ভাগের এক ভাগ মাত্র কার্যক্ষেত্রে সচল আছে। চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর, বরিশাল প্রভৃতি জেলায় মজুরের অভাবে মাঠের ধান মাঠে পড়িয়া আছে, সময়মত কাটা হইতেছে না। এইভাবে প্রচুর ধান এবার নষ্ট হইবে। নৌকা গরুরগাড়ী প্রভৃতি গ্রাম্য যানবাহন একরকম অমিল। গ্রাম হইতে সহরে ধান রপ্তানি করা বা সহর হইতে গ্রামে কাপড়, নুন, কেরোসিন, চিনি প্রভৃতি আমদানি করা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য এবং বহুক্ষেত্রে একেবারেই অসম্ভব। এতদিন ছিল শুধু রেলগাড়ীর অভাব, এবার সেই সঙ্গে দেখা দিল গ্রাম্য যানবাহনেরও অভাব। ফলে সহরের সঙ্গে গ্রামের এবং এক গ্রামের সঙ্গে অন্য গ্রামের যোগাযোগ নষ্ট হইয়া যাইতেছে।'

৪. 'সহরে চাউল এখনও দুষ্প্রাপ্য, দাম আবার বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, অথচ পুরো রেশনিং এখনও চালু হয় নাই।'

৫. 'কয়লার অভাবে শিল্প উৎপাদন বন্ধ হইবার উপক্রম। উৎপাদন বন্ধ হইলে লক্ষ লক্ষ মজুর দুঃস্থ শ্রেণীতে পরিণত হইবে এবং সকলরকম জিনিষেরই দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে।'

সামগ্রিক বিপর্যয়ের এক বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ। এই পার্টি দলিলে প্রায় সবই বলা হয়েছে, কিন্তু মানুষের তৈরি এই দুর্ভিক্ষের জন্যে প্রধান এবং একমাত্র আসামীরূপে চিহ্নিত করা হয়নি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে। দায়ী করা হয়নি তারই সৃষ্টি—সামন্ততন্ত্রকে। ফলে জনগণের প্রকৃত শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই পরিচালনার ক্ষেত্রে পার্টি ব্যর্থ। পরবর্তীকালে পার্টি দলিলে এই ব্যর্থতার অকপট স্বীকৃতি রয়েছে :

'খাদ্য সংকটের জন্যে যে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা ও তার অনুষঙ্গ চরম দারিদ্র্য ও দাসত্ব-ই দায়ী—এ সত্য আমরা উপেক্ষা করেছি। খাদ্য সংকটের প্রশ্নে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লড়াই বন্ধ রেখে, আমরা প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যবাদের

সার্বিক নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে অনীহা দেখিয়েছি।' (ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে উত্থাপিত সংস্কারবাদী বিচ্যুতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন, পৃ ১২৮)

সেদিন সংকট কিন্তু পার্টিকেও রেহাই দেয়নি। মৃত্যু অকালে ছিনিয়ে নিয়েছে বহু কমরেডকে। পরবর্তী পার্টি চিঠি (৫/৪৪) থেকে জানা যায়: গত পাঁচ মাসে নানারোগে বহু কমরেড প্রাণ হারিয়েছেন। বলা হচ্ছে, 'গড়ে তিনদিন অন্তর একজন করিয়া পার্টি কমরেড মরিতেছে। কলেরা ও বসন্তরোগেই সব চেয়ে বেশি কমরেড মারা গিয়াছেন। তাঁহাদের বাঁচানোর গুরুত্ব স্থানীয় জনসাধারণকে বুঝাইতে পারিলে এই শোচনীয় মৃত্যুর হার আমরা নিশ্চয়ই রোধ করিতে পারিব।'

১৯৪৩-এর নভেম্বরে. ভবানী সেনের নামে প্রকাশিত এক পুস্তিকার মাধ্যমে পার্টি জনগণকে আহ্বান জানায়: 'মৃত্যু ও মহামারীর বিরুদ্ধে খাদ্যের জন্য লড়'। সরোজ মুখোপাধ্যায় লিখছেন:

'সারা ভারতের জনগণের কাছে বাংলার সর্বনাশা দুর্ভিক্ষের ছবি তুলে ধরার ডাক দেয় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি। যেমন বাংলার অভ্যন্তরে রিলিফের কাজ চলেছে সর্বত্র, তেমনি বাংলার শিল্পীরা গায়ক নাট্যকাররা বেরিয়ে পড়েছেন দল বেঁধে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ক্ষুধিত বাংলার সংকট সমাধানে সকলকে এগিয়ে আসার আবেদন নিয়ে। উত্তর, পশ্চিম, দক্ষিণ সর্বত্র সারা ভারত জুড়ে দুর্ভিক্ষ পীড়িত বাংলার পাশে দাঁড়াবার জন্য মানুষের কাছে নাচ, গান, নাটক, বক্তৃতার মাধ্যমে আওয়াজ পেঁৗছে গেছে দ্রুতগতিতে। 'বাংলাকে বাঁচাও', 'সেভ বেঙ্গল'—ধ্বনিতে সারা ভারতের মানুষ আলোড়িত হয়েছেন।' (ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা, ২ খণ্ড, পৃ ১৫৭)

এই সার্বিক সংকটের পটভূমিতে বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে বৃহত্তর জনসমাজে প্রবেশ করার সুযোগ এল পার্টির সামনে।

ছাত্রনেতা কমল চ্যাটার্জি বলছেন: 'তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ আমাদের কাছে যেন দেবতার আশীর্বাদের মতো। রিলিফের কাজের মাধ্যমে আমরা মুষড়ে-পড়া কংগ্রেসী ছাত্রদেরও কাছে টানার চেষ্টা করি। মনে রাখতে হবে, সে সময় আমাদের অবস্থা জটিল—প্রায় নিঃসঙ্গ। আমরা লোকের সেবা করতে চাই—দেশ স্বাধীন করতে চাই—অথচ পড়ে গিয়েছি উল্টো দিকে। আমরা তখন সেবাকার্যের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছাকাছি থাকতে পেরেছি। জোশীর লেখা 'বেঙ্গল মাস্ট বি সেভ্ড্' (বাংলাকে বাঁচাতেই হবে), ভবানী সেনের লেখা 'ভাঙনের মুখে বাংলা'—এ জাতীয় রচনা পার্টিকে ধাক্কা সামলাবার সুযোগ দিয়েছিল।'

সাধারণ মানুষের বিরূপতা সত্ত্বেও পার্টি টিকে রইল। তার অন্যতম

কারণ—কুমুদ বিশ্বাসের ভাষায়, দুর্ভিক্ষ ও জিনিসপত্রের আকালের সময় কমিউনিস্টরাই একমাত্র শক্তি যারা মানুষের জন্যে লড়াই করেছে। তিনি বলছেন, 'আমরা তখন 'সেক্‌টারিয়ান রিলিফ ওয়ক'' করিনি। রিলিফ ওয়র্ক'-এর মধ্য দিয়ে গড়ে উঠল সারা বাংলায় জনরক্ষা আন্দোলন। এটাই ছিল পার্টির 'স্টোরহাউস অফ কাডারস্‌' (কর্মী-সংগ্রহশালা)।'

শাহেদুল্লাহ্‌ বলেছেন, 'দুর্ভিক্ষের সময় আমরাই ঐক্যবদ্ধ ত্রাণ কমিটি জেলা ভিত্তিতে মহকুমা ভিত্তিতে গড়ে তুলি। বর্ধমান জেলায় আমরা বর্ধমান মহারাজাকে কমিটির সভাপতি বানাই। কংগ্রেস, লীগ, হিন্দু মহাসভা—সবাই ছিল তাতে। ব্রিটিশ সরকার এই কমিটিকে উপেক্ষা করতে পারেনি। অবশ্যি পার্টির কিছু লোক সরকারি অফিসারদের সাথে দহরম মহরম করে কোথাও কোথাও গোলমালও করেছে।'

মনোরঞ্জন হাজরা বলেছেন, 'আমরা বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলনে যোগ না দেওয়াতে কোণঠাসা হয়ে পড়ি। কিন্তু সেই বিচ্ছিন্নতা তাড়াতাড়ি কাটিয়ে উঠি। কারণ হুগলি জেলার হাজার হাজার মানুষের মধ্যে দুর্ভিক্ষের সময় রিলিফ বিলিয়েছি। ম্যালেরিয়া মহামারির সময় লক্ষ লক্ষ মানুষের মাঝে কুইনিন বিলিয়েছি। পরে সে সব এলাকায় গড়ে উঠেছে পার্টির সংগঠন। ডাক্তার বিধান রায় আমার হাতে তিন লক্ষ টাকার কুইনিন দিয়েছিলেন। আমাদের কাজে তিনি মুগ্ধ। গোলার ধান 'সীজ' করে মেপে মেপে গরীবদের মধ্যে বিলিয়েছি। ডাকাতি হচ্ছে শুনে এস. ডি. পি. ও. ছুটে এসেছেন। দেখলেন ভালো কাজই হচ্ছে। মিথ্যে নালিশ করার জন্যে ধানগোলার মালিককে ধমকান।'

শান্তিময় রায় বলেন, 'দুর্ভিক্ষে রিলিফ আর আই. পি. টি. এ.-র মধ্য দিয়ে কমিউনিস্টরা প্রমাণ করে দিয়েছে তারা সৎ এবং ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান। 'স্পিরিট অফ ইন্ডিয়া' নৃত্যনাট্য দেখে সজনীকান্ত দাস পর্যন্ত মুগ্ধ আর সরোজিনী নাইডু তো কেঁদেই ফেলেন।'

শুধু সেবাকার্য নয়। কমিউনিস্টরা সেদিন নিরন্ন মানুষের দুঃখের সমান ভাগীদার ছিলেন। গোবিন্দ কাঁড়ার লিখছেন, 'বাংলার পঞ্চাশের মন্বন্তরে দেখেছি কমিউনিস্ট কর্মীরা নিজেরা দিনের পর দিন অভুক্ত অর্ধভুক্ত থেকে নিরন্ন মানুষদের লঙ্গরখানায় রান্না করে খাইয়ে গেছেন মাসের পর মাস।' (কমিউনিস্টদের সেকাল ও একাল, পৃ ২৯)

জোশীর ভাষায়, কমিউনিস্টরা সেদিন নিজেদের বিবেককে বাঁচাতে পেরেছে। সংকটে অভিভূত হয়নি। (জবাব, পৃ ২২৩)

কিন্তু সেদিন এজাতীয় আত্মতুষ্টির অবকাশ কোথায়! লাঠি-গুলি-পিটুনি করের দাপটে স্তব্ধ স্বাধীনতা আন্দোলন। দেশটা যেন হঠাৎ-ধনী, কালোবাজারি ও মিলিটারি কন্ট্রাক্টরদের স্বর্গরাজ্য। মেয়ে-বেচার দালালরা সমাজের মাতব্বর। সমর সেন লিখছেন :

আসন্নপ্রসবা অন্ধকারে
ক্ষুরধার নখে মাটিতে অঙ্ক কষে
কারা টাকা গোনে, আর কালো তাস ভাঁজে,
সমলোভী ঠোঁটে আঁকা
কর্কশ, শব্দহীন উৎকণ্ঠা।
দূরে শবযাত্রী হাঁকে।

('শবযাত্রী', সমর সেনের কবিতা, পৃ ৮৬)

সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তি-মানুষের অস্তিত্বকে এক শ্বাসরোধকারী পরিবেশ গ্রাস করতে উদ্যত। সোমনাথ লাহিড়ী লিখছেন :

'বর্ষার মেঘ কাটিয়া শরতের চাঁদনীরাত আসিতেছে। কিন্তু সে রাত আজ আর নূতন ফসলের গন্ধ বহিয়া আনে না। আনে আগুন আর বারুদের জ্বলন্ত নিঃশ্বাস, শহরের ঘরে-ঘরে জাপানী বোমার দুঃস্বপ্ন।

...অথচ কোথায় সে জ্বলন্ত আত্মবিশ্বাস, যাহা প্রতিটি নগরবাসীকে আত্মরক্ষার প্রতিজ্ঞায় উদ্দীপিত করিবে, সম্ভাব্য বিশৃঙ্খলা ও কঠোরতর খাদ্যাভাব হইতে শহরকে বাঁচাইবে? দুর্ভাগ্যের নির্মম কঠিনতাই তাহাদের একমাত্র গতি। যদি না দেশভক্ত আর সমস্ত ভুলিয়া ইহাদের সেবা, শুশ্রূষা ও সাহায্য দানে সমস্ত দেশভক্তি উৎসর্গ করেন।' (৯ই অগাস্টের এক বছর)

গভীর সংকটের আবর্তে গোটা দেশ ও জাতি যখন তলিয়ে যাচ্ছে, তখন নিছক সেবা ও ত্রাণকার্যের মাধ্যমে তাকে উজ্জীবিত করা কঠিন। এ সত্য সেদিন বাংলা পার্টির সম্পাদক ভবানী সেন উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি অকপটেই স্বীকার করেছেন : 'মোটামুটি একথা বলা যায় যে এযুগে আমরা আত্মরক্ষাই করতে পারলাম, জনগণের মধ্যে স্বদেশপ্রেমের প্রেরণা জাগাতে পারলাম না, জাতীয় ঐক্যের পথে স্বাধীনতার জন্য গণ-আন্দোলন সৃষ্টি করতে পারলাম না।' (তৃতীয় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে রাজনৈতিক-সাংগঠনিক রিপোর্ট)

ইতিহাসের সেই সর্বনাশা লগ্নে ঘটনা-প্রবাহকে প্রভাবিত করা ছিল কমিউনিস্টদের সাধ্যাতীত। কিন্তু ঘটনার ঘূর্ণিস্রোতে তলিয়ে যায়নি তাদের অস্তিত্ব। কারণ, দুর্গত মানুষের প্রতি অঙ্গীকারে তারা স্থির। কমিউনিস্টদের আদর্শনিষ্ঠা ও প্রাণঢালা সেবা মানুষের মন স্পর্শ করে। জাতীয়তাবাদী মহলের বিরূপতা সত্ত্বেও কমিউনিস্টদের কণ্ঠস্বর সাড়া জাগায় শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের অন্তর্গত অগ্রসর মানুষের চেতনায়। কমিউনিস্ট পার্টির

দিকে আকৃষ্ট হয় ফ্যাসিবিরোধী মননশীল মানুষেরা। অপ্রতিহত অগ্রগতির প্রমাণস্বরূপ দেখা যায় বাংলা-পার্টির সদস্য সংখ্যা ১৯৪৩ সালে দাঁড়িয়েছে তিন হাজারে—১৯৩৮ সালে সংখ্যাটি ছিল পাঁচশ। গোষ্ঠীস্তর থেকে গণ-পার্টির স্তরে উত্তরণের এক নির্ভুল দৃষ্টান্ত।

১৯৪৩-এর ১৮—২১শে মার্চ কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয় বাংলা-কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় প্রাদেশিক সম্মেলন। প্রকৃতপক্ষে এটাই প্রথম প্রকাশ্য সম্মেলন। সোমনাথ লাহিড়ীর আবেগঘন বক্তৃতার মাধ্যমে, সমবেত ১৮৬ জন প্রতিনিধির কাছে উন্মোচিত হয় পার্টির উন্মেষ ও প্রসারের এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিবৃত্ত। সোমনাথ লাহিড়ী বলেন :

কুড়ি-বাইশ বছর আগে একদা এক তরুণ অসীম সাহস, প্রেরণা ও উৎসাহ নিয়ে লাল পতাকা হাতে জনগণের মাঝে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। মুষ্টিমেয় দু'চারজন সাথী মাত্র ছিল তাঁর সম্বল। চারদিকে ছিল পর্বতপ্রমাণ বাধা। না ছিল কাজের অভিজ্ঞতা, না ছিল কাজের শিক্ষা. কিন্তু ছিল এক মহা সম্পদ—রুশ বিপ্লবের অনুপ্রেরণা। তারপর কেটেছে এক-চতুর্থ শতাব্দী। সেই তরুণ মুজফ্‌ফর আজ ভগ্নস্বাস্থ্য, বৃদ্ধ, পেশী তাঁর দুর্ব্বল। কিন্তু তাঁর দুর্ব্বল বাহুকে আজ সবল করে তুলেছি আমরা হাজার হাজার নূতন কর্মী। লাল পতাকাকে বজ্রমুষ্টিতে করেছি প্রতিষ্ঠা।

পার্টির ভেতর আজ আন্দোলনের বহুমুখী শ্রেষ্ঠধারা এসে মিলেছে। আপনারা কেউ এসেছেন কংগ্রেস আন্দোলন থেকে, কেউ এসেছেন কৃষক ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন থেকে; কেউ বা এসেছেন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন থেকে। বহুমুখী অভিজ্ঞতা পার্টিতে এসে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। ভারতের জাতীয় জীবনের যা-কিছু অমূল্য সম্পদ, যা-কিছু শ্রেষ্ঠ অবদান তাই আজ এসে পুষ্ট করেছে কমিউনিস্ট পার্টিকে। কোন পার্টিরই এমন মহান ঐতিহ্য নেই।

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার আমলে নবজাত পার্টির ওপর আমলাতন্ত্রের দমননীতির স্টীম রোলার চলেছে। নেতারা সব কারারুদ্ধ। আমরা মুষ্টিমেয় কয়েকজন তখন মিটমিট করে জ্বলছি। চারদিকে বাধার অন্ত নেই। কিন্তু আমাদের ছিল এক মহান সম্পদ—বিশ্বের বিপ্লবী আন্দোলনের অবদান। দুনিয়া জোড়া বিপ্লবী মজুর আন্দোলনের—কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসের অনুপ্রেরণা। সেই ছিল আমাদের পাথেয়। আর আমাদের চলার পথে চারিদিক থেকে এলেন আপনারা—সর্বহারাদের ছোট্ট ধারাটিতে সমস্ত বিপ্লবী ধারা জড়ো হয়ে তাকে করল দুর্জয়।

সেই পার্টি আজ দেশের অন্যতম বৃহৎ ও শ্রেষ্ঠ পার্টিতে পরিণত হয়েছে। দেশের ভিতর এক বিপুল শক্তি বলে পরিগণিত হয়েছে। জাতীয় জীবন গঠনে এক বিরাট অংশ গ্রহণ করেছে।

কমরেড, আসুন আজ এই মহান আদর্শকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাই, জাতীয় সংকট সমাধানে, দেশরক্ষার জন্য, দেশের স্বাধীনতার জন্য কোটি কোটি ভারতবাসীকে সংগঠিত করি, জাতির জীবনে অন্যতম শক্তি থেকে আসুন আমরা জাতির জীবনে নেতা হয়ে উঠবার সংকল্প গ্রহণ করি।' (সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষ থেকে উদ্বোধনী ভাষণ)

সোমনাথ লাহিড়ীর বক্তৃতায় ছিল এক নতুন দিগন্তের ইশারা—দূরতর লক্ষ্যের দিকে অভিযানের ডাক। পার্টিকে জাতীয় জীবনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। ছড়িয়ে পড়তে হবে ক্ষেতে-খামারে—কলে-কারখানায়—জন-জীবনের সর্বত্র। সেদিন দুর্ভিক্ষ মহামারির প্রহারে জর্জরিত হতাশায় মলিন মানুষের একমাত্র ভরসাস্থল কমিউনিস্ট পার্টি। দিগন্তবিস্তৃত জলা-ভূমিতে একমাত্র শক্ত জমিন্। ইতিহাসের দাবি পূরণের জন্যে, তাই সংকীর্ণ চৌহদ্দি ভেঙে পার্টিকে বেরিয়ে আসতে হবে উন্মুক্ত প্রান্তরে।

সরোজ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন।

'সম্মেলনের রিপোর্টে বলা হয়—ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের শাখা) বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির নেতৃত্বে এই প্রদেশের পার্টি একটি চক্রস্তর থেকে গণপার্টিতে পরিণত হতে চলেছে। স্বতঃ-স্ফূর্ততা কাটিয়ে উঠে বলশেভিক প্রতিযোগিতায় শ্রমিক, কৃষক, ছাত্রদের মধ্য থেকে জঙ্গী সদস্যদের পার্টি সদস্য করার জন্য সচেতন প্রচেষ্টা চালাবার আহ্বান দেওয়া হয় পার্টি সম্মেলন থেকে।' (ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা, ২য় খণ্ড, পৃ ৫৮)

সেদিন পার্টির প্রসারের মূলে ছিল প্রবল আত্মবিশ্বাস। প্রতিটি পার্টি কমরেড ছিলেন আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। ইতিহাস-চেতনা ও আত্মবিশ্বাসের সমন্বয়ে সঞ্চারিত এক নতুন উপলব্ধি উদ্দীপিত করেছিল গোটা পার্টিকে। অমিয় মুখার্জি বলেছেন, '১৯৪২ সালের ২৪শে জুলাই যেদিন পার্টি বৈধ হয়—কলকাতায় পার্টির সদস্য-সংখ্যা তখন মাত্র দু'শ তেতাল্লিশ জন। অথচ কী বিরাট শক্তি আমাদের। পার্টি ছড়িয়ে পড়েছে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। মানুষ হয়তো আমাদের সব কথা বোঝে না—সব কথা মানে না। তবুও স্বীকার করে লোকে—কমিউনিস্টরা এক ভাষায় কথা বলে। তারা নিরলস কর্মী ও প্রবল অধ্যবসায়ী। একদিকে কমিউনিস্ট-দের ঐকান্তিকতা ও অপরদিকে লাল ফৌজের বীরত্ব কমিউনিস্টদের চিনিয়ে দিল মানুষের কাছে। সেদিনের পার্টি-রাজনীতিতে নিশ্চয় ভুলভ্রান্তি ছিল। কিন্তু সংগঠন! সেরকম আর কখনও হয়নি, আর হবে না। সেদিন গোটা পার্টি যেন এক বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারের মতো।'

একই ছবি ফুটে ওঠে হাওড়ার প্রবীণ নেতা গোবিন্দ কাঁড়ারের রচনায়। তিনি লিখেছেন :

'সে যুগে চল্লিশের দশকে জনযুদ্ধের যুগে গোটা পার্টির মধ্যে একাত্মভাব, পারিবারিক আবহাওয়া গড়ে ওঠে। পার্টির কাকাবাবু, পার্টির কাকীমা—মাসীমা, পার্টির মা নামে বিশেষ বিশেষ কমরেড আখ্যাত হতেন। হাওড়ার ডোমজুড়ের কমরেড তারাপদ দে-র মা হয়ে গেলেন গোটা পার্টির মা। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত প্রথম পার্টি কংগ্রেসে পার্টির মা সংবর্ধিত হলেন। সে এক মেজাজ, আজও মনে পড়লে অভিভূত হতে হয়। এই মেজাজেই 'লালবাড়ি' সৃষ্টি হয়। গোটা পরিবার পার্টিমুখী হলে, পার্টির জন্য কাজ করলে নাম দেওয়া হত 'লালবাড়ি'। আমিও এমনি এক লালবাড়ির সন্তান ছিলাম সেদিন। দেখেছি আমাদের সংসারে খুব টানাটানি চললেও এক বা একাধিক সারাক্ষণ কর্মীকেও রাখা ও খাওয়ানো হতো। সেযুগে একের দুঃখ ও বিপদে সবাই এগিয়ে আসতেন। পার্টির জন্য তাই সবরকম ত্যাগে কমরেডরা প্রস্তুত থাকতেন। দেখতাম পার্টির এক একটি ডাকে জি. বি. মিটিং-এ কমরেডরা সর্বস্ব দান করেছেন পার্টিকে—সোনার গহনা, জমি, বাড়ি, গাছ, উপহার পাওয়া প্রিয় বস্তু প্রভৃতি।' (কমিউনিস্টদের সেকাল ও একাল, পৃ ২০-২১)

সাত

শিল্প-শ্রমিক ও শহরের মেহনতী মানুষদের মধ্যেই ছিল কমিউনিস্ট পার্টির আসল গণভিত্তি—শ্রমিক আন্দোলনই তার শক্তির উৎস। যুদ্ধের বছরগুলিতে পার্টির প্রভাব শ্রমিক মহলে তৃণমূল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

আব্দুল মোমিন দাবি করেন :

'আমরা চেষ্টা না করলে কলকাতাবাসী যানবাহন, বিজলী ও জল থেকে বঞ্চিত হত। আতঙ্ক দশগুণ বেড়ে যেত, কলকাতা এবং আশেপাশের কল-কারখানা বেশীর ভাগই বন্ধ হয়ে যেত, শাসনব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ত এবং আক্রমণকারীদের আক্রমণের পথ প্রশস্ত হয়ে পড়ত। শিল্পগুলিকে সচল রেখে আমরা কলকাতাকে দ্বিতীয় রেঙ্গুন হতে দিইনি। এই হচ্ছে আমাদের পার্টির প্রধানতম জয়।' (তৃতীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে ট্রেড ইউনিয়ন রিপোর্ট)

অতিরঞ্জনের ছোঁয়া না থাকলেও মোমিনের রচনায় যতটা আত্মপ্রত্যয়ের দ্যোতনা—ততটা নেই প্রকৃত অবস্থার প্রতিফলন। সেদিন শ্রমিক মহলে কমিউনিস্টদের নিরঙ্কুশ প্রতিপত্তির প্রকৃত কারণ আমাদের অন্যত্র খুঁজতে হবে। সম্ভবত এ প্রসঙ্গে রণেন সেনের পর্যালোচনা অনেকটা বাস্তবসম্মত। তিনি বলেছেন, 'সেদিন ময়দানে কংগ্রেস বা সি. এস. পি. নেই। তখনও

কংগ্রেসের পাল্টা শ্রমিক সংগঠন হয়নি। শ্রমিকদের সামনে তখন কমিউনিস্ট নেতৃত্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন ছাড়া আর কোনো বিকল্প ছিল না। তাছাড়া 'জনযুদ্ধ'-র লাইন চালু থাকা সত্ত্বেও বাংলায় তিন-চারটি শ্রমিক আন্দোলন হয়। ট্রাম, ইঞ্জিনিয়ারিং, চটকল, সুতাকলের মজুররা পার্টির নেতৃত্বে লড়েছে। পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে যাবার সাথে সাথে শ্রমিকদের মধ্যে পার্টির আসর রীতিমতো জমে ওঠে। প্রধানত উর্দু ভাষাভাষী মুসলমান শ্রমিকদের মধ্যে পার্টির প্রভাব বিস্তৃত হয়।'

শ্রমিকদের মধ্যে কমিউনিস্ট রাজনীতির প্রকৃত প্রভাব কতখানি গভীর—তার মূল্যায়নের সময় তখনও আসেনি। লাল ঝাণ্ডা তার নিজস্ব পতাকা—কমিউনিস্টরা তার ঘরের লোক এই বোধটুকু অন্তত সেদিন শ্রমিকের মনে বাসা বেঁধেছিল। তার পেছনে অবশ্য রয়েছে কমিউনিস্টদের নিরলস পরিশ্রম। অমিয় মুখার্জির মনে পড়ে—ছোট ছোট গ্রুপে শ্রমিকদের রাজনীতি বোঝানো হচ্ছে। তিনি দেখেছেন, দর্জিপাড়ার ঋষি ব্যানার্জি টালা ট্যাংকের কাছে রোয়াকে বসে শ্রমিকদের পড়াচ্ছেন ছোট ছোট পুস্তিকা।

তাছাড়া ছিল মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আগত কমরেডদের শ্রমিক-জীবনের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার সচেতন প্রয়াস। চন্দ্র রায় বলেছেন, 'বরানগরের লোকদের দৃষ্টিভঙ্গি রক্ষণশীল। তার ওপর তারা আবার মুসলমান-বিদ্বেষী। যারা কলে কাজ করে—যারা গরীব—তাদের এরা মনে করত ছোটলোক। কী ঘৃণাই না করত গরীবদের। যে ছেলের লেখাপড়া হত না—তাদের বলত, যা, নোয়ার (লোহার) কাজ করগে যা, নোয়া পিটুগে যা। আমায় সরোজ মিত্র নিয়ে গেল একদিন ইউনিয়ন অফিসে। ইশাকের মা খেতে দিল। সরোজ খেল—আমি খেলাম—ইশাক খেল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল : এই তো আমি এতদিন খুঁজছিলাম। এরা জাত-ধর্ম—এসব মানে না। নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরে বেড়ে ওঠা আমি—আমার জায়গা মজুরের পাশে ছাড়া আর কোথায়? সুতরাং মধ্যবিত্ত নয়—আমি হয়ে গেলাম মজুর। মজুর বস্তিতেই রাতদিন পড়ে থাকতাম। একদিন নিত্যানন্দ চৌধুরী আমায় মজুর বলে ভুল করলেন। জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কি তাঁতে কাজ কর? আমি বললাম না, না—আমি একজন কমরেড। আমি দৌড়ে গিয়ে তাঁকে এক বাণ্ডিল বিড়ি এনে দিয়েছিলুম।'

শ্রমিকের পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি। এটা শুধু কথার কথা নয়। সেদিন কমিউনিস্টরা যাবতীয় উদ্যম উজাড় করে দিয়ে একের পর এক শ্রমিক সংগঠন গড়ে তুলেছিল। তাদের নিরলস পরিশ্রম, ত্যাগ ও নিষ্ঠার এক সার্থক ফসল—কলকাতা ট্রাম ওয়ার্কার্স' ইউনিয়ন। সংগঠনটি কমিউনিস্ট পার্টি অনেক যত্নে ও মমতায় ধাপে ধাপে গড়ে তুলেছিল। ট্রাম শ্রমিক আন্দোলনের অগ্রণী নেতা ও সংগঠক ধীরেন মজুমদার ১৯২৮ সালে যেদিন ট্রামে চাকরি নিলেন, সেদিন থেকেই ট্রাম-শ্রমিক আন্দোলন ও সংগঠনের সূচনা। ধীরেন

মজুমদারের ভাষায়, '১৯২৮ সাল আমার জীবনে মোড় ফেরার বছর। একই সঙ্গে সাইমন কমিশন-বিরোধী আন্দোলনের দৌলতে থানায় গারদবাস ও পুলিশের প্রচণ্ড প্রহার—লেবার পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ—১৬ নম্বর রিচি রোডের মেসের লাগোয়া সৎকার সমিতির নেপথ্যে সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে যোগাযোগ—বিপ্লবী মামা সন্তোষ মিত্রের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ—আবার পার্ক-সার্কাস ময়দানে কংগ্রেস অধিবেশন মণ্ডপে বঙ্কিমদার নেতৃত্বে চটকল শ্রমিক মিছিলের আবির্ভাব—সবই জড়াজড়ি করে আমার জীবনে ঐ বছরেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে। সবচেয়ে জোরালো ধাক্কা দিল বঙ্কিমদার মিছিলটি।

১৯২৯ সালের শেষদিকে ট্রামে ঢুকে পড়ি এবং দেখি ট্রামে চলছে তখন প্রতিবাদহীন গোলামি। নেই শ্রমিকের চাকরির নিরাপত্তা—নেই কাজের ঘণ্টার কোন হিসেব-নিকেশ। কী করা যায়। মাথায় এক বুদ্ধি এল। শ্রমিক ছ'-সাতজনকে নিয়ে গড়ে তুললাম প্রতাপাদিত্য রোডে এক মেস। পার্কসার্কাসে রাজাবাজারেও মেস তৈরি হল। আরও পাঁচ-ছ'টা মেস বাঙালি শ্রমিকরা তৈরি করে ফেলল—যদিও বাঙালি তখন ট্রাম-শ্রমিকদের পাঁচভাগের একভাগ। হিন্দুস্তানী শ্রমিকদের কাছে যাতায়াত শুরু করলাম—যেতাম তাদের সঙ্গে কুস্তি লড়তে। ধীরে ধীরে পরিচয় ঘটল নওরতন সিং ও পাঁড়েজীর সঙ্গে। এদিকে তখন গোপেন চক্রবর্তীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। তিনি তখন প্রতাপাদিত্য রোডে গৃহান্তরীণ অবস্থায় আছেন। সেখানে এসে জুটতেন কালী সোম আর শিবনাথ ব্যানার্জি। মনে আছে, ১৯৩৫ কি ৩৬ সাল নাগাদ মুজফ্ফর আহ্মদ আমাদের ক্লাশ নিয়েছিলেন। ১৯৩৭ সালের ১লা মে আমরা এক দুঃসাহসিক কাণ্ড করে বসি। মেসের দোরগড়ায় ঝাণ্ডা তুলে দিই। দুটো ঝাণ্ডা—একটা তেরঙ্গা আর একটা লাল। শ্রমিকদের মধ্যে এ নিয়ে চাপা উত্তেজনা। ঝাণ্ডা তোলা হয়েছে—লাল ঝাণ্ডা! ১৯৪০ সালে পার্টি সভ্যপদ লাভ করি। বে-আইনী পার্টি! শ্রমিকদের কাছ থেকে ইউনিয়নের জন্যে দু'আনা চাঁদা আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে এক আনা করে লাল ঝাণ্ডার চাঁদাও আদায় করতে থাকি। লাল ঝাণ্ডার চাঁদা—সে আবার কী! বলতাম, আছে—আছে। শ্রমিকরা বুঝত, লাল ঝাণ্ডার নেপথ্যে কোন এক রহস্যময় ব্যাপার রয়েছে।'

ধীরেন মজুমদার বলছেন, '১৯৪২ সালের ১লা মে। সেদিন মে দিবস উদ্‌যাপনকে কেন্দ্র করে এক বড় রকমের সংঘাত বাধল ট্রাম-শ্রমিক আর মালিকের মধ্যে। সেদিন ট্রাম-শ্রমিকরা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে জড়ো হয়ে মার্চ করে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে গেল। সেখানে মিটিং হল। মৃণালকান্তি বসু আর রহমান বক্তৃতা করলেন। খুব কম ট্রাম বেরোল পথে। আঁচ পেয়েছিলুম এর জের সহজে মিটবে না। তাই রাত্রে বঙ্কিমদা, চুনী জোয়ারদার আর শ্রীবাস্তবের সঙ্গে দেখা করলাম। কাল যদি রুজি রোজগারের উপর হামলা আসে—তাহলে কী করা হবে? তাঁরা বললেন, যাই হোক না কেন, স্ট্রাইক করা চলবে না। জনযুদ্ধ—অতএব 'নো স্ট্রাইক'। মানতে পারলাম না।

পরের দিন ১০৪ নম্বর ট্রাম কন্ডাক্টার অর্ধেন্দু দাস সহ এগার জন শ্রমিক বরখাস্ত হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ডাক দিলুম—সবাই নম্বর ফেলে দাও। আমি লং কোটের কোঁচড় পেতে দাঁড়ালুম। ঝুপ ঝুপ করে আমার কোঁচড়ে নম্বর পড়তে লাগল। একশ দেড়শ আড়াইশ। গাড়ি বন্ধ হয়ে গেল। কোম্পানি মিটমাট করতে বাধ্য হল—ছাঁটাই শ্রমিকদের কাজে ফিরিয়ে নিল।

যুদ্ধের সময় পার্টির রাজনীতি যখন সাধারণ মানুষের চেতনার উল্টো খাতে বইছে—ট্রাম-শ্রমিকদের মধ্যে তখন কিন্তু পার্টির ভিৎ শক্ত হচ্ছে। পার্টি ট্রামের ওপর পুরোপুরি নজর দিয়েছে। পার্টির প্রধান ভরসা ট্রাম। ট্রাম থেকে অন্তত একশজন ভালো ক্যাডার বেরিয়েছে। আমরা ট্রামের ডিপোতে ডিপোতে 'জনযুদ্ধ' বিলোতাম। দাও সকলের হাতে। ভালো না লাগে ছিঁড়ে ফেলুক—তবুও দেখুক কাগজটা।'

প্রবীণ ট্রাম-শ্রমিক নেতা গোপাল আচার্যের মতে, ট্রামের 'ম্যাস ইউনিয়ন'-এর মূল কারণ হল 'ফল অফ বার্মা' (বর্মার পতন)। তার হিড়িকে বেশ কিছু শ্রমিক চাকরি ছেড়ে পালায়। তারা দাবি করে প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা দিয়ে দাও। ১৯৪২ সালের শেষাশেষি কলকাতায় খুচখাচ বোমা পড়ল। তাতে অনেক অবাঙালি শ্রমিক কলকাতা ছেড়ে চলে গেল। এবং যখন দেখা গেল বিশেষ কিছু হল না, তখন একমাস পরে শুরু হল উল্টো 'এক্সোডাস', তারা সবাই ফিরে এল। সবাইকে ছাঁটাই করা হল। ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের ঐক্যবদ্ধ চেষ্টার ফলে তাদের সকলকে পুরনো জায়গায় ফিরিয়ে নেওয়া হল। তার ফলে ট্রাম-শ্রমিকদের মধ্যে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের ভিৎ মজবুত হয়।'

সে যুগে পূর্ব কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে অসংগঠিত শ্রমিকদের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে আন্দোলন ও সংগঠনের কাজ শুরু হয়। এ প্রসঙ্গে পূর্ব কলকাতার শ্রমিক আন্দোলনের অগ্রণী সংগঠক জগৎ বোস বলেন, '১৯৩৮ সালে আন্দামান থেকে ছাড়া পাই। আগে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। নৃপেন চক্রবর্তীর কাছে হাতেখড়ি। নৃপেনদা 'ডি-ক্লাসড্' (শ্রেণীচ্যুত) হবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। মজুর জীবন জানবার জন্যে তিনি চটকলেও ঢুকেছেন। আনাড়ি হাতে পাটের ফ্যাঁসো পাকাতে গিয়ে হাত তাঁর রক্তাক্ত।'

উল্টোডাঙ্গা থেকে তিলজলা পর্যন্ত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মজুরদের সঙ্গে জগৎ বোসের যোগাযোগ গড়ে ওঠে। ধীরে ধীরে মজুর জীবনের সঙ্গে তিনি পরিচিত হন। মধ্যবিত্ত কলকাতার জীবন ও সমাজের পাশাপাশি আর একটি সমাজ যে গড়ে উঠছে—তার অন্দর মহলে তিনি ঢোকার চেষ্টা করেছেন। কলকাতার মজুর দেশ-জাতি-ভাষা-ধর্ম নির্বিশেষে আলাদা এক সত্তায় পরিণত। এক বিলাসপুরী শ্রমিক তাঁকে বলে—গ্রামে কোন ব্রাহ্মণের বাড়ি যেতে হয় এক কলসি জল গলায় বেঁধে। এখানে এসব কিছু নেই। এখানে সব দোকানে জল খাই—চা খাই। কারখানা আমাদের মুক্তি দিয়েছে।

জগৎ বোস বলছেন, 'কারখানা সত্যিই মুক্তি দিয়েছে। ১৯৩০ সাল পর্যন্ত পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন নারীর স্থান ছিল—বেশ্যাবাড়ি। তিরিশ সালের পর এসব মেয়ের স্থান—কারখানা। একজন ব্রাহ্মণ শ্রমিক, সেই মেয়ের নতুন বিয়েতে পুরোহিত হয়ে যেত। এভাবে গড়ে ওঠে এক নতুন ধরনের পরিবার।'

গোড়ার দিকে শ্রমিকদের সংগঠনে আনতে তাঁকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। মিছিলে আনা তো কঠিন ব্যাপার। একবার কাদাপাড়া থেকে অতিকষ্টে এক মিছিল আনছিলেন—কয়েকটি ছোকরা রোয়াক থেকে কদর্য ভাষায় তাঁদের গালি দিল। নৃপেনদা হেসে বললেন, জগৎ, এই হল প্রলেতারিয়ান ভাষা।

যুদ্ধ শুরু হতেই তাঁকে প্রথমে কলকাতা থেকে বহিষ্কার ও ১৯৪১ সালে আলমবাজারে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৪৩ সালে মুক্তি পাবার পর আবার কাজে লেগে যান এবং দু'বছরের মধ্যে পটারী, স্যাক্সবি ও সুরা জুটমিলে সংগঠন গড়ে তোলেন।

ধীরেন মজুমদার ও জগৎ বোসদের মতো কমিউনিস্ট সংগঠকরা সেদিন সমস্ত শক্তি নিংড়ে দিয়ে কলকাতার মজুর জীবনে পার্টিকে প্রতিষ্ঠিত করেন। কলকাতার শ্রমজীবী মানুষ, তাদের স্বার্থের পাহারাদার কমিউনিস্ট পার্টিকে যে চিনে নিতে ভুল করেনি—তারই প্রমাণ কলকাতা কর্পোরেশন নির্বাচনের ফলাফল। ১৯৪৪-এর ২৯শে মার্চে অনুষ্ঠিত কর্পোরেশনের শ্রমিক নির্বাচন কেন্দ্রের দুটি আসনেই জয়ী হয়েছেন কমিউনিস্ট প্রার্থী সোমনাথ লাহিড়ী ও মহম্মদ ইসমাইল।

প্রসঙ্গত নির্বাচনী আসরে কংগ্রেস বা অন্য কোন রাজনৈতিক দল ছিল না। এই জয় সেদিন উল্লসিত করেছিল সমস্ত স্তরের শ্রমজীবী মানুষদের। এই জয়ের চেয়ে ৮ই এপ্রিলের বিজয় সমাবেশের ঘটনাটিও কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। দেখা গিয়েছে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে সমবেত দশহাজার শ্রমিকের মধ্যে সব রকম মেহনতী মানুষের মুখ। 'জনযুদ্ধে'র সাংবাদিক লিখছেন:

'এতবড় জমাট সভা কলিকাতা শহরে ইদানীং দেখা যায় নাই। শ্রমিকদের বিজয়োল্লাসে সমগ্র পার্ক মুখরিত। কিন্তু বিজয় গৌরবে তাহারা অভিভূত নয়, ভবিষ্যতের কর্ম সংকল্প ও বিপ্লবী দৃঢ়তার ছবি সমবেত জনতার মধ্যে পরিস্ফুট। সভার ভিতরে কোথাও ভাঙ্গন নাই—দশহাজার শ্রোতা যেন সুদৃঢ় লৌহ-খণ্ড। সভার চতুর্দিকে এক অভূতপূর্ব গাম্ভীর্য্য ছড়াইরা রহিয়াছে।

সভায় আসিয়াছে কলিকাতা ও আশপাশের সমস্ত কারখানার শ্রমিক। ট্রাম, বিড়ি, রিক্সাওয়ালা, লোহা কারখানা, কর্পোরেশন, প্রেস, বুকবন্ড, পোর্ট, গ্যাস, বাস প্রভৃতি সমস্ত মজুর দলে দলে আসিয়াছে, নিজ নিজ ফেস্টুন

লইয়া। চারিদিকে লাল নিশান আর লাল নিশান। কলিকাতার সব রকমের মজুরের একত্র সমাবেশ পূর্বে বড় একটা দেখা যায় নাই। প্রত্যেকটি ইউনিয়ন প্রতিনিধি পাঠাইয়াছে বিজয়ী কমিউনিস্ট কাউন্সিলারদের দৃঢ় মুষ্টিতে অভিবাদন জানাইতে।' (জনযুদ্ধ, ১২. ৪. ১৯৪৪)

এই সমাবেশে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তৃতা করেন সাপ্তাহিক 'অরণি'-র সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। প্রখ্যাত সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ছিলেন বুদ্ধিজীবী সমাজের সেই অংশের প্রতিনিধি যাঁদের দৃষ্টিতে ফ্যাসিবাদ প্রতিক্রিয়ার জঘন্যতম প্রকাশ। অতএব মানব-সভ্যতার অগ্রগতির পথে প্রধান বাধা অপসারণের জন্যে ফ্যাসিবাদের পতন চাই। তাঁদের স্বচ্ছ দৃষ্টি বর্তমানের কুয়াশা পেরিয়ে স্থির নিবদ্ধ ছিল ভাবীকালের দিকে। তাঁরা অনুভব করেছিলেন, আমাদের দেশের মুক্তি আন্দোলনকে বিশ্বব্যাপী প্রগতির স্রোতের সঙ্গে, শুধু কথায় নয়, আন্তরিক কাজের ক্ষেত্রে যুক্ত করতে পারাই সার্থকতার পথ। মানবজাতির পরম মিত্ররূপে সোভিয়েত ইউনিয়নকে অনায়াসে চিনতে পেরেছিলেন তাঁরা এবং বিশ্বমানবতার মুক্তির অগ্রদূতরূপে বরণ করেছিলেন লাল ফৌজকে।

সেদিন ফ্যাসিবিরোধী চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাংলার বুদ্ধিজীবী মহলের এক উল্লেখযোগ্য অংশ স্বভাবতই কমিউনিস্ট পার্টির সমীপবর্তী হয়েছিলেন। তাঁদের নিয়ে গড়ে ওঠে সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি। ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনের মঞ্চ, সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির দপ্তর ৪৬নং ধর্মতলা স্ট্রীটের দোতলা সেদিন বাংলার প্রগতিশীল লেখক-শিল্পীদের মিলনকেন্দ্র। এ প্রসঙ্গে চিন্মোহন সেহানবীশ লিখছেন :

'সেদিনের জটিল পরিস্থিতিতেও সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি সমাজের বিভিন্ন স্তরে বেশ কিছুটা দাগ কাটতে পেরেছিল তার কারণ একদিকে ভারতবাসীর গভীর গণতান্ত্রিক চেতনা ও অন্যদিকে কিছু মহাপ্রাণ নেতা ও কর্মীর অশ্রান্ত, আন্তরিক প্রচেষ্টা। এঁদের মধ্যে প্রথমেই সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয়ের নাম। ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বার্ধক্যের পিছুটান হেলায় উপেক্ষা করে তখন শুধু জনসভায় নয়, পাড়া প্রতিবেশীদের বাড়ি বাড়ি ঘুরেছেন ফ্যাসিজম-বিরোধী ও সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির বাণী নিয়ে। জ্বলন্ত দেশপ্রেম, আন্তর্জাতিকতা ও সোভিয়েত সৌহার্দ্যের পরম মিলন জীবন্ত হয়ে উঠেছিল তাঁর সেদিনকার তৎপরতায়।

…রাজনৈতিক দিক দিয়ে প্রভাবশালী মহলে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের প্রভাব দেশবন্ধুর সময় থেকেই। তিনি সেদিন ঐ প্রতিপত্তি হারাবার কথা কিছুমাত্র চিন্তা না করে ঝাঁপ দিয়েছিলেন স্রোতের বিরুদ্ধে। তার জন্য তাঁকে শুধু যে অন্তঃসারশূন্য, নগণ্য মানুষের তুচ্ছ ও ইতর নিন্দাবাণী সহ্য করতে

হয়েছিল তাই নয়, ক্ষুণ্ণ করতে হয়েছিল বহুদিনের একটানা রাজনৈতিক জীবন, এমনকি চরম ক্ষতিগ্রস্তও হতে হয়েছিল বৈষয়িক দিক দিয়ে।' (৪৬নং, পৃ ৬)

সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির দপ্তর অর্থাৎ ৪৬নং ধর্মতলা স্ট্রীট—ফ্যাসিবিরোধী লেখক সংঘেরও মিলনকেন্দ্র (১৯৪৫-এর পরে এরই নতুন নামকরণ হয় প্রগতি লেখক সংঘ)। লেখক সংঘের প্রযোজনায় প্রতি বুধবার বসত সাহিত্য বৈঠক। পড়া হত গল্প ও কবিতা এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা তা নিয়ে চলত আলোচনা। এই আসরে নিয়মিত অংশ নিতেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে প্রমুখ প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক ও কবি এবং নীরেন্দ্রনাথ রায়, হীরেন মুখার্জি, হিরণকুমার সান্যাল, রাধারমণ মিত্র প্রমুখ প্রথিতযশা বুদ্ধিজীবী। একদিন বুধবারের বৈঠকে মানিকবাবু তাঁর 'হারাণের নাতজামাই' গল্পটি পড়ে শোনান। আর একদিন কিশোর সুকান্ত পড়ে শোনাল তার সদ্যোরচিত 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতাটি।

চিন্মোহন সেহানবীশ লিখছেন :

'এই বুধবারের বৈঠকেই ননী ভৌমিক, গোলাম কুদ্দুস, সুলেখা সান্যাল প্রভৃতি অনেকে তাঁদের নতুন লেখা পড়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রবীণ পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র সেন মহাশয় থেকে শুরু করে বিমল চন্দ্র ঘোষ, সতীনাথ ভাদুড়ী ও নরেন মিত্রের মত মধ্যবয়সীরা এবং অমল দাশগুপ্ত, মণীন্দ্র রায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, সিদ্ধেশ্বর সেনের মত তরুণেরা অনেকেই তখন নিয়মিত যোগ দিতেন এই আসরে।' (৪৬ নং, পৃ ১১)

সমরেশ বসুর ভাষায়, সে যুগে উদীয়মান লেখক-শিল্পীরা কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে এসে নতুন দিগন্তের সন্ধান পেয়েছিল। ফ্যাসিস্টবিরোধী আন্দোলনের মঞ্চে ছিল সব বয়সী ও সব মতাবলম্বী লেখকের স্থান।

কৃষ্ণ চক্রবর্তীর মতে, সে এক অসাধারণ যুগ। সুভাষ-সুকান্ত-গোপাল -মানিকের যুগ। নতুন লেখা পেলে তাঁরা লুফে নিতেন। 'জনযুদ্ধ'-'পরিচয়ে'র পথ বেয়ে নতুন লেখক চলে আসত পার্টির কাছাকাছি। আর তাদের পথ দেখাতেন তাঁরা।

পঞ্চাশের মন্বন্তর পর্বে দেখা যাচ্ছে, লেখকের কলমের মতো শিল্পীর তুলি সেদিনের ভয়াবহ বাস্তবের বিরুদ্ধে সমান মুখর। চিন্মোহন সেহানবীশের ভাষায়, '…জয়নাল আবেদীন, গোপাল ঘোষ, নীরদ মজুমদার, রথীন মৈত্র, চিত্তপ্রসাদ, সোমনাথ হোড়ের তুলি এবং সুনীল জানার ক্যামেরা সেদিনের ভয়ংকর রূপকে চিরদিনের জন্যে ধরে রেখেছে।' (৪৬ নং, পৃ ১৫)

পার্টিতে নবাগত বুদ্ধিজীবীদের নিরভিমান আচরণে তুষার চট্টোপাধ্যায় মুগ্ধ। প্রমথ চক্রবর্তী, ভিক্টর কাউল, নীরেন রায় ও স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য 'জনযুদ্ধে'র কাজে তাঁকে সহায়তা করতেন। স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য কাজ না থাকলে ঘর ঝাড় দিতে আরম্ভ করতেন এবং অফিস ঘরটা গোছগাছ করে দিতে চাইতেন।

তুষার চট্টোপাধ্যায় বলছেন, 'আই. পি. টি. এ. গড়ে উঠল। রংপুর থেকে এসে বিনয় রায় গান ধরলেন। তাঁর প্রাণ-মাতানো গান সমস্ত কমিউনিস্ট-বিরোধিতা ভাসিয়ে নিয়ে গেল। মেয়েদের শরীর দুলিয়ে গান গাওয়াকে প্রথমদিকে রক্ষণশীল লোকেরা ভালো চোখে দেখেনি। কিন্তু গান শোনার পর তারা অভিভূত। যেমন ঘটেছে গোন্দলপাড়ার সভায়। তারা বলল, আমরা ভুল করেছি—তোমরা সত্যিই মহৎ কাজ করছ।' তাঁর মনে পড়ে—শম্ভু মিত্র, সলিল চৌধুরী এসে সভায় সভায় আবৃত্তি করতেন—গান গাইতেন। ঠিক সাধারণ ক্যাডারের মতো।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যা য়লিখছেন :

' '৪৬ নং'-এ তখন আসত নানা দেশের কম্যুনিস্ট—শুধু ব্রিটেন, আমেরিকা নয়, আসত অন্য বহু দেশ থেকে, আসত নিগ্রো আর গ্রীক আর জাপানী—আমেরিকান—তারা কেউ কবি, কেউ শিল্পী, কেউ চিকিৎসক, কেউ সাধারণ শ্রমজীবী—তাদের একসূত্রে বেঁধেছিল সাম্যবাদ, আর তাই অতি সহজে ছাদের মেঝেতে আসনপিঁড়ি হয়ে বসার চেষ্টা করে তারা বাংলা আর হিন্দী আর উর্দু ইন্টারন্যাশনাল কিম্বা রবীন্দ্রনাথ বা কারো জোরালো গান গাইতে চাইত, আলাপ করত নানা বিষয়ে, তাদের হৃদ্যতা অক্লেশে প্রকাশ হতে দেখতাম।' (তরী হতে তীর, পৃ ৩৮১)

তাঁরা দিব্যি মাটিতে বসে যখন গণনাট্যের গান শুনতেন বা নাচের মহড়া দেখতেন তখন মনে হত না যে কয়েকদিনের মধ্যেই এঁদের ডাক আসবে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার। সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে এই বিদেশী কমরেডদের কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন শান্তিময় রায়। তিনি বলেছেন, 'জেল থেকে ছাড়া পেয়ে কলকাতায় এসে জোশীর নোট পেলাম। আমায় যশোহরে গিয়ে থাকতে হবে। সেখানে আর. এ. এফ.-এর বেস্ (রাজকীয় বিমান-বাহিনীর ঘাঁটি)। ক্যান্টনমেন্টের ধারে বাসা নিতে হবে—সেটা হবে বিদেশী সৈন্যদের দেখা-সাক্ষাতের জায়গা। মনে পড়ে ক্লাইভ ব্রানসন আসতেন এবং আরো আসতেন ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেডের তিনজন কমরেড। তাঁরা পার্টি কমরেডদের জন্যে নানা খাবার আনতেন এবং পার্টি ফান্ডে দিতেন প্রচুর টাকা। আন্তর্জাতিক সংহতি কী—নিজের চোখে দেখলাম। প্রতিদিন সকালে বিমান ঘাঁটি থেকে এক ঝাঁক বোমারু বিমান উড়ে যেত ফ্রন্টের দিকে—সন্ধ্যায় আবার ফিরে আসত। বাড়ির ছাদে উঠে গুনতাম। একদিন

গনে দেখি—দুটি বিমান কম। কয়েকদিনের মধ্যে খবর এল, দুজন কমরেড মারা গেছেন।'

এই কমরেডরা শুয়ে আছেন যশোহরের কবরখানায়। তাঁদের স্মরণে সাবিত্রী রায় লেখেন তাঁর 'ঘাসফুল' উপন্যাসটি। সেদিন ক্লাইভ ব্রানসনের মতো মহাপ্রাণ বিদেশীরাও এসেছিলেন যাঁরা এ দেশের মানুষকে ভালবেসেছিলেন সমস্ত অন্তর দিয়ে। ইংরেজ সাম্যবাদী সাংবাদিক ও কবি ক্লাইভ ব্রানসনের সংকল্প ছিল যুদ্ধশেষে ভারতবাসীর পাশে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম চালানোর। কিন্তু ঐ যুদ্ধেই তাঁকে প্রাণ দিতে হল বর্মায়।

স্বভাবতই এ সব মানুষের সান্নিধ্যে এসে বাংলার লেখক, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীর দৃষ্টিভঙ্গি স্বচ্ছতর হয়েছে এবং আন্তর্জাতিকতা-বোধ হয়েছে আরও প্রখর। প্রসঙ্গত আন্তর্জাতিকতা-বোধের অভিব্যক্তি কমিউনিস্ট-প্রভাবিত শ্রমিকদের মধ্যেও এক পরিচিত দৃশ্য।

এ প্রসঙ্গে ধীরেন মজুমদার বলেন, 'জনযুদ্ধ চেতনা—সোভিয়েতের প্রতি ভালবাসা—বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ববোধ ট্রাম শ্রমিকদের মধ্যে কত গভীরে গিয়েছিল দেখুন। বোধহয় ১৯৪৫ সালে এক পার্টি জি. বি.-তে ইউনিভার্সিটি ইন্স্টিটিউট হল্-এ স্টালিনের ছবি নিলামে চড়ানো হয়। কেউ ডাকছে একশ—দেড়শ—পাঁচশ। কী! স্টালিনের ছবি নিয়ে যাবে ওরা—ভদ্রলোকরা। হাঁকলাম—আড়াই হাজার। তারপর সেই ছবি ট্রাম-শ্রমিকরা মিছিল করে নিয়ে আসে ইউনিয়ন অফিসে। ইউনিয়ন অফিসের ছাদে মিটিং হল—ছবি সামনে রেখে। দেখি কখন কোন্ ফাঁকে এসে এক হাফ-প্যান্ট পরা লোক বসে আছে মিটিং-এর এক কোণে। পি. সি. জোশী—পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি। ইন্স্টিটিউটের সভায় এই তাজ্জব কাণ্ড দেখে জোশী হতবাক্। তাই অন্য কাজকর্ম ফেলে জোশী চলে আসে ট্রাম শ্রমিকের মিটিং শুনতে।'

সরোজ মুখোপাধ্যায়ের মতে, সে যুগ পার্টির বহুমুখী অগ্রগতির যুগ। পার্টি তখন সর্বাগ্রগামী। তিনি লিখেছেন :

'পার্টির সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে শ্রমিক-কৃষক-মহিলা-ছাত্র-কিশোর ও সাংস্কৃতিক গণনাট্য, লেখক-শিল্পী, সোভিয়েত সুহৃদ সংঘ প্রভৃতি বিভিন্ন গণসংগঠনের সভ্যসংখ্যা। দ্রুতগতিতে এই তিন বছরে (১৯৪৩-৪৪-৪৫) সর্বক্ষেত্রে ব্যাপক সমর্থন অর্জন করতে সমর্থ হয় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। পার্টির সংগঠন, আন্দোলন ও প্রভাব বৃদ্ধির এই গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের কথা কখনই কেউ ভুলতে পারবে না।' (ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা, ২য় খণ্ড, পৃ ১৪৯)

পার্টির এই 'গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের কথা' বলতে গিয়ে আত্মপ্রসাদ অনুভব করতে রাজি নন কুমুদ বিশ্বাস। তদানীন্তন কলকাতা জেলা পার্টির

সম্পাদক কুমুদ বিশ্বাস বলেন, 'ব্যাকগ্রাউন্ডটা ভুলে গেলে চলবে না। বিয়াল্লিশ-এর অভ্যুত্থান হল—অ-কমিউনিস্টরা জেলে বা আন্ডারগ্রাউন্ডে। আমরা ফাঁকা ময়দান পেলাম। অনেকে স্বীকার করে না—আত্মপ্রসাদ অনুভব করে। কিন্তু সত্যিই ফাঁকা ময়দান। আমাদের জনযুদ্ধ স্লোগান কখনো 'টেস্টেড' (পরীক্ষিত) হয়নি। ঐ যুগে আমরা অক্ষত রয়ে গেলাম। হয়তো দু-একজন কমরেড এখানে ওখানে গ্রেপ্তার হয়ে থাকতে পারে। পার্টি আইনী—পার্টির 'ওপেন' কাগজ বার হয়েছে। সভা, শোভাযাত্রা পুরোদমে চলছে। অথচ আমাদের সম্বন্ধে লোকে 'হোস্টাইল' (শত্রুভাবাপন্ন)—তার কারণ, নেতাজী সম্বন্ধে আমাদের সংকীর্ণ ও আপত্তিকর মূল্যায়ন, কাগজে নেতাজীর বিকৃত কার্টুন প্রচার করা ইত্যাদি।

তা সত্ত্বেও আমরা এগুলাম কী করে? তিনটি কারণ রয়েছে তার পেছনে। প্রথম কথা, দুর্ভিক্ষের সময় আমরাই একমাত্র সক্রিয় শক্তি যারা দুর্ভিক্ষ ও অভাবের প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। তাছাড়া, ঐ সময় থেকে কালো টাকার সূত্রপাত। তখন শ্রমিকদের মধ্যে আমরা ছাড়া কোন শক্তি নেই। শ্রমিকদের মধ্যে তখন ডি. এ. আর বেতন বৃদ্ধির ব্যাপক আন্দোলন হয়। শ্রমিকদের মধ্যে আমাদের পা রাখবার জায়গা শক্ত হয়। সেরা লোকদের আমরা পার্টিতে পাই। উদাহরণ : ট্রামের ধীরেন মজুমদার, জহীর, রেজাক, মিশির ইত্যাদি। শেষ কথা হচ্ছে, যুদ্ধে সোভিয়েত-এর যোগদান সবাইকে যুদ্ধ সম্বন্ধে ভাবায়। মনে রাখতে হবে যে সুভাষ বোসও বক্তৃতায় কখনও সোভিয়েতের বিরুদ্ধে কোন উক্তি করেননি। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব আর পার্টির আইনী কাজকর্ম—দুটো একত্রে বুদ্ধিজীবী-দের মধ্যে পার্টির প্রভাব ছড়িয়ে দেয়। তারা দলে দলে পার্টিতে আসতে থাকে। ঐ সময় জনসাধারণের মধ্যে পার্টি কমরেডদের ভাবমূর্তি অকলঙ্ক। লোকে মনে করে, তাদের স্বভাব চরিত্র ভালো—তারা নিঃস্বার্থ কর্মী।'

নৃপেন ব্যানার্জি মনে করেন, পার্টির সামনে তখন অবাধ বিচরণ-ক্ষেত্র। কমিউনিস্ট পার্টি তখন অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি। তিনি বলেছেন, 'কমিউনিস্টদের জন্য খোলা ময়দান। কমিউনিস্টদের হাতে একটার পর একটা ইউনিয়ন চলে আসছে। যে-ক'জন তৃতীয় শ্রেণীর কংগ্রেস নেতা বাইরে পড়ে রয়েছে—আমরা তাদের নিয়ে খেলছি। লীগ নেতা আবুল হাশিম আমাদের সহযাত্রী। আমাদের সভায় বেশ কয়েক হাজার করে লোক হচ্ছে। কিন্তু তখনও জানতাম না মিটিং-এ লোক হওয়া কাকে বলে এবং জানতাম না যে আসল খেলা তখনও বাকি। আমাদের লোক জড়ো করার ক্ষমতা, পরে নেহরু এসে নস্যাৎ করে দিয়েছিল। নেহরুই প্রথম হাজারকে লক্ষে দাঁড় করাল।

যাই হোক, আমরা তখন একটা 'সেন্স অফ স্ট্রেংথ' (শক্তির অনুভূতি) বোধ করতাম। কিন্তু ধীরে ধীরে অবস্থা কেমন যেন মিইয়ে গেল।'

এই মিইয়ে-যাওয়া অবস্থার ছবি 'পার্টি চিঠি'তেও প্রতিফলিত :

'আগস্ট মাসের ১লা তারিখে আমাদের প্রদেশের পার্টি সভ্যের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৮৬৪০। ১৯৪৪ সালের ১লা জানুয়ারী সভ্য ছিল ৭৫১৭। অথচ গত বছর জুন হইতে ডিসেম্বরে সাতমাসে বাড়িয়া ৩৯৯৪ হইতে ৭৫১৭ —প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছিল। জাতীয় রাজনীতির মোড় ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নূতন পর্য্যায়ে পদক্ষেপের বদলে আসিল এই আভ্যন্তরীণ বিপর্য্যয়। সোভিয়েট লাল ফৌজ, বিশ্ব জনগণের বিজয় অভিযানের ও আমাদের কর্মীদের কঠোর পরিশ্রমের ফলেই ভারতের স্বদেশপ্রেমিক শিবির ও জনসাধারণের রাজনৈতিক চৈতন্যের অগ্রগতির পথে এক বিরাট পদক্ষেপ ধ্বনি শুনা যাইতেছে। আর আমাদের পার্টি সংগঠন অচল অবস্থার মধ্যে দিনের পর দিন কাল কাটাইয়া ক্ষয়ের পথে আসিতেছে।' (প্রাদেশিক পার্টি চিঠি নং ১১/৪৪, ২৫শে আগস্ট ১৯৪৪)

কেন পার্টি এভাবে তার চলার ছন্দ হারিয়ে বসল? তার কারণ পর্যা-লোচনা প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে বলা হয়, 'সাধারণভাবে বলতে গেলে, এতে কোন সন্দেহ নেই যে ১৯৪৩ সালের শেষাশেষি পার্টি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং পার্টির অগ্রগতি থমকে যায়। এই নিশ্চলতার কারণ, সাধারণ মানুষ পার্টির মধ্যে আগেকার সেই সংগ্রামী চরিত্র আর খুঁজে পাচ্ছিল না।' (দ্বিতীয় কংগ্রেসে সংস্কারবাদী বিচ্যুতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন, ১৯৪৮, পৃ ১৩৩-৩৪)

আট

১৯৪২-এর স্মৃতির জের ধরে, দেশের রাজনীতিতে সৃষ্টি হয় এক তিক্ততার পরিবেশ। আগস্ট আন্দোলনকে কেন্দ্র করে, সুমিত সরকার লিখছেন, 'কমিউনিস্ট-বিরোধীরা কমিউনিস্টদের ইংরাজের দালাল আখ্যা দেয় আর কমিউনিস্টরা সোশ্যালিস্ট ও সুভাষ বোসের অনুগামীদের 'পঞ্চম বাহিনী' বলে সম্বোধন করতে থাকে। তার ফলে গড়ে ওঠে উভয়ের মধ্যে এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর। তার জের চলতে থাকে দীর্ঘদিন—এমনকি পরবর্তী প্রজন্ম অবধি এই তিক্ততার রেশ অব্যাহত থাকে।' (মডার্ন ইন্ডিয়া, পৃ ৪০৫)।

এ-প্রসঙ্গে মণিকুন্তলা সেন লিখছেন:

'পঞ্চম বাহিনী কথাটার হাস্যকর অপপ্রয়োগ ঘটতে লাগল। সামান্য একটা ভুখা মিছিল নিয়ে যাচ্ছিল সোশ্যালিস্ট পার্টির লোকেরা। মিছিলে ছিল নিতান্তই ছোট ছোট ছাত্র ও ছেলে-মেয়েরা, আর কিছু গরীব লোক। এই মিছিল বেশী এগোলেই পুলিশ ওদের পেটাবে মনে করে আমরা কিছু কর্মী সেটাকে ঠেকাতে গেলাম। ওরা রেগে গিয়ে আমাদের একজন কর্মীকে মার-

ধোর করল। আমরাও পঞ্চম বাহিনী বলে ওদের গালাগাল দিলাম। পরে জেনেছিলাম আমারই এক পরিচিত সোশ্যালিস্ট বন্ধুর নেতৃত্বে ঐ মিছিলটি যাত্রা শুরু করেছিল। তিনি আমাদের লাইন না মানতে পারেন কিন্তু পঞ্চম বাহিনী কখনই নন। পরে তিনি আমাকে অনুযোগ করেছিলেন, 'তুমি এই কাজ করলে?' এ ধরনের ভুল অনেক ঘটতে লাগল।' (সেদিনের কথা, পৃ ৬১)।

যাদের সঙ্গে রাজনৈতিক মতে মেলে না, তাদের ঢালাওভাবে পঞ্চম বাহিনী বা জাপানের চর আখ্যা দেওয়া যে সংগত হয়নি তা পরবর্তীকালে স্বীকার করা হয়। এবং সে সময় যাকে-তাকে পঞ্চম বাহিনী সম্বোধন করে পঞ্চম বাহিনীর শক্তি যে বেশ বাড়িয়ে দেখানো হয়—তাতেও কোন সন্দেহ নেই। দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি সংক্রান্ত প্রতিবেদনে এ-কথাটা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়। বলা হয়:

'সাম্রাজ্যবাদের নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম বর্জনের নীতির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করার জন্যই পঞ্চম বাহিনীর শক্তি সম্পর্কে আমাদের স্বকপোলকল্পিত ধারণার উদ্ভব।...

.. সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকা সম্পর্কে আমাদের ভ্রান্ত ধারণার ফলে আমরা সোশ্যালিস্ট দল, ফরওয়ার্ড ব্লক ও অন্যান্য বামপন্থী গ্রুপগুলি সম্পর্কে জঘন্য সব উক্তি করেছি। আমরা তাদের পঞ্চম বাহিনী ডেকেছি—অথচ আসলে সাম্রাজ্যবাদই পঞ্চম বাহিনীর ভূমিকায় অবতীর্ণ।...

.. এই পার্টিগুলিকে পঞ্চম বাহিনী বলে অভিহিত করার জন্য আমরা বহু লোকের সমর্থন হারিয়েছি এবং হাজার হাজার লোকের ক্রোধের শিকার হয়েছি। যুদ্ধোত্তর যুগে কমিউনিস্ট-বিরোধী জেহাদে বামপন্থী দলের অনুগামীদের সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার পেছনে এটাই মূল কারণ।' (দ্বিতীয় কংগ্রেসে সংস্কারবাদী বিচ্যুতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন, ১৯৪৮, পৃ ১২৯-৩৩)।

বেশ কিছুকাল পর পার্টির সাধারণ সম্পাদক অজয় ঘোষ প্রকাশ্য জনসভায় এ-বিষয়ে পার্টির সর্বশেষ বক্তব্য পেশ করেন। ২৫শে জানুয়ারি, ১৯৫৭, কলকাতার এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে অজয় ঘোষ বলেন:

'কমিউনিস্টরা নেতাজীকে দেশদ্রোহী বলিয়াছিল। আমরা তাঁহার সম্পর্কে এইরূপ কথা বলিবার জন্য দুঃখিত। ১৯৪২ সালে অন্যান্য দেশপ্রেমিক দলের সহিত আমাদের অনুসৃত নীতির বিভেদ ছিল। এইসব মতভেদ সম্পর্কে বাদানুবাদ অত্যন্ত তিক্তভাবে করা হইত। আমাদিগকে বলা হইত বৃটিশের অনুচর, আমরাও বিপক্ষকে বলিতাম ফ্যাসিস্টদের অনুচর ইত্যাদি। ইহা নিঃসন্দেহে শোচনীয়। আমরা বলিয়াছিলাম যে যদি অক্ষশক্তি যুদ্ধে জয়ী হয়, দুনিয়াময় স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম গুরুতরভাবে

দুর্বল হইয়া পড়িবে। যুদ্ধ পরবর্তী ঘটনা হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে আমাদের কথাই ঠিক। জাপানের সাহায্যে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের যে নীতি নেতাজী গ্রহণ করিয়াছিলেন আমরা বিবেচনা করিয়াছিলাম যে সেই নীতি সঠিক নয়। ব্রহ্মদেশের দৃষ্টান্ত ইহার চূড়ান্ত প্রমাণ। কিন্তু তাঁহাকে দেশদ্রোহী আখ্যা দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ ভুল হইয়াছিল। আমরা তাহার জন্য দুঃখিত। সুভাষ বসু দেশপ্রেমিক এবং ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়াছিলেন যদিও অক্ষশক্তি সম্পর্কে তিনি যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা ভুল ছিল ইহাই আমাদের ধারণা।' (যুগান্তর, ২৬. ১২. ১৯৫৭)

কিন্তু সে সব তো অনেক পরের কথা। সেদিন কিন্তু কোন পক্ষই এ-বিষয়ে আপস করতে রাজি নয়। নৃপেন ব্যানার্জি বলছেন, 'আগস্ট আন্দোলন ঝিমিয়ে এল। কিন্তু স্কুলে-স্কুলে কলেজে-কলেজে কমিউনিস্ট ছাত্রদের কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হল। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদের সঙ্গে ভীষণ তর্ক বেধে গেল। এ-বিষয়ে আর. এস. পি.-র চ্যালেঞ্জ সবচেয়ে জোরালো। একটি-দুটি করে ছেলেকে আমাদের পক্ষে টানতে হত। জোশী বলতেন, যদি 'কনভিন্স' (বুঝিয়ে রাজি) করতে না পারো, 'কনফিউজ' (বিভ্রান্ত) করে দাও। তর্কের পয়েন্টস্ জোশী যোগাতেন 'পিপ্‌লস্ ওয়র' পত্রিকায় প্রশ্নোত্তর আকারে।'

তিনি বলছেন, 'ছাত্র ফেডারেশন তখন ছাত্রদের সমস্যার উপর জোর দিচ্ছে। বই খাতা কেরোসিন সস্তা দরে ছাত্রদের দিতে হবে। আমরা যখন গঠনমূলক আন্দোলনের চেষ্টা করছি তখন আর. এস. পি., ফরওয়ার্ড ব্লকের ছাত্ররা চেষ্টা করছে ছাত্রদের মধ্যে বিয়াল্লিশের স্পিরিট-কে জিইয়ে রাখার। কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয় লনে ছাত্রসভা। ১৯৪৪ সালের ৯ই আগস্ট। সেই সভায় নাটকীয়ভাবে হাজির তথাকথিত আন্ডার-গ্রাউন্ড থেকে সি. এস. পি.-র অবনীশ্বর মিশ্র ওরফে কমরেড গুপ্ত। সে বলল, আগের বক্তার মনোভাবের সঙ্গে আমি একমত। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কোন্ পথে সেই মুক্তি। তাঁরা চাইছেন ভিক্ষে করে মুক্তি আর আমরা চাইছি জেল ভেঙে মুক্তি আদায় করতে।

ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে আমরা ছাত্র কনভেনশন ডেকেছি ছাত্রদের আশু দাবির ওপর। কাগজ চাই—বই চাই—খাতা চাই। বক্তৃতা চলছে। এমন সময় তড়াক করে লাফ দিয়ে একজন ডায়াসে উঠে দাঁড়াল। 'চাই-চাই-চাই, চাই তো অনেক কিছু। কিন্তু দিচ্ছে কে? চাইতে গেলে লড়তে হয় এবং সেটা এখানে নয়—সেটা রাস্তায়।'

এই রাজনীতির নাম জোশীর ভাষায় 'বিপ্লবের পাশবিক মতবাদ'। তিনি লিখছেন: 'তাঁহারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন, তাহা হইতেছে—"জনগণ না খাইয়া মরুক। তাহা হইলেই বিপ্লব আসিয়া যাইবে।"' (জবাব, পৃ ২১২)

এতসব ঘটছে, কিন্তু মধ্যবিত্তদের মধ্যে পার্টি সম্বন্ধে বিরূপতার কিছু কমতি নেই। 'জনযুদ্ধ' বিক্রির স্কোয়াডের উপর হামলা অব্যাহত। ফরওয়ার্ড ব্লকের কৃতিত্ব এ-ব্যাপারে বেশি। লোকের মধ্যে এই কথাটা চালু হয়ে গেছে যে কমিউনিস্টরা ইংরেজের টাকা খায়।

একদিন নৃপেন ব্যানার্জি কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে 'জনযুদ্ধ' বিক্রি করছেন অন্যদের সাথে। এমন সময় ট্রাম থেকে এক ভদ্রলোক নেমে এসে জিজ্ঞেস করলেন :

—তুমি বিজয়বাবুর ছেলে না?

—হ্যাঁ।

তারপর প্রশ্ন :

—তোমায় ওরা কত করে দিয়েছে?

সেদিন এ ধরনের প্রশ্ন একজন কমিউনিস্টের কাছে অভাবনীয় বা অপ্রত্যাশিত নয়। প্রশ্নকর্তা ভদ্রলোকটি আসলে মধ্যবিত্ত সমাজের এক প্রতিভূস্থানীয় চরিত্র। সেদিন মধ্যবিত্ত মানসিকতায় ইংরেজ-বিরোধিতা ও কমিউনিস্ট-বিদ্বেষের এই অদ্ভুত সহাবস্থান এক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। ইংরেজের বিরুদ্ধে তাদের পুঞ্জীভূত জ্বালা ও অক্ষম রাগ কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে অন্ধ আক্রোশে রূপান্তরিত।

সেদিনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে সোমনাথ লাহিড়ী বলছেন, 'আমরা তখন সার্পেন্টাইন লেনে থাকতাম। আমি, সরোজ মুখার্জি, সরোজের বৌ, কয়েকটি মেয়ে ও কয়েকটি ছেলে। ঢুকতে বেরুতে বেশ মুস্কিলে পড়তে হত। ধরে মারত—মেয়েদের কাপড় ধরে টানত। একসঙ্গে তিন-চারজন দল বেঁধে বেরুতে হত। আমায় কিছু বলত না। আমি গট্ গট্ করে চলে যেতাম। পেছন থেকে কথা ছুঁড়ে মারত মাঝে মাঝে। বোধহয় আমার 'পজিশন'-এর কথা ভেবে আমায় মারধর করেনি। ভেবেছে হয়তো আমায় মারধর করলে খুব খারাপ প্রতিক্রিয়া হবে। এসব করত হাফ-মস্তানেরা। যারা রকে বসে আড্ডা দেয়—আবার রাজনৈতিক আন্দোলনেও ঝাঁপিয়ে পড়ে। সাধারণ মানুষের সমর্থন ছিল তাতে—অন্তত তারা আপত্তি করেনি।'

এই কমিউনিস্ট-বিদ্বেষের উৎস কী? জবাবে লাহিড়ী বলেন, 'এর উৎস আমাদের হিটলার-বিরোধিতা। লোকে তখন 'হিটলারাইট' (হিটলারপন্থী) হয়ে পড়েছিল—হিটলারের সহায়তায় দেশ স্বাধীন করার কল্পনায় মেতে উঠেছিল। কংগ্রেস-কর্মীরা প্রকাশ্যে এটা স্বীকার না করলেও মনে মনে তারাও তাই ভাবত। খুব খারাপ অবস্থার মধ্যে আমাদের তখন সময় কাটছিল।'

নয়

১৯৪৫ সালের গোড়াতে কংগ্রেস নেতারা একে একে জেল থেকে ছাড়া পেলেন। বড় মাঝারি খুদে নেতা—সবাই বেশ ভালভাবেই সংবর্ধিত। কারাবাস তাঁদের গৌরবান্বিত করেছে। খোকা রায় বলছেন, 'এমনকি লীগ-সমর্থক মুসলমান উকীল মোক্তাররাও তাদের সমীহ করে। ওদের চোখেও ৪২-এ আমাদের ভূমিকা ভালো নয়।'

দামোদর ধর্মানন্দ কোসম্বী লিখছেন, 'আতঙ্কগ্রস্ত ব্রিটিশ সরকার সমস্ত নেতাকে জেলে ভরে দেয়। ফলে পরবর্তী ঘটনাবলির জন্য তাদের কোনভাবে আর দায়ী করা চলে না। উপরন্তু কারাবরণের এমনই মহিমা যে, তাঁদের প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, জনগণের মাঝে কংগ্রেস আবার পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। মানুষ ইতিমধ্যে ভুলে গিয়েছে কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলির সাদা-মাটা কীর্তিকলাপের কথা।' (এক্সাসপ্যারেটিং এসেজ, পৃ ১৭)

'১৯৪৫ সালে ভবানীবাবু আমাদের সদ্য ছাড়া-পাওয়া কংগ্রেসী নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বললেন', বলছেন অমিয় মুখার্জি। 'জনযুদ্ধে'র রাজনীতি তাঁদের বুঝিয়ে বলে পার্টির ইমেজকে উজ্জ্বলতর করার জন্য এই নির্দেশ।' তিনি আলাপ করে দেখেন, চেনাজানা উত্তর কলকাতার কংগ্রেসী নেতাদের রাজনৈতিক জ্ঞান একেবারে সামান্য। আন্তর্জাতিক রাজ-নীতির কোন খবরই তাঁরা রাখেন না বলা চলে। কমিউনিস্টদের যুক্তি হয়তো অকাট্য—কংগ্রেস নেতারাও যুক্তিতে পেরে ওঠেননি। কিন্তু স্বাধীনতার প্রশ্ন যেখানে প্রধান—সেখানে যুক্তির চেয়েও আবেগ বড়।

পরবর্তীকালে জোশী লেখেন :

'দিনগুলি আমাদের পক্ষে উতরোল আর বিপর্যয়ে ভরা। কংগ্রেসের দক্ষিণ-পন্থী ও বামপন্থী—উভয় তরফের নেতারা আনলেন কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ। দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস নেতাদের মুখপাত্র ছিলেন সর্দার প্যাটেল। বামপন্থী ফরওয়ার্ড ব্লক তো বটেই, তাছাড়া ছিলেন জয়প্রকাশ ও মাসানি প্রমুখ কংগ্রেস-সমাজতন্ত্রী নেতারা—যাঁরা আগস্ট বিপ্লবের গৌরবমুকুট পরে সারা দেশ চষে বেড়াচ্ছিলেন। আমি মহাত্মাজীর সঙ্গে বারকয়েক দেখা করে তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম—কিন্তু তাঁর মনো-ভাবের তেমন কিছু ইতরবিশেষ ঘটল না।' (এ ডেডিকেটেড টিচার, এসেজ ইন অনর অফ প্রফেসর এস. সি. সরকার, পৃ ৮)

কংগ্রেস ও কমিউনিস্টদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ব্যবধানের পটভূমিতে জোশী আবেদন জানান, 'কংগ্রেসের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির পুরাতন হৃদ্যতা আবার ফিরে আসুক, কংগ্রেস যেহেতু পিতৃপ্রতিম সংগঠন, এবং তার নেতারা আমাদের রাজনৈতিক পিতা এবং কংগ্রেস কর্মীরা আমাদের সহযোদ্ধা।'

১৯৪৫ সালের গোড়ায়, 'কমিউনিস্ট ও কংগ্রেস' পুস্তিকায় জোশী

লেখেন : 'কংগ্রেস দেশের সর্ববৃহৎ জাতীয় প্রতিষ্ঠান…বিভিন্ন দেশপ্রেমিক শক্তিগুলিকে নিজ সংগঠনের মধ্যে স্থান দিয়া কংগ্রেস আজ শক্তিমান হইয়া উঠিয়াছে।'

কমিউনিস্ট পার্টির শক্তি সম্পর্কে তিনি দাবি করেন :

'১৯৩০-এর আন্দোলনের মধ্য দিয়া যেসব বামপন্থী সংগঠন গড়িয়া উঠিয়াছিল, ১৯৪০ এবং তারপরে সেইসব দল ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। একমাত্র পার্টিই ক্রমাগত লড়িয়া চলিয়াছে এবং আজ নিজ শক্তির বলে আমাদের পার্টিই কংগ্রেস এবং লীগের পরেই দেশের মধ্যে, তৃতীয় বৃহৎ রাজনৈতিক শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে।' (কমিউনিস্ট ও কংগ্রেস, পৃ ৪-৫)

জোশী কংগ্রেস-কর্মীদের স্মরণ করিয়ে দিতে চান : দেশ উভয় সংগঠনকেই চায়। তার কারণ, 'কংগ্রেসের মধ্য হইতেই আমাদের জন্ম ; কংগ্রেস নেতারাই আমাদের রাজনৈতিক গুরু এবং কংগ্রেস অনুগামীরা আমাদের সহযোদ্ধা।' (ঐ, পৃ ৫)

জাতীয় আন্দোলনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ, কমিউনিস্ট পার্টির মতে, আজ এই তিনটি জাতীয় স্লোগান : স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ। 'এই তিনটি জাতীয় আন্দোলনের মূলকথা।…সেই সব নীতি যাঁহারা প্রথম প্রচার করিয়াছেন কমিউনিস্টরা তাঁহাদের অন্যতম।' (ঐ, পৃ ১১-১২)

কমিউনিস্টদের মতে স্বাধীনতা ও পাকিস্তান দাবি অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। এবং কমিউনিস্টদের প্রচারের লাইন এইরূপ : 'লীগপন্থীদের মধ্যে আমরা প্রচার করিয়াছি কংগ্রেসের সহযোগিতা ছাড়া পাকিস্তান সম্ভব নহে। কংগ্রেসপন্থীদের কাছে আমরা বলিয়াছি, আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে কংগ্রেস-লীগ ঐক্য না হইলে জাতীয় সরকার আদায় অসম্ভব। এইভাবেই উভয়ের মনের মধ্যে চিন্তা জাগাইয়া তুলিতে আমরা চেষ্টা করিয়াছি।' (ঐ, পৃ ২০-২১)

মুসলীম লীগ ও পাকিস্তান দাবি সম্পর্কে কংগ্রেস কর্মীদের দৃঢ়মূল সংস্কার ও বিরূপতাকে মনে রেখে জোশী লিখছেন : 'কংগ্রেস জনসাধারণের নিকট গান্ধীজীর যে স্থান, মুক্তিকামী লীগ-জনসাধারণের নিকট জিন্না সাহেবের স্থানও সেইরূপ।…'স্বরাজ', এই একটি শব্দের দ্বারা গান্ধীজি আমাদের স্বাধীনতার প্রেরণাকে যেভাবে ভাষা দিয়াছিলেন, জিন্না সাহেব তেমনি তাঁহার 'পাকিস্তান' কথার মধ্যে মুসলিম জনগণের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও নিজ বাসভূমে পূর্ণ অধিকার অর্জনের কামনাকে রূপ দিয়াছেন।' (ঐ, পৃ ৩১)

এই রচনায় জোশী অগাস্ট আন্দোলনকে কংগ্রেসের আন্দোলন বলে অভিহিত করতে অস্বীকার করেন। এই আন্দোলন, পার্টির মতে, জন-

প্রকাশের দলের কীর্তি। এই আন্দোলনের পক্ষে জনসমর্থন জোগাড় করার জন্যে তারা কংগ্রেসের নাম জাল করেছে এবং এই আন্দোলন ফ্যাসিস্ট শক্তির সহায়ক।

সুভাষ বসুর প্রতি কমিউনিস্ট পার্টির বিরূপতা জোশীর রচনায় আরেকবার প্রকট হয়। তিনি লিখছেন: 'নীতিহীন সুবিধাবাদের জন্য সুভাষ বসু কংগ্রেস হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন, কংগ্রেস ভক্তরা একথা জানেন।' (ঐ, পৃ ২৩)

এই রচনার পটভূমি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে জোশী লিখছেন:

'আমরা জানি কংগ্রেসসেবীদের মধ্যে কমিউনিস্ট বিদ্বেষ প্রসার লাভ করিয়াছে ---জাতীয় আন্দোলন আজ গভীর সংকটের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছে, কমিউনিস্ট বিতাড়নের দাবি তাহারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। কংগ্রেস কর্মীরা আজ প্রকাশ্যেই স্বীকার করিতেছেন এবং আগাইবার পথ তাঁহারা খুঁজিয়া পাইতেছেন না। · আমরা মনে করি, কংগ্রেসসেবীদের মনে আমাদের সম্বন্ধে যে ভুল ধারণা রহিয়াছে তাহা হইতেই এই বিদ্বেষের জন্ম এবং এই ভুল ধারণাকে দূর করাই আমাদের কর্তব্য।' (ঐ, পৃ ৩৯)

কিন্তু কংগ্রেসসেবীদের মন থেকে কমিউনিস্ট-বিদ্বেষ দূর হল না। একটার পর একটা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি কমিউনিস্টদের নির্বাচিত কর্মকর্তার পদ থেকে সরিয়ে দিতে থাকে। পরিশেষে ১৯৪৫ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক, জে. বি. কৃপালনী নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কমিউনিস্ট সদস্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র পেশ করেন। তার জবাবে পি. সি. জোশী যুদ্ধ চলাকালীন পার্টির লাইন ব্যাখ্যা করে এক চিঠি লেখেন। তার উপর (১৯৪৫ সালের ১১-১২ই ডিসেম্বর) কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মন্তব্য:

'জবাবটি একটি বিরাট বই—প্রচারের উদ্দেশ্যেই লিখিত। নির্দিষ্ট অভিযোগ-সমূহ খণ্ডন করিবার জন্য প্রায় কোন চেষ্টাই করা হয় নাই এবং তাহার জন্য কোন অনুশোচনাও করা হয় নাই। যে-সব লক্ষ্যের উপর ভিত্তি করিয়া অভিযোগ তৈয়ারী করা হইয়াছিল তাহারও প্রতিবাদ করা হয় নাই। রিপোর্টে যে সমস্ত দলিলের কথা বলা হইয়াছিল, তাহাও প্রমাণ-সিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। স্বাক্ষরকারীরা আগাগোড়া তাহাদের নিজেদের কাজ সমর্থন করিয়াছে এবং নিঃসন্দেহে কংগ্রেসের মূলনীতি আক্রমণ করিয়াছে।

তাহাদের জবাবদিহি কংগ্রেসকে আক্রমণ ছাড়া আর কিছুই নয়। তাহাদের কথাবার্তা ঔদ্ধত্যপূর্ণ আত্মপক্ষ সমর্থন ছাড়া কিছুই নয়। তাহাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ যে সত্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। তাহাদের জবাব হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে তাহারা অনেকদিন

হইতেই কংগ্রেসের নীতি ও কার্যসূচীর সক্রিয় বিরোধিতা করিতেছে এবং বাধা দিতেছে। তাহারা কংগ্রেস সংগঠনের সম্মান ও পদমর্যাদা যাহাতে ক্ষুন্ন হয় এরূপ কাজ এখনও করিতেছে।

তাহারা সর্বতোভাবে কংগ্রেসের আস্থা হারাইয়াছে। কংগ্রেসের নির্বাচিত কমিটিসমূহের দায়িত্বশীল পদে অধিকারী থাকার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। সম্ভবত তাহারা তাহাদের অবস্থা উপলব্ধি করিয়াছে। জ্ঞানপাপী বলিয়াই তাহারা কংগ্রেসের নির্বাচিত কমিটিসমূহ এবং কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্য-পদেও ইস্তফা দিয়াছে। আমরা ঐ আটজন এ. আই. সি. সি. সভ্যকে কংগ্রেস হইতে বহিষ্কার করা অনুমোদন করিতেছি, এবং সমস্ত প্রাদেশিক কমিটিকে কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যদের কংগ্রেসের নির্বাচিত কমিটি সমূহ হইতে বহিষ্কার করিবার নির্দেশ দিতে সুপারিশ করিতেছি।' (বোম্বে ক্রনিক্‌ল্, ১৩. ১২. ১৯৪৫)

এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে কমিউনিস্টদের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জোশীর বিবৃতিতে ব্যক্ত হয়। তাতে বলা হয়:

'অতীতে আমাদের মধ্যে কোথায় মিল আর কোথায় গরমিল ছিল, তাহা আমরা জবাবে তুলিয়া ধরিয়াছি। আজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বহুকালের বন্ধু মুনাফাখোর, চোরাকারবারী ও মধ্যযুগের পরগাছা জমিদারদের খোলাখুলিভাবে কংগ্রেসের মধ্যে নেতৃবর্গ অভ্যর্থনা জানাইতেছেন। আর যে-কমিউনিস্টরা দেশে মজুর ও কিসানের মধ্যে যাহা কিছু সংগঠন গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহাদের কংগ্রেস হইতে বহিষ্কার করিতেছেন। এই নবাগত ও বহিষ্কৃতদের মধ্যে কাহারা কংগ্রেসের মর্যাদা ক্ষুন্ন করিবে—তাহা প্রমাণ করিবে ভবিষ্যতের ইতিহাস।' (ঐ, ১৪. ১২. ১৯৪৫)

জাতীয় কংগ্রেস ও কমিউনিস্টদের মধ্যে বিচ্ছেদ এবার পাকাপাকিভাবে সম্পন্ন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রশ্নে উভয়ের মধ্যে যে বিচ্ছেদের সূচনা—তার আনুষ্ঠানিক উপসংহার এভাবে ঘটল। প্রসঙ্গত, কমিউনিস্ট পার্টির যে সমস্ত কাজ কংগ্রেসের নেতাদের চোখে অত্যন্ত নিন্দনীয়, অনুরূপক্ষেত্রে অন্যদের বেলায় তাঁরা কিন্তু অতিমাত্রায় উদার। উদাহরণস্বরূপ, সুমিত সরকারের ভাষায়:

'...এটাও উল্লেখযোগ্য যে রাজগোপাল আচারীর মতো দক্ষিণ ভারতের স্বনামখ্যাত গান্ধীবাদী নেতা আগস্ট আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন। উপরন্তু তিনি পাকিস্তান দাবিকে ভিত্তি করে মুসলিম লীগের সঙ্গে আলাপ আলোচনা শুরু করার পরামর্শ দেন। অথচ কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে নেহরু যখন বিষোদ্গার করেন এবং কংগ্রেসী জনতা বোম্বাইতে কমিউ-নিস্টদের সদর দপ্তর আক্রমণ করে—তখন রাজাগোপাল আচারীর ভূমিকা সম্পর্কে তারা নীরব। এমনকি হিন্দু মহাসভার কয়েকজন নেতা যে ১৯৪২

সালের অগাস্ট আন্দোলনের সময় মন্ত্রিত্ব করে গেছেন—সে বিষয়েও উচ্চবাচ্য করা হয় না। তাদের মারধোর করা দূরে থাকুক।' (মডার্ন ইন্ডিয়া, পৃ: ৪১১-১৩ ; ৪২০)

জাতীয় কংগ্রেসের পরিমণ্ডলের বাইরে নব পর্যায়ে যখন কমিউনিস্ট পার্টির একক পথ চলা শুরু—এদিকে তখন কংগ্রেসের সভায় মানুষের উপছে-পড়া ভীড়। সে সময় কলকাতায় সদ্য কারামুক্ত শরৎ বসু জনপ্রিয়তার শিখরে বিরাজ করছেন। জেল থেকে বেরুতেই শরৎ বসু প্রথমে হাওড়া ময়দানে—তারপর দেশবন্ধু পার্কে সংবর্ধিত হলেন। দেশবন্ধু পার্কে ভীড়ের চাপে একজন মারা গেল। লক্ষাধিক মানুষের ভীড়। অন্যদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে শরৎ বসু গাইলেন—কদম কদম বঢ়ায়ে যা। আজাদ হিন্দ ফৌজের গান। আই. এন. এ বা আজাদ হিন্দ ফৌজের খাকি উর্দিপরা সেনাদের তখন কলকাতার রাস্তাঘাটে দেখা যাচ্ছে। তাঁদের দেখে মানুষের বাঁধভাঙা আবেগ। দিল্লীর লালকেল্লায় তখন আই. এন. এ-র সেনানায়ক শানওয়াজ, সেগল আর ধীলনের বিচারের আয়োজন।

সে সময় আর একজন সদ্যোমুক্ত রাজবন্দী সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার কমিউনিস্ট পার্টির ক্রীক রো কমিউনে কুমুদ বিশ্বাসকে জিজ্ঞাসা করছেন, অবস্থা কী?

'ভালো নয়', কুমুদ বিশ্বাসের জবাব। 'আই. এন. এ-র লোকেরা বেরিয়েছে—আমাদের 'বেস' রাখা দায়।' লোকের মনে প্রশ্ন : আই. এন. এ-র জোয়ানরা যদি দেশপ্রেমিক হয়—তাহলে সুভাষ বসুকে কী করে দেশদ্রোহী বলা যায়? এ প্রশ্নের সদুত্তর কুমুদ বিশ্বাসেরও জানা নেই।

এক চরম প্রতিকূল পরিস্থিতি। বিষণ্ণ চিন্মোহন সেহানবীশ অনুভব করছেন : 'কংগ্রেস আর লীগের পরেই আমাদের পার্টির স্থান। কমিউনিস্ট পার্টি তৃতীয় শক্তি। অথচ আমরা হয়ে গেলাম অপাঙ্‌ক্তেয়!'

বিশ্বরণাঙ্গনে 'জনযুদ্ধ' জয়যুক্ত। অথচ এক অভাবনীয় সমস্যাবর্তের কবলে এদেশের কমিউনিস্টরা!

দ্বিতীয় পর্ব

বৈশাখী মেঘ মেদুর হয়েছে সুদূর কোণে
কুরুক্ষেত্রে উড়েছে হাজার রথচক্রের ধূলি
স্বপ্ন-গোধূলি ডুবে গেল খর-রক্তের কোলাহলে।

বিষ্ণু দে / ক্রেসিডা

এক

'দেশ ও জাতির জীবনে এমন একটা সময় আসে যখন ইতিহাস একদিনে কুড়ি বৎসর এগিয়ে যায়'—মার্কসের এই অবিস্মরণীয় উক্তিটির যথার্থ তাৎপর্য এদেশে ক'জনা উপলব্ধি করেছিল? অন্তত ১৯৪৫-এর ২১শে নভেম্বরের আগে? কী ঘটতে যাচ্ছে সেদিন—কোন পূর্বাভাস কি তার ছিল? বা হাওয়ায় হাওয়ায় কোন সংকেত?

না, কোন পূর্বাভাস পাননি নৃপেন ব্যানার্জি। দিল্লীর লাল কেল্লায় আই. এন. এ. বন্দীদের বিচার চলছে। সেদিন অর্থাৎ ২১শে নভেম্বর গান্ধীবাদী ছাত্র সংগঠন, দিলীপকুমার বিশ্বাস-দের ছাত্র কংগ্রেস একটা সভা ডেকেছিল তার প্রতিবাদে। ছাত্রদের মধ্যে তাদের তেমন পাত্তা ছিল না। কাজেই কেউ তেমন গুরুত্ব দেয়নি সভাটার উপর। ইডেনে সেদিন একটা বড় ক্রিকেট খেলা ছিল—নৃপেন ব্যানার্জি খেলা দেখতে যান। তিনি বলছেন, 'খেলা ভাঙার পর রাস্তায় এসে শুনলাম ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের একটা গণ্ডগোল হয়েছে। ছাত্ররা রাস্তায় বসে আছে। আমাদের কোন ব্যাপার নয়—তবুও 'ইনস্টিংক্টিভ্লি' (প্রবৃত্তিবশে) সেদিকে পা বাড়ালাম। পুলিশ কর্ডন করে রয়েছে—এগুনো গেল না। তখন মেট্রো সিনেমার গলি দিয়ে কর্ডনের পাশ কাটিয়ে এসে ধর্মতলার রাস্তায় নামলাম। পরিষ্কার কিছু বুঝতে পারছি না। শুনলাম একটু আগে লাঠিচার্জ হয়ে গেছে। ছত্রভঙ্গ ছাত্ররা ধীরে ধীরে এসে জড়ো হয়েছে। অফিস ভাঙা ভীড়ও রয়েছে—তারাও নতুন কিছুর প্রত্যাশায় ছাত্রদের আশেপাশে দাঁড়িয়ে। নতুন কিছু ঘটছে—নতুন কিছু ঘটতে চলেছে। মনে ভয়ও রয়েছে: দেখলাম সরোজ হাজরা আর কমলাপতি রয়েছে ছাত্রদের সঙ্গে। আমি এসে সরোজদার সঙ্গে যোগ দিলাম।

বিরাট পুলিশ বাহিনী মোতায়েন। ঘোড়-সওয়ার পুলিশও রয়েছে—তারা মাঝে মাঝে এসে ভীড় সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। এমন সময় দেখলাম চাঁদনির দিক থেকে একদল খাকসার সামরিক কায়দায় মার্চ করে আসছে। তারা এসেই পুলিশ কর্ডনকে ধাক্কা দিল। সঙ্গে সঙ্গে লাঠিচার্জ—হুড়োহুড়ি দৌড়াদৌড়ি। রাস্তায় সাধারণ লোকের সংখ্যা ইতিমধ্যে অনেক বেড়ে গেছে—আশেপাশের মুসলমান ছেলেরাও নেমে পড়েছে। রাস্তার আলো নিভিয়ে দেওয়া হল—বাল্ব্ ভেঙে ভেঙে। এই প্রথম রাস্তা অন্ধকার করল কলকাতার মানুষ। আমি আর সরোজ হাজরা দোতলায় লন্ডন ফার্মেসিতে আশ্রয় নিয়েছি। একটু পরে আবার রাস্তায় নেমে এলাম। কানে এল—কাছের এক দোকান থেকে প্রাদেশিক ছাত্রনেতা রণজিৎ গুহ, রমেন ব্যানার্জিকে ফোন করছে। রমেনদা, তাহলে কি 'ইনসারেকশন' (অভ্যুত্থান) শুরু হয়ে গেল!

আসলে কী যে ঘটছে—ঘটনা কোন্‌দিকে যে গড়াবে—কেউ আন্দাজ করতে পারছে না। অবস্থা দেখার জন্যে পার্টির নেতারা একে একে আসছেন। এলেন কুমুদ বিশ্বাস—এলেন নৃপেন চক্রবর্তী। তাঁরা চলেও গেলেন। নেতারা স্পষ্টত মনস্থির করতে পারছেন না। শ্যামাপ্রসাদ দস্তুরমতো ঘাবড়ে গেছেন। তিনি তখনকার দিনের গরম নেতা। তিনি ছাত্রদের বললেন—তোমরা বাড়ি চলে যাও—আমি দেখছি। কিন্তু কেউ বাড়ি ফিরে গেল না।'

সেদিন অবন্তী সান্যাল বিরাট কিছু প্রত্যাশা নিয়ে আসেননি সেখানে। ছাত্র কংগ্রেস আর মির্জাপুরি ছাত্র ফেডারেশন মিটিং ডেকেছে একই সময়ে একই জায়গায়। কলকাতার স্কুল-কলেজ ছেড়ে ছেলে-মেয়েরা এসে জুটেছে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। ক্ষুদে নেতারা ঘুরছে চারপাশে, রুক্ষ চুল, হাত গোটানো টুইলের সার্ট। মুখে মুখে ফিরছে নেতাজীর জয়ধ্বনি।

নভেম্বরের দ্বিপ্রহর। মাথার ওপরে সূর্য। ইতস্তত সঞ্চরমান পদক্ষেপে ধুলো উড়ছে। খানিক পরেই শেষ হবে মিটিং। ফিরে যাবে ছেলেরা যথাস্থানে। পরদিন ঢুকবে স্কুল-কলেজে, ক্লাস করবে, নোট নেবে। আবার হঠাৎ বেরিয়ে আসবে শোভাযাত্রা করে। এই তো চলছে আজ তিন বছর। আজও তা অন্যথা হবে কেন? মিটিং তখন শেষের মুখে।

হঠাৎ তাঁর কানে এল লাউডস্পীকার থেকে শোনা যাচ্ছে···পুলিশ জুলুম অবশ্যম্ভাবী। আমরা ডালহাউসি স্কোয়ারের দিকে এগিয়ে যাব। বাধা মানব না। দরকার হলে প্রাণ দেব·· বক্তৃতা করছেন ছাত্রনেতা নৃপেন সান্যাল।

গান তখনও শেষ হয়নি। বাঁধভাঙা জনস্রোতের মতো ছাত্ররা এগিয়ে চলল। তিনিও এগোচ্ছেন। অবন্তী সান্যাল লিখছেন:

'ধর্মতলার বাঁক ঘুরছি তখন। সামনে আটকে গেল একটা আমেরিকান্ জিপ। শোভাযাত্রা গর্জন করছে—'জয় হিন্দ', 'কুইট ইণ্ডিয়া'। বেচারী আমেরিকান ড্রাইভার।

ফুটপাত আর রাস্তার একাংশ আটকে চলেছি আমরা, কখনো ট্রাম লাইন আটকে, কখনো সংকুচিত হয়ে। পেরিয়ে গেলাম কমলালয়, ফ্রি স্কুল স্ট্রীট। মাথার উপরে জানলা খুলে গেছে, রেলিং-এ ঝুঁকে পড়েছে দেশী, বিদেশী মুখগুলো। জ্যোতি সিনেমা পেরিয়ে এলাম। সামনে ম্যাডান আর মতি শীল স্ট্রীট। পথ আটকাল পুলিশ।

বসে পড়ল তৎক্ষণাৎ শ-দুয়েক ছেলে রাস্তার উপরে। লাইন তখন ভেঙে গেছে। ছুটে আসছে ছেলের দল, কয়েক হাজার, চীৎকার করে। পথ আটকেছে পুলিশ। সামনে লালমুখো ফিরিঙ্গী সার্জেন্টের দল। ভ্যানের উপর লাঠিধারী পুলিশ। ম্যাডান স্ট্রীটের উপর দুটো ভ্যান। আর পথের উপর বসে রয়েছে হাজার হাজার ছেলে। তখন ৩-৩০ মিনিট।

ছেলেরা চেঁচাচ্ছে। স্লোগানের হুংকারে কাঁপছে চারদিক। বক্তৃতা দিচ্ছে কেউ কেউ; চীৎকার করছে প্রাণপণে। ততক্ষণে ভিড় জমে গেছে পথচারীর, 'চালাও ভাই', 'এই ত চাই'। অবাঙালী একজন ছাত্র মাঝখানে পথ তৈরী করে নিয়েছে। হাতে ফ্ল্যাগ, পায়জামার উপর পাঞ্জাবী, বোতাম আঁটা ভেস্ট। গান ধরেছে পা ফেলার তালে তালে—যে গান গাইত আজাদ হিন্দ ফৌজ। যে যেমন করে পারে গেয়ে উঠছে সমবেত কণ্ঠে। ততক্ষণে এসে পড়েছেন সংবাদবাহীরা। ছাদের উপর থেকে ফটো নিচ্ছে আমুদে যন্ত্রব্যবসায়ী, অপেক্ষা করছি আমরা।

হেলে পড়ল সূর্য। দূরে গির্জার চূড়াটা ঝকমক করছে। অট্টালিকার বেড়াজালে ঘেরা চৌমাথায় ছায়া নেমেছে। কতক্ষণ হয়ে গেল। আর কতক্ষণ থাকতে হবে?

…প্রতি মুহূর্তে আশংকা করছি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে ছাত্রদল। উত্তেজনার বশে আক্রমণ করবে মুষ্টিমেয় লালমুখো সার্জেন্টগুলোকে। কে একজন কংগ্রেসী প্রৌঢ় ভদ্রলোক আবেদন জানালেন শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করতে যতদিন পর্যন্ত না পুলিশ রাস্তা ছেড়ে দেয়। এমন সহিষ্ণুতা জীবনে দেখিনি; এমন ধৈর্য কখনো আশা করিনি ছাত্রদের তরফ থেকে। দেখছি আর আশ্চর্য হচ্ছি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে আছি।

আলো জ্বলল রাস্তায়। সিনেমার পাশের আলো জ্বলে উঠল। এপাশ ওপাশ ক্যামেরা বসিয়ে শকুনির মত অপেক্ষা করছে সংবাদবাহীরা। এরি মধ্যে কে বালতি করে জল খাইয়ে গেল ছেলেদের; ঠোঙ্গায় বিস্কুট ছুঁড়ে দিল। কতক্ষণ? আর কতক্ষণ? ছেলেরা কি অসহিষ্ণু হয়ে উঠল?

— কোন নেতা আসছেন না কেন?'
—'শরৎবাবুকে ফোন করা হয়েছিল?'
—'আমরা ফিরব না—কিছুতেই না।'

…নেতা—যে কোন কংগ্রেসী নেতা ফেরাতে পারেন এদের আসন্ন বিপদ থেকে। ভাবছি আর মুহূর্ত গুনছি। কমার্স ক্লাসের ছেলেরা দল বেঁধে আসছে ছুটে। পুলিশ কর্ডনের ওপিঠে একটা দল ফ্ল্যাগ হাতে দাঁড়িয়ে গেছে। দ্বিগুণ উৎসাহে চঞ্চল হয়ে উঠল ছাত্রদল…

…হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠল সামনের ছেলেরা। 'লাঠিচার্জ'—চেঁচিয়ে উঠল অনেকে। ছিটকে পড়লাম একেবারে মাথায়, ফুটপাত ঘেঁষে, ল্যাম্প পোস্ট ঘেঁষে, কে যেন হাত চেপে ধরল। গৌরী হাত ধরে চেঁচাচ্ছে—লাঠিচার্জ সুরু হয়ে গেল, অবন্তীদা সর্বনাশ। তখন প্রায় ৭টা।

এমনি সময়—ঠিক এই মুহূর্তে বিদ্যুতের বেগে ছুটে এল অশ্বারোহী জাঠ পুলিশ। মতি শীল স্ট্রীট থেকে ছুটে গেল ধর্মতলা দিয়ে ওপারে

ম্যাডান স্ট্রীটের দিকে জনতাকে দু' ভাগে ভাগ করে। ঘোড়ার চাঁটে ছিটকে পড়ল একজন—হুমড়ি খেয়ে পড়ল একটা শিখ ছেলে।

তখনই গুলি ছুটল। কলকাতার প্রকাশ্য রাজপথে ১৯৪৫ সালের ২১শে নভেম্বরের ৭-১০ মিনিটের আলো-অন্ধকারে যে এ দৃশ্য দেখেনি—সে বুঝতেও পারবে না কোনদিন কি ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছিল। গুলি ছুটলো উল্টোদিক থেকে। ভীড়ের চাপে স্রোতের মত জনতা পেছিয়ে যাচ্ছে। ...শুধু মনে হলো হাজার হাজার ছেলে পালাচ্ছে। ভীড়ের মধ্যে ফিরে দাঁড়ালাম, ছিনিয়ে নিলাম হাত। চেচিয়ে উঠলাম—'ফিরে দাঁড়াও। পালাব না—কেউ পালাব না।' আবার হাত ধরেছে গৌরী—টানছে পেছনে। সেই মুহূর্তে শুধু মনে ছিল—এগুতে হবে, আমাদের এগুতে হবে। পালানো কাপুরুষতা। রাস্তার মাঝখানে আছড়ে পড়েছে গুটি দুই বুলেট-বেঁধা দেহ। লাঠিতে থেঁতলে যাওয়া মাথা দশ বছরের ছেলেকে টেনে তুললাম।

'ছাড়ুন, ছেড়ে দিন আমাকে। জয় হিন্দ।' রুখে দাঁড়াল ওইটুকু ছেলে।

ওদিকে গুলি চলেছে। কর্ণভেদী চীৎকার আর হুংকার। ওরা পালায়নি। সত্যি ছাত্ররা পালায়নি। তবু ভীড় ঠেলে গৌরীকে ছাড়িয়ে এগুনো অসম্ভব। ইতস্তত ইঁট পড়ছে। একটা গাড়ী ভেঙ্গে ফেলে দিল। মিলিটারী ট্রাকে আগুন জ্বলে উঠল। অসহ্য আবেগে, উত্তেজনায় কেঁদে উঠলাম—তারপর ঠিক মনে নেই। ...মোড়ের মাথায় কারা ঢিল ছুঁড়ছে... সামনেই একজন লোক। ডান হাতে একটা থান ইঁটের অর্ধাংশ। 'কি করছেন? ফেলে দিন।' তার জামার হাতায় রক্ত। চেপে ধরলাম, চলুন ডাক্তারখানায়।

'ছেড়ে দিন—ইঁট লেগেছে। কিছু হয়নি।' টেনে নিয়ে চললাম মজুমদার ক্লিনিকে। আলোর সামনে হাতা সরিয়ে আঁতকে উঠলাম। ইঁট নয় গুলি—এদিক ওদিক বেরিয়ে গেছে। তার ভেতর দিয়ে স্পষ্ট আলো দেখা যাচ্ছে। ঘোড়ার গাড়ীতে চাপিয়ে নিয়ে এলাম মেডিকেল কলেজে।

সে আর এক দৃশ্য। আহতের দল আসছে তো আসছেই। ডাক্তার, নার্স ছুটোছুটি করছে। কতক্ষণ আর বসব। ফিরে গেলাম ঘটনাস্থলে। রাত তখন ৯টা। অবস্থা তখনো শান্ত হয়নি। গুলি বন্ধ হয়েছে। ছাত্ররা তবু হটেনি। বসে রয়েছে তেমনিভাবে সামান্য একটু পেছিয়ে। দুপাশে পুলিশের ব্যারিকেড।' (রক্ততিলক / রক্তের স্বাক্ষর)

আজকের সভা ও মিছিলের উদ্যোক্তারা কমিউনিস্ট ছাত্রদের শরিক হতে দেয়নি। কিন্তু ঘটনাস্রোতে ভেসে গেল বিভেদের আড়াল। ঘনায়মান রাতের প্রতিটি প্রহর ক্রমশ নিয়ে আসছে কমিউনিস্ট ছাত্রদের ব্যারিকেডের সামনের সারিতে। কমিউনিস্ট-অ-কমিউনিস্ট ছাত্রনেতা সবাই এখন পুলিশের

মুখোমুখি। সবাই এক নিরবচ্ছিন্ন প্রতীক্ষার শরিক। চলছে সকলের একসঙ্গে রাত জাগার পালা।

কমিউনিস্ট ছাত্রনেতা গৌতম চট্টোপাধ্যায় লিখছেন :

'একটার পর একটা ঘণ্টা কেটে গেল—১০টা, ১১টা, ১২টা·· সময়ের খেই হারিয়ে ফেলছি ; শুধু শীত বেড়ে যাওয়া থেকে বুঝছি যে রাত্রি গভীর হচ্ছে। বসে আছি ছাত্রদের সঙ্গে ধর্মতলা স্ট্রীটের ওপর। একই আলোয়ানের নীচে তিন-চারজন ছেলে—কেউ কাউকে চেনে না। হাফসার্ট গায়ে একটি স্কুলের ছেলে শীতে কাঁপছে আর মাঝে মাঝে উঠে স্লোগান দিচ্ছে। অন্ধকার রাত্রে গ্যাসের আলোয় ক্লান্ত মুখগুলোর দিকে চেয়ে দেখলাম—সেখানে চাঞ্চল্য নয়, জেগে রয়েছে শুধু অনমনীয় দৃঢ়তা।

···একে একে এলেন কত নেতা, কত শুভাকাঙ্ক্ষী। কিরণবাবু এলেন—শরৎবাবুর নামে অনুরোধ করলেন সবাইকে ফিরে যেতে—এলেন আরও অনেকে—চিনি না তাদের। কিন্তু কে শোনে তাদের কথা ? ফিরে এরা যাবে না—পুলিশের হুমকির সামনে এরা হটবে না।

একে একে সবাই এলেন এবং গেলেন। শুধু দু'জন রয়েছেন ছাত্রদের সঙ্গে, শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী আর বীণা দাস। অবাধ্য একগুঁয়ে ছেলের সম্মুখে মা'র মত জ্যোতির্ময়ী দেবী কখনও বকছেন, কখনও অনুনয় করছেন। কতবার রাগ করে চলে গেলেন আবার ফিরে এলেন। একবার ছুটে গেলেন শরৎবাবুর কাছে--বলে গেলেন—আমি চললাম তাঁর কাছে, পায়ে ধরে হলেও তাঁকে নিয়ে আসব, ততক্ষণ তোমরা চুপ করে থাক। ফিরে এলেন কিছুক্ষণ পর, বললেন—'না, তিনি আসবেন না।'' (পথের দাবী / রক্তের স্বাক্ষর)

সে রাত কি কলকাতার মানুষ ঘুমোতে পেরেছিল ! অফিস ফেরত লোকেরা কি ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়নি ধর্মতলার বুকে এই অলৌকিক দৃশ্যের কথা ! গত চার বছরের যত পুঞ্জীভূত ক্ষোভ, অপমান, জ্বালা এবার কি তাহলে বিস্ফোরণ ঘটাতে চলেছে ! ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শেষ লড়াইয়ের মহড়া কি ঐ ধর্মতলা স্ট্রীটেই শুরু !

পরের দিন সকাল থেকে লোকের মুখে চোখে এক চনমনে ভাব। রাস্তায় রাস্তায় সওদাগরি অফিসের কেরানীদের গলা থেকে নেকটাই আর মাথা থেকে টুপি খুলে ফেলা হচ্ছে। হেদুয়ার মোড়ে এক অফিসযাত্রী বাঙালি সাহেব সহাস্যে মাথার টুপি পায়ের নীচে ফেলে মাড়াতে লাগলেন। সিগারেট তো বিলাতি জিনিস। অতএব দাসত্বের প্রতীক। একটি হিন্দুস্তানী বাচ্চা ছেলেকে দেখা গেল—এক ভদ্রলোককে সিগারেট ফেলে দিতে বলছে—ফেক দিজিয়ে—ফেক দিজিয়ে। ভদ্রলোক চোখ কটমট্ করে বাচ্চাটির দিকে তাকিয়ে হাতের সিগারেট ফেলে দিলেন। ট্রাম চলছে না। লোকে হেঁটেই পাড়ি

দিচ্ছে ধর্মতলার দিকে যেখানে গতকাল থেকে রাস্তায় বসে রয়েছে কয়েকশ' ছেলে।

একুশে-র রাত্রিতে কমিউনিস্ট পার্টির নেতারাও ধর্মতলায় উপস্থিত ছিলেন। স্পষ্টত তাঁরা মনস্থির করতে পারেননি। কুমুদ বিশ্বাস বলছেন, '১৯৪৫-এর ২১শে নভেম্বরের ঘটনাকে আমরা 'রিয়ালাইজ' (উপলব্ধি) করতে পারিনি। 'উই ফাম্‌বলড্‌' (আমরা ইতস্তত করি)—আমরা দ্বিতীয় দিনে যোগ দিই। আমাদের মনে বিস্তর খট্‌কা ছিল। সাহেবের টুপি খুলে দেওয়া—মেমদের গাউন ধরে টানাটানি—সাহেবের দোকানের কাঁচভাঙার ঘটনাকে বড় করে দেখি।' তাই পার্টি পুস্তিকায় লেখা হয়:

'লালঝাণ্ডার গাড়ী পথে পথে প্রচার করতে লাগলো: উচ্ছৃঙ্খলতা নয়, সকল দলের মিলিত প্রতিবাদ আন্দোলন চাই।

হাজরা রোড ও সেণ্ট্রাল এভেনিউ এলাকার নামকরা গুণ্ডারা তখনো মিলিটারী লরীতে ঢিল ছুঁড়ছে, আগুন লাগাচ্ছে।' (জনতা ও নেতা / রক্তের স্বাক্ষর)

পার্টির নেতাদের সেদিনের বিভ্রান্ত মানসিকতার অন্যতম সাক্ষী খোকা রায়। তিনি বলছেন, '১৯৪৫-এর ২১শে নভেম্বর শুনলাম ধর্মতলার ট্রাম লাইনের উপর সত্যাগ্রহ শুরু হয়েছে। আমরা সবাই গেলাম দেখতে—আমি. ভবানী সেন আর নৃপেন চক্রবর্তী। নৃপেনদা তো রাস্তায় বসে পড়লেন। রাত একটায় তখন সেখানে মাত্র শ'দেড়েক লোক। আমরা চলে এসেছি—ঠিক করলাম কাল ট্রাম স্ট্রাইক হবে। লাহিড়ীকে জানান হলে—লাহিড়ী তার দায়িত্ব নিলেন।

পরের দিন ধর্মতলায় গিয়ে দেখি কাল যেখানে ছিল শ' দেড়েক লোক—আজ সেখানে তিন লক্ষ লোক। চাঁদনি থেকে ওয়েলিংটন পর্যন্ত একেবারে লোকে ঠাসা। বুঝতে পারছিলাম মানুষের মধ্যে লড়াই-এর 'মুড' রয়েছে—কিন্তু সেটা যে এই পর্যায়ের তা আন্দাজ করতে পারিনি। যদি বলেন 'সাব্‌-জেক্‌টিভ্‌লি' (নিজেদের মনের দিক দিয়ে) প্রস্তুত ছিলাম কিনা—না, তা ছিলাম না।'

২২শে নভেম্বর সকাল থেকেই গোটা কলকাতার মানুষ যেন ধর্মতলায়। গৌতম চট্টোপাধ্যায় লিখছেন:

'পরদিন বাইশে নভেম্বর। রাস্তায় পা দিয়েই বুঝলাম ঝড় উঠেছে। ঘরের মানুষ আজ রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে। ট্রাম-বাস বন্ধ—ইউনিয়নের নির্দেশে। লালঝাণ্ডা উড়িয়ে পার্টির লরী হরতাল করিয়ে বেড়াচ্ছে। মোড়ে মোড়ে জটলা পাকাচ্ছে, বিবর্ণ মুখ সব হিংস্র হয়ে উঠেছে। প্রতিকার চাই, প্রতিকার। গত পাঁচ বছরের বহু দুঃখ, দুর্ভিক্ষের দিনের জমে থাকা শোক, আশাহীন ভবিষ্যতের বিভীষিকা থেকে মুক্তি পাবার বেপরোয়া লড়াই—সব উথলে উঠেছে। ছড়িয়ে পড়েছে আজ শহরের প্রতিটি কোণ।

বড়বাজারের বিহারী ব্রাহ্মণের দোকান আর কলুটোলার মুসলমানের দোকান সব আজ বন্ধ। আজ কেউ গাড়ী চড়তে পাবে না, মাথায় টুপি পরতে পাবে না, দাসত্বের চিহ্ন ওই সোলার টুপি।

ঘুরে বেড়াচ্ছি রাস্তায় রাস্তায়। এরি মধ্যে সুরু হয়েছে নতুন করে শোভাযাত্রা ছোট, বড়, ছাত্রছাত্রীর। কোনটা চলেছে শান্তভাবে—শহীদের কথা স্মরণ করে। কোনটা চলেছে আকাশ ফাটানো আওয়াজ তুলে।

কাল দু'হাজার ছাত্রের শান্ত দৃঢ়তা ধর্মতলা স্ট্রীটের ওপর কলকাতা পুলিশের সমস্ত ব্যবস্থাকে অচল করে দিয়েছিল—আজ লক্ষ লক্ষ লোকের এই দুর্ব্বার স্রোত কোথায় গিয়ে শেষ হবে ?

কেউ বলে দেয়নি কিন্তু সবাই আপনা থেকেই এসে জমা হচ্ছে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সকাল থেকে। দশ হাজার, বিশ হাজার, পঞ্চাশ হাজার—বেড়েই চলেছে। এরই মধ্যে এসে ঢুকলো ইসলামিয়ার ছাত্ররা লীগের সবুজ ঝান্ডা উড়িয়ে, 'সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক' আর 'পুলিশী জুলুম বন্ধ হোক' আওয়াজ তুলে। ত্রিবর্ণ পতাকা হাতে হিন্দু ছেলেরা জড়িয়ে ধরল তাদের—'আল্লা হো আকবর' আর 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি পরস্পরের সঙ্গে মিশে ভরে তুলল চারিদিক। তারই মধ্যে এলো লাল ঝাণ্ডা উড়িয়ে মজুরের দল। এলো খাকসার, এলো গৈরিক পতাকা উড়িয়ে হিন্দু মহাসভার ছাত্ররা। 'এগিয়ে দাও, এগিয়ে দাও' চীৎকার উঠল চারিদিকে। হাতে হাতে সব পতাকা চলে গেল মঞ্চের ওপর। সে দৃশ্য ভোলবার নয়।···

···শরৎবাবুও এলেন শেষ পর্যন্ত, পুত্র অমিয়নাথ এবং বন্ধু সুরেশ মজুমদারকে সঙ্গে নিয়ে। স্তব্ধ হয়ে সেই জনসমুদ্র প্রতিটি কথা শুনছে—'···আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনাদের মত তোমাদের আদেশ মেনে চলতে হবে··· আজ এই আন্দোলন আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তি আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে···আমার উপর বিশ্বাস রাখ···ডাক একদিন দেব, সেদিনের জন্য প্রস্তুত থাক কিন্তু তার সময় আজ নয়···'

বিশ্বাস করতে পারছে না ছাত্ররা যে বক্তা শরৎবাবু, বাংলার কংগ্রেস নেতা শরৎবাবু। ৪২-এর আগস্টে এমনি করে তারা ছুটে গিয়েছিল কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তারে ক্ষিপ্ত হয়ে। সেদিনকার বীরত্বকে প্রত্যেকে অভিনন্দন জানিয়েছে। সেদিন যদি কম্যুনিস্টরা যোগ দিত, যদি শ্রমিকরা ধর্মঘট করত আর যদি আসত মুসলমানরা তবে কবর রচনা হোত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের—এই কথাই তারা শুনেছে শরৎবাবুর আর অন্য সব নেতাদের কাছে।

আজ তো সবাই আছে—শ্রমিকরা এসেছে, এসেছে মুসলমানরা। তবে অপেক্ষা কিসের ? কেন ফিরে যাবার এই নির্দেশ ? কার কথা তারা শুনবে ? একমাস আগের দেশবন্ধু পার্কের শরৎবাবুর, না আজকের শরৎবাবুর ? শরৎবাবু তাঁর কর্তব্য পালন করে গিয়ে উঠলেন মোটরে। কিন্তু একজনও ফিরে গেল না তাঁর কথায়। মাঠের কোণে কোণে দলে দলে ছাত্র জটলা পাকিয়েছে। আওয়াজ উঠছে—'ডালহাউসি, ডালহাউসি'। কম্যুনিস্ট,

অ-কম্যুনিস্ট, কম্যুনিস্ট-বিরোধী বহু ছাত্রকর্ম্মী তাদের বোঝাবার চেষ্টা করছে, তাদের ফেরাবার চেষ্টা করছে। এক কোণে দেখলাম দুটি যুবককে ঘিরে কয়েকজন ছাত্র। তাদের মধ্যে গুঞ্জন উঠেছে—'শালারা কম্যুনিস্ট—ফিরে যেতে বলছে।' ভিড় ঠেলে এগিয়ে গিয়ে দেখি যুবক দুটির একজন কম্যুনিস্ট-বিরোধী ছাত্র পত্রিকা 'সাথী'-র সম্পাদক রামমুনি মেনন। অন্য জন তারই সহকর্ম্মী ছাত্র কংগ্রেসের মনুজেন্দ্র দত্ত মজুমদার। তারা দুজন বোঝাবার চেষ্টা করছে যে ডালহাউসি যাবার চেষ্টা করা আত্মহত্যার সমান। ভাগ্যের নির্ম্মম পরিহাস !

হঠাৎ কে চীৎকার করে ছুটে এল—গুলি গুলি—ধর্ম্মতলা স্ট্রীটে আবার গুলি চলেছে।

ছুটলাম ঘটনাস্থলে। ততক্ষণে ভীড় জমে গেছে বেশ পুলিশ ব্যারিকেডের সামনে—আর লোক আসছে বন্যার স্রোতের মত, চারিদিক থেকে ··

···ব্যারিকেডের দ'ুপাশে পতাকা দুলছে। চীৎকার উঠেছে—স্লোগান কাঁপছে কণ্ঠে কণ্ঠে। যে কোন মুহূর্তে ব্যারিকেড ভেঙ্গে যেতে পারে। তবু গুটিকয় আমরা; ফেরাতেই হবে ক্ষিপ্ত জনতাকে। যে কোন মূল্য দিয়েই।

এমনি সময়ে এলেন ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল। প্রাণপণে আবেদন জানালেন। আর একজন সম্ভবত ভূপতিবাবু। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। আজ নেতৃত্ব নেই 'বিপ্লবী' নেতাদের হাতে। ক্ষিপ্ত ছাত্র অ-ছাত্র জনতা যে কোন মূল্য দিতে প্রস্তুত; কর্তব্যের নির্দেশ না পেয়ে হাজার হাজার মানুষ ছুটছে এই দিকে। সামনেই পুলিশ ব্যারিকেড।

এগিয়ে আসছে একটি শোভাযাত্রা। সামনে দুটি মেয়ে—এক সহপাঠিনীর হাতে ফ্ল্যাগ। এগিয়ে তারা যাবেই, তারা প্রাণ দেবেই। দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন এক বৃদ্ধ কংগ্রেসকর্ম্মী—তোমরা যেতে পারবে না। না না, কিছুতে না।

—'ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন। এ পথে আমরা যাবই।'

—'তোমাদের নেতা বারণ করেছেন। কংগ্রেস বারণ করেছে।'

—'আমাদের নেতা কেউ নেই। ছিলেন যিনি তিনি মৃত। আজ আমরা মরবো। এ পথে যাবই।'

বৃথা চেষ্টা। ওরা যাবেই। ঘুরে দাঁড়ালাম। বুক দিয়ে, পিঠ দিয়ে আটকে ধরেছি পথ, আমরা কয়েকজন হাত ধরাধরি করে। দশহাত দূরে ব্যারিকেড। কি ভয়ংকর মুহূর্ত !

হঠাৎ চেয়ে দেখি পুলিশ ব্যারিকেডের পিছনেও জেগে উঠেছে পতাকার পর পতাকা, শোনা যাচ্ছে আওয়াজ—সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক। হাজার হাজার ছাত্র আর নাগরিকের আর এক মিছিল এসেছে উল্টো দিক থেকে। যাঁতাকলের মধ্যে পড়েছে পুলিশের দল। অগণিত মানুষের ক্রোধ ঘিরে ফেলেছে তাদের···পালাচ্ছে, ওরা পালাচ্ছে। একটার পর একটা গাড়ী বোঝাই

পুলিশ গণেশ এভিনিউর দিকে রওনা হয়েছে—কলকাতা শহরে ! দিনের আলোয় !! লক্ষ লোকের সম্মুখে !!!

তারপর। লক্ষ লক্ষ লোক হেঁটে গেল ডালহাউসির বুকের উপর দিয়ে, স্লোগানে আকাশ ফাটিয়ে। ক্লাইভ স্ট্রীটের অফিস খালি করে বেরিয়ে এল কেরাণীবাবুরা। রাইটার্স বিল্ডিং-এর বারান্দা ছেয়ে গেছে দর্শকে, যোগ দিয়েছে অফিসের যত দারোয়ান আর কুলী। যারা দেয়নি তারাও বারান্দা থেকে, জানালা থেকে রুমাল নেড়ে অভিনন্দন জানাচ্ছে আমাদের। এমন বিপুল অভিনন্দন আর কেউ কোনদিন দেখেছি কি ?' (পথের দাবী / রক্তের স্বাক্ষর)

দুই

খোকা রায়ের চোখের সামনে ঘটেছে দৃশ্যপটের দ্রুত পরিবর্তন। মানুষ বেপরোয়া, এমনকি মিলিটারি-কেও ভয় করে না। মিলিটারি লরি পোড়ানো এখন রেওয়াজে দাঁড়িয়েছে। তিনি দেখছেন গলির মোড়ে মোড়ে খোয়া আর ইঁটের স্তূপ। যেই মিলিটারি লরি আসছে তার উপর গিয়ে পড়ছে ঝাঁকে ঝাঁকে ইট। ড্রাইভার লরি ফেলে প্রাণের ভয়ে দে দৌড়। মিলিটারিও ভয় পাচ্ছে চারধারের ক্রুদ্ধ মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে। সকলের মুখে মুখে নেতাজী' আর 'জয় হিন্দ্'। জেলেপাড়ার ছেলের গলায় নেতাজী লকেট। সেই লকেটের দিকে তাকিয়ে বলছে ছেলেটা—ফিরে এসেছ—আবার এসেছ তুমি। বৌবাজার আর সেন্ট্রাল এভেনিউর মোড়। ট্রাফিক পুলিশের ড্রামের উপর গিয়ে বসল এক মাতাল। টলে পড়ে যাচ্ছে সে আর বলছে —জয়ই হিন্দ্। তার এক হাত ধরে তার বৌ টানছে। এক্ষুনি মিলিটারি আসবে, গুলি চালাবে।

খোকা রায় বলছেন, 'আমরাও রয়েছি, যেখানে পারছি সংগঠিত করছি—নেতৃত্ব দিচ্ছি। কিন্তু আমাদের প্রধান অসুবিধে যুদ্ধের সময় নেতাজীকে জাপানের চর ডাকা। জয়প্রকাশকে, অরুণা আসফ আলিকে পঞ্চমবাহিনী বলা। নেতাজী জাপানের চর নয়—'মিসগাইডেড পেট্রিয়ট' (বিপথচালিত দেশভক্ত)—'পেট্রিয়ট' যে তাতে কোন সন্দেহ নেই। জয়প্রকাশ আর অরুণার তো তখন দারুণ ইজ্জত—অথচ সি. এস. পি.-র শক্তি আর কতটুকু ! কিন্তু অরুণা বেরিয়ে আসার পর দেশবন্ধু পার্কে যে বক্তৃতা দিল—তাতে কাতারে কাতারে লোক। সেই মিটিং-এর দিকে এক শোভাযাত্রা আসছিল তাতে একটি ছেলে ক্রাচে ভর দিয়ে চলছিল। তার মুখে কিন্তু 'দিল্লী চল—চল দিল্লী' এই স্লোগান। যে হাঁটতে পারে না সেও দিল্লী যেতে চায়।' খোকা রায়ের মতে, এই পটভূমিতে মানুষের ব্রিটিশ-বিরোধী মেজাজ আর কমিউনিস্ট-বিরোধী মনোভাব একাকার। কমিউনিস্টদের মারধর

আর কদর্যভাষায় গালাগাল তখন দৈনন্দিন ব্যাপার। এ বিষয়ে নেহরু ও অন্য নেতারা নিঃসন্দেহে সফল।

বস্তুত কমিউনিস্ট-বিরোধী নেতাদের প্রেরণাদাতা স্বয়ং জহরলাল নেহরু। 'কমিউনিস্টরা দেশদ্রোহী', নেহরুর এই উক্তি—বোম্বাই, কলকাতা ও অন্যত্র জাতীয়তাবাদী মানুষের মন কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে বিষিয়ে তোলে।

কলকাতায় নতুন করে কমিউনিস্টদের উপর হামলা নেহরুর সভা থেকেই সূত্রপাত। নৃপেন ব্যানার্জি বলছেন, 'এদিকে নেহরুও বেরিয়ে পড়েছে; নেহরুর সভায় রেকর্ডভাঙা ভীড়। শ্রদ্ধানন্দ পার্ক - ওয়েলিংটন স্কোয়ার কুলোতে পারছে না সে ভীড়। এমনকি দেশপ্রিয় পার্কের সভায়ও লক্ষ লক্ষ লোক বাইরে রয়ে গেল। রাসবিহারী মোড় থেকে লোক জমাট বেঁধে—আর এগুতে পারছে না। সরোজ হাজরার সঙ্গে সে সভা দেখতে গিয়ে শুনি, কমিউনিস্টরা নাকি মাইকের তার কেটে দিচ্ছিল—একজন ধরাও পড়েছে। আসলে একজন এজেন্ট প্রোভোকেটর জোগাড় করা হয়। সেদিন সন্ধ্যার পর সার্কুলার রোডের পার্টি অফিসে গিয়ে শুনি, কালীঘাটের পার্টি অফিস তছনছ করেছে কংগ্রেসীরা। আর নৃপেন চক্রবর্তী মারের চোটে জ্ঞান হারিয়েছেন।' কমরেডদের কাছ থেকে খবরটা শুনে লাহিড়ী একটুখানি চুপ করে থেকে স্বভাবসিদ্ধ কায়দায় বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে বলতে থাকেন, 'আপনারা থাকতেও নৃপেনদা মার খেলেন! কই, আপনাদের কারও একটা আঙুলও তো ভাঙেনি। জানেন নৃপেনদাকে? আজ নিয়ে নৃপেনদা দুবার অজ্ঞান হলেন। প্রথমবার লর্ড সিংহ রোডে জ্ঞান দত্ত টেনে টেনে নৃপেনদার জুলপি ছিঁড়ে দিয়েছিল—নৃপেনদার মাথায় সেপ্‌টিক হয়ে যায়। সেই একবার আর আজ আর একবার। নৃপেনদা অজ্ঞান—আপনারা অক্ষত দেহে সেই খবর দিতে এসেছেন!'

আসলে বাৎসল্যরসই নৃপেন চক্রবর্তীর কাল হয়েছিল। কালীঘাট অফিসে কংগ্রেসীরা আর গুণ্ডারা মিলে হামলা করেছে। কোনরকমে সেখান থেকে বেরিয়ে তিনি বাসে উঠেছেন। একটি কিশোর তাঁকে বাসের মধ্যেই ধাওয়া করে। ছেলেটির কচি মুখ দেখে, তাঁর মনে হয়েছিল একে মারলে তো মরে যাবে। তাই আত্মরক্ষা করলেন না। মার খেলেন। এক মজুর কমরেড তাঁকে বাঁচালেন। বেশ কিছুদিন পর একদিন 'স্বাধীনতা' অফিসে এসে দুটি ছেলে তাঁর সাথে দেখা করল।

—দেখুন তো, এই ঘড়ি আর পেনটি কি আপনার?

—হ্যাঁ। তোমরা কোথায় পেলে?

—আমরাই তো আপনাকে মেরেছিলুম।

নৃপেন চক্রবর্তী নীরবে তাকিয়ে রইলেন।

—এখন আমরা আপনার পার্টিতে যোগ দিয়েছি, ছেলে দুটি জানাল।

১৯৪৬ সালের গোড়া থেকেই দেশের নানা জায়গায় পার্টিকর্মী ও পার্টি

অফিসের উপর হামলা চলতে থাকে। এমনকি পার্টির সদর দপ্তরও রেহাই পেল না। 'স্বাধীনতা'র সংবাদসূত্রে প্রকাশ :

বোম্বাইতে সুভাষ দিবসে কমিউনিস্ট পার্টি অফিসে দলবদ্ধ আক্রমণ
পার্টির ছাপাখানা ও পুস্তকের দোকানে অগ্নিসংযোগ
৪০ জন কর্মী আহত আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ এক লক্ষ টাকা

'বোম্বাই, ২৩শে জানুয়ারী মঙ্গলবার রাত্রে একদল লোক খেওয়াদী রোডে কমিউনিস্ট পার্টির সদর কার্যালয়ের উপর হানা দিয়া 'পিপলস্ এজে'র ছাপাখানার গুরুতর ক্ষতিসাধন করিয়াছে। কমিউনিস্ট পার্টির ৪৩ জন সদস্য আহত হইয়াছেন, তন্মধ্যে কয়েকজনের আঘাত গুরুতর। কমিউনিস্ট পার্টির একজন নেতা শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই-এর নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন জানান। তাঁহার মতে সব মিলাইয়া ক্ষতির পরিমাণ প্রায় এক লক্ষ টাকা।— এ. পি., (স্বাধীনতা, ২৫. ১. ৪৬)

'স্বাধীনতা'র পাতায়—দেশের নানা জায়গায় সংঘটিত এজাতীয় হামলার খবর প্রায় প্রতিদিন প্রকাশিত হতে থাকে। তার মধ্যে কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

১. বোম্বাইয়ের পর কলিকাতা। ২৬শে জানুয়ারি দক্ষিণ কলিকাতা কমিউনিস্ট পার্টি অফিসের উপর হামলা করা হয়। প্রায় দশজন কর্মী আহত হন এবং তাঁদের অন্যতম 'স্বাধীনতা'র সহকারী সম্পাদক কমরেড নৃপেন চক্রবর্তী। পুলিশ চারজন পার্টি-সভ্যকে গ্রেপ্তার করেছে। (স্বাধীনতা, ২৭. ১. ৪৬)

২. মুঙ্গেরের কংগ্রেস নেতা অর্থাৎ জেলা কংগ্রেসের সেক্রেটারির নেতৃত্বে কয়েক হাজার লোক কমিউনিস্ট পার্টির সভা ভেঙে দেয় ও পার্টি নেতা কমরেড কার্যানন্দ শর্মাকে মেরে অজ্ঞান করে ফেলে। (স্বাধীনতা, ৭.২.৪৬)

৩. ৫ই ফেব্রুয়ারি, বীরভূম জেলা পার্টি অফিসে গভীর রাতে আগুন লাগিয়ে পার্টি নেতা কালীপদ বশিষ্ঠকে ঘুমন্ত অবস্থায় পুড়িয়ে মারার চেষ্টা হয়। (স্বাধীনতা, ১০. ২. ৪৬)

৪. ভাটপাড়ায় কমরেড শীতাংশু ভট্টাচার্যকে ভীষণভাবে মারার পর সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাঁকে রাস্তার ধারে ফেলে রাখা হয়। একজন পার্টি দরদী তাঁকে সেই অবস্থায় বাড়ি পৌঁছে দেন। (স্বাধীনতা, ১৮. ২. ৪৬)

এধরনের হামলাবাজির বিরুদ্ধে ময়দানে কমিউনিস্ট পার্টির ডাকে শ্রমিক-সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'স্বাধীনতা'য় প্রকাশিত সেই সভার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংবাদ-শিরোনামসহ উদ্ধৃত করা হচ্ছে :

কমিউনিস্ট পার্টির উপর আক্রমণে শ্রমিকদের ক্ষোভ

জনসভায় 'লাল ঝাণ্ডার' সম্মান রক্ষার শপথ গ্রহণ

'গত শুক্রবার ময়দানে এক বিরাট শ্রমিক সমাবেশ হয় এবং তাতে কমরেড আবদুর রেজ্জাক খাঁ সভাপতিত্ব করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে কমরেড পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী বলেন, 'মার খেয়ে অজ্ঞান হওয়া কমরেড নৃপেন চক্রবর্তীর জীবনে নতুন কিছু নয়। প্রথমবার ১৯৩২ সালের 'আরামবাগ সত্যাগ্রহে', দ্বিতীয় বার 'অভয় আশ্রম অধিকারের' ব্যাপারে ১৯৩৩ সালে এবং তৃতীয়বার ১৯৩৯ সালে কলকাতার স্পেশাল ব্রাঞ্চের হেডকোয়ার্টারে। প্রথম দুবার তো পুলিস তাঁকে মৃত মনে করে ফেলে গিয়েছিল।'

নৃপেন চক্রবর্তী ছাড়াও সম্প্রতি আরও কয়েকজন শ্রমিক কমরেড হামলার শিকার হয়েছেন। যেমন, 'স্বাধীনতা' বিক্রী করতে গিয়ে বেঙ্গল ক্যামিকেলের প্রাক্তন শ্রমিক সুশীল দত্ত রায় ও ট্রাম শ্রমিক রিপ্জাক গুণ্ডাদের হাতে মার খেয়েছেন। আহত শ্রমিক দুজনকে সভামঞ্চে দাঁড় করালে সভায় তুমুল নিন্দাবাদ ধ্বনিত হয়।

পোর্ট শ্রমিক নেতা বক্তৃতা প্রসঙ্গে জানতে চান—যে কোন অবস্থাতেই হোক না কেন, মজুরেরা লাল ঝাণ্ডার সম্মান রক্ষা করতে প্রস্তুত আছে, কিনা? সকলেই একবাক্যে বলে ওঠে—"হাঁ, প্রস্তুত।"' (স্বাধীনতা, ২. ২. ৪৬)

দেখা যাচ্ছে তখনো শ্রমিকদের মধ্যে কমিউনিস্ট-বিরোধিতার সংক্রমণ ঘটেনি—যেটা পরবর্তীকালে এপ্রিল মাসের নির্বাচনের সময় দেখা যায়। সে সময় কমিউনিস্ট-বিদ্বেষ মধ্যবিত্ত মহলে প্রবল—কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে তারা মারমুখী। ২৭শে জানুয়ারি, কলকাতার প্রায় প্রতিটি অঞ্চলে 'স্বাধীনতা' পত্রিকার হকারদের উপর ঢালাও আক্রমণ চলে। 'স্বাধীনতা'র সংবাদসূত্রে প্রকাশ: 'ঐদিন সকাল হইতেই কয়েকজন লোক মোটরে চড়িয়া সমস্ত কলিকাতা ঘুরিতে থাকে এবং মোড়ে মোড়ে হকারদের কাছ হইতে 'স্বাধীনতা' ছিনাইয়া লইয়া ছিঁড়িয়াছে।'

হামলাবাজীর উপযুক্ত জবাব দেবার জন্যে শ্রমিকদের উদ্দেশে পার্টি আহ্বান জানায়, 'স্বাধীনতা'র পাতায়—'লাল ঝাণ্ডার ডাক' স্তম্ভে।

লাল ঝাণ্ডার মান রাখো

'মজুর ভাই সব! যারা মিথ্যা রটনা করে মজুরের লাল ঝাণ্ডাকে টুকরো টুকরো করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে সোজা হয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াও। তারা কংগ্রেসী নয়, কংগ্রেসী নেতাদের পর্যন্ত তারা আক্রমণ করছে, কংগ্রেস নেতারা তাদের অস্বীকার করেছেন। তারা স্বদেশী নয়, কারণ পুলিশের সাহায্যে তারা কমিউনিস্টদের গ্রেপ্তার করিয়েছে। তারা মানুষ নয়, কারণ গুণ্ডাবাজীই তাদের পেশা। আজ স্থানে স্থানে নিরীহ গৃহস্থ এবং মেয়েদের উপর পর্যন্ত হামলা করেছে। তারা কাপুরুষ। তোমার হাতের হাতুড়ী উঠাও, লাল ঝাণ্ডাকে আরও শক্ত করে ধর, বুক ফুলিয়ে রুখে দাঁড়াও—গুণ্ডার দল মাথা হেঁট করে পালাতে বাধ্য হবে।' (স্বাধীনতা, ২৮. ১. ৪৬)

কমিউনিস্টদের উপর কংগ্রেসী হামলা উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকে। এই হামলাবাজির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্যে পার্টিসভ্য ও দরদীদের প্রতি আহ্বান জানান সাধারণ সম্পাদক পূরণ চাঁদ জোশী। এক বিবৃতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন:

'আজ সারা দেশ জানে যে, কংগ্রেস কর্মীরাই কমিউনিস্টদের আঘাত করিতেছে, আমাদের বিরুদ্ধে গুণ্ডা লেলাইয়া দিতেছে—কমিউনিস্টরা কংগ্রেস কর্মীদের আঘাত করে নাই। এখন আর কোনো আঘাত মুখ বুজিয়া সহিয়া যাইবার প্রয়োজন নাই।

…কমিউনিস্ট বিরোধীরা ঘোর কাপুরুষের দল। তারা শুধু ভাড়া করিয়া গুণ্ডাই আনিতে পারে। আমরা কমিউনিস্টরা নিষ্ঠাবান বিপ্লবী। বীর শ্রমিক ও কৃষক আমাদের পিছনে আছে। এখন হইতে কোনো একজন কমিউনিস্টও যেন আঘাত সহ্য না করেন। যেখানেই আক্রান্ত হউন না কেন আত্মরক্ষা করিতে হইবে। আমরা আক্রমণ করিতে যাইব না। কিন্তু যে অস্ত্রই হাতের কাছে পাইব তাহা দিয়াই আমরা আত্মরক্ষা করিব। আমাদের মেয়ে কমরেডরা তাঁহাদের জুতা ও মুখের জোরে নিজেদের রক্ষা করিবেন।

যদি কোনো কমরেড মার খাইয়া শক্ত মার না দিয়া ফিরিয়া আসেন, তবে তাঁহাকে কাপুরুষ অপবাদ দিয়া পার্টি হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইবে।

বীরের মতো দাঁড়াইয়া পার্টির প্রত্যেকটি অফিসকে রক্ষা করিতে হইবে—যতক্ষণ পর্যন্ত একজন কমরেডও বাঁচিয়া থাকেন ততক্ষণ পর্যন্ত রক্ষা করিতে হবে। কখনো কোনো অফিস ছাড়িয়া যাওয়া চলিবে না।

অতিরিক্ত কয়েকজন গার্ড অথবা ঐ জাতীয় ব্যবস্থার কিছুমাত্র দরকার নাই। সেটা বিহ্বলতার লক্ষণ। কোনো দামী দলিল বা দামী অন্য জিনিষ পার্টি অফিসে যেন রাখা না হয়। কমরেডরা স্বাভাবিক অবস্থার মতো পার্টি অফিসে কাজ চালাইয়া যাইবেন—শুধু আগের চেয়ে একটু সজাগ থাকিয়া অফিসে গোটা কয়েক লাঠি রাখিয়া দিবেন এবং শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত অফিসকে রক্ষা করিয়া যাইবেন।

সমস্ত পার্টি-সভ্য, বিশেষ করিয়া সারাক্ষণের কর্মীরা লাঠি, ডাণ্ডা বা সুবিধামতো অন্য কিছু লইয়া ঘোরাফেরা করিবেন।' (স্বাধীনতা, ২৫. ২. ৪৬)

তিন

গীতা মুখোপাধ্যায় লিখছেন: 'নভেম্বরে [১৯৪৫] প্রথম ঝড়ের ভেরী বেজে ওঠে' এবং 'ঝড়ের হাওয়া আছড়ে পড়েছিল তরঙ্গে তরঙ্গে; ঝঞ্ঝার রূপে সারা বাংলায় আবার ফেটে পড়ল ১৯৪৬ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি।' (ছাত্র ফেডারেশন, ১৯৭৬)

সুমিত সরকার লিখছেন: ১৯৪৫-এর ২১ - ২৩শে নভেম্বরের পর কলকাতার বুকে একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে দফায় দফায় কিছুদিন পর পর। অর্থাৎ প্রথম ছাত্রদের বিক্ষোভ মিছিল—পুলিশের লাঠি চার্জ, কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ ও গুলিচালনা এবং তারপর সারা সহর জুড়ে জনতা বনাম পুলিশ ও মিলিটারির রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। ২১ - ২৩ নভেম্বর—এই তিন দিনে ১৪টি গুলি বর্ষণের ঘটনায় ৩৩ জন প্রাণ হারিয়েছে এবং আহতের সংখ্যা দু'শরও বেশি। দৃশ্যটা ঠিক যেন উনিশ শতকের ফরাসি বিপ্লবের প্যারিসের মতো।

২রা জানুয়ারি, ১৯৪৬—বাংলার লাট কেসি বড়লাট ওয়াভেলকে লিখছেন: 'পুলিশী তদন্তের ফলে এবার একটা নতুন বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়েছে যে গুলি চালিয়েও জনতাকে পুরোপুরি ছত্রভঙ্গ করা যায় না—তারা একটু সরে গিয়ে ফের অকুস্থলে জড়ো হয় এবং আক্রমণ শুরু করে।' জনতার এই বিদ্রোহী আচরণ রসিদ আলি দিবসে আরও প্রকট। (মডার্ন ইন্ডিয়া, পৃ ৪২১)

রসিদ আলি দিবস ও পরবর্তী কয়েকদিনের কলকাতা যেন উনিশ শতকের বিপ্লবী প্যারিসকেও হার মানিয়েছে। কলকাতার বিদ্রোহী প্রাণসত্তা সেদিন বরঞ্চ কবি মায়াকভস্কির এক তেজীয়ান উক্তির মধ্যবর্তিতায় অধিকতর বোধগম্য। সর্বহারা বিপ্লবের কবি এক জায়গায় বলেছেন: "The revolution has filled the street with the talk of millions and the slang of the city suburbs has flowed through the central avenues. How to bring conversational language into poetry and how to extract poetry from these conversations ?" (The Poet of the New World : Robert Rozhdestvensky, Notes about Vladimir Mayakovsky, *Soviet Literature*, 1983, p. 3.)

১৯৪৬-এর ১১ - ১৫ই ফেব্রুয়ারি কলকাতার চেহারা অবিকল তাই। রাস্তায় সেদিন লক্ষ লক্ষ লোক সামিল এবং তাদের আকাশ ফাটা স্লোগান। কলুটোলা, কলাবাগান, পাটোয়ারবাগান, ইলিয়ট রোড, গর্চা, রামবাগান, মোহনবাগান, নারকেলডাঙ্গা, কাঁকুড়গাছি, গ্যাস স্ট্রীট—যাবতীয় বস্তি উজাড় করে সব মানুষ রাস্তায়। তাদের স্ল্যাং বা খিস্তি অনর্গল শোনা যাচ্ছে। তারা এই জালিম সরকারের চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করছে নিজস্ব প্রাকৃত ভাষায়। হ্যাঁ, তারা লড়ছে। মর্গে মর্গে তাদের লাশ। অজানা অনামা শহীদের তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর।

এই অচেনা মানুষদের বিদ্রোহের ভাষা জন্ম দিয়েছিল সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা: ১৯৪৫-এর ২৬শে নভেম্বর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চিহ্ন' উপন্যাসের পটভূমি। তেমনি রসিদ আলি দিবস তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে লিখিয়েছিল 'ঝড় ও ঝরাপাতা' উপন্যাসটি। তাছাড়া

নৃত্যশিল্পী ও গল্পকার বুলবুল চৌধুরীর কলম থেকে বেরিয়েছিল একটি সার্থক গল্প, 'রক্তের ডাক'—বস্তির একজন গুণ্ডা যার কেন্দ্রীয় চরিত্র।

বিদ্রোহী জনতার মেজাজ তখনও কমিউনিস্ট নেতারা বুঝে উঠতে পারেননি। তাঁদের ধারণায়, কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের বোঝাপড়া স্বাধীনতা সংগ্রামের সাফল্যের একমাত্র পূর্বশর্ত। গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায়, তাঁরা তখনও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠতে পারেননি। তবে পার্টি ক্যাডারদের বলেছেন সংগ্রামী মানুষের সঙ্গে থাকতে। (দি অলমোস্ট রেভলিউশন, এসেজ ইন অনার অফ প্রফেসর এস. সি. সরকার, পৃ ৩৫)

কিন্তু পার্টির সদ্য প্রকাশিত বাংলা দৈনিক 'স্বাধীনতা' সেদিনের ঘটনা-প্রবাহের বর্ণনায় অসাধারণ দক্ষ ও বিশ্বস্ত। শুরু থেকে থিতিয়ে যাওয়া পর্যন্ত রসিদ আলি দিবস সংশ্লিষ্ট আন্দোলনের প্রতিটি স্তর অনুপুঙ্খ-সহ 'স্বাধীনতা'র পাতায় প্রতিবিম্বিত। রাতারাতি 'স্বাধীনতা' জনপ্রিয়তার শিখরে। সীমাবদ্ধ ক্ষমতা নিয়ে কাগজের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। যদিও সাধারণ মানুষ কমিউনিস্ট পার্টির মতিগতি সম্পর্কে রীতিমতো সন্দিহান—বিশেষ করে বামপন্থী ছাত্র-যুবকেরা। কিন্তু ভাল লেখা পেলে তারা 'স্বাধীনতা' দেওয়ালে সেঁটে রাখত—তার পাশে অবশ্য থাকত নেতাজীর ছবি। কারণ নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজই-তো তখন কেন্দ্রবিন্দু।

চার

৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬—সংবাদপত্র-সূত্রে জানা যায় যে সামরিক আদালত আজাদ হিন্দ ফৌজের ক্যাপ্টেন আবদুল রসিদ আলিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছে এবং সেই দণ্ডাদেশ কমিয়ে ভারতের জঙ্গীলাট সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান দিয়েছেন। ১০ই ফেব্রুয়ারি 'স্বাধীনতা'র পাতায় পরের দিন ছাত্রদের প্রতিবাদ-সভা অনুষ্ঠানের এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আহ্বায়ক সিটি ছাত্র ফেডারেশনের সম্পাদক গৌতম চট্টোপাধ্যায় ও কলিকাতা মুসলিম ছাত্র লীগের সম্পাদক মোয়াজ্জেম আহম্মদ চৌধুরী এবং তার পরিণতিতে সমগ্র দৃশ্যপটের আমূল পরিবর্তন। ১২ই ফেব্রুয়ারি 'স্বাধীনতা'র প্রথম পৃষ্ঠায় বড় অক্ষরের শিরোনামা সহ প্রকাশিত হল ছাত্রদের প্রতিবাদ-সভার জের হিসেবে—উত্তাল ঘটনাপুঞ্জের বিবরণ :

কলকাতায় হিন্দু-মুসলিম ছাত্র শোভাযাত্রার উপর পুলিশের লাঠি চালনা

শতাধিক ছাত্র আহত : ৩২ জন গ্রেপ্তার

ক্যাপ্টেন রসিদের মুক্তির দাবিতে কংগ্রেস-লীগ ও কমিউনিস্ট ঐক্য

আরও জানা যায় যে ছাত্রদের উপর লাঠি চার্জের ঘটনা গোটা শহরকে অশান্ত করে তুলেছে। সংবাদদাতার ভাষায়: 'লাঠি চার্জের সংবাদ দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িবার সঙ্গে শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষুব্ধ জনতা ট্রাম-বাস থামাইবার চেষ্টা করে এবং কলুটোলার কাছে মিলিটারী লরীতে আগুন লাগাইয়া দেয়। ঘটনার পর শহরের বিভিন্ন স্থানে দোকান-পাট বন্ধ হইয়া যায়। বর্তমানে সশস্ত্র পুলিশ রাস্তায় রাস্তায় টহল দিতেছে।'

ছাত্রসভা

বেলা ১টায় ছাত্র ফেডারেশন ও মুসলিম ছাত্র লীগের ডাকে ক্যাপ্টেন রসিদ ও অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবীতে অধিকাংশ কলেজ ও স্কুলের হিন্দু-মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীরা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে জমায়েত হয়। সভার প্রথমেই খবর আসে যে ডালহৌসি স্কোয়ারে জেনারেল পোষ্ট অফিসের সামনে একটি ছাত্র শোভাযাত্রার উপব পুলিশ লাঠিচার্জ করেছে এবং ছাত্র ফেডারেশনের কর্মী সালে আহম্মদ সহ ১২ জন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করেছে। দারুণ উত্তেজনার মধ্যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের সম্পাদক অন্নদাশংকর ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে সভার কাজ শুরু হয়। ছাত্র ফেডারেশনের গৌতম চট্টোপাধ্যায়, মুসলিম ছাত্র লীগের মুয়াজ্জেম হোসেন, ছাত্র কংগ্রেসের জনৈক কর্মী ও ট্রটস্কীপন্থী ছাত্রী সুপ্রভা রায় প্রভৃতি বক্তারা রসিদ আলি সহ আজাদ হিন্দ ফৌজ ও রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাবী করেন।

সুহরাবর্দীর আহ্বান

'লীগ নেতা মিঃ সুহরাবর্দী সাহেব ছাত্রদের সম্বোধন করিয়া বলেন:

"আমার জীবনের একটা বড় আশা আজ পূর্ণ হইয়াছে—কংগ্রেস, লীগ পতাকার নীচে হিন্দু-মুসলমান ছাত্ররা এক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"

"পুলিশ ডালহৌসিতে লাঠি চালাইয়াছে; তাহার প্রতিবাদে সমস্ত কলিকাতাকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। ইহার জন্য আমাদের শান্তিপূর্ণভাবে কাজে অগ্রসর হইতে হইবে।"

ডালহৌসির দিকে

কংগ্রেস লীগ ছাত্র ফেডারেশন ও খাকসার পতাকা সম্মুখে লইয়া ছাত্রদের শোভাযাত্রা ধর্ম্মতলা স্ট্রীট, সেণ্ট্রাল এভিনিউ, বৌবাজার দিয়া যখন কলুটোলার মোড়ে আসিয়া পড়ে, তখন পুলিশ শোভাযাত্রাকারীদের বাধা দিবার চেষ্টা করে। সে বাধা ভাঙ্গিয়া ছাত্ররা চীৎপুর রোড, স্ট্র্যান্ড রোড হইয়া ডালহৌসি স্কোয়ারের দিকে ধাবিত হয়। ডালহৌসি স্কোয়ারে পৌঁছিবার আগেই ক্লাইভ স্ট্রীট ও ফেয়ারলি প্লেসের মোড়ে ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সম্মুখে টমিগান, রাইফেল, কাঁদুনে বোমা ও লাঠি লইয়া সশস্ত্র সার্জেণ্ট ও পুলিশ

মিছিলের সম্মুখে অবরোধ করিয়া দাঁড়ায়। সে বাধাও টিঁকে নাই। ছাত্রদের চাপে সার্জেণ্ট ও পুলিশদের প্রায় পঞ্চাশ হাত দূরে হটিয়া দাঁড়াইতে হয়।

এই সময় বড় বড় অফিস বাড়ীগুলির বারান্দা ও ছাদ লোকে লোকারণ্য হইয়া পড়ে। শোভাযাত্রায় অধিকাংশ ছিল লীগ পতাকা এবং তাহারই সহিত কংগ্রেসের পতাকা উড়িতে দেখিয়া রাস্তার জনতার মধ্যে রীতিমতো সাড়া পড়িয়া যায়। প্রত্যেকের মুখেই একটি মাত্র কথা—এতদিন পরে সকলে এক হইয়াছে, মুসলিম লীগ সত্যই স্বাধীনতার লড়াই চায়। পাশেই কাস্টমস্ অফিসের এক হিন্দুস্তানী দারোয়ানকে বলিতে শুনা যায়—হিন্দু-মুসলমান যখন এক হইয়াছে তখন বৃটিশকে ভাগানো আর শক্ত হইবে না।

শোভাযাত্রীদের রুখিবার জন্য আরও বেশী রাইফেলধারী গুর্খা ও পুলিশের আমদানী হয়। ছাত্ররা শান্তভাবে পুলিশের অবরোধের সামনে বসিয়া পড়েন ও রাস্তা ছাড়িয়া দিবার জন্য দাবী করেন।

কলিকাতা সিটি মুসলিম লীগের সম্পাদক মহম্মদ ওসমান ঘটনাস্থলে আসিয়া ছাত্রদের লক্ষ্য করিয়া বলেন: "আজ কংগ্রেস ও লীগের পতাকা একসঙ্গে উড়িতেছে। ইহাই আমাদের জয়ের সূচনা করিতেছে।" এই সময় ডেপুটি পুলিশ কমিশনার মিঃ সামসুজ্জোহা আসিয়া চীৎকার করিয়া বলেন, "হয় আপনারা চলিয়া যান, না হইলে আপনাদের ছাতু করিয়া দিব।"

ছাত্র জনতার পক্ষ হইতে অন্নদাশংকর ভট্টাচার্য জবাব দিলেন, 'তোমরা আমাদের পেটাতে পার, খুন করতে পার, চূর্ণ করতে কিছুতেই পারবে না!'

ইহার পরই লীগনেতা মহম্মদ ওসমানকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই দুই শত সার্জেণ্ট, পুলিশ ও গুর্খা শান্ত শোভাযাত্রীদের উপর ক্ষিপ্ত কুকুরের মতো ঝাঁপাইয়া পড়ে। প্রায় এক ঘণ্টা পর্যন্ত অবিরাম লাঠি চালানো হয়। ইহার ফলে প্রায় শতাধিক ছাত্র আহত হন ও ২০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। আহতদের মধ্যে রয়েছেন রবীন মুখার্জী, নীরেন্দ্র রায়, গোলাম নবী, অমল মুখার্জী, অন্নদাশংকর ভট্টাচার্য, সুনীল মুন্সি, গৌতম চট্টোপাধ্যায়, রশিদা খায়ের, মোরশেদ আলী, অমলেন্দু চ্যাটার্জী, উমর আবিদ জুবেরী, জহিরুদ্দীন ফারুকী, আরশেদ আলী, লুৎফর রহমান, মহম্মদ আলী ফারুকী, সুনীল ব্যানার্জী, চিত্তরঞ্জন গোস্বামী, বাদল সরকার, সাহাজান, তারক সরকার, নৃপেন ব্যানার্জী, মহম্মদ আবদুল্লা, পান্নালাল ঘোষ, আব্দুল করিম খান, এস. সি. দাস, সুবোধ রায়, প্রদ্যোৎ দাস, রাজকান্ত ঝা, শ্যামলাল মিত্র। ইহা ছাড়া আহমদ আহসান, শিবু সেন, কালীমোহন দাস ও সদ্য মুক্ত কমিউনিস্ট রাজবন্দী নন্দদুলাল সিংহ গুরুতরভাবে আহত হইয়াছেন। আহতদের মধ্যে অনেক ছোট ছোট ছেলে আছে। একটি ছোট ছেলেকে বাঁচাইতে গিয়া সুনীল মুন্সির হাতে গুরুতরভাবে লাঠির আঘাত লাগে।'

'স্বাধীনতা'র সংবাদদাতা আরো জানাচ্ছেন যে ছাত্র মিছিলের উপর লাঠি চার্জের খবর পেয়ে শহরের সর্বত্র হিন্দু-মুসলমান জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

'রাত্রি সাড়ে আটটার সময় রাজাবাজার ট্রামডিপোর সম্মুখে দুইটি মিলিটারী লরী জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। অন্য অঞ্চলেও বিক্ষুব্ধ জনতা ট্রাম-বাস হইতে লোক নামাইয়া দেয় ও মিলিটারী লরীতে আগুন লাগানোর চেষ্টা করে। রাত্রি প্রায় ৯টার সময় সেন্ট্রাল এভিনিউ ও হ্যারিসন রোড়ের মোড়ে বিক্ষুব্ধ জনতার উপর পুলিশ কাঁদুনে বোমা ছোঁড়ে। রাত্রি ১০টার সময় পুলিশ রাজাবাজার অঞ্চলে ২৩ বারেরও বেশী রিভলবারের ফাঁকা আওয়াজ করে এবং কাঁদুনে গ্যাস ছোঁড়ে। ইহার পর মানিকতলা অঞ্চলে আরও অনেকগুলি মিলিটারী লরী পোড়ান হয়। মুসলমান জনতাকেই অধিকাংশ জায়গায় রাস্তার উপরে আসিয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে দেখা যায় এবং 'কংগ্রেস লীগ এক হো' ধ্বনি দিতে শুনা যায়। পুলিশের লাঠি চালনার প্রতিবাদে শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান দোকানদাররা দোকান বন্ধ করেন।'

পরের দিন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা বেলা ১ টায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে মিলিত জনসভার আহ্বান জানান এবং জনসাধারণকে পূর্ণ শান্তি রক্ষার জন্য অনুরোধ জানান।

প্রতিবাদ সভাব আবেদন

'গতকল্য (সোমবার) ছাত্র সমাজের উপর পুলিশ যে আক্রমণ করিয়াছে তাহার প্রতিবাদে অদ্য মঙ্গলবার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বেলা ১ টায় এক সভা হইবে।

অদ্য মঙ্গলবার শহরের সর্বত্র শান্তিবাহিনী কাজ করিবে। আমরা জনসাধারণের নিকট আবেদন করিতেছি, তাঁহারা যেন শহরের শান্তিরক্ষার কাজে শান্তিবাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করেন। লোকজন এবং সাধারণ বা ব্যক্তিগত যানবাহন চলাচলে যেন কোন প্রকার বাধা দেওয়া না হয়। আমরা আশা করি জনসাধারণের প্রত্যেক অংশই শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে বা রক্ষা করিতে সাহায্য করিবেন।'

স্বাক্ষর

শরৎ চন্দ্র বোস	সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ	চৌধুরী মোয়াজ্জেম হোসেন (লাল মিঞা)
আবুল হাসেম	সতীশ সরকার	
জিতেন্দ্রমোহন দত্ত	দেবতোষ দাশগুপ্ত	এইচ. এস. সুরহাওয়ার্দী
সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত	পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী	মুজাফ্ফর আহ্মদ
যতীন্দ্র চক্রবর্তী	এম. এম. ওসমান	মহম্মদ হবিবুল্লা

প্রসঙ্গত শান্তি রক্ষার জন্যে সকলের উৎকণ্ঠা বিশেষ লক্ষণীয়। কংগ্রেস, লীগ, কমিউনিস্ট—সব দলের নেতারা যেন শহরে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে

আনার জন্যে বেশি মাত্রায় ব্যাকুল। আরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ খবর সেদিন 'স্বাধীনতা'র পাতায় পরিবেশিত হয় :

বিশেষ দ্রষ্টব্য

'কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের সহিত কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিদের যে আলোচনা হয়, তাহাতে প্রথম স্থির হইয়াছিল যে, আজ সর্বত্র হরতাল ও ধর্মঘট পালিত হইবে। সে অনুসারে কমিউনিস্ট পার্টি হইতে সর্বত্র ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত জানানো হইয়াছিল। কিন্তু পরে গভীর রাত্রে কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের মত পরিবর্তিত হওয়ায়, সকলের সহিত ঐক্যের খাতিরে আমরা ধর্মঘট স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হইয়াছি—কমিউনিস্ট পার্টি।'

স্পষ্টত, পার্টি তখনও যুদ্ধোত্তর আগ্নেয়-পরিস্থিতি ও বৈপ্লবিক সম্ভাবনা এতটুকু উপলব্ধি করেনি। সেদিন একার ডাকেই পার্টি অন্তত কলকাতার বুকে ট্রাম, বাস ও শহরের উপকণ্ঠে শিল্পাঞ্চল অচল করে দিতে পারত।

কুমুদ বিশ্বাস এ প্রসঙ্গে বলেন, 'লোকে নিজের মতো করে বুঝেছিল, বুঝেছিল 'লাস্ট আওয়ার অফ ফ্রিডম স্ট্রাগল্, হাজ স্ট্রাক'--স্বাধীনতা আসছে। আমরা বুঝিনি, পিপল্ বুঝেছে।'

শৈলেন মুখার্জি বলেন, 'লোকের মাথা থেকে টুপি, গলার টাই টান মেরে খুলে ফেলা হচ্ছে—পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে। কিন্তু পার্টির কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ নেই। অথচ চারদিকে নানা কাণ্ড ঘটছে—লোকে লড়ছে।'

ছাত্রনেতা কমলা চ্যাটার্জি বলেন, 'ছাত্রদের জঙ্গী মেজাজ দেখে একটা ক্ষীণ উপলব্ধি আমাদের কারও কারও মধ্যে হচ্ছিল যে লাইন বদলাতে হবে। ঘটনা কত দ্রুত ঘটে যাচ্ছে—পরিস্থিতি কত দ্রুত বদলাচ্ছে। আমরা ঘটনার পেছনে দৌড়ুচ্ছি—কিন্তু দিশেহারা।'

বীরেন রায় বলছেন, 'যুদ্ধোত্তর যুগের অভ্যুত্থান ও তার তাৎপর্য পার্টি বোঝেনি। লক্ষ লক্ষ লোক ডালহৌসি মার্চ করেছিল ; তখন কমিউনিস্ট পার্টি যদি বলত, 'লালবাজার দখল কর !' তাহলে দু' হাজার মানুষ প্রাণ দিত। কমিউনিস্ট পার্টির স্বতন্ত্র কোন ভূমিকা নেই। তারা তো বুর্জোয়াদের পিছু পিছু ছুটছে। প্রতি পদে দ্বিধা। এমনও ঘটেছে যে পার্টি মিটিং-এ ঠিক হল স্ট্রাইক হবে। আমরা সেইমতো সব জায়গায় খবর পাঠাচ্ছি। তখন টেলিফোন করলেই স্ট্রাইক হয়ে যেত—যেতে হত না শ্রমিকদের কাছে। রাত একটায় নেতারা বললেন, 'নো স্ট্রাইক', হয়তো কংগ্রেস আপত্তি করেছে। এদিকে 'স্বাধীনতা'র পাতায় ভোরের ডাকে ছাপা হয়ে গেছে—স্ট্রাইক হবে। কিন্তু সর্বশেষ সংখ্যায় ছাপা হল—স্ট্রাইক হবে না !'

পাঁচ

তার পরের দিনগুলি নিয়ে এল এক প্রবল ঝড়ের মাতন। কংগ্রেস ও লীগ নেতারা আপসকামী, কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিধাগ্রস্ত ও নিজের শক্তি সম্বন্ধে সন্দিহান—অতএব সকলে মিলে শান্তিরক্ষার জন্য ব্যাকুল। কারণ ক্ষমতা হস্তান্তর আসন্ন। কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মৌলানা আজাদের ভাষায়, 'ইংরেজ শাসকরা স্বদেশে ফিরে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে—তারা বর্তমানে শুধু কেয়ার টেকারের কাজ করছে। সুতরাং ধর্মঘট হরতাল ইত্যাদি অপ্রয়োজনীয়।' (মডার্ন ইন্ডিয়া, পৃ ৪২৩)

তবুও নীচের তলার মানুষ রাতারাতি শহরের চেহারা বদলে দিল। নেতৃবৃন্দের যাবতীয় উপদেশ পরামর্শ ধমকানি সত্ত্বেও বিদ্রোহী মানুষ কলকাতার বুকে এক অভ্যুত্থান সৃষ্টি করল। এবং সবটাই ঘটল স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে। সেইসময়ের বিশ্বস্ত দলিল নিঃসন্দেহে 'দৈনিক স্বাধীনতা'—যার ১৩ই ফেব্রুয়ারি সংখ্যা থেকে প্রকট কলকাতার তোলপাড় দৃশ্যপট।

১৩ই ফেব্রুয়ারি '৪৬-এর 'স্বাধীনতা'র সংবাদ-শিরোনামায় পরিস্ফুট কলকাতার আমূল পরিবর্তিত রূপ :

কলিকাতায় গুলিবর্ষণে দুই শতাধিক হতাহত . মিলিটারির হাতে সহরের ভার

পুলিশ জুলুমের বিরুদ্ধে কংগ্রেস-লীগ-কমিউনিস্ট মিলিত প্রতিবাদ

লুটতরাজ ও গুন্ডামির বিরুদ্ধে জননেতাদের সতর্কবাণী

মঙ্গলবার (১২ই ফেব্রুয়ারী) রাত্রি প্রায় ৯টার সময় রেডিওতে বাঙলার লাট মিঃ কেসী ঘোষণা করেন যে মিলিটারী কোন কোন অংশের শান্তিরক্ষার ভার গ্রহণ করিতেছে এবং জনসাধারণ যেন ঘরের ভিতরে থাকেন।

সোমবার ছাত্র শোভাযাত্রার উপর পুলিসের নিষ্ঠুর আক্রমণ এবং গভীর রাত্রি পর্যন্ত বিক্ষুব্ধ জনতার উপর পুলিশের কাঁদুনে বোমা ও গুলি বর্ষণের ফলে যে বিপুল উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল মঙ্গলবার সকাল হইতে তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সোমবার রাত্রিকালে কংগ্রেস লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দের মধ্যে আলোচনার পর স্থির হইয়াছিল যে হরতাল হইবে না। কিন্তু মঙ্গলবার সকাল হইতে উত্তেজিত জনতা ক্রমাগত ট্রাম ও বাস চলাচলে বাধা দিতে থাকায় অল্পকালের মধ্যেই ট্রাম ও বাস চলাচল বন্ধ হইয়া যায়। অধিকাংশ দোকানপাটও বন্ধ ছিল। রাস্তায় রাস্তায় উত্তেজিত জনতা ভীড় জমাইতে থাকে এবং স্থানে স্থানে মিলিটারী লরীগুলির উপর আক্রমণ চলিতে থাকে। কংগ্রেস, ছাত্র ফেডারেশন, মুসলিম লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির শান্তিবাহিনী জনতাকে শান্ত রাখিবার চেষ্টা করে। বেলা প্রায় সাড়ে বারটার সময় বিবেকানন্দ রোড ও সেণ্ট্রাল এভিনিউর মোড়ে পুলিশের গুলি বর্ষণের ফলে মনোরঞ্জন দত্ত নামক একজন যুবক নিহত হন।

আজ ভোর হইতে বিক্ষুব্ধ জনতা দক্ষিণ কলিকাতার জগুবাবুর বাজার ও হাজরা মনোহরপুর রোড অঞ্চলে, মধ্য কলিকাতায় সেণ্ট্রাল এভিনিউ, রাজা বাজার, ওয়েলিংটন স্ট্রীট, চৌরঙ্গী রোড এবং উত্তর কলিকাতার মানিকতলা, মেছুয়াবাজার প্রভৃতি অঞ্চলে মিলিটারী লরী পুড়ানো শুরু করে এবং রাস্তার মাঝখানে মাঝখানে ডাস্টবিন, কাঁটাতার, ইঁটপাথর, প্রভৃতি জড়ো করিয়া পুলিশ চলাচলের বাধা সৃষ্টি করে। বেলা সাড়ে দশটায় সেণ্ট্রাল এভিনিউ ও বিডন স্ট্রীটের মোড়ে, ১১টার সময় জ্যাকারিয়া স্ট্রীট অঞ্চলে এবং তারপর পৌনে ১টার সময় সেণ্ট্রাল এভিনিউ ও বৌবাজারের মোড়ে পুলিশ গুলি চালায়। যতই বেলা বাড়িতে থাকে রাস্তায় রাস্তায় জনসাধারণ ততই বিক্ষোভ দেখাইতে থাকে। বেলা ১টার সময় হাজরা রোড ও মনোহরপুকুর রোড অঞ্চলে পুলিশ জনতার উপর ২৫ দফা গুলি চালায়।

বিকাল সাড়ে চারটার পর শহরের অবস্থা ভীষণ আকার ধারণ করে। শহরের প্রায় চতুর্দিক হইতে পুলিশের গুলি চালনার খবর আসিতে থাকে। মেডিক্যাল কলেজে বিকাল হইতে স্রোতের মত হতাহতের ভীড় হইতে থাকে। মেডিক্যাল কলেজে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এম্বুলেন্স কোরের স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকারা অক্লান্তভাবে আহতদের উদ্ধারকার্য্য ও সেবা করেন। মেডিক্যাল কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের সোশ্যাল সার্ভিস বিভাগ মাইক্রোফোন-যোগে হতাহতদের সম্বন্ধে অবিরাম খবর সরবরাহ করেন।

আজ সমস্ত কলিকাতার চেহারা যুদ্ধক্ষেত্রের মত। সশস্ত্র গুর্খা পুলিশ ও সার্জেণ্টরা রাইফেল লইয়া রাস্তায় রাস্তায় টহল দিতেছে।

স্কুল ও কলেজের ছাত্ররা ধর্মঘট করিয়া দলে দলে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের দিকে যাইতে থাকে। তথায় প্রাদেশিক ছাত্র লীগ ও ছাত্র ফেডারেশনের সম্মিলিত উদ্যোগে এক সভার পর কংগ্রেস, লীগ ও কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে মিঃ সুরাবর্দ্দীর সভাপতিত্বে ২০ হাজার লোকের এক বিরাট সভা হয়।

কংগ্রেস ও লীগের পতাকা ও লাল ঝাণ্ডা লইয়া সকল দলের লোক এই সভায় যোগ দেন। ১৯২৯ সালের অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলনের পর হিন্দু-মুসলমান জনতার এমন অপূর্ব্ব মিলনদৃশ্য আর দেখা যায় নাই। সভার পর এক বিরাট শোভাযাত্রা ডালহৌসি স্কোয়ারের দিকে অগ্রসর হয়। শোভাযাত্রার পুরোভাগে ছিলেন এইচ. এস. সুরাবর্দ্দী, সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, গুণদা মজুমদার, সোমনাথ লাহিড়ী ও মোয়াজ্জেম হোসেন।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের সভায় মুসলিম লীগের সভাপতি মৌলানা আক্রম খাঁ বলেন: বিনাশর্তে ক্যাপ্টেন রসীদের মুক্তি, অত্যাচারীদের শাস্তি ও মৃতদের ক্ষতিপূরণ চাই—যদি এইসব দাবী মানিয়া লওয়া না হয়, তবে হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণের জন্য যেভাবে হিন্দু মুসলমান সম্মিলিত আন্দোলন চালাইয়াছিলেন, আমরা পুনশ্চ তেমনি আন্দোলন চালাইব। এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে আমি ঝাঁপাইয়া পড়িব।

মুসলিম লীগের সম্পাদক আবুল হাসেম ও মোয়াজ্জেম হোসেনের (লাল মিঞা) কণ্ঠেও ঐক্যের ডাক।

সোমনাথ লাহিড়ী বলেন, "আজ বিভিন্ন দলের নেতারা এক হইতে না প্যারিলেও, জনসাধারণ যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে এক হইতে পারে, এই যুক্ত সভা তাহাই প্রমাণ করিয়াছে। আমরা কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ নেতাদের বলিতেছি, আজ তাঁহারা প্রতিজ্ঞা করুন, আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তির জন্য আলাদা হইয়া আন্দোলন চালাইবেন না। যুক্তভাবে আন্দোলন চালাইয়া আজাদ হিন্দ ফৌজকে মুক্ত করিতে হইবে।"

... ...

দেখিতে দেখিতে শোভাযাত্রা লক্ষাধিক লোকের জনসমুদ্রে পরিণত হয়। ডালহৌসি স্কোয়ার ঘুরিয়া শোভাযাত্রা সেণ্ট্রাল এভিনিউ দিয়া অগ্রসর হইবার সময় পুলিশ কয়েকবার কাঁদুনে গ্যাসের বোমা ছোঁড়ে ও লাঠি চার্জ করে। গণেশ এভিনিউয়ের নিকট কাঁদুনে গ্যাসে বিব্রত জনতাকে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেমসাহেবদের জল ঢালিয়া সাহায্য করিতে দেখা যায়। বিকাল চারটার পর পুলিশ সেণ্ট্রাল এভিনিউ হইতে আরম্ভ করিয়া হাজরা পার্ক পর্যন্ত বিভিন্ন অঞ্চলে বারবার গুলিবর্ষণ করায় অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ করে। বিক্ষুব্ধ জনতা বৃষ্টল হোটেল, ফার্পো প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উপর আক্রমণ করিতে থাকে। জনতার হাতে অনেক ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ও এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান নরনারীও লাঞ্ছিত হয়। জনতা বহু মিলিটারী লরী পুড়াইয়া ধ্বংস করে।

গতকাল গুলির আঘাতে নিহত নাজীমুদ্দিনের শব লইয়া ৫০ হাজার হিন্দু মুসলমানের এক বিরাট শোভাযাত্রা নাখোদা মসজিদ হইয়া মানিক-তলার কবরখানায় যায়। লীগের একজন সভ্য কবরের মাটী হাতে লইয়া বলেন, "এই মাটী যেন লীগ ও কংগ্রেসের পতাকাকে শক্ত করে বেঁধে দেয়, শহীদের রক্তে এই বন্ধন চিরদিনের জন্য এক হয়ে যাক।"

রাত্রির খবরে প্রকাশ, কালীঘাট ট্রাম ডিপোতে আগুন লাগানো হয় ও রসা রোড-হাজরা রোডের মোড়ে রেলের বুকিং অফিসের দরজা ভাঙ্গিয়া কাগজপত্র ও আসবাব টানিয়া বাহির করিয়া তাহাতে আগুন লাগানো হয়। এসপ্ল্যানেডে বৃষ্টল, গ্র্যাণ্ড হোটেল, মেট্রো, টাইগার সিনেমা প্রভৃতির কাঁচ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়।

বিভিন্ন হাসপাতালের সূত্রে আহতদের খবরাখবর

ক্যালকাটা মেডিক্যাল স্কুল

২জন মুসলমান গুরুতররূপে গুলির আঘাতে আহত, মিঃ এল. পি. চৌধুরী (লাঠির আঘাত), জয় সিং—কালীঘাট ট্রাম ডিপোর নিকট আহত।

মাড়োয়ারী হাসপাতাল

১। মদনমোহন দাস (গুরুতর আহত)—২২/২ বৈষ্ণবপাড়া ফার্স্ট লেন ২। চাঁদুলাল—২৫ পোলক স্ট্রীট ৩। তাহের আহ্‌মেদ—২৫ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট ৪। সত্যরঞ্জন সরকার—২৫ গোরাচাঁদ বসু রোড

ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুল

১। মতিলাল রায় ২। বঙ্কিম ব্যানার্জী—২৯ নারায়ণকৃষ্ণ সাহা লেন। ৩। ধীরেন্দ্রনাথ সাহা (রামকৃষ্ণপুর) ৪। মহম্মদ ইউসুফ ৫। ললিতমোহন সরকার ৬। মণিগোপাল মল্লিক ৭। এস. এম. মজিদ ৮। অমূল্যকুমার বিশ্বাস ৯। শঙ্কর রায় ১০। নামকু, ৯/১ গ্লোব লেন।

মেডিক্যাল কলেজ

পুলিশের গুলিতে নিহত

১। মনোরঞ্জন দত্ত (২১)—৪ সি লাটুবাবু লেন ২। রামজান মিয়া (৭০)—৭ ওয়েলসলি স্ট্রীট ৩। বহর মিয়া (৩০)—৯ রাণী রাসমণি রোড ৪। এস. দত্ত।

বুলেটের আঘাতে নিহত আরো তিন জনকে আনা হইয়াছে। কিন্তু মৃতদেহগুলি সনাক্ত হয় নাই।

অবস্থা আশঙ্কাজনক

১। সমরেশ বসু ২। দীনেশ দে ৩। সোন্দর মোল্লা ৪। রামেশ্বর।

গুলিতে আহত

১। কৃপাসিন্ধু (২১) ২। গোলাম রসুল (১৭)—সেণ্ট্রাল এভিনিউ ৩। মিনা (১০) ৪। আব্দুল মান্নান—২০ কলিন্‌স্ স্ট্রীট ৫। রামস্বরূপ (২০)—মেটিয়াবুরুজ ৬। গোপী দুলাল মান্না (২০)—মেটিয়াবুরুজ ৭। অম্বিকা বিশ্বাস (১৯)—১৫০ হ্যারিসন রোড ৮। শচীন কুমার রায় (২০)—২৬/২এ, প্রসন্ন ঠাকুর স্ট্রীট ৯। মদনমোহন দাস (১৭)—২২/২ বৈষ্ণবপাড়া বাই লেন ১০। মফিমুদ্দীন খান (২৫) ১১। রায়সাজ হোসেন (১৪)—১ ডেকার্স লেন। ১২। কুবের সিং (২৫) ১৩। গোবিন্দ চন্দ্র দত্ত—৩৩ পাইকপাড়া রোড ১৪। নারায়ণ (২২)—বড়াগ্রাম ১৫। ফৌদর মোল্লা (২০)—১১ চোরবাগান লেন ১৬। বলাই চক্রবর্তী (২৪)—৬নং নিমতলা ঘাট স্ট্রীট ১৭। এস. কে. পাঁচু (২৫)—২২ নারকেল ডাঙ্গা নর্থ ১৮। দয়ারাম (৩৫)—৭৩ বেনিয়াটোলা স্ট্রীট ১৯। পায়রা ২০। চননুলাল (২২)—২৫ পোলক

স্ট্রীট ২১। যুগলকিশোর দে—২৩২/২ বাগমারী রোড ২২। অতুল দাস (২৫)—৪০/১ রামকান্ত বোস স্ট্রীট ২৩। তফী খান (৩০)—৬০ ক্যানিং স্ট্রীট ২৪। খালিদ (১৭) ২৫। অনঙ্গমোহন রায় ২৬। রাজভূষণ পণ্ডিত (২৬) ২৭। হোসেনী (২৫)—২৪ পোলক স্ট্রীট ২৮। মহম্মদ করিম (২৪) ২৯। সুশীল কুমার মিত্র (২৪)—৪-ডি ট্যাংরা রোড ৩০। আলি আজম (২০) ৩১। মহম্মদ মল্লিক (২৫)—৭৫ কলেজ স্ট্রীট ৩২। শেখ কমরুদ্দিন (২৫) ৩৩। সাতুপাণ্ডে (১২)—হাওড়া ৩৪। জিবালাল (১৮)—১০৪ তুলাপট্টি। ৩৫। বলাইলাল মাইতি (১৮)—৫৪ কৈলাস বসু স্ট্রীট ৩৬। আব্দুল করিম (২৪)—২২ জেলিয়া টোলা ৩৭। কাফী খান (৩০)—৬০ ক্যানিং স্ট্রীট ৩৮। মালিক (১৭) ৩৯। প্রেমানন্দ রাউথ (২০)—৪ সুভাষচন্দ্র লেন।

আহতদের মধ্যে মহিলা

কুমারী আরতি বসু (১৮)—৪১ হ্যারিসন রোড—মাথায় চোট পাইয়াছেন। তাঁহার অবস্থা ভালর দিকে।

মঙ্গলবার রাত্রি একটা। এখন পর্যন্ত ১২৮ জন আহতকে চিকিৎসার জন্য আনা হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে ৬৩ জনকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হইয়াছে এবং ৮জন মারা গিয়াছেন।' (স্বাধীনতা, ১৩.২.৪৬)

উপরের তালিকায় চোখ বুলালে ফুটে ওঠে কয়েকটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। প্রথমত, শহরের হাসপাতালে প্রায় সব মহল্লার হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বিভিন্ন পেশার মানুষকে আহত অবস্থায় আনা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, আহতদের অধিকাংশই শহরের নীচুতলার বাসিন্দা। অর্থাৎ পুলিস ও সামরিক বাহিনীর সঙ্গে শহরের সর্বত্র শ্রমজীবী ও গরীব মানুষেরা জোর সংঘর্ষে লিপ্ত।

গৌতম চট্টোপাধ্যায় লিখছেন,

'১২ই ফেব্রুয়ারি বিকেলের মধ্যে কলকাতার নাগরিক জীবন ও সরকারি প্রশাসন অচল হয়ে গেল। বিকেল পাঁচটার পর ভারতীয় পুলিশ ও সেনাদের রাজপথে কোথাও দেখা গেল না। বিদ্রোহী শহরকে সায়েস্তা করার ভার নিল সশস্ত্র ব্রিটিশ ফৌজ। এই সংবাদ রাত আটটায় বেতারের মধ্যবর্তিতায় লাটসাহেব কেসি সবাইকে জানিয়ে দিলেন। তারপর শুরু হল ইঁট ও সোডার বোতল সম্বল জনতা বনাম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ফেরত—সাঁজোয়া গাড়িতে ভ্রাম্যমান টমিগানধারী ব্রিটিশ ফৌজের মধ্যে অসম লড়াই। বড় রাস্তার মোড় থেকে ব্রিটিশ সৈন্যরা জনতাকে হটিয়ে দেয়। সাময়িকভাবে মানুষ পিছু হটে গলিতে আশ্রয় নেয়; কিন্তু সুযোগ পেলেই ইঁট হাতে ধেয়ে আসে—গুলি খায়—মরে—মারে।' (দি অলমোস্ট রেভলিউশন, এসেজ..., পৃ ৪৩২)

প্রথম দুদিনের অভিজ্ঞতা থেকে কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের চোখে—স্বাধীনতার চূড়ান্ত সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে-পড়া নীচুতলার মানুষের মধ্যে ঐক্যের আবেগ ছাড়া আর কোন বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েনি। তারই সঙ্গে রয়েছে গুন্ডামি ও উচ্ছৃঙ্খলতা নিয়ে যারপরনাই দুশ্চিন্তা। এই দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে 'স্বাধীনতা'র সম্পাদকীয় নিবন্ধের ছত্রে ছত্রে। তার প্রাসঙ্গিক অংশ-বিশেষ :

অত্যাচারীর বিরুদ্ধে ঐক্য

'...মঙ্গলবারে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের দৃশ্য কলিকাতার নাগরিকদের অনেকদিন স্মরণে থাকিবে। প্রত্যেকটি শোভাযাত্রার পুরোভাগে কংগ্রেস-লীগ-লাল পতাকা। হিন্দু ছাত্র যখন লীগ পতাকা উঁচু করিয়াছে, মুসলিম ছাত্র তেমনি শক্ত হাতে কংগ্রেস পতাকা আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে; লরী, মোটর ও সাইকেলে ঝান্ডার মিলন লক্ষ্য করিয়া সহরবাসী বলিতে শুরু করিয়াছে, এবার আর ডালহৌসী স্কোয়ার নিষিদ্ধ এলাকা করিয়া বাঁচোয়া নাই, গোটা ভারতবর্ষকে নিষিদ্ধ এলাকা ঘোষণা করিতে হইবে। সারা কলিকাতা ডালহৌসীর ময়দানে পরিণত হইল। এবং ঐক্যবদ্ধ নেতৃবৃন্দ ও জনসাধারণের দাবীর সম্মুখে সাম্রাজ্যবাদও নতি স্বীকার করিল। ডালহৌসী স্কোয়ারের নিষেধ উঠিয়া গেল।

...হয়তো পরাজয়ের অপমানে ক্ষিপ্ত হইয়া সাম্রাজ্যবাদ আবার লোককে উস্কাইবার চেষ্টা করিবে, গুলী চালাইবার বাহানা খুঁজিবে। জনতার ন্যায়সঙ্গত বিক্ষোভকে কাজে লাগাইয়া যাহারা গুন্ডামী ও লুঠপাটের সুযোগ খুঁজিতেছে, তাহারাও হয়তো সাম্রাজ্যবাদী মতলবেই ইন্ধন যোগাইবে।

...কলিকাতা সহরের হিন্দু মুসলমান অধিবাসীর মনে যে ঐক্যবোধ ও সংগ্রাম চেতনা জাগিয়াছে তাহা অপূর্ব। সকলকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে, এই চেতনাকে আমরা উচ্ছৃঙ্খলতার আত্মঘাতী পথে ব্যর্থ হইতে দিব না।' (স্বাধীনতা, ১৩.২.৪৬)

হায় কলকাতার সংগ্রামী মানুষ। তোমাদের প্রাণ কবুল লড়াই আজ কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল কলাম আজাদের চোখেও নিছক উচ্ছৃঙ্খলতা। আর তোমরা এক-একটি নিকৃষ্ট গুন্ডা। মৌলানা আজাদ এক বিবৃতিতে বলছেন: 'কলিকাতার গোলযোগ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, শহরের অসচ্চরিত্র লোকেরা যুবকদের ক্ষেপাইয়া তুলিতেছে। বর্তমান পরিস্থিতিকে কাজে লাগাইয়া তাহাদের জঘন্য মতলব হাসিল করাই এ প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য। গুন্ডামীর বিস্তার বন্ধ করিবার জন্য আমি সকল নাগরিকের নিকট আবেদন করিতেছি।' (যুগান্তর, ১৩.২.৪৬)

ছয়

বুধবার, ১৩ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬। এই দিন থেকে চলেছে কলকাতায় মিলিটারি-রাজত্ব। কলকাতা যেন এক যুদ্ধক্ষেত্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধজয়ী ব্রিটিশ সেনারা পুরোদস্তুর যুদ্ধসাজে বিদ্রোহী শহরকে শায়েস্তা করার কাজে নেমেছে। এবার তাদের শত্রু জার্মান বা জাপানিরা নয়। শত্রু আজ কলকাতার যত আধপেটা-খাওয়া দিনমজুর, ফেরিওয়ালা, ফলওয়ালা, ঠেলাওয়ালা ও রিক্সাওয়ালা। টমিগান মেশিনগান নিয়ে সাঁজোয়াগাড়িতে চড়ে শহরের রাস্তায় রাস্তায় টহল দিচ্ছে গুর্খা ও গোরা সৈন্যেরা। মধ্য কলকাতায় মহম্মদ আলি পার্কের কাছে ফায়ার ব্রিগেড স্টেশনে বসেছে মিলিটারি ক্যাম্প। ব্রেনগান মেশিনগান কারবাইন হাতে শতাধিক গোরা সৈন্য সেখানে আস্তানা গেড়েছে। একই দৃশ্য উত্তর কলকাতার শ্যামবাজারের মোড়ে। সাঁজোয়া গাড়ি ও লরিতে করে গোরা সৈন্যরা সার্কুলার রোড ধরে ঘন ঘন টহল দিচ্ছে। দক্ষিণ কলকাতায়—'থামো নয়তো গুলি করব'—রাস্তাজোড়া এই ফেস্টুন লাগিয়ে মিলিটারি রাস্তা আগলিয়ে বসেছে। জগুবাবুর বাজারের ছাদের উপর সামরিক বাহিনী চারদিকে বন্দুক তাক করে ওৎ পেতে বসে। রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মতলায় সার্চলাইট জ্বালিয়ে সামরিক বাহিনীর তৎপরতা শুরু।

১৩ই ফেব্রুয়ারি, শহরের প্রায় কুড়িটি জায়গা থেকে গুলি চালানোর খবর আসে। গুলি ও কাঁদুনে গ্যাসের শেল ফাটার শব্দে গোটা শহর যেন কাঁপছে। এইদিন রাত্রি ৯টা পর্যন্ত ১৬৯ জন গুলিবিদ্ধ মানুষকে হাসপাতালে আনা হয়। তার মধ্যে পনের জন মৃত। তারপর থেকে দেখা গেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মিনিটে একজন করে বুলেট-বেঁধা লোক আসছে। কাউকে কাউকে হাসপাতালে না নামিয়ে সোজা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মর্গে। শোনা যাচ্ছে আত্মীয়-স্বজনদের আকাশ-বাতাস জুড়ে বুকফাটা কান্না। আহতদের সংখ্যা অগণন, অতএব ব্লাড ব্যাঙ্কের রক্ত ভাণ্ডার নিঃশেষিত। আহতদের জন্য রক্ত দিতে এগিয়ে এলেন অনেকে—ব্লাড ব্যাঙ্কের সামনে অসংখ্য মানুষের লাইন।

সারারাত ধরে কেবল গুলি -গোলার আওয়াজ। বৌবাজার ও কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে পুলিশ ও মিলিটারি সারাদিন-সারারাত অসংখ্যবার গুলি চালিয়েছে। গুলি চলে মানিকতলা অঞ্চলে অন্তত চারবার। ওয়েলিংটন ও ধর্মতলার মোড়ে বহুবার গুলি চলে। গুলি চালানোর খবর আসে ওয়েলেসলি স্ট্রীট, গিরীশ পার্ক, জগুবাবুর বাজার, রাজাবাজার, শ্যামবাজার ও দর্জিপাড়া অঞ্চল থেকে। জগুবাবুর বাজারের কাছে গুলিতে আহত হলেন বাস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সম্পাদক নিত্য ব্যানার্জি। তাঁর একটা পা কেটে বাদ দিতে হয়।

তবুও অবাধ্য শহরকে বাগে আনা যাচ্ছে না। আজ কোন কিশোর

বোধহয় ঘরে নেই। বস্তির বাচ্চারা গলির ভেতর থেকে মিলিটারি লরির উপর আধখানা ইঁট ছুঁড়ে আবার গলির মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। তারা মরছেও প্রচুর। আর বড়রা মিলিটারি লরির পেট্রল ট্যাংকে আগুন লাগাবার ফিকির খুঁজছে। দাউ দাউ জ্বলছে মিলিটারি লরি শহরের পথে পথে। বৌবাজার থেকে কলেজ স্ট্রীট মার্কেট পর্যন্ত গোটা অঞ্চলটা যেন যুদ্ধক্ষেত্র। এক অসম যুদ্ধ। জেলেপাড়া ও কলাবাগান বস্তির অল্পবয়সীরা রাস্তার মাঝখানে ব্যারিকেড তৈরি করে লড়ছে। তাদের মদত দিচ্ছে ফলওয়ালারা। গোটা এলাকা কাঁদুনে বোমার ধোঁয়ায় অন্ধকার। কোনদিকে তাকানো যাচ্ছে না—চোখ জ্বালা করছে; আর মাঝেমাঝে গুলির শব্দ; হয়তো আট, দশ বা বারো বছরের একটি বাচ্চা মারা পড়ল। লোকেরা গঙ্গাজলের নলগুলো খুলে দিয়ে সমস্ত রাস্তা ভাসিয়ে দিয়েছে। ফলে কাঁদুনে বোমায় কাজ হচ্ছে না।

রাস্তায় রাস্তায় ঠেলাগাড়ি, প্যাকিং বাক্স ও ডাস্টবিন দিয়ে ব্যারিকেড তৈরি হয়েছে। ব্যারিকেডের আড়াল থেকে অত্যন্ত মামুলি হাতিয়ার সম্বল করে কলকাতার গরীব মানুষ লড়ছে। হিন্দু, মুসলমান, ফলওয়ালা, রিক্সাওয়ালা এবং কিশোর ও বাচ্চাদের নির্ভীক লড়াইয়ের কাহিনী লোকের মুখে মুখে সারা শহরে ছড়িয়ে পড়েছে। শহরবাসীর চোখে তারা বীর।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখছেন:

'মাঝে মাঝে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি চলছে কার্জন পার্কের দিকে। তারই মধ্যে একটি বাচ্চা ছেলে দেখি একটা লাঠির আগায় ছেঁড়া ন্যাকড়া জড়িয়ে মশাল জ্বালিয়েছে। মশালটা নিয়ে সে আস্তে আস্তে রাস্তা পার হল। সামনে মিলিটারি ট্রাক দাঁড়ানো। তবু ভ্রুক্ষেপ নেই। কাছেই সাহেবদের একটা হোটেল। একতলার দরজা, জানালা আঁটা। ছেলেটা হাতে মশাল নিয়ে থাম বেয়ে ওপরে উঠল। তারপর জ্বলন্ত মশালটা ছুঁড়ে ফেলে দিল ভেতরে। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। সাহেবদের ভয়ার্ত চিৎকার। তারপর ছেলেটা থাম বেয়ে আস্তে আস্তে নিচে নেমে এল। মিলিটারি লরিটার দিকে ক্রুদ্ধচোখে একবার তাকিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে যখন সে চৌমাথায় এসে পেঁছল, তখন লুঙি-পরা এক ফলওয়ালা ঝুড়ি হাতে ছুটতে ছুটতে এসে তার হাতে একটা কমলালেবু গুঁজে দিয়ে গেল। কমলালেবুটা ছাড়াচ্ছে এমন সময় পেছন দিক থেকে গুলির একটা শব্দ। ছেলেটা মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল।' (আমার বাংলা, পৃ ৯৪)

লড়িয়েদের মধ্যে যারা আহত হচ্ছে সে সব অখ্যাত মানুষের জন্যে মহল্লার সমস্ত খেটে-খাওয়া মানুষের মন দরদে ভরপুর। তেমনি একজন ৬নং চক্রবেড়িয়া রোডের বস্তিবাসী গোরক্ষপুর জেলার জগাই মাহাতো। সেখানে তার বৌ ও দুটি বাচ্চা মেয়ে রয়েছে। কলকাতায় গত পঁচিশ বছর ধরে সে কুলিগিরি করে আসছে। তার তলপেটে গুলি লেগেছে। তার ও তার পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিয়েছে গোটা বস্তির মানুষ।

তের বছরের ছেলে নূর মহম্মদ। তার অভিভাবক নুলো দাতা সাহেব ঃ কাগজ বিক্রির কমিশন ও খয়রাতের পয়সায় দিন চালায় দু'জনে। ধর্মতলা ও চাঁদনী চকের মোড়ে গুলি খেল নূর মহম্মদ। হাতে ভর করে ঘসতে ঘসতে হাসপাতালে তাকে রোজ দেখতে যান দাতা সাহেব। খুশি হয়ে তিনি জানান—কংগ্রেস-লীগ সবাই ফল দিয়ে যাচ্ছে জখম ছেলেটাকে।

চৌদ্দ বছরের তাজা কিশোর আজমীরি-মল্লুমিয়া দুধওয়ালার একমাত্র ছেলে। মঙ্গলবার রাত্রিতে রিপন স্ট্রীটে চার-পাঁচটা গুলিতে তার দেহ ঝাঁঝরা হয়ে গেল। তের বছরের ছেলে ইশাক—বাপ-মা নেই—এক দিদি আছে। তার ডান হাতে গুলির চোট। মিলিটারি বুলেটের সামনে রাস্তা ফাঁকা। এমনকি রেডক্রসের গাড়িও নেই। শুধু ছিল লিনটন স্ট্রীট ও মফিজুল ইসলাম লেন বস্তির কিশোর ছেলেরা। ঠেলা গাড়িতে আহতদের উঠিয়ে তারা টেনে আনল মহল্লায়। খলিলও সেদিন চোট খেয়েছিল। ফাটা মাথা ঝাঁকিয়ে খলিল সবাইকে শুনিয়ে দিল—সে আর এক দফা লড়তে রাজি—'ফিন এব মর্তোয়া লড়েঙ্গে।'

আজমীরি মারা গেল। মহল্লার তিন হাজার বস্তিবাসী লাল, সবুজ ও তেরঙ্গা ঝাণ্ডার মিছিলে মুডিওয়ালী বাগানে শহীদকে কবর দিয়ে এল। মারা গেলেন ইউনিয়নের কর্মী গ্যাস শ্রমিক মহম্মদ কদম রসুল।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখছেন :

'পরদিন সন্ধ্যাবেলা বস্তির সবাই দড়ির ভাঙা খাটিয়াগুলো রাস্তায় টেনে মিটিং করল। সবাই দু-চার আনা করে চাঁদা দেবে। বাঁচিয়ে রাখবে তারা কদম রসুলের অসহায় কাচ্চা-বাচ্চাদের। পয়সা দেবে যারা সারাদিন রিক্সা টানে, বিড়ি বাঁধে, ফেরি করে জিনিস বেচে, কল-কারখানায় কাজ করে। মরদ ছিল কদম রসুল। গ্যাস কোম্পানির ইউনিয়নের পাণ্ডা ছিল সে। মালিকের চোখরাঙানিকে কখনও ভয় করেনি। দিল ছিল তার। বস্তির সবাই তাকে ভালবাসে।' (আমার বাংলা, পৃ ৯৫)

মহম্মদ কদম রসুলের মৃতদেহ নিয়ে গ্যাস শ্রমিক ইউনিয়নের অফিস থেকে পাঁচ হাজার হিন্দু-মুসলমানের এক শোভাযাত্রা কবরখানার দিকে চলতে থাকে। বিড়ি শ্রমিক মহম্মদ জানের গুলি লাগে মঙ্গলবার রাতে। বুধবার সকালে তাঁর মৃত্যু হয়। ইন্টালি মহল্লার হিন্দু-মুসলমান এক বিরাট শোভাযাত্রায় তাঁর মৃতদেহ গোবরা সমাধিস্থানে নিয়ে গেল।

প্রতিদিনই শহীদের দেহ নিয়ে শ্মশান ও কবরের দিকে বহু শোভাযাত্রা চলতে থাকে। হাজার হাজার মানুষ শবানুগমন করে। শহীদদের তালিকায় মহল্লার বেপরোয়া ও নামকরা গুণ্ডারাও স্থান পেয়েছে। তাদেরই একজনকে নিয়ে বুলবুল চৌধুরীর 'রক্তের ডাক' গল্পটি। গল্পের নায়ক কোরবান শেখ রাজাবাজার মহল্লার নামকরা গুণ্ডা। 'খবরটা শোনা অবধি অপরিসীম অধীরতায় দিশেহারা হয়ে উঠেছে কোরবান। হিন্দু মুসলমান এক হয়ে

গেল। এক হয়ে গেল সব ঝাণ্ডা! বলে কি! তাহলে তো এইবার জালিমের অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়া যাবে—আদায় করা যাবে রশীদ আলিদের মুক্তি—বারতানিয়ার দম্ভ চুরমার করা যাবে অনায়াসে।'

তারপর মিলিটারি ট্রাক জ্বালাতে গিয়ে কোরবানের সারা শরীর পুড়ে গেল। তাতেও দমল না সে। 'বস্তির ছেলেদের আড়াল দিয়ে বুক পেতে দাঁড়িয়ে গেছে কোরবান: লে মার মার গোলি, শালা পুলিশ কা বাচ্চা, মার না! তেরি—হিংস্রভাবে খিঁচিয়ে উঠে একটা অশ্লীল গাল দিল কোরবান। ··একটু ইতস্তত করে ছেলেরা সবে যাবার জন্য পা বাড়ালো। আর ঠিক সেই মুহূর্তে একজনের পৃষ্ঠদেশ লক্ষ্য করে টমিটার হাতে প্রচণ্ড-ভাবে গর্জে উঠলো রাইফেলটা। অস্ফুট এক অন্তিম চীৎকারে মাটিতে ঢলে পড়ল ছেলেটা। যেন কারবালার ময়দানে এসে দাঁড়িয়েছে কোরবান—জবরদস্ত জালিম এজিদের সেই কারবালা—শহীদ হাসান হোসেনের রক্তস্মৃতি জড়িত মরু ময়দান। খুনিয়ারী কোরবানের মস্তিষ্ককোষের ঝিল্লিতে ঝিল্লিতে বিশৃঙ্খলার মত্ত দোলানি। চোখের পলকে কোরবান ঝাপটা মেরে ছিনিয়ে নিলে রাইফেলটা।' ' কিংকর্তব্যবিমূঢ় মাত্র একটি মুহূর্ত পরেই কোরবানের অধীর চোখের তারায় ঝিকিয়ে উঠল রাইফেলের ডগার উদ্ধত সঙ্গীনটা এবং পরক্ষণেই টমিটার বুকে সেটা আমূল চালিয়ে দেওয়ার জন্য সে ক্ষিপ্রহাতে রাইফেল বাগিয়ে ধরল।

কিন্তু বিঁধিয়ে দেওয়া হল না। তার আগেই কাণ্ডচ্যুত বৃক্ষের মত মাটিতে হুমড়ি খেয়ে কোরবান পড়ে গেল। · সাজোয়া গাড়ীর পিপ হোলস্ দিয়ে ব্রেনগানের নলটা তখনও উঁকি মেরে রয়েছে-- তখনো সেটার মুখ থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে একটা ক্ষীণ অতি সূক্ষ্ম রেখায়। ···পাশাপাশি দুটো পতাকা দিয়ে শবাধার ঢাকা। একটি বিড়ি মজদুর ইউনিয়নের দেওয়া লাল ঝাণ্ডা। আর একটি অর্ধচন্দ্র চিহ্নিত সবুজ—শহীদের প্রতি মহল্লার মুসলিম লীগের সশ্রদ্ধ নজরানা। ডাক্তারবাবু এগিয়ে গিয়ে সসম্ভ্রমে জানু পেতে বসলেন। ধীরে ধীরে শবাধারের মাঝামাঝি বিছিয়ে দিলেন তেরঙ্গা পতাকাখানা!' । রক্তের ডাক।

সাত

পুলিশ ও মিলিটারির অত্যাচার ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। ১৪ই ফেব্রুয়ারির 'স্বাধীনতা' জানাচ্ছে—বহু নিরীহ নাগরিক মিলিটারির হাতে লাঞ্ছিত হয়েছে। বৌবাজার, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট ও জগুবাবুর বাজারের মধ্যে ঢুকে মিলিটারি নিরীহ দোকানী ও ক্রেতাদের মারধর করে। সকাল ন'টায় মট লেনের চা-খানায় চা-পানরত একজন মুসলমানকে গুলি করে মারা হয়। পাড়ায় পাড়ায় 'সন্দেহভাজন' ব্যক্তিদের খোঁজে পুলিশ ও মিলিটারি বহু

বাড়িতে হানা দেয়। পদ্মপুকুর রোডে একটি সরকারী গ্রেন শপের ক্রেতাদের তারা অকারণে মারতে থাকে। ৪৮ নং চক্রবেড়িয়া রোডে দোতলায় উঠে সামরিক বাহিনী চারজনকে ধরে মারে এবং তার মধ্যে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। সত্তর বছরের এক বৃদ্ধা রান্না করছিলেন—মারের হাত থেকে তিনিও রেহাই পাননি। উত্তর কলকাতায় বিদ্যাসাগর স্ট্রীট, গড়পার প্রভৃতি অঞ্চলে পুলিশ কয়েকটি বাড়িতে ঢুকে 'মুসলমান অথবা গুণ্ডা' লুকিয়ে আছে কিনা খোঁজ করে। জগুবাবুর বাজার, হাজরা ও কালীঘাট অঞ্চলে মিলিটারি খুশিমতো পথচারীদের ধরে মারতে থাকে। মাঝে মাঝে রাস্তার মোড়ে গাড়ির আরোহীদের আটক করে খানা-তল্লাসি চালানো হয়। ১৩ই ফেব্রুয়ারি রাত দশটায় ৩৮ নং ক্রীক রো-র পার্টি কমিউনে ঢুকে কয়েকজন পার্টি-কর্মীকে তারা মারধর করে। কলকাতার বহু অঞ্চলে পুলিশ ও মিলিটারি বিভিন্ন হোটেল ও রেস্তোরাঁ ও খাবারের দোকান লুট করেছে—এই অভিযোগও শোনা যায়। চক্রবেড়িয়া রোডের দেশবন্ধু হোটেল, ১১৩ নং আপার সার্কুলার রোডে মহম্মদ ওমরের হোটেল, বিবেকানন্দ রোডে আবদুর শকুরের ফলের দোকান, ছায়া সিনেমার পাশে সিগারেটের দোকান—পুলিশ ও মিলিটারি লুট করে।

শহরের বিভিন্ন জায়গায় পথচারী ভদ্রলোক ও দোকানীদের ধরে এনে জোর করে রাস্তার জঞ্জাল পরিষ্কার করান হয়। যাঁরা অস্বীকার করেন, তাঁদের উপর মারপিট চলে। সৈন্যরা কথাশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে এভাবে রাস্তা সাফ করানোর চেষ্টা করে। মানিক তাদের আদেশ অগ্রাহ্য করায় তাঁকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়া হয়।

১৪ই ফেব্রুয়ারি সকাল থেকে কলকাতা ও আশেপাশের শিল্পাঞ্চলে কংগ্রেস, লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির সম্মিলিত শান্তিবাহিনী বার হয়। তাঁরা শান্তিপূর্ণ ও সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রতিরোধ আন্দোলন চালিয়ে যাবার জন্য জনতার কাছে আবেদন জানান। কলকাতার গুলিতে হতাহতদের পরিবার-বর্গকে সাহায্য করার জন্য কংগ্রেস, লীগ ও কমিউনিস্ট নেতাদের নিয়ে একটি রিলিফ কমিটি গঠিত হয়েছে। তাতে আছেন: এইচ. এস. সুরাবর্দী (চেয়ারম্যান), সোমনাথ লাহিড়ী, ভূপেশ গুপ্ত, চৌধুরী মোয়াজ্জেম হোসেন, হবিবুল্লা বাহার, পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী, নুরুল হুদা, মৌলভী আবুল জব্বর ওয়াহিদী, জে. সি. গুপ্ত, অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, আবুল হাসেম ও স্নেহাংশু আচার্য।

১৪ই ফেব্রুয়ারি 'স্বাধীনতা'র পাতায় মিলিটারি গাড়ি পোড়াবার অভিযোগে ধৃত ব্যক্তিদের নামের এক তালিকা প্রকাশিত হয়:

প্রথম দফা

১. দিলওয়ার ২. আব্দুল আলি ৩. সওলা মুচি ৪. শেখ মহীউদ্দিন ৫. মাহী মুচি ৬. মহম্মদ জাহির ৭. দিলওয়ার কুর্মী

৮. কালিপদ ঘোষ ৯. বাসু ১০. রাম অবতার ১১. চণ্ডীকুমার দে ১২. দুখন গোয়ালা ১৩. আব্দুল রহমান ১৪. অমিত কুমার গুহ ১৫. ক্ষীরোদ চন্দ্র পইড়া ১৬. শিবপদ রায় ১৭. বিমলচন্দ্র দাস ১৮. মহম্মদ নৌসের আলি ১৯. আব্দুল হামিদ ২০. সেখ বাসু ২১. মহম্মদ ইশাক।

দ্বিতীয় দফা

২২. হালিম ২৩. শেখ সত্তর ২৪ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ২৫. শিবশঙ্কর মিত্র ২৬. যমুনা শেঠী ২৭ মনোরঞ্জন দত্ত ২৮. লাছঙ্কর ২৯. এস. এম. ইউসুফ ৩০ জানে আলম ৩১ এস. কে. হোসেন ৩২. দুলাল চন্দ্র জানা ৩৩. মহম্মদ ইব্রাহিম ৩৪. সফরুদ্দিন ৩৫. মুরাদ আলি ৩৬. আব্দুল রসিদ খান ৩৭. সমরেন্দ্র দত্ত ৩৮. অসীম ঘোষ ৩৯. নিত্যানন্দ পালিত ৪০. গোবিন্দচন্দ্র দে ৪১ মহম্মদ ইউসুফ খাঁ ৪২ চরকু কুর্মী।

তৃতীয় দফা

৪৩. কাসিম খান ৪৪. এম. এস. চৌধুরী ৪৫. মানিকলাল চৌধুরী ৪৬. আব্দুল আলিম ৪৭. মহম্মদ ইসমাইল ৪৮. ওমপ্রকাশ গুপ্ত ৪৯. মহম্মদ জ্যাকেরিয়া ৫০. সালে আহমদ ৫১. শামসুল হক ৫২. আবা নবাব খান ৫৩. সরিফুদ্দিন আহমদ ৫৪. মহম্মদ সৈয়দ ৫৫. মহম্মদ ওমর ৫৬. এম. ডি. হানিফ ৫৭. আজিজুদ্দিন সিদ্দিকি ৫৮. জসিমুদ্দিন মিয়া ৫৯. অনিল দাস ৬০. ভগবান দাস ৬১. আহমদ সোভান ৬২. শৈলজা পাল ৬৩. আবদুর রসিদ ৬৪. মহম্মদ শাহ যেহার ৬৫. মৃত্যুঞ্জয় চ্যাটার্জী ৬৬. নারায়ণ চক্রবর্তী ৬৭. আব্দুল খান ৬৮. মোহন সিং ৬৯. আলি মহম্মদ রফিকুল্লা ৭০. এম. জি. হোসেন ৭১. দুখীরাম রায় ৭২. মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী [তালিকা অসম্পূর্ণ]

এ কদিন কলকাতার সমস্ত স্তরের মানুষ যে কী প্রবলভাবে আলোড়িত হয়েছে—এই তালিকা তার অকাট্য প্রমাণ। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের অধিকাংশই যে নির্দোষ তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং এই তিনদিন পুলিশ ও মিলিটারি নির্বিচারে যে ধরপাকড় করেছে—এই তালিকা তারও একটি দৃষ্টান্ত। তারই সঙ্গে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে অভিযুক্তদের অধিকাংশই মুসলমান। ১৯২১ সালের পর কলকাতার মুসলমান সমাজ রাজনৈতিক বিক্ষোভের সঙ্গে এত ব্যাপক হারে কি কখনও জড়িয়ে পড়েছে? মিছিলে মিছিলে কংগ্রেস-লীগ পতাকার সহাবস্থান যেমন আগে কখনও চোখে পড়েনি—তেমনি হিন্দু মুসলমানের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সমবেত অভিযানও এক অভূতপূর্ব ঘটনা। মাত্র সাড়ে তিন বা চার বছর আগে ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলনেও মুসলমান তরুণ এত ব্যাপক হারে অংশ নেয়নি।

তাছাড়া কলকাতার গরীব মহল্লার মানুষদেরও এই প্রথম সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জঙ্গী লড়াইয়ে অংশ নিতে দেখা গেল : সত্যিই অকল্পনীয় এই দৃশ্য।

আট

ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় সৈনাধ্যক্ষ স্যার ফ্রান্সিস টাকার-এর ভাষায় : মুসলমান, শিখ, কমিউনিস্ট ও গুণ্ডা বদমায়েশদের সক্রিয় সহযোগিতায় গোলযোগ দ্রুত শহরময় দাঙ্গা, অগ্নিকাণ্ড ও লুটতরাজের ব্যাপক আকার নেয়। (দি অলমোস্ট রেভলিউশন, এসেজ · , পৃ ৪৪৩)

ব্রিটিশ সেনানায়ক এ ক'দিনের জঙ্গী লডাইয়ের যে কৃতিত্ব কমিউনিস্ট পার্টি'র উপর আরোপ করতে চান—কমিউনিস্ট পার্টি কিন্তু আদৌ তার দাবিদার নয়। ১৩ই ফেব্রুয়ারি বর্তমান পরিস্থিতি প্রসঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি তার বিশ্লেষণী বক্তব্য উপস্থিত করে :

'কংগ্রেস ও লীগনেতাদের কাছে এবং কলকাতার বীর নাগরিকদের কাছে কমিউনিস্ট পার্টি'র আবেদন :

কলিকাতার সাধারণ মানুষ অপূর্ব বীরত্বে সংগ্রাম করিতেছেন। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের সভায় তাঁহারা প্রতিজ্ঞা লইয়াছিলেন—যাহারা গ্রেপ্তার হইয়াছে তাহাদের মুক্তি চাই, যাহারা দেশবাসীর রক্ত বহাইয়াছে তাহাদের শাস্তি চাই, ক্যাপ্টেন রসিদ ও অন্যান্য আজাদ হিন্দ বন্দীদের মুক্তির জন্য সকলের সমবেত আন্দোলন চাই, কলিকাতার পথে কলিকাতাবাসীর অবাধ অধিকার চাই। সেই প্রতিজ্ঞা সার্থক করার জন্য সকল মানুষের মনে আজ মৃত্যুভয়হীন সংগ্রামের কঠোর পণ, পথে পথে প্রবাহিত রক্তধারার মধ্যে তাহারই জ্বলন্ত স্বাক্ষর, হিন্দু-মুসলমানের অপূর্ব ঐক্য তাহারই জয়ধ্বনি।

উচ্ছৃঙ্খল জনতার গুণ্ডামি বলিয়া সাম্রাজ্যবাদ ইহাকে দেশভক্তদের চোখে খেলো করিবার চেষ্টা করিয়াছে; তাহাতে ব্যর্থ হইয়া ইহার বিরুদ্ধে অমানুষিক আঘাত হানিতেছে। শহরে মিলিটারী স্বেচ্ছাচারের তাণ্ডবলীলা চলিয়াছে, এমনকি লোকের বাড়ীর ভিতরে ঢুকিয়াও তাহারা অত্যাচার চালাইয়াছে। ১৪৪ ধারা জারি করিয়া সমস্ত সহরবাসীর কণ্ঠরোধ করিয়াছে। রাস্তা বন্ধ করার অজুহাতে লোককে বেপরোয়া গুলি করা যাইবে বলিয়া নৃশংস আদেশ শুনাইয়া দিয়াছে। শহরময় বিভীষিকার রাজত্ব কায়েম হইয়াছে।

এই বিভীষিকার বিরুদ্ধে অসংখ্য সাধারণ নাগরিকের যে সংগ্রাম, তাহাকেই মৌলানা আজাদ ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতা গুণ্ডাদের কাজ বলিয়া

ভাবিতেছেন, ইহা মর্মান্তিক পরিতাপের বিষয়। সাধারণ মানুষের সংগ্রাম পদ্ধতিতে ভ্রান্তি থাকিতে পারে, বিশৃঙ্খলা থাকিতে পারে, কিন্তু দেশভক্তির অতুল প্রেরণা আর অত্যাচারীদের প্রতি জ্বলন্ত ঘৃণাই যে তাহাদিগকে মরিবার কঠিন প্রতিজ্ঞায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে সে কথা কে অস্বীকার করিবে? আজ যদি নেতারা তাহাদিগকে গুণ্ডা বলিয়া সরিয়া দাঁড়ান তবে নির্ম্মম মিলিটারী অত্যাচারের হাতেই তাঁহারা তাহাদিগকে সঁপিয়া দিবেন, একটা গোটা অঞ্চলের অধিকাংশ নাগরিকের মনোবল একেবারে ভাঙ্গিয়া দিবেন।

ইহাদের সংগ্রামের প্রেরণাকে বাঁচাইয়া রাখা ও সফলতার পথে লইয়া যাওয়া নেতাদের প্রধান কর্ত্তব্য। যে কয়টি দাবী লইয়া জনসাধারণ সংগ্রামে নামিতে বাধ্য হইয়াছে, সে দাবী অসম্ভব নয়। সকল দলের নেতা একত্র হইয়া তাহার জন্য চেষ্টা করিলে শান্তিপূর্ণ হরতাল ও আন্দোলনেই সে দাবী আদায় করা যায়, জনসাধারণের এত রক্তের বিনিময়ে তাহা পাইবার চেষ্টা করিতে হয় না।

দেশবাসীর অপূর্ব বীরত্ব অথচ অপরিসীম যন্ত্রণা দেখিয়া আমরা কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের কাছে সনির্ব্বন্ধ আবেদন জানাই—তাঁহারা ইহাদের রক্ষা করিতে অগ্রসর হোন, মিলিটারীর আধিপত্যের বিরুদ্ধে জনসাধারণের সংগ্রাম সফল করিবার ব্যবস্থা করুন। আর এক মুহূর্তও বসিয়া থাকিবার সময় নাই। কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ হইতে আমরা কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের কাছে প্রস্তাব করিতেছি: তাঁহারা এখনি একত্রে বৈঠক করুন এবং ঘোষণা করুন যে যতদিন না দাবীগুলি পূরণ হইতেছে ততদিন তাঁহারা শান্তিপূর্ণ-ভাবে হরতাল ও ধর্মঘট চালাইবার জন্য আবেদন করিতেছেন। শ্রমিক-শ্রেণীর পক্ষ হইতে আমরা এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত করার জন্য পূর্ণ সহযোগিতা করিব তাহার প্রতিশ্রুতি দিতেছি। সকল দলের সম্মিলিত চেষ্টায় শান্তিপূর্ণ ধর্মঘট আরম্ভ হইলে সাম্রাজ্যবাদ দাবী মানিতে বাধ্য হইবে। সংগঠিত সংগ্রামের ভরসা পাইলে জনসাধারণও অযথা রক্তক্ষয় ছাড়িয়া সানন্দে শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধের পথ গ্রহণ করিবে।

যাহারা আজ পথে পথে গুলি খাইতেছে, তাহাদের সমর্থনেই কংগ্রেস ও লীগ এত বড় হইয়াছে। তাহাদের সংগ্রামের ভারগ্রহণ করা ও উহাকে ঠিক পথে পরিচালিত করা কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের মহান কর্তব্য। সে কর্তব্য পালন করিয়া দেশবাসীকে অযথা মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচান—এই আহ্বানই আমরা জানাইতেছি।

বীর নাগরিকদের কাছে আমরা আবেদন করি—যে সংগ্রামে দেশের দুটি শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক সংগঠনের সমর্থন নেই, সে সংগ্রাম যতই বীরত্বপূর্ণ হোক তাহা সফল হইতে পারে না। [ইতিমধ্যেই কংগ্রেসী সংবাদপত্রে ঐক্যের সমর্থনে উৎসাহের অভাব দেখা যাইতেছে।] তাহার ফলে সংগ্রামকারীদের মধ্যেই সংশয় ও ভেদ জাগিতে থাকিবে, প্রথম উচ্ছ্বাস ফুরাইবা মাত্র নিজেদের মধ্যেই নিরুৎসাহভাব ও ঝগড়াঝাটি আরম্ভ হইবে। সেই সুযোগে সাম্রাজ্য-

বাদী দমননীতি ক্রমেই কঠোর হইবে, অথচ প্রতিবাদ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইবে। গুণ্ডা প্রভৃতিও ইহার সুযোগ লইয়া ইহাকে লুঠতরাজের সর্ব্বনাশা পথে চালিত করিবে।

সংগ্রামকে এই শোচনীয় পরিণাম হইতে নাগরিকেরাই রক্ষা করিতে পারেন। তাঁহাদের সুস্থ দেশপ্রেম এত বিরোধের মধ্যেও অপূর্ব্ব হিন্দু-মুসলমান ঐক্য গড়িয়া তুলিয়াছে। এখন যদি তাঁহারা শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধের পথ গ্রহণ করিয়া তাহারই শক্তিতে সাধারণ ধর্মঘট ও হরতালের জন্য নিজ নিজ নেতাদের আহ্বান করেন, তবে সেই আহ্বান অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা কোনও নেতার নাই। তখন নেতারা সে আহ্বান না শুনিলেও আমরা সে পথে অগ্রসর হইতে পারিব এবং তাহার ভিতর দিয়া যে সম্মিলিত আন্দোলন জন্মলাভ করিবে তাহাতে আজাদ হিন্দ বন্দীদের মুক্তি আন্দোলনও অপূর্ব প্রেরণা পাইবে। সে আন্দোলনকে রোধ করিবার ক্ষমতা সাম্রাজ্যবাদের নাই।'—কমিউনিস্ট পার্টি, ১৩ ২.৪৬

কলকাতার মানুষের এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পটভূমিতে কমিউনিস্ট পার্টির এই বিবৃতি নানা কারণে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রথমত, বিগত নভেম্বর মাসের পর যুদ্ধোত্তর রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুধাবনের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট চেতনায় অগ্রগতির লক্ষণ সুস্পষ্ট। পুলিশ ও মিলিটারির সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জনতার স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ কোন কোন ক্ষেত্রে হিংস্র আকার নিলেও—জনতার আচরণকে গুণ্ডামি আখ্যা দেওয়া হয়নি। জনতার ক্রুদ্ধ আচরণ ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপও যে দেশপ্রেমের অভিব্যক্তি, তার স্বীকৃতি রয়েছে এই বিবৃতিতে। কিন্তু জনতার ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপকে সমর্থন জানান হয়নি, তাকে ভ্রান্ত বলা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, এই বিবৃতির মধ্যে কংগ্রেস-লীগ মুখাপেক্ষিতা যে পার্টি নেতৃত্ব এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি তার প্রমাণও সুস্পষ্ট। কংগ্রেস ও লীগ সংগ্রামের নেতৃত্ব না নিলে সংগ্রাম ব্যর্থ হতে বাধ্য—তার হুঁশিয়ারিও রয়েছে। সুতরাং কংগ্রেস ও লীগ নেতৃত্ব সংগ্রামবিমুখ মনোভাবের পরিচয় দিলে সাধারণ মানুষের হাজার বীরত্ব ও ত্যাগ নিষ্ফল হতে বাধ্য। কংগ্রেস-লীগ নেতাদের বিরোধিতার জন্যে হরতাল ও সাধারণ ধর্মঘটের ডাক স্থগিত রাখা হয়। এককভাবে ডাক দেওয়ার মতো আত্মবিশ্বাস পার্টি তখনও অর্জন করেনি। এই বিবৃতিতে কংগ্রেস ও লীগ সমর্থকদের বলা হয়েছে তাঁরা যেন নেতাদের সাধারণ ধর্মঘটের পথে যেতে বাধ্য করেন।

তৃতীয়ত, পার্টির দৃষ্টিতে এই রক্তঝরা লড়াই যেন কতকগুলি নির্দিষ্ট দাবি আদায়ের জন্য। যেমন, আজাদ হিন্দ বন্দীদের মুক্তি আদায় ও দমননীতির জন্য যারা দায়ী তাদের শাস্তিবিধান ইত্যাদি। আসলে সাধারণ মানুষের এই মরিয়া লড়াই যে শুধু বন্দীমুক্তি আদায়ের জন্য নয়, তাঁদের চোখে যে এটা আজাদীর শেষ লড়াই—এই উপলব্ধি তখনো পার্টি নেতাদের

অনায়ত্ত। তাঁরা জোর দিয়েছেন শান্তিপূর্ণ পথে সমবেতভাবে আংশিক দাবি পূরণের আন্দোলনের উপর যার নেতৃত্বে থাকবে অবশ্যই কংগ্রেস ও লীগ। পার্টি শুধু শ্রমিক ধর্মঘট সফল করার জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করবে—কোন অগ্রণী ভূমিকা নয়।

১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে কলকাতার রক্তে-ধোয়া রাস্তায় দাঁড়িয়েও কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা অশান্ত মানুষের প্রকৃত মনোভাব উপলব্ধি করতে অসমর্থ। তাঁরা বুঝতে পারেননি যে পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। তার প্রমাণ ১৫ই ফেব্রুয়ারির 'স্বাধীনতা'র সম্পাদকীয় নিবন্ধ 'মিলিটারী রাজত্বের অবসান চাই'—যেখানে ফুটে উঠেছে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা।

এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামকে পাছে কেউ 'বিপ্লব' বা 'চরম সংগ্রাম' বলে মনে করেন, তাই সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে :

'...প্রত্যেকটি শ্রমিক, মধ্যবিত্ত এবং ছাত্রকে মনে রাখিতে হইবে, জনগণের মনে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত ঘৃণা যখনই ফাটিয়া পড়ে, তখনই যদি তাহাকে 'বিপ্লব' অথবা 'চরম সংগ্রাম' বলিয়া চীৎকার করা যায়—তাহা আপনা আপনি 'চরম সংগ্রামে' পরিণত হয় না।'

তাঁরা আবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে এই লড়াই শুধু কয়েকটি নির্দিষ্ট দাবী আদায়ের জন্য : '...আজ আমাদের সামনে লক্ষ্য খুব স্পষ্ট : মিলিটারীর এই অত্যাচারের অবসান ঘটাইতে হইবে, যাহারা এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী তাহাদের প্রকাশ্য বিচার করিয়া শাস্তি দিতে হইবে, মৃত শহীদদের পরিবার পরিজনকে খেসারৎ দিতে হইবে, ১৪৪ ধারা এবং অন্যান্য সমস্ত দমনমূলক আইন প্রত্যাহার করিতে হইবে।

শান্তিপূর্ণ, সংগঠিত ও সুপরিচালিত সর্ব্বব্যাপী সাধারণ ধর্ম্মঘট ও হরতাল গভর্ণমেণ্টকে কেবল উপরোক্ত দাবী পূরণে বাধ্য করিবে না, ক্যাপ্টেন রসীদ ও আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তি দুর্ব্বার করিয়া তুলিবে।'

নয়

কিন্তু নেতাদের ডাক আসার জন্যে শ্রমিকরা অপেক্ষা করেনি। ১২ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬ ওয়েলিংটন স্কোয়ারের সমাবেশে স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘটের পর উর্দিপরা ট্রাম শ্রমিকরা লাল ঝাণ্ডা হাতে দলে দলে মিছিল করে গেল। শৈলেন মুখার্জি বলছেন, 'সেদিন শ্রমিকরা শুধু ধর্মঘট করেনি, মিছিলে যাবার জন্যে আপনা থেকেই লাইনে এসে দাঁড়িয়েছে।' জগৎ বোস বলছেন, 'সমস্ত পূর্ব কলকাতা জুড়ে শ্রমিকরা ধর্মঘট করার পর চলল মিছিল করে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের দিকে।'

১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬ 'স্বাধীনতা' পত্রিকার সংবাদ-শিরোনামায়

শ্রমিকের এই উদ্দীপিত লড়াকু-ভূমিকা প্রতিফলিত : হাওড়া, ২৪ পরগণা ও হুগলীতে অশান্তির বিস্তার। দেখা যাচ্ছে, কলকাতার কাছাকাছি সমস্ত শিল্পাঞ্চল কলকাতার ঘটনার অভিঘাতে উত্তাল। কংগ্রেস লীগ কমিউনিস্ট নির্বিশেষে সমস্ত শ্রমিক তিন ঝান্ডা বেঁধে মিছিলে মিছিলে কলকাতার উপকণ্ঠে গোটা শিল্পাঞ্চল কাঁপিয়ে তুলেছে।

১৫ই ফেব্রুয়ারি 'স্বাধীনতা'র সংবাদদাতা জানাচ্ছেন : কলকাতার হত্যা-কাণ্ডের প্রতিবাদে সর্বত্র শ্রমিক বিক্ষোভ। ১৪ই ফেব্রুয়ারি হাওড়ার শালিমার কারখানার শ্রমিকরা কাজ বন্ধ রাখে। গেস্টকীন কারখানার মালিক এক নোটিশ জারি করেছে—যতদিন গোলমাল চলবে, ততদিন কারখানা বন্ধ থাকবে।

বেলঘরিয়ায় ডানলপ, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান জুট মিল ও অন্যান্য কারখানার শ্রমিকরা ১৪ই ফেব্রুয়ারি ধর্মঘট করে। ১৩ই ফেব্রয়ারি পালিত হয় শ্রীরামপর, মাহেশ, রিসড়া ও কোন্নগরে পূর্ণ হরতাল। ইন্ডিয়া জুট মিল, বেঙ্গল বেল্টিং, রামপুরিয়া, বঙ্গলক্ষ্মী ও রিসড়া জুট মিলের শ্রমিকরা ধর্মঘট করে। সেদিন সকালে কংগ্রেস, লীগ ও লাল ঝান্ডা এই তিন পতাকা হাতে শ্রমিক মিছিল বিভিন্ন রাস্তায় পরিক্রমা করে। শ্রীরামপুর স্টেশনে উত্তেজিত জনতা প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ট্রেন থামিয়ে রাখে।

মাহেশে কংগ্রেস, লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে প্রায় সাত হাজার শ্রমিকের এক প্রতিবাদ-সভা হয়। সেই সভায় শ্রমিক নেতা মহম্মদ ইসমাইল অন্যতম বক্তা। শ্রমিকরা ঘোষণা করেন, রক্ত ঢেলে তাঁরা তিনটি ঝান্ডায় যে একতা এনেছেন—সে একতা কিছুতেই ভাঙতে দেবেন না।

তেলেনীপাড়া, চাঁপদানী, ভদ্রেশ্বর ও এংগাস জুট মিলের শ্রমিকরাও ধর্মঘটের পর সভা ও শোভাযাত্রায় সামিল হয়।

অ্যাংলো ইন্ডিয়ান জুট মিল ও টিটাগড় পেপার মিলে ১৪ই ফেব্রুয়ারি পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। দু'জন শ্রমিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আগর-পাড়া ও কামারহাটি জুটমিলের শ্রমিকরাও ধর্মঘটে সামিল।

কলকাতার গ্যাস শ্রমিকরা কাজে যোগ দিতে অসম্মতি জানালে কোম্পানির পক্ষ থেকে 'যতদিন না আবহাওয়া সৃষ্টি হয়' ততদিন পর্যন্ত ছুটি ঘোষিত হয়েছে। ১৩ই ফেব্রুয়ারি আলমবাজারের চটকল, ম্যাচ ফ্যাক্টরি ও কাঁচ-কলের শ্রমিকরা ধর্মঘট করে। তারপর কংগ্রেস, লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির মিলিত শোভাযাত্রায় শ্রমিকরা অংশগ্রহণ করে। এই শোভাযাত্রার উপর মিলিটারি গুলি চালায় এবং তার ফলে একজন আহত হয়। তার প্রতিবাদে অনুষ্ঠিত হয় পাঁচ হাজার শ্রমিকের এক বিরাট সমাবেশ।

১৩ই ফেব্রুয়ারি টিটাগড় ও ইচ্ছাপুরে মিলিত প্রতিবাদসভায় শ্রমিকরা দলে দলে অংশগ্রহণ করেন। জগদ্দলে শ্রমিকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ বন্ধ করে কারখানা থেকে বেরিয়ে আসেন। বিক্ষুব্ধ জনতা শ্যামনগর ও কাঁকিনাড়া স্টেশনে রেল লাইনের উপর শুয়ে পড়ে ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেন।

পুলিশরা এসে গুলি চালায় এবং গুলিতে চারজন নিহত ও চারজন আহত হন। এই খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নদীয়া জুট মিল, গৌরীপুর মিল, নৈহাটী জুট মিল, কাগজ কল, হাজিনগরের জুট মিলের শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করে বেরিয়ে আসেন। দুপুরে আবার বিক্ষুব্ধ জনতা নৈহাটী স্টেশনে একটি ট্রেনে আগুন ধরিয়ে দিলে সৈন্যরা গুলি চালায়। গুলিতে নিহত হন রিক্সাচালক ওয়ামা ইশাক এবং গৌরীপুরের দুজন শ্রমিক, মিশিরলাল মাহাতো ও মুনিয়া কাহার। আঠারোজন শ্রমিককে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

১৩ই ফেব্রুয়ারি কাঁচড়াপাড়ার দশহাজার লোকের মিলিত সভা ও পাঁচ হাজার লোকের এক মিছিল হয়। নৈহাটীতেও হয় সমস্ত দলের মিলিত সভা।

সমরেশ বসু বলছেন, '১১ই ফেব্রুয়ারির পর পরিস্থিতি এমনভাবে বাঁক নিল যে পার্টি বুঝতেই পারল না শ্রমিকদের মনোভাব। পার্টি ধারণাও করতে পারেনি যে শ্রমিকের মেজাজ এমনভাবে চড়ে যাবে। জগদ্দলে আগুন জ্বলছে। শ্রমিকদের রোখা গেল না। 'মাষ্টারজী হঠ যাও'—বলে তারা অকল্যান্ড মিলে ঢুকল। সব তাঁত ছুঁড়ে গঙ্গায় ফেলে দিল। তারপর সাহেবদের ধরে পিটল। অবশেষে শ্রান্ত অবসাদগ্রস্ত শ্রমিক ফিরে গেল। সেদিন যদি গুলি চলত—তাহলে কী সাঙ্ঘাতিক কান্ড হত। জগদ্দলের পার্টি সংগঠক সত্য মাস্টারের আফশোস—লাল ঝান্ডার কর্মী লছমন পর্যন্ত আমার কথা শুনল না।' সমরেশের মনে প্রশ্ন—এরা যদি সত্যি খেপে ওঠে এবং সঠিক নেতৃত্ব থাকে—তাহলে!

এই প্রশ্নের মুখোমুখি অবশেষে পার্টি নেতাদেরও হতে হয়েছিল। কিছুটা বিলম্বে হলেও নেতৃত্বের একাংশের মনে পরিবর্তিত পরিস্থিতির ছায়াপাত ঘটে। তারই পরিণতি--১৬ই ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত 'স্বাধীনতা'র পাতায় 'প্রস্তুত হও' রচনাটি। রচয়িতা সোমনাথ লাহিড়ী।

প্রস্তুত হও

'কলকাতার জনসাধারণের বীরত্বপূর্ণ লড়াই সাময়িকভাবে স্তব্ধ হয়েছে। নিহত আহত ভাই-বোনদের জন্যে শহরের ঘরে ঘরে শোকের ছায়া, কিন্তু সে ছায়ার মধ্যে পরাজয়ের বেদনা নেই। দুর্দম সাহস আর কঠোর প্রতিজ্ঞায় প্রত্যেক শহরবাসীই উদ্বুদ্ধ ও সকলেই নিশ্চিন্ত সঙ্কল্প করে নিয়েছেন যে লড়াইয়ের দ্বিতীয় পর্ব শীঘ্রই আরম্ভ হবে। শহরতলীর শ্রমিক ভাইয়েরা এখনও লড়ছেন, সেখানেও হয়তো কয়েকদিনের ভেতর স্তব্ধতা নেমে আসবে, কিন্তু সেখানেও সে স্তব্ধতা হবে দ্বিতীয় ঝড়ের পূর্ব লক্ষণ।

দ্বিতীয় লড়াই শুরু হওয়ার আগে দেশের প্রত্যেককে যাচাই করে নিতে হবে যে, প্রথম লড়াইয়ে আমাদের কোন ত্রুটি ছিল কিনা এবং ভবিষ্যতে কিভাবে চললে দ্বিতীয় লড়াইয়ে আমরা সফল হতে পারব। কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে প্রথম দিনে আমরাও কিছুটা ভুল করেছিলাম। সে ভুল পরিষ্কার করে খুলে ধরলে অন্য সকলেরও নিজ ভুল বুঝতে সুবিধে হবে।

ছাত্রদের উপর লাঠি চলার পর আমাদের হরতাল ও ধর্ম্মঘটের প্রস্তাব কংগ্রেস ও লীগ নেতারা অস্বীকার করলেন, আমরাও প্রথম দিন তাঁদের কথা মানলাম। কিন্তু তদের সে বারণ আমাদের শোনা উচিত হয়নি—বোঝা উচিত ছিল যে, সমস্ত জনসাধারণ যেখানে অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে উন্মুখ, সেখানে আমাদের তথা শ্রমিকশ্রেণীরই কর্তব্য হল সঙ্ঘবদ্ধ ধর্ম্মঘট করে জনসাধারণকে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিবাদের পথ দেখানো। নেতারা দূরে থাকলেও, জনসাধারণের অধীর আগ্রহে তাঁরা হস্তক্ষেপ করতে পারতেন না। অথচ জনসাধারণকেও অসংগঠিত উত্তেজনায় গা ভাসিয়ে দিয়ে অযথা রক্ত ব্যয় করতে হত না।

বিভিন্ন শ্রেণীর জনসাধারণ, দল ও নেতাকে একত্র আন্দোলনে যুক্ত করার উদ্যোগ আমরা নিয়েছিলাম এবং খানিকটা সফল হয়েছিলাম বলেই এবারে প্রথম দিনই ডালহৌসী স্কোয়ারের পথ অত সহজে উন্মুক্ত হল। কিন্তু ডালহৌসী থেকে ফেরার পর দু'এক জায়গায় দু'একজন নিরীহ সাহেব-মেমের ওপর উৎপাত দেখে আমরা ভুল ভেবেছিলাম যে, গুপ্তচর বা গুণ্ডারাই বোধহয় লোককে উস্কাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু পরদিন (বুধবার) সকালেই আমাদের ভুল সংশোধিত হল। কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের আহ্বান জানিয়ে আমরা লিখলাম, 'সাধারণ মানুষের সংগ্রাম পদ্ধতিতে ভ্রান্তি থাকিতে পারে, বিশৃঙ্খলা থাকিতে পারে। কিন্তু দেশভক্তির অতুল প্রেরণা আর অত্যাচারী-দের প্রতি জ্বলন্ত ঘৃণাই যে তাঁহাদিগকে মরিবার কঠিন প্রতিজ্ঞায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছে সে কথা কে অস্বীকার করিবে?' সেই জন্যেই আমরা তাঁদের কাছে আবেদন করি যে জনসাধারণের এই সংগ্রামের দায়িত্ব তাঁরা যুক্তভাবে নিন, একে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধের পথে পরিচালিত করুন। কিন্তু নেতারা সে আহ্বানে সাড়া দেননি।

নেতারা সাড়া দিন বা না দিন, সকল সাধারণ মানুষের জ্বলন্ত বিক্ষোভ আর অতুল ভ্রাতৃভাব এমনই বিরাট প্রেরণা জাগিয়েছে যে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের বন্যা সমস্ত বাধাকে ভাসিয়ে দিয়ে গেছে, লোকে কাতারে কাতারে গুলির সামনে বীরের মৃত্যুবরণ করেছে। কিন্তু সে ঐক্য, সে বীরত্ব, সে মৃত্যু সবই ব্যর্থ হবে—যদি আমরা প্রথম লড়াইয়ের সমস্ত ভুল-ত্রুটি নির্মম-ভাবে সংশোধন না করি, দ্বিতীয় লড়াইয়ের জন্যে সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রস্তুত না হই।

ভুল কোথায়? মৃত ভাইদের মুখ স্মরণ করে আকুল আগ্রহে অনেকে ভেবেছেন, আমাদের হাতে অস্ত্র ছিল না বলে এবার আমরা হারলাম, সামনের বারে সে ত্রুটি আমরা সংশোধন করব, তখন আমাদের ঠেকায় কে? কিন্তু আসল ত্রুটি সেখানে নয়।

অত্যাচারের বিরুদ্ধে উত্তেজনা ও ঘৃণার প্রখর উচ্ছ্বাসে সাধারণ মানুষের নীচের তলা থেকে আপনা-আপনি একতার জোয়ার উঠেছে। চট্টগ্রামের কসাইপাড়ায় সৈন্যদের অত্যাচারের প্রতিবাদেও ঠিক এমনই জোয়ার উঠেছিল।

কিন্তু তারপর ওপর থেকে দমন নীতির চাপ এসেছে, স্বার্থের সংঘাত বেধেছে, সে ঐক্য আজ নেই বললেই হয়। এখানেও এই ঐক্যের ওপর এখনই আঘাত আসছে, ক্রমে ক্রমে সে আঘাত বাড়তেই থাকবে। নেতাদের আমরা এক করতে পারিনি—এমন কি কাল সুহরাবর্দ্দি সাহেব যখন সকল দলের নেতাদের ডাকলেন তখন কংগ্রেস নেতারা সে বৈঠকে উপস্থিত হলেন না। 'আজাদ' পত্রিকা এখনই ইঙ্গিত করতে আরম্ভ করেছে যে এই আন্দোলনকে হিন্দুরা অপব্যবহার করছেন। নির্ব্বাচনের দলাদলি প্রচারে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত্ত ঐক্য আরও ঘা খেতে থাকবে, আর লীগ বা কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব কায়েম হলে ভেদ সৃষ্টি চরমে উঠবে। অথচ এই ঐক্য কায়েম রাখাই প্রথম কাজ, সর্ব্বপ্রধান কাজ, বোমা-বন্দুক তার কাছে কিছুই নয়। এই ঐক্যকে আরও বাড়ানোর এবং একে আরও সুদৃঢ় করার কাজ ছেড়ে যিনি বোমা-বন্দুকের পেছনে দৌড়বেন বা তার গল্প শোনাবেন, তিনি গোটা লড়াইটারই সর্ব্বনাশ করবেন।

রক্তাক্ত মৃত্যুর বিভীষিকার মধ্যে প্রত্যেক মহল্লার হিন্দু-মুসলমান দল-বেদলের মানুষ এক হয়েছেন। এখন তাঁদের নিয়ে যুক্ত কমিটি গঠন করতে হবে, যে কোন বিষয়েই সকলের স্বার্থ তাই নিয়ে এই কমিটিকে সারা মহল্লায় তীব্র আন্দোলন চালাতে হবে। যারা মারা গেল তাদের আত্মীয় স্বজনদের সাহায্যের জন্য এবং যারা গ্রেপ্তার হয়েছে তাদের কেস চালানোর জন্য যে যুক্ত কমিটি গঠিত হয়েছে তার চাঁদা তোলা ও সাহায্য দেওয়ার মত সামান্য কাজ দিয়েই এই মহল্লা কমিটি কাজ সুরু করতে পারে। কিন্তু এর প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত দ্বিতীয় লড়াইয়ের জন্য সকলকে তৈরী করা, প্রথম লড়াইয়ের ত্রুটি সবাইকে বুঝিয়ে দেওয়া, যার যা মনে এল সেইভাবে না লড়ে সংঘবদ্ধ-ভাবে সার্ব্বজনীন ধর্ম্মঘট ও হরতালের পথে যাতে লড়াই শুরু হতে পারে তার আয়োজন করা। এই কমিটিগুলি বোমা-বন্দুকের গুপ্ত চক্র নয়—কমিটি-গুলি হবে মহল্লার সমস্ত লোকের সব কাজে অগ্রণী, তাঁদের সব লড়াইয়ের নেতা। শ্রমিকরা, বস্তিবাসীরা, ছাত্ররা—সবাইকে এর সঙ্গে ভলাণ্টিয়ার দল গঠন করতে হবে—যাতে হরতাল বা ধর্ম্মঘট হলে তাকে সুশৃঙ্খলভাবে চালানো যায়, হারের আশঙ্কা দেখলে পিছু হঠা যায়, আবার আক্রমণে আগানো যায়।

উপযুক্ত সময়ে লড়াই আরম্ভ করার আন্দোলন সৃষ্টি করাও এই কমিটি-গুলির কাজ। নীচের তলায় সকল মতের লোক মিলে যে দাবী নিয়ে লড়বেন, যে লড়াই আরম্ভ করবেন, তাতে কোন দলের নেতাই বাধা দিতে পারবেন না—বরং কমিটিগুলির তেমন জোর থাকলে তাঁরাও এর মধ্যে এসে যাবেন। কমিটি গঠন ও তার কাজের মধ্যে এইটাই প্রধান কথা। কারণ দলাদলি হচ্ছে দ্বিতীয় লড়াইয়ের সবচেয়ে বড় শত্রু। কেউ যদি দলাদলির জন্যে এতে যোগ দিতে না চান, তাহলে তিনি লড়াই চান না।

বিক্ষোভের উত্তেজনায় যাঁর রক্ত টগবগ করে ফুটছে, তিনি হয়তো

ভাববেন—যুক্ত কমিটির এই শুকনো কর্মতালিকায় কি হবে, আমি লড়াই করতে চাই। আমি বলব, তিনি লড়াই করে মরতে চান, কিন্তু আমরা লড়াই করে জিততে চাই। তার জন্যে এছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

হতাশ হয়ে তিনি ভাববেন, এইসব করতে করতে সব তো ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, তাঁকে আমরা বলি আজকের দারুণ যন্ত্রণা ও মৃত্যুভয়হীন বিপ্লবী পরিস্থিতিতে দুদিন অন্তর অসন্তোষের স্ফুলিঙ্গ জ্বলে জ্বলে উঠবে। মুহূর্তে মুহূর্তে অত্যাচারীর সঙ্গে বিরোধ বাধবে। দেশের মধ্যে দুর্ভিক্ষের আগুন আসছে, ব্যাপক ছাঁটাইয়ের আগুন আসছে। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন মহল থেকে বিভিন্ন শ্রেণী অগ্রসর হচ্ছে শত্রুকে আক্রমণ করতে। রেলওয়ে, ডাক ও অন্যান্য ধর্ম্মঘটের জোয়ার আসছে। কৃষকরা আবার মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াচ্ছে। শাসনযন্ত্র আজ ডাণ্ডা ছাড়া আর কোনো পথ দেখতে পাচ্ছে না। যে কোনো আগুনের ফুলকি যে কোনোদিন দাবানল হয়ে জ্বলে উঠতে পারে। সাধারণ মানুষের ঐক্য যদি সংগঠিত হয়ে তৈরী থাকে তবে সেই দাবানলে অত্যাচারীকেই আমরা পুড়িয়ে শেষ করতে পারব। আর সংগঠিত না হয়ে যত বীরের মতই লড়ি, সেই আগুনে আমাদের সংগ্রামই পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।' (স্বাধীনতা, ১৬.২.৪৬)

এই রচনার পটভূমি প্রসঙ্গে সোমনাথ লাহিড়ী বলেন, ''স্বাধীনতা' পত্রিকা প্রকাশের দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনে আমি যে সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি লিখি তার মর্মবস্তুর সঙ্গে তৎকালীন পার্টি লাইনের পার্থক্য রয়েছে। আমি লিখেছিলুম, এখন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লড়াই আর কংগ্রেসের নেতৃত্বে চলতে পারে না—কংগ্রেস আর লড়বে না। লড়াইয়ের নেতৃত্বভার আমাদের নিতে হবে। ১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬-এর 'প্রস্তুত হও' রচনাটি তারই জের। পাঁচদিন লড়াই চলার পর আমরা কিছুই তো 'গেন' (লাভ) করলাম না। কমরেডদের হতাশা কাটানোর জন্যে ওটা লেখার দরকার ছিল। বিপ্লবী পরিস্থিতি—সুতরাং একটা 'পার্সপেক্টিভ' (পরিপ্রেক্ষিত) তো দেওয়া দরকার।'

তাঁকে প্রশ্ন করা হয়: আপনার লেখায় কি গোটা পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে?

—'না, ওটা আমার 'আন্ডারস্টান্ডিং' (বোধ), যদিও অনেক কমরেড লেখাটা অ্যাপ্রিসিয়েট' (তারিফ) করেছেন; কারণ, তাঁরাও এভাবে 'ফীল' (অনুভব) করেছিলেন। মনে রাখা দরকার রশীদ আলি ডে-র একটা 'লিমিটেশন' (সীমা) ছিল—একটা 'কমিউনাল' (সাম্প্রদায়িক) দিক ছিল। যেহেতু লীগ সমর্থন করেছে—এই আন্দোলনে সাধারণ বস্তিবাসী মুসলমান তাই দলে দলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। গোটা বস্তিই 'ইনভলভড্' (যুক্ত) হয়ে পড়ে। কংগ্রেস 'নিউট্রাল' (নিরপেক্ষ) তাই ভদ্রলোকেরা বেশি 'পার্টিসিপেট' করেনি (যোগ দেয়নি), যারা অংশ নিয়েছিল ইতিপূর্বে তারা আন্দোলনে আসেনি। লীগ চুপ করে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারাও চলে যায়।'

কলকাতার মানুষ আবার ঘরে ফিরে যায়। দিন কাটে তার আর এক বিস্ফোরণের প্রতীক্ষায়। আর রক্তস্নাত কলকাতার অবশ্যম্ভাবী প্রভাব গিয়ে পড়ে বাংলার প্রতিটি জেলায়—গ্রামে গঞ্জে।

দশ

রক্তঝরা কলকাতার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে গোটা বাংলাদেশ। কলকাতাবাসীর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের অভিঘাতে জেলা শহর শুধু নয়, সুদূর গ্রাম গঞ্জও উত্তেজনায় থরথর। ১৬ই ফেব্রুয়ারি ও ১৭ই ফেব্রুয়ারি, 'স্বাধীনতা'য় পরিবেশিত সংবাদের সংক্ষেপিত বর্ণনা থেকে ফুটে ওঠে প্রতিবাদে-মুখর সংগ্রামের আবেগে উত্তাল এক জনপদের ছবি। সমস্ত জেলা থেকেই ছাত্র ধর্মঘটের খবর এসেছে। কলকাতার ছাত্রদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে রংপুর, ঢাকা, ডায়মণ্ডহারবার, হরিনাভি, খুলনা, চট্টগ্রাম, কাটোয়া, বনগ্রাম, কার্সিয়াং, জলপাইগুড়ি, টাঙ্গাইল, জয়নগর-মজিলপুর, নওগাঁ, বীরভূম, সিরাজগঞ্জ, নাটোর—গোটা বাংলাদেশের ছাত্রসমাজ।

কলকাতার সংগ্রামী মানুষের প্রতি সমর্থন শুধু ছাত্রসমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বিক্ষোভ ও ক্রোধের অভিব্যক্তি ছড়িয়ে পড়েছে আপামর জনসাধারণের মধ্যে। সর্বত্র সভা মিছিল সমাবেশে সার্বজনীন ঐক্যের মঞ্চ গড়ে ওঠে। স্থানীয় কংগ্রেস, লীগ ও কমিউনিস্ট কর্মীদের মিলিত উদ্যোগে জেলায় জেলায় গড়ে ওঠে জমাট ও সোচ্চার প্রতিবাদী আন্দোলন।

১৫ই ফেব্রুয়ারি, 'স্বাধীনতা'র সংবাদসূত্রে জানা যায়: হাওড়ায় ১০ হাজার লোকের বিরাট শোভাযাত্রার মাধ্যমে কংগ্রেস, লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টি মিলিতভাবে কলকাতার হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানায়।

১৩ই ফেব্রুয়ারি, হাওড়ায় শিবপুর লাইব্রেরি হলে কংগ্রেস, লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির এক যুক্ত সভা হয়। সুশীল ব্যানার্জি ও শান্তি দাশগুপ্ত, সমর মুখার্জি এবং আফতাব হোসেন যথাক্রমে কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি এবং মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে সভায় বক্তৃতা করেন। সভার পরে সমস্ত দলের আহ্বানে ১০ হাজার লোকের এক শোভাযাত্রা পথ পরিক্রমা করে। কংগ্রেস নেতা কালোবরণ ঘোষ, কমিউনিস্ট নেতা সমর মুখার্জি এবং লীগ নেতা মহম্মদ ইলিয়াস শোভাযাত্রা পরিচালনা করেন। জনতা আকাশ ফাটিয়ে স্লোগান দেয়: 'সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক', 'ভাই ভাই এক হো', 'লড়কে লেঙ্গে আজাদী', 'আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তি চাই'।

১৫ই ফেব্রুয়ারি 'স্বাধীনতা'য় প্রকাশিত শ্রীহট্টের সংবাদ থেকে জানা যায়।

"হিন্দু এবং মুসলমানের সমস্ত দোকানপাট বন্ধ, সিনেমা হাউস খোলে নাই।

দিনমজুর এবং রিক্সাচালকেরাও ধর্মঘটে যোগ দিয়াছেন। স্কুল-কলেজ হইতে কয়েক হাজার ছাত্র বাহির হইয়া আসেন। বিরাট শোভাযাত্রা চলিয়াছে, কংগ্রেস, লীগ, কমিউনিস্ট এবং জমিয়ৎ ঝাণ্ডা একসঙ্গে পতপত করিয়া উড়িতে থাকে, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ধ্বনিতে আকাশ ফাটিয়া পড়ে। এতবড় হরতাল বহু বৎসর শ্রীহট্টে কেহ দেখে নাই।'

'কলিকাতা হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে আজ হইতে মিলনের জয়যাত্রা শুরু হল'—শিরোনামা সহ, ১৬ই ফেব্রুয়ারি 'স্বাধীনতা'র পাতায় বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিবাদ আন্দোলনের খবর পরিবেশিত হয়। এই তার সংক্ষেপিত বিবরণ :

১. যশোহরে কংগ্রেস, লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে মিলিত প্রতিবাদ-সভা অনুষ্ঠিত হয়।

২. রংপুরের ছাত্ররা প্রতিবাদ ধর্মঘটে সামিল হয়।

৩. ঢাকায় কংগ্রেস, লীগ ও কমিউনিস্ট এবং ছাত্র-পতাকা হাতে পাঁচশ ছাত্রের মিছিল শহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে।

৪. 'স্বাধীনতা'র নিজস্ব সংবাদদাতা আরামবাগ থেকে জানাচ্ছে : ১৪ই ফেব্রুয়ারি জাঙ্গীপাড়া হাইস্কুল ও আতপুর হাইস্কুলের ছাত্ররা আশে-পাশের সমস্ত গ্রামগুলিতে শোভাযাত্রা করে প্রতিবাদ জানায়।

৫. ডায়মন্ডহারবারে যুক্ত শোভাযাত্রা বার হয় এবং বাস বন্ধ হয়ে যায়।

৬. হরিনাভিতে স্কুলের ছাত্ররা হরতাল পালন করে।

৭. খুলনা শহরে মিউনিসিপ্যাল হলে ১২ই ফেব্রুয়ারি বিকেলে ছাত্রদের মিলিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৩ই ফেব্রুয়ারি বিকেলে ৬টায় গান্ধী পার্কে কংগ্রেস লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির মিলিত উদ্যোগে পাঁচ সহস্রাধিক নর-নারীর এক সভায়, কলকাতায় গুলি চালনার তীব্র প্রতিবাদ জানান হয়। ১৪ই ফেব্রুয়ারি শহরে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। ঐদিন পনের হাজার লোকের এক সভা হয় ও দেড়হাজার লোকের শোভাযাত্রা পথ পরিক্রমা করে।

উদ্দীপিত খবর আসে ময়মনসিংহ থেকে। 'সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমরা সবাই একজোট'—শিরোনামা সহ, ১৭ই ফেব্রুয়ারি 'স্বাধীনতা'র পাতায় ময়মনসিংহে ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ আন্দোলনের অপূর্ব উৎসাহ-উদ্দীপনার খবর পরিবেশিত হয়। সংবাদদাতা জানাচ্ছেন

'ময়মনসিংহ (১৪ই ফেব্রুয়ারী), কংগ্রেস, লীগ, কমিউনিস্ট পার্টির তিন ঝাণ্ডা লইয়া শোভাযাত্রা চলিয়াছে। এক বৃদ্ধ মৌলভী সাহেব ছাত্রকর্মীদের ডাকিয়া বলিলেন, "বাবা, এই যে সব ঝাণ্ডা একত্রে তুলিয়াছ, ইহা আর নামাইও না। এই দৃশ্য দেখিয়া আমি সারারাত ঘুমাই নাই। এও কি সত্য?'

কলিকাতায় মিলিটারীর নৃশংস অত্যাচার ও বিভিন্ন দলের জনতার মিলিত লড়াইয়ের খবর পৌঁছামাত্র ময়মনসিংহের শহরগুলিতে দারুণ

উত্তেজনা দেখা দেয়। ১৪ই ফেব্রুয়ারি ময়মনসিংহ শহরে সমস্ত হিন্দু-মুসলমান দোকানদার যে রকমভাবে ধর্মঘট করে তাহা এই শহরের ইতিহাসে কখনও হয় নাই। ঐদিন সকালে সমস্ত ছাত্র প্রতিষ্ঠানের এক মিলিত শোভাযাত্রা বাহির হয়। সকালে বিপিন পার্কে, সমস্ত ছাত্র প্রতিষ্ঠানের আহ্বানে অনুষ্ঠিত ১২ হাজার স্ত্রীপুরুষের সভায় বিভিন্ন বক্তা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন।'

জামালপুর, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা প্রভৃতি কেন্দ্রেও হরতাল পালিত হয় এবং মিলিত সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদদাতা আরও জানাচ্ছেন:

'ছাত্র ও জনসাধারণের মধ্যে দারুণ উৎসাহ দেখা দিলেও কংগ্রেস ও লীগের নেতারা কোন নির্দেশ দিতেছেন না। এমনকি কয়েকস্থানে সাধারণ কর্মীরা নেতাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও মিলিত আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। বিপিন পার্কের মিলিত ছাত্রসভায় ছাত্র ফেডারেশনের পক্ষে রমেন ব্যানার্জী বলেন—"কেসী সাহেবের জ্বালা আগুনে আমাদের ভ্রাতৃবিদ্বেষ ছাই হইয়া যাক। আজ হিন্দু ভাই চাহিয়া দেখুন মুসলমানকে যাহা মনে করিয়াছিলেন তাহারা সেরূপ নয়। কংগ্রেসী ভাই চাহিয়া দেখুন লাল ঝাণ্ডা বিশ্বাস-ঘাতকের ঝাণ্ডা কিনা। তবেই মিলিটারী ঔদ্ধত্যের শেষ জবাব দেওয়া যাইবে"।'

১৭ই ফেব্রুয়ারি 'স্বাধীনতা'র সংবাদসূত্রে জানা যায় বাংলার সর্বত্র গণবিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে।

১. চট্টগ্রাম: ১৪ই ফেব্রুয়ারি, কমিউনিস্ট ও মুসলিম লীগের উদ্যোগে শহরে এক হাজার লোকের এক বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেস এই সভায় অনুপস্থিত থাকে।

২. খুলনার ফুলতলায় গ্রামীণ কৃষি মজুরেরাও ১৫ই ফেব্রুয়ারি কাজ বন্ধ রাখে।

৩. কাটোয়ায়, ১৩ই ফেব্রুয়ারি সমস্ত দোকানপাট বন্ধ রাখা হয়। স্কুলের ছাত্ররা ধর্মঘট করে এবং একটি শোভাযাত্রা পথ পরিক্রমা করে।

৪. ১৩ই ফেব্রুয়ারি, নড়াইলের তিনশ ছাত্র ও যুবক পুলিশের বাধা অগ্রাহ্য করে শোভাযাত্রা বার করে।

৫. ১৩ই ফেব্রুয়ারি বনগ্রামে কংগ্রেস, লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির আহ্বানে হরতাল পালিত হয়। ছাত্র এবং সাধারণ মানুষের মিলিত শোভা-যাত্রা তিন পতাকা নিয়ে শহর প্রদক্ষিণ করে ও বিকালে টাউন হলে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

৬. বেশ সাড়া জাগানো খবর আসে রংপুর থেকে। 'স্বাধীনতা'র নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন:

'রংপুর, ১৫ই ফেব্রুয়ারী, "হিন্দু-মুসলমানের একতার দড়ি দিয়া আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামের রথকে সাম্রাজ্যবাদের শবদেহের উপর দিয়া টানিয়া লইয়া যাইব।" এই কথাগুলি, রংপুর পাবলিক লাইব্রেরী প্রাঙ্গণে কলিকাতায় গুলি চালনার প্রতিবাদে সম্মিলিত পাঁচ হাজার লোকের সভায় কুড়িগ্রামের প্রবীণ কংগ্রেস নেতা আবেগের সঙ্গে বলেন।'

সংবাদদাতা আরও জানাচ্ছেন :

'প্রায় স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ১৩ই ফেব্রুয়ারী রংপুরে পূর্ণ হরতাল সুরু হইল। শহরের বয়স্ক লোকেরা বলিলেন, "গত কুড়ি সালের আন্দোলনের পরে রংপুরে এরকম হরতাল আমরা আর দেখিনি।" রিক্সা, ঘোড়ার গাড়ী, ছোট-বড় সমস্ত দোকান হরতালে যোগ দিয়েছে। ঐদিন বিকালে কংগ্রেস, লীগ, কমিউনিস্ট, ছাত্র ও মধ্যবিত্ত সহ সর্ব্বসাধারণের এক বিরাট শোভাযাত্রা অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত শহরের পথে পথে আকুল উদ্দীপনায় ঘুরিল।'

৭. ১৫ই ফেব্রুয়ারি, কার্সিয়াং-এ পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। বিভিন্ন জনসভায় গুর্খা নেতারা আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ব্যাপারে গুর্খা সৈন্য ব্যবহারের তীব্র নিন্দা করেন।

এগারো

কলকাতার আগুন নিভে গেল। বাংলাদেশ ব্যাপী প্রতিবাদ আন্দোলনও আপাতত স্তিমিত। তরঙ্গ উঠে আবার মিলিয়ে গেল। কিন্তু বন্যার জল সরে গেলেও থেকে যায় পলিমাটি। যে-ঐক্যের বন্যায় গত সাতদিন গোটা বাংলাদেশ প্লাবিত হয়—তার স্মৃতির রেশ অফুরান। সোমনাথ লাহিড়ীর ভাষায়, 'অত্যাচারের বিরুদ্ধে উত্তেজনা ও ঘৃণার প্রখর উচ্ছ্বাসে সাধারণ মানুষের নীচের তলা থেকে আপনা-আপনি একতার জোয়ার উঠেছে।'

কিন্তু ঐক্য কায়েম রাখার পথে মূল প্রতিবন্ধক একদিকে হিন্দু-মুসলমান অনৈক্য ও অপরদিকে জাতীয়তাবাদী মহলে দৃঢ়মূল কমিউনিস্ট-বিদ্বেষ। ১৯৪২ সালের ভারত ছাড় আন্দোলনে মুসলমানদের ভূমিকা ও অংশগ্রহণ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। সেদিন হিন্দু দেশপ্রেমিকের মনে সংশয়ের খোঁচা—তবে কি মুসলমানরা চায় না ইংরেজ এদেশ ছেড়ে চলে যাক! কলকাতার আরক্ত কাহিনী অন্তত মুসলমানের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভূমিকা নিয়ে সংশয় হিন্দুর মন থেকে অনেকটা মুছে দিয়েছে।

তেমনি মিছিলে মিছিলে কংগ্রেস-লীগ পতাকার পাশে লাল পতাকার অবস্থানে কংগ্রেসীদের একটা অংশের মধ্যেও অন্ধ কমিউনিস্ট-বিদ্বেষের প্রবলতা স্তিমিত হতে বাধ্য। অনেক রক্তের বিনিময়ে নীচের তলার মানুষ

অন্তত অনুভব করেছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শেষ আঘাত হানার জন্যে তিন ঝাণ্ডার ঐক্য অপরিহার্য।

১৮ই ফেব্রুয়ারি 'স্বাধীনতা'র পাতায় প্রকাশিত হয় কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে সোমনাথ লাহিড়ীর এক বিবৃতি এবং তারই সঙ্গে সূচিত হয় সারা বাংলা ব্যাপী এক অসামান্য সংগ্রামী অধ্যায়ের অবসান। বিবৃতিটির একাংশ :

'...জনসাধারণের আশু দাবী পূরণের জন্য এখনই যদি সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন আরম্ভ না হয় তবে, যে কোন মুহূর্তে সামান্য প্ররোচনাতেই গণ-বিক্ষোভের আগুন জ্বলিয়া উঠিতে পারে—আবার তাহাদের উপর গুলি চলিতে পারে। এজন্য মিলিটারী কর্তৃত্ব অপসারণ, ধৃত ব্যক্তিদের মুক্তি ও হতাহত বা তাহাদের উপরে নির্ভরশীল আত্মীয়-স্বজনের ক্ষতিপূরণের জন্য আমরা একত্রে শান্তিপূর্ণ অথচ প্রবল প্রতিরোধ আন্দোলন চালাইতে কংগ্রেস, লীগ ও অন্যান্য দলের নেতাদের আহ্বান জানাইতেছি।'

বারো

রক্তস্নাত কলকাতার বুক থেকে রক্তের দাগ মিলিয়ে যাবার আগেই আবার বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল। এবার ঘটনাস্থল বোম্বাই ও করাচী। বোম্বাইয়ের রাজপথে ধর্মঘটী নৌ-সেনারা বিদ্রোহের ঝাণ্ডা হাতে মিছিলে বেরিয়েছে। কলকাতার মতোই কংগ্রেস, লীগ ও কমিউনিস্ট পতাকা নিয়ে এই মিছিল। সেদিনটা ছিল ১৯শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬।

দৃশ্যপটের কী আমূল পরিবর্তন! মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে—গুলির জবাবে গুলি—কামানের বিরুদ্ধে কামান গর্জে উঠেছে। নৌ-সেনাদের অবাধ্যতা ব্রিটিশ ফৌজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে রূপান্তরিত। আরব সাগরের উপকূলে জন্ম নিচ্ছে এক নতুন ইতিহাস। নৌ-সেনারা আজ একা নয়। ধর্মঘটী নৌ-সেনার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে বোম্বাইয়ের লক্ষ লক্ষ ধর্মঘটী মজুর। নৌসেনাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শহরের রাস্তায় রাস্তায় গুলি-গোলার তোয়াক্কা না করে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বোম্বাইয়ের বীর শ্রমিক। সোমনাথ লাহিড়ীর ভাষায়, 'ভারতের ইতিহাসে ইহা অপূর্ব। পরাধীনতার শৃঙ্খল চুরমার করিবার জন্য ভারতবাসী আর এক মুহূর্তও দেরী করিতে প্রস্তুত নয়। স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহের রেখায় রেখায় সেই অগ্নিবাণী আজ সবার চোখের সামনে জ্বলন্ত। ভারতের ইতিহাস বিপ্লবের অগ্নিময় পথে পা বাড়াইয়া দিয়াছে।' (রক্তের ডাক, স্বাধীনতা, ২২. ২. ৪৬)

তারপর কয়েকদিন ধরে আগুনের ফুলকি বৃষ্টি সংবাদপত্রের শিরোনামায় :

বোম্বাইয়ে ভারতীয় নৌ-বাহিনীর সহস্র সহস্র লোকের ধর্মঘট
বন্দর, জাহাজ ও বেতার কেন্দ্রে ধর্মঘটের দ্রুত বিস্তার
শহরের রাজপথে কংগ্রেস, লীগ ও কমিউনিস্ট পতাকা সহ বিক্ষোভ।

(স্বাধীনতা, ২০. ২. ৪৬)

. ...

বোম্বাই ও করাচীতে বৃটিশ সৈন্যের সহিত ভারতীয় নৌবাহিনীর
সশস্ত্র সংগ্রাম

নৌ-বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রেরিত সৈন্যদলের বিদ্রোহ
বিশটি জাহাজ ধর্ম্মঘটীদের হাতে

কুড়ি হাজার ডক শ্রমিকের ধর্ম্মঘট ! সাধারণ ধর্ম্মঘটের আহ্বান

(স্বাধীনতা, ২২. ২. ৪৬)

... ...

নৌ-বাহিনীর সমর্থনে বোম্বাইয়ের লক্ষ মজুর ধর্ম্মঘট
শহরে মিলিটারী রাজত্ব

২০ জন নিহত- ২৫০ জন আহত

(স্বাধীনতা, ২৩. ২. ৪৬)

বোম্বাইয়ের বিদ্রোহের বার্তা আগুনের হলকার মতো সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। স্বাধীনতা সংগ্রামের সমস্ত বৈপ্লবিক সম্ভাবনার মূর্তরূপ আজ বোম্বাই। অবাধ্য নৌ-সেনার পাশে বোম্বাইয়ের ধর্মঘটী মজুর; নৌ-সেনাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যদের গুলি বর্ষণে অস্বীকৃতি; ব্রিটিশ পল্টনের বিরুদ্ধে বোম্বাইয়ের রাস্তায় মজুরদের ব্যারিকেড লড়াই এবং বোম্বাইয়ের ঘটনাবলির করাচীতে পুনরাবৃত্তি—একটার পর একটা দৃশ্য উন্মোচিত করে স্বাধীনতাকামী মানুষের দৃষ্টিপটে এক নতুন দিগন্ত। বিদ্যুৎপ্রবাহী ঘটনাগুলির প্রেক্ষাপটে অনিবার্য হয়ে পড়ে সমগ্র রাজনৈতিক পরিস্থিতির নব মূল্যায়ন। অপরিসীম তাৎপর্যবাহী বোম্বাইয়ের ঘটনাবলির পর্যালোচনা প্রসঙ্গে গঙ্গাধর অধিকারীর মন্তব্য :

'বাচাল রাজনৈতিক নেতারা এই ঘটনাকে 'রাজকীয় নৌ-বাহিনী'র ঘটনা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান। সাম্রাজ্যবাদের রক্তচক্ষু বড় সাহেবরা ইহাকে 'বিদ্রোহ' ও 'নিয়মানুবর্ত্তিতার অভাব' বলিয়া ধমকায়। কিন্তু ভবিষ্যতে স্বাধীন ভারতের ঐতিহাসিক ইহাকে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের গৌরবময় শেষ অধ্যায় বলিয়া অভিহিত করিবেন।'

(স্বাধীনতা, ৮. ৩. ৪৬)

স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়ের যাঁরা নায়ক এবং বোম্বাই ও করাচীর এই অবিস্মরণীয় দিনগুলি যাঁরা উপহার দিয়েছেন এবার তাঁদের প্রসঙ্গে আসা যাক। বোম্বাইয়ের উপকূলে জাহাজে এবং তীরে নৌ-সেনার সংখ্যা বিশ হাজার। তাদের মধ্যে রয়েছেন পাঞ্জাবি, বাঙালি, দক্ষিণ ভারতীয়—হিন্দু ও মুসলমান। তাঁদের অনেকেই নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান—সোজা স্কুল-কলেজ থেকে নৌ-সেনাবাহিনীতে নাম লিখিয়েছেন। তাঁদের দুঃসাহস ও নৈপুণ্যে গড়ে উঠেছে ভারতীয় নৌ-বাহিনী। তাঁদের অনেকেই জার্মানি ও জাপানের বিরুদ্ধে সমুদ্র-যুদ্ধের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। ভারতবাসী বলে গর্বিত ও আত্মমর্যাদা-সম্পন্ন যুবকরা এতদিন ধরে ভারতীয় নৌ-বাহিনীর বড় সাহেব গডফ্রে ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের কাছ থেকে কুৎসিত ব্যবহার পেয়ে আসছেন। 'শুয়োরের বাচ্চা', 'কুলির বাচ্চা', 'কালা বেজন্মা' ব'লে ভারতীয় নৌ-সেনাদের গালাগাল দেওয়াটা ব্রিটিশ অফিসারদের রেওয়াজ। খারাপ খাদ্য, যাতায়াতের প্রচুর অসুবিধে, নৌ-বাহিনী থেকে ছাড়া পাওয়ার অনিশ্চয়তা এবং ছাড়া পেলে বে-সামরিক জীবনে আদৌ কোন কাজ জুটবে কিনা—এ জাতীয় ভাবনায় প্রতিটি নৌ-সেনার মন ভারাক্রান্ত।

একদিন সকালে 'তলোয়ার' জাহাজের সংবাদ আদান-প্রদান প্রশিক্ষণ স্কুলের কয়েকজন শিক্ষার্থী অফিসারদের কাছে অভিযোগ করেন, আজকাল খাদ্যের বদলে অখাদ্য দেওয়া হচ্ছে। উত্তর আসে, 'ভিখারির আবার পছন্দ।' যাঁরা এই খাবার খাননি—সাজা হিসেবে তাঁদের জন্য অতিরিক্ত খাটুনি বরাদ্দ করা হল। ধৈর্য না হারিয়ে নৌ-সেনারা এই ঘটনা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনলেন। প্রতিবিধান নেই। অপমান চলতেই থাকে। ৮ই ফেব্রুয়ারি ফ্ল্যাগ অফিসারের পরিদর্শন কালে 'তলোয়ার' জাহাজের ভিতরের দেওয়ালে 'জয় হিন্দ' ও 'ভারত ছাড়' স্লোগান লেখা হয়। এই অপরাধে বি. সি. দত্ত ও আর. কে. সিং-কে গ্রেপ্তার করা হয়। বি. সি. দত্তকে পরে ছেড়ে দেওয়া হল. কিন্তু আর্থার রোড জেলে আর. কে. সিং-কে আটক রাখা হয়।

১৮ই ফেব্রুয়ারি নৌ-সেনারা স্থির করেন—অপেক্ষায় কেটেছে অনেক কাল—অতএব ধর্মঘট ছাড়া আর পথ নেই। কিছু নাবিক প্রথমে ধর্মঘট করেন সকাল দশটায়। সেই খবর শুনে আরও অনেকে যোগ দিলেন এবং দুপুরের মধ্যে 'তলোয়ার'-এর সমস্ত ভারতীয় নাবিক ধর্মঘটে যোগ দিলেন। জন্ম নিল এক নতুন ইতিহাস।

নৌ-সেনাদের বিদ্রোহের পটভূমি প্রসঙ্গে বি. সি. দত্ত লিখেছেন :

'জাহাজের সংবাদ আদান-প্রদান বিভাগের অনেকেই কলেজে লেখাপড়া করেছে। তারা নিয়মিত খবরের কাগজ পড়ত। যুদ্ধের সময় তারা বাইরের জগৎকে চিনেছে। তারা এও জানত যে যুদ্ধের শেষে তাদের জীবন ও জীবিকা অনিশ্চিত। অল্প বয়স এবং নৌ-বিভাগের প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতার দৌলতে তারা মহাত্মাজীর চেয়ে সুভাষ বোসকেই বেশি পছন্দ করত। শেষ

পর্যন্ত বাইরের জাতীয়তাবাদী প্লাবনের ঢেউ সেনা ব্যারাকের উঁচু দেওয়াল আর ঠেকিয়ে রাখতে পারল না।

আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানায়কদের বিচারের খবরে স্বাভাবিকভাবেই নৌ-সেনারা চঞ্চল হয়ে উঠল। তারা দেখেছে রাস্তার লোকজন সামরিক উর্দিপরা লোকদের কী ঘৃণার চোখেই না দেখে। তাদের চোখে ১৯৪২ সালের ভারত ছাড় আন্দোলনের সংগ্রামীরা বীর। অথচ আমরা যুদ্ধ জয় করে ফিরেছি। যুদ্ধের পর যখন ঝড়ো কাকের চেহারা নিয়ে বোম্বাইতে ফিরলাম—তখনি নৌ-সেনার উর্দি নিয়ে আমার যাবতীয় অহংকার ধূলিসাৎ হয়ে গেল। কার সাম্রাজ্য আমরা রক্ষা করতে গিয়েছিলুম! আমি যে আসলে আমার দেশের বুকে বিদেশী শাসন অব্যাহত রাখার যন্ত্রাংশ মাত্র। আমার সমস্ত সত্তাকে নিয়ে আমার প্রশ্ন। কার জন্যে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলুম আমি? সেটা কি আমার দেশের জন্যে যুদ্ধ?

স্বাধীন ভারতের সেনাবাহিনীও যে সম্ভব এবং বাস্তব—তার খবরও আমরা পেলাম। মালয় ফেরত সলিল শ্যামের কাছে শুনলাম আজাদ হিন্দ ফৌজের অভিনব কাহিনী। সলিল সে সংক্রান্ত ছবি ও পত্র-পত্রিকা আমাদের দেখাল।' (মিউটিনি অফ দি ইনোসেন্টস, পৃ ৭৩-৭৫)

অতএব—যুদ্ধশেষে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল প্রবাহে মিশে যাবার ব্যাকুলতায় আলোড়িত হয় ভারতীয় নৌ-সেনারা। আজাদ হিন্দ বন্দীদের মুক্তির দাবিতে দেশজোড়া দুর্বার আন্দোলনের অভিঘাতে ধূলিসাৎ হয় সেনা ব্যারাকের প্রাচীর। এক দুর্নিবার আবেগ নৌ-সেনাদের টেনে আনে মুক্ত রাজপথে। ভেঙে খানখান হয়ে যায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের তৈরি ফৌজি শৃংখলার নামে বাধা-নিষেধের বেড়ি। অবশেষে সেই অদৃষ্টপূর্ব বিস্ফোরণ—নৌ-সেনা বিদ্রোহ ও তাদের সমর্থনে বোম্বাইয়ের বুকে শ্রমিক অভ্যুত্থান। আগুনের অক্ষরে গাঁথা সেই কাহিনী বর্ণনা করেছেন 'স্বাধীনতা'র নিজস্ব সংবাদদাতা—দিনলিপির মধ্যবর্তিতায়। তিনি লিখছেন:

বোম্বাই, ১৯শে ফেব্রুয়ারি (মঙ্গলবার):

'তলোয়ার' জাহাজের ক্যাডেটদের ধর্মঘট আজ আরো ছড়িয়ে পড়েছে। পোতাশ্রয়ে অবস্থিত রাজকীয় ভারতীয় নৌ-বাহিনীর জাহাজগুলি থেকে উপকূলের সমস্ত ধর্ম্মঘটীদের প্রতি সমর্থনসূচক সঙ্কেত জানান হয়েছে। রাজকীয় নৌ-বাহিনীর ধর্ম্মঘটীদের কয়েকটি দল কংগ্রেস, লীগ, কমিউনিস্ট পতাকা উড়িয়ে লরী করে শহরের বিভিন্ন অঞ্চল পরিক্রমা করেন।

উপকূলে নৌবিভাগের বিভিন্ন কার্যে নিযুক্ত ৫ হাজার নাবিক 'তলোয়ার' জাহাজের ধর্মঘটীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ক্যাসল ব্যারাক, ফোর্ট ব্যারাক, কোলাবার সংবাদগ্রহণ কেন্দ্র ও পোতাশ্রয়ের জাহাজীরা।

ধর্ম্মঘটীদের একাংশ সকাল ৯টায় হকি স্টিক ও অগ্নিনির্বাপক কুঠার

হাতে শোভাযাত্রা করে বোম্বাইয়ের প্রধান যানবাহনকেন্দ্র ফ্লোরা ফাউন্টেন অঞ্চল দখল করেন এবং রাস্তার মাঝখানে লোহার ট্রাম রেখে পথ বন্ধ করেন। ইউনিফর্ম পরা কয়েকজন বৃটিশ সৈন্যকে দেখামাত্র তাড়া করা হয়। একজন পাঞ্জাবী ক্যাডেট দুই হাত মেলে ধরে একজন আহত ব্রিটিশ সৈন্যকে সহ-ধর্ম্মঘটীদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন। শোভাযাত্রা অগ্রসর হবার সঙ্গে সঙ্গে দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে যায়। একদল যুদ্ধসাজে সজ্জিত মিলিটারী-পুলিশ শোভাযাত্রাকে অনুসরণ করে চলেছিল। ফ্লোরা ফাউন্টেনে বিক্ষোভের সময় হর্ণবি রোডে একটি মার্কিন পতাকা টেনে নামিয়ে পোড়ান হয়। বেলা ১১টার সময় শোভাযাত্রীরা 'তলোয়ার' জাহাজের জন্য সংরক্ষিত ব্যারাক স্কোয়ারে সমবেত হন। সেখানে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বোম্বাই, ২০শে ফেব্রুয়ারি (বুধবার) :

এই দিনের প্রধান ঘটনাস্থল চার্চগেট স্টেশন। সকাল সোয়া দশটায় ভাসোয়া ও বোম্বাই শহরতলীর অন্যান্য নৌবিভাগীয় ব্যারাক থেকে শতশত ক্যাডেট লোকাল ট্রেনে চেপে চার্চগেট স্টেশনে এসে হাজির হন। পনের মিনিটের মধ্যে সংখ্যাটা গিয়ে দাঁড়ায় দু'হাজারে। তাঁরা কংগ্রেস পতাকা হাতে ধ্বনি দিতে থাকেন।

ধর্মঘটীদের দাবীর বয়ানে রয়েছে: নৌবাহিনীর ভারতীয় সদস্যদের জন্য আরো সুযোগসুবিধা, আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দীদের বিরুদ্ধে সমস্ত মামলা প্রত্যাহার এবং ইন্দোনেশিয়া থেকে সমস্ত ভারতীয় সৈন্যের অপসারণ।

নৌবিভাগীয় পুলিশেরা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ধর্ম্মঘটী ক্যাডেটদের ব্যারাকে ফিরে যেতে বলছিল। 'তলোয়ার' জাহাজের সম্মুখস্থ গেটে ভারতীয় সেনাদের একটি ইউনিটকে মোতায়েন রাখা হয়েছে।

বোম্বাই, ২১শে ফেব্রুয়ারি (বৃহস্পতিবার) :

বুধবার রাত্রে নৌবাহিনীর ধর্ম্মঘটে এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটে। ক্যাস্‌ল ব্যারাকের ধর্ম্মঘটীদের ঘেরাও করার জন্য যে এক হাজার সৈন্য পাঠানো হয়েছিল, তারা গুলি চালাতে অস্বীকার করে এবং ধর্ম্মঘটীদের দলে যোগ দেয়। তাদের জায়গায় বৃটিশ সৈন্য পাঠানো হয়। বৃহস্পতিবার সকালে ধর্ম্মঘটী নৌসেনাদের একজন পাহারাদার সশস্ত্র সৈন্যদের ব্যূহ ভেদ করতে গিয়ে গুলি-বিদ্ধ হন। তার জবাবে ক্যাস্‌ল ব্যারাকের অবরুদ্ধ নৌসেনারা পাহারাদার সৈন্যদের উপর গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করে। দুপুর বারোটা থেকে সাড়ে বারোটা পর্যন্ত উভয় পক্ষের মধ্যে প্রবল গুলি বিনিময় চলে। নৌবাহিনীর ক্যাডেটরা হাতবোমা ছোঁড়ে। পাল্টা জবাবে বৃটিশ সৈন্যরা মেশিনগান চালাতে থাকে। হতাহতের সংখ্যা অনেক বলে মনে হয়। ক্যাস্‌ল ব্যারাকে ক্যাডেটদের সংখ্যা প্রায় দু'হাজার। তাঁরা অস্ত্রাগার দখল করে প্রচুর গোলা-বারুদ হস্তগত করেছেন। নৌবাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসারদের মতে, ক্যাডেটদের হাতে এখন বেশ কিছুদিন লড়াই করার মতো গুলি বারুদ মজুত রয়েছে।

গুলি বিনিময়ের ফাঁকে ধর্ম্মঘটী নৌসেনারা ২০টি জাহাজের কর্তৃত্ব নিজেদের হাতে নিয়েছেন এবং অফিসারদের নিরস্ত্র করে উপকূলে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের নির্বাচিত ধর্ম্মঘট কমিটির হাতে রয়েছে জাহাজগুলির ভার। 'যমুনা' জাহাজের কম্যাণ্ডিং অফিসারকে তাঁর কেবিনে তালা বন্ধ করে রাখা হয়। অল্পকাল পরেই তীরবর্তী বৃটিশ সৈন্য ও ধর্ম্মঘটী জাহাজগুলির মধ্যে গুলি বিনিময় শুরু হয়। জাহাজঘাটায় ধর্ম্মঘটে অংশ নেয়নি এমন দুটি জাহাজকে ধর্ম্মঘটীরা ঘেরাও করে ফেলে এবং জাহাজ দুটির লোকজনকে তীরে পাঠিয়ে দিয়ে তাদের জায়গায় নতুন ভারতীয় নাবিক নিযুক্ত করা হয়।

ধর্ম্মঘটী নাবিকদের সমর্থনে আজ দুহাজার ভারতীয় বৈমানিকের এক বিরাট ও সুশৃংখল মিছিল রাস্তা পরিক্রমা করে। শোভাযাত্রার উপর পুলিশের লাঠিচার্জ সত্ত্বেও আহতদের সাথে করে শোভাযাত্রীরা এগিয়ে চলে। স্কুল কলেজের ছাত্র ও কুড়ি হাজার ডক শ্রমিক আজ ধর্ম্মঘট করেছে। ধর্ম্মঘটী নাবিকদের কেন্দ্রীয় কমিটি সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছে আবেদন জানিয়েছেন এবং বোম্বাইয়ের জনসাধারণকে হরতাল ও ধর্ম্মঘট করে সমর্থন জানাতে ডাক দিয়েছেন। আগামীকাল তাই শহরের সমস্ত শ্রমিক এবং ছাত্র সাধারণ ধর্ম্মঘট পালন করবে। সমস্ত দোকান বন্ধ থাকবে।

সমস্ত দেশবাসীর প্রতি কমিউনিস্ট পার্টি আবেদন জানিয়েছে: "নৌবাহিনীর অন্তর্গত আমাদের ভাইদের নির্ম্মমভাবে হত্যা করিতে দিবেন না। দমননীতি ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মঘটীদের ন্যায্যদাবী মানিয়া লইতে সরকারকে বাধ্য করুন।"

সন্ধ্যায় অ্যাপোলো বন্দরে লোকের ভিড় জমেছে। আগ্রহ এবং উদ্বেগভরে তারা বন্দরের জাহাজগুলির দিকে তাকিয়ে রয়েছে। নাবিকরা লঞ্চে করে কূলে এসে দর্শকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগল। তারপর লঞ্চের পর লঞ্চ ভর্তি খাদ্য, ফল এবং মিষ্টান্ন জাহাজের দিকে যেতে লাগল। এসব জনসাধারণের ভালবাসার দান। সে এক অভিনব দৃশ্য। সমুদ্রতীরবর্তী 'ভারতের প্রবেশ দ্বার'-এর সামনে দলে দলে নর-নারী, শিশু-যুবক-বৃদ্ধ, হিন্দু-মুসলমান—সারা ভারতের সকল প্রদেশের লোক ঝুড়ি বোঝাই ফল ও খাবার নিয়ে গুলি বৃষ্টির মধ্যেও দাঁড়িয়ে রয়েছে। জাহাজ থেকে ছোট ছোট নৌকাগুলি তীরে এলে খাবারগুলি তাতে ছুঁড়ে দিয়েছে। ভারতীয় সান্ত্রীরা কোন বাধা না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখেছে। এমনকি ক্যাসল ব্যারাকের উপর গুলি চালাবার সময় সাধারণ মানুষজন পাঁচিলের উপর উঠে দাঁড়িয়ে ভিতরে খাবার ফেলে দিয়েছে। তাতে অনেকের জীবন বিপন্ন হয়েছে। আঠার বছরের একটি শ্রমিক সন্তান এক প্যাকেট ছোলা দিতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়েছে। গ্রান্ট মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররা নাবিকদের জন্য খাদ্য কেনার টাকা সংগ্রহ করেছেন।

শহরময় গুজব রটে গেল, ব্রিটিশ সরকার ধর্ম্মঘটী নাবিকদের উপোস

করিয়ে নীতি স্বীকার করাতে চায়। শহরের অলিগলি থেকে খাবারের প্যাকেট হাতে লোকে ছুটে এল। তারা ইণ্ডিয়া গেটওয়ের কাছে এসে নাবিকদের হাতে খাবারের প্যাকেট ও বালতি ভর্তি জল তুলে দিল। এমনকি কয়েকজন ভিক্ষুককেও নাবিকদের জন্য খাবারের প্যাকেট হাতে বন্দরের দিকে যেতে দেখা গেল। কাঁধে বন্দুক ঝুলিয়ে পাহারারত ভারতীয় সৈনিকদের দেখা গেল লোকজনদের কাছ থেকে খাবার নিয়ে লঞ্চে তুলে দিচ্ছে। ব্রিটিশ অফিসাররা অসহায়ের মতো তাকিয়ে।

ডক থেকে ফেরার পথে কয়েকদল লোকের সঙ্গে কলবাদেবী অঞ্চলে পুলিশের সংঘর্ষ বাধল। পুলিশ গুলি চালাল দু'বার। গভীর রাত্রিতে জানা গেল যে সর্দার প্যাটেল হরতাল করতে বারণ করেছেন। সন্ধ্যায় পার্টির প্রচার ভ্যান সমস্ত শ্রমিক অঞ্চলে হরতালের ঘোষণা করে বেড়ায়। রাস্তায় রাস্তায় পথসভা। ভারতীয় নাবিকদের বৈপ্লবিক তৎপরতার সংবাদে সভায় তুমুল আনন্দধ্বনি। শ্রমিকদের মনোভাব থেকে পরিষ্কার বোঝা গেল যে, আগামীকাল সাধারণ ধর্ম্মঘট হবেই। ইতিমধ্যেই ফাগুসন রোডের ৮টি মিলে নাইট শিফ্টে যাদের কাজ করার কথা—তারা ধর্ম্মঘট শুরু করে দিয়েছে।

বোম্বাই ২২শে ফেব্রুয়ারি (শুক্রবার) :

কংগ্রেস, লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির কাছে ধর্ম্মঘটী নৌ-সেনারা আকুল আহ্বান জানিয়েছেন :

'ফ্ল্যাগ অফিসার কম্যাণ্ডিং আমাদের ভয় দেখাচ্ছেন যে আমাদের বিরুদ্ধে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিপুল শক্তি নিক্ষেপ করে আমাদের একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে।

কর্তৃপক্ষের অপমানকর শর্ত আমরা মেনে নিই এটা নিশ্চয় কোনো দেশভক্ত ভারতবাসী চাননা। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বুটের তলায় আমরা বুক পেতে দিই—এটা কোন দেশভক্ত চাইতে পারেন না।

আমরা অবশ্য আলাপ আলোচনা চালাতে অরাজী নই। আমরা এটাও জানি যে ফ্ল্যাগ অফিসার কম্যাণ্ডিং মুখে যে ভয় দেখিয়েছেন কাজেও তা করতে ছাড়বেন না।

একমাত্র আমাদের দেশবাসী ও আমাদের রাজনৈতিক নেতারাই এখন আমাদের ভরসা।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা—বিশেষ করে আপনাদের কাছে আমরা আবেদন জানাচ্ছি। বোম্বাইয়ের রক্তস্নান বন্ধ করার জন্য আপনাদের সমস্ত শক্তি কাজে লাগান। নৌবাহিনীর কর্তৃপক্ষের গোলাগুলি চালানো রোধ করুন। আমাদের সঙ্গে আপস আলোচনা চালাতে তাদের বাধ্য করুন।'

সকালে দেখা গেল মিলগেটের সামনে ভিড় করে শ্রমিকরা দাঁড়িয়ে আছে।

আজ ভিতরে ঢুকবার কোন প্রশ্নই ওঠে না ; কারণ কমিউনিস্ট পার্টি ও কয়েকটি গণসংগঠন মিলিতভাবে ধর্ম্মঘটের ডাক দিয়েছে। অপরদিকে বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি এবং সর্দার প্যাটেল ধর্ম্মঘট না করার জন্য বিশেষভাবে আবেদন জানিয়েছেন। তবুও একটি মিলেও আজ একটিও চাকা ঘোরেনি। তিনটি রেলওয়ে ওয়ার্কসপ, ৬০টি কাপড়ের কল এবং ছোট বড় সব কারখানার তিন লক্ষ শ্রমিক ধর্ম্মঘটে যোগ দিয়েছেন। সকাল থেকেই শহরের যানবাহন বন্ধ হয়ে যায়। রাস্তায় শোভাযাত্রার পর শোভাযাত্রা দোকান বন্ধ করতে বলছে। সমস্ত স্কুল ও কলেজের ছাত্ররা ধর্মঘট করে শোভাযাত্রায় যোগ দেয়। বেলা বারোটায় লোহার শিরস্ত্রাণ পরে বেয়নেট উঁচিয়ে ব্রিটিশ সৈন্যরা রাস্তায় টহল দিতে থাকে। ধ্বনি দিতে দিতে শ্রমিকরা শোভাযাত্রা করে কামগড় ময়দানে কমরেড ডাঙ্গের সভায় দলে দলে যোগ দেন। প্রচণ্ড উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে ডাঙ্গে ও নাগরকার বক্তৃতা করেন।

শ্রমিক এলাকায় রাস্তার দেওয়ালে দেওয়ালে কাস্তে-হাতুড়ি চিহ্নের নীচে 'জয় হিন্দ' লেখা। সকালে প্যারেল রেলওয়ে ওয়ার্কশপের শ্রমিকরা কংগ্রেস-লীগ-কমিউনিস্ট পতাকাসহ এক দীর্ঘ শোভাযাত্রা বার করে।

ভেণ্ডীবাজার অঞ্চলের সমস্ত মুসলমান দোকানদার পূর্ণ হরতাল পালন করে। সর্বত্র এক ধ্বনি : হিন্দু মুসলমান এক হও। মুসলিম স্টুডেণ্ট ফেডারেশন পূর্ণ হরতাল পালনের আহ্বান জানিয়েছে। নৌ-বিদ্রোহীদের সমর্থনে সওদাগরী জাহাজের নাবিকরাও ধর্মঘট করে। ছাত্র কংগ্রেসের বিরোধিতা সত্ত্বেও সমস্ত ছাত্র ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ করে।

কিন্তু দিনের শুরুটা শান্তিপূর্ণ হলেও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মধ্যে তার অবসান। সারাদিন ধরে বোম্বাইয়ের পথে পথে রক্তস্রোত বইতে থাকে। সকাল থেকেই শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে টমিগান ও রাইফেলধারী বৃটিশ ফৌজ মোতায়েন এবং তারা যথেচ্ছ গুলি বৃষ্টি করেছে। তাই শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে মিলিটারি লরির উপর আক্রমণ চলতে থাকে এবং কয়েকটি লরিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড। জনতার উপর পুলিশ বেলা এগারটা থেকে দুপুর পর্যন্ত অনবরত গুলি চালিয়েছে। বাজার গেট ষ্ট্রীটের পোষ্ট অফিস পুড়িয়ে দেয়া হয়। পুলিশ এই এলাকায় অন্ততঃ কুড়িবার গুলি চালায়। ম্যাজিস্ট্রেটদের সঙ্গে করে সাঁজোয়া গাড়ী-গুলি উপদ্রুত অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছে।

কলবাদেবী, বুলেশ্বর ও গিরগাঁও এলাকায় পুলিশ বারবার গুলি চালায়। অনেক লোক হতাহত হয। ফোর্ট এলাকায় অন্যান্য বার সাধারণতঃ গোলযোগ তেমন ঘটত না। এবার সেখানেও জনতা ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে এবং পুলিশ গুলি চালায়। ফিরোজশা মেটা রোডে একজন অফিসার রিভলবার থেকে গুলি চালায়। এই অঞ্চলে বহু মিলিটারী লরী পোড়ান হয়। মিলিটারী আসার পর অবস্থা আয়ত্তে আসে। পাইধোনী ও থাম্বাকানটা অঞ্চলে বারবার গুলি চালান হয়। দুপুর পর্যন্ত ৩০ জন

আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তারমধ্যে ২২ জন গুলিতে আহত। লীগ কর্মী মুন্সিরেজা শান্তি প্রচারের সময় গুলিতে নিহত হন। ব্রিটিশ সেনারা মুসলিম অঞ্চলে ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়ী নিয়ে টহল দিতে থাকে এবং দুবার ট্যাঙ্ক থেকে গুলি চালায়।

মেরিন ড্রাইভ, আন্ধেরী এবং অন্যান্য ছাউনিতে বিমান বাহিনীর কর্মীরা ধর্মঘট শুরু করেছেন। এই সমস্ত শিবিরের চারধারে মিলিটারী মোতায়েন।

পোর্ট অঞ্চলে শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রার উপর হঠাৎ দুটি মিলিটারী লরী এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দুজন শ্রমিক চাকার তলায় পিষ্ট হয়ে মারা যান। শ্রমিকরা তাদের সঙ্গীদের বাঁচাবার জন্য ছুটে যায় এবং লরী দুটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। বৃটিশ পল্টন ঘটনাস্থলে ছুটে এসে রাইফেল ও টমিগান থেকে অনবরত গুলি চালাতে থাকে। বহু লোক মারা যায় এবং বহু লোক আহত হয়।

লালবাগ অঞ্চলে সকালে বিক্ষোভের পর পুলিশ এসে শ্রমিকদের পেটাতে থাকে। মিলিটারী 'তেজুকায়া' ম্যানসনে ঢুকে একজন শ্রমিককে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। যখন একদল শ্রমিক পুলিশের কাছে ধৃত শ্রমিকের মুক্তি দাবি করে, পুলিশ তখন তাদের উপর গুলি চালায়। শ্রমিকরা গুলির সামনে এগিয়ে গিয়ে পুলিশকে আক্রমণ করে। এই সংঘর্ষে পঞ্চাশ জন আহত হয়। এই অঞ্চলের লালঝাণ্ডা ভলান্টিয়াররা আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যায়। তাদের সাহায্যে মুসলিম লরী ড্রাইভাররা এগিয়ে আসে। তার একটু পরেই রাইফেল ও টমিগান সজ্জিত ব্রিটিশ সৈন্যরা এসে হাজির। তারা কাছাকাছি গলি ও বস্তির মধ্যে লুটপাট করে গিয়ে ঢোকে এবং যাকেই সামনে পায় তাকেই গুলি করে।

বেলা তিনটে নাগাদ বোম্বাইয়ের সর্বত্র এবং বিশেষত প্যারেলের রাস্তায় বৃটিশ মিলিটারী লরী হন্যে হয়ে ছুটতে থাকে এবং জনতার উপর অবাধে গুলি ছুঁড়তে থাকে; জায়গায় জায়গায় মেসিনগান সজ্জিত সৈন্যদের ছাউনি বসে। এমনি একটা ছাউনি বসল প্যারেলে ঠিক কমিউনিস্ট পার্টির অফিসের সামনে।

বিকেল চারটেয় দাদার রোড ধরে মিলিটারী লরী আসতে থাকে। প্যারেলে একবার চক্কর দিয়ে মিলিটারি এলফিনস্টিন ব্রিজের দিকে ছুটে গেল। বিনা কারণে এখানে মিলিটারী বারবার গুলি ছোঁড়ে। প্যারেল মহিলা সংঘের সেক্রেটারী কমরেড কুসুম রণদিভে, কোষাধ্যক্ষ কমরেড কমল ধোন্ধে এবং কমরেড অহল্যা রঙ্গনেকর রেলওয়ে স্টেশনের দিকে যাচ্ছিলেন। কমরেড কমলের দেহ ভেদ করে একটি বুলেট চলে গেল। কমরেড কুসুমের পায়ে এসে গুলি লাগল। কমরেড ধোন্ধে স্ত্রীকে বাঁচাবার ব্যর্থ চেষ্টায় নিজেই তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। এই জায়গায় আরও চল্লিশ জন লোক আহত হয়। মানুষের রক্তে জায়গাটা লাল হয়ে যায়।

৩রা মার্চের 'পিপল্‌স্‌ এজ'-এ বি. টি. রণদিভে শহীদ কমল ধোন্ধের উদ্দেশে লেখেন :

কমল

'আমরা লাল পতাকা অর্ধনমিত করছি। ২২শে ফেব্রুয়ারি সাম্রাজ্যবাদী বুলেটের আঘাতে তোমার জীবনাবসান হল। তোমার যৌবনোদ্দীপ্ত জীবনের অবসান হল। বোম্বাই শহরের ঘরে ঘরে শোকের ছায়া যারা নামিয়ে এনেছে সেই জনশত্রুরাই তোমার জীবন ছিনিয়ে নিল। তোমায় শহীদ হতে হল, কারণ তুমি আতঙ্কিত হয়ে পালিয়ে যাওনি। সামরিক বাহিনীকে দেখে তুমি তোমার নিজের স্থান ত্যাগ করনি। তুমি ভারতের বীর কন্যা। তুমি কমিউনিস্ট পার্টির বীর কন্যা। আমাদের একজন যোগ্য পার্টি সদস্যা হিসাবে তোমায় সকলে ভালোবেসেছে, তাই তোমার মৃত্যুতে সকলে আজ শোকাচ্ছন্ন শোকাভিভূত। পার্টির বীরকন্যা, তোমার পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে আমি তোমায় জানাই লাল সালাম। তুমি যে স্বাধীনতার জন্য জীবন দিয়ে গেলে সেই স্বাধীনতার জন্য তোমার পার্টি সংগ্রাম চালিয়ে যাবে তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

কমরেড ধোন্দেব প্রতি

তোমার গভীর শোকের আমরাও অংশীদার। কমল শহীদের মৃত্যু বরণ করেছে। তুমি একজন যোগ্য পার্টি সদস্যের মতো এই শোক সহ্য কর। বহু সংগ্রামে পরীক্ষিত সৈনিকের মতো তুমি এসবই সহ্য করতে সক্ষম জানি। শোক ও দুঃখের মধ্যেও তোমায় সংগ্রামে অগ্রসর হতে হবে। আমরা জানি তুমি তা পারবে।'

ডি-লাইন রোডে শ্রমিকরা একশ সুসজ্জিত পুলিশের সঙ্গে পুরো তিন ঘণ্টা ধরে সামনা সামনি যুদ্ধ চালায়। দুবার পুলিশকে জায়গা ছেড়ে পালাতে হয়। চারজন কনস্টেবল উর্দি খুলে পালিয়ে যায়। অবশেষে সেই অবশ্যম্ভাবী মিলিটারী লরী এসে গুলি চালাতে থাকে। একজন আহত শ্রমিককে একজন জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে?' পরিষ্কার উত্তর এল, 'একটুর জন্য ফস্কে গেল।'

এভাবে যে-দিনটা শুরু হয়েছিল শ্রমিকের সুশৃংখল রাজনৈতিক বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে—তার শেষ নৃশংস নরহত্যার মধ্যে। এই তিনদিনে সরকারি হিসেবে ২৫০ জনের মৃত্যু ঘটেছে। এক শ্রমিক অঞ্চলের কে. ই. এম. হাসপাতালের মর্গের মধ্যেই ৯৭টি মৃতদেহ রয়েছে। অর্থাৎ মোট মৃতের অর্ধেকই শ্রমিক অঞ্চলের বাসিন্দা। সমস্ত শ্রমিক এলাকা জুড়ে সংঘর্ষ ক্রমাগত ছড়িয়ে পড়ার ফলে বোম্বাইয়ের বারো মাইল রাস্তা যুদ্ধের ময়দানে পরিণত।

বোম্বাই ২৩শে ফেব্রুয়ারি (শনিবার) :

সর্দার প্যাটেলের পরামর্শমতো বোম্বাইয়ের ভারতীয় নৌবাহিনীর ধর্মঘটী নৌসেনাদের পরিচালনাধীন সমস্ত জাহাজ শনিবার সকালে বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করে। ভোর ছ'টা তের মিনিটে নৌবাহিনীর সদর ঘাঁটিতে ধর্মঘট কমিটি কর্তৃক প্রেরিত এক বেতার বার্তায় আত্মসমর্পণের অভিপ্রায় জানানো হয়। তারপর নৌবাহিনীর ফ্ল্যাগ অফিসারের শর্তানুযায়ী একে একে জাহাজগুলি এসে আত্মসমর্পণ করে। ক্যাসেল ব্যারাকের ধর্মঘটী ক্যাডেটরাও ব্যারিকেডের অন্তরাল থেকে এসে আত্মসমর্পণ করেন। নৌবাহিনীর শিক্ষার্থীরা ধর্মঘট প্রত্যাহার করেন।

কিন্তু বোম্বাই শহরের মানুষ তখনো লড়ে যাচ্ছে। বোম্বাই আজও বিদ্রোহী শহর। শ্রমিকরা আজও কাজে যায়নি। তাদের মৃত আত্মীয়-স্বজন বন্ধু পরিজন মর্গে পড়ে রয়েছে। সুতরাং আজ কারখানায় ঢোকার প্রশ্ন ওঠে না। বেশ কিছু অঞ্চলে দোকানপাট আজও বন্ধ।

মধ্যাহ্নে শিবাজী পার্ক অঞ্চলে (দাদার) অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ করে। বহু সহস্র লোকের এক ক্রুদ্ধ জনতা কোহিনুর টেক্সটাইল মিলে আগুন লাগিয়ে দেয়। মিলিটারী গুলি চালালে জনতা সরে যায়। কিন্তু আবার তারা আক্রমণ করে। শিবাজী পার্কের উত্তরে একমাইল দূরে মাহিম-এ জনতা একদল পুলিশকে আক্রমণ করে। এখানেও গুলি চলে। বেলা একটা পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় প্রায় বারবার গুলি চলে। ক্রফোর্ড মার্কেট থেকে মাহিম পর্যন্ত প্রায় দশ মাইল অঞ্চল জুড়ে সংঘর্ষ চলতে থাকে। মেয়ার সেগুন মিলে কাজ চালু করার চেষ্টা করলে পর জনতা মিল আক্রমণ করে। পুলিশ গুলি চালালে জনতা সরে পড়ে। কিন্তু মিল বন্ধ করে দিতে হয়। বেলা যতই গড়াতে থাকে ততই মিলিটারী ও পুলিশের সঙ্গে জনতার সংঘর্ষ বাড়তে থাকে। মুসলমান-প্রধান অঞ্চল বিক্ষোভের প্রধান ঘাঁটি। মদনপুরা নর্থ ব্রুক গার্ডেনস এবং ডানকান রোডে মিলিটারী এসে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি বৃষ্টি করে।

ডানকান রোডের কাছে এক মস্ত ব্যারিকেড খাড়া করা হয়। কামাতিপুরা আর মদনপুরার মাঝামাঝি এই জায়গায় তীব্র সংঘর্ষ হয়। শ্রমিক, নিম্ন মধ্যবিত্ত, হিন্দু মুসলমান সবাই মিলে পুলিশ মিলিটারীর রক্তাক্ত অত্যাচারের বিরুদ্ধে একযোগে রুখে দাঁড়াল। এখানকার ব্যারিকেড যে-সে ধরনের নয়। মোটা মোটা বাঁশকে একসঙ্গে শক্ত করে বেঁধে রাস্তার উপর বেড়া দেওয়া হয়েছে। মিলিটারী লরী পর্যন্ত আটকানো চলে। ব্যারিকেডের উপর কংগ্রেস ও লীগের ঝাণ্ডা পাশাপাশি বেঁধে দেওয়া হয়েছে। কামাতিপুরার দিকে কংগ্রেস, লীগ এবং কমিউনিস্ট ঝাণ্ডা একসঙ্গে উড়ছে। লোকজন পুলিশ চৌকির উপর হামলা শুরু করে। যেই মিলিটারী লরী দেখা যায়, অমনি রাস্তার মোড় থেকে সংকেতধ্বনি ভেসে আসে। লোকজন বাড়ী এবং গলির মধ্যে মিলিয়ে যায়। ক্রুদ্ধ মিলিটারী ব্যারিকেড ভেঙে চুরে সামনে যাকে পায়

তাকেই গুলি করতে থাকে। হঠাৎ কোথা থেকে ইঁট পাথর পড়তে শুরু করে; আর তখন মিলিটারীও অক্ষত থাকে না। কিন্তু যারা ইঁট ছুঁড়ছে তাদের কোথাও দেখা যাচ্ছে না। নিষ্ফল আক্রোশে টমিরা মেশিনগান থেকে অগ্নিবৃষ্টি করে চলে যায়। যেই সৈন্যরা চলে গেলে অমনি লোকজন রাস্তায় বেরিয়ে আসে, আহতদের রাস্তা থেকে ঘরে নিয়ে যায়। বাড়ীর মেয়েরা সেবার কাজে লেগে যায়। পুরুষেরা আবার রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে এবং ফের যুদ্ধ শুরু হয়। দিনের বেলা বৃটিশ মিলিটারী কতবারই না গুলি করল—কিন্তু জনসাধারণের মনে কোন আতঙ্ক নেই—তারা নির্বিকার।

রাত্রিবেলায় মিলিটারী ক্যাম্পগুলি লোকেরা তছনছ করে দিল। এই অঞ্চলে মিলিটারী আসা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ধার-কাছ থেকে মিলিটারী গুলি ছুটে আসছে—কিন্তু লোকেরা নিরাপদ—অথচ তাদের ছোঁড়া ইঁট নির্ভুল লক্ষ্যে মিলিটারী লরীর উপর গিয়ে পড়ছে। সকালে আবার সবকিছু আশ্চর্যরকম শান্ত। মিলিটারী এই অবস্থা দেখে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আট-দশ জন লোক ছুটে এস পাশের পুলিশের থানা থেকে এনে ইঁট কাঠ রাস্তায় বোঝাই করে আগুন লাগিয়ে দিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই চলেছে। কিন্তু এত কাণ্ডের পরও সাধারণ মানুষের বাড়ি-ঘব-দোকানের কোন ক্ষতি হয়নি। বেলা বারটার সময় দুটি মিলিটারী লরী এসে এলোপাথাড়ি মেশিন গান দাগতে লাগল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে উপযুক্ত জবাব আসে। ঝাঁকে ঝাঁকে সোডাওয়াটারের বোতল এসে লরীর উপর পড়তে লাগল। বোতল বৃষ্টির মধ্যে মিলিটারীর পক্ষে লরীতে দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব। লরী থেকে একলাফে নেমে মিলিটারী একজন গোয়ালাকে ধরে ঝাঁকুনি দিতে থাকে। গোয়ালা ভীত হয়ে একটা বাড়ির দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। খোলা রিভলবার হাতে বৃটিশ সৈন্যবা বাড়ির উপর চড়াও হল। হাতের কাছে যাকেই পেল তাকেই ধরে—আন্দাজ কুড়ি জনের মতো লোককে নিয়ে গেল। ফলে লোকের ক্রোধ আরও চরমে ওঠে। সংঘবদ্ধ জনতার সামনে মিলিটারী তারপর আর আসার সাহস করেনি।

সন্ধ্যায় কংগ্রেসের শান্তিবাহিনীর লরী এল। দু-একটা শান্তির কথা এবং 'স্ট্রাইক করো না' বলে শান্তিবাহিনী উধাও। তারপর এল লীগের ন্যাশনাল গার্ডের লরী। তারাও ঠিক কংগ্রেসের কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করল। রাস্তায় একজন লোক তাদের লক্ষ্য করে বলে—'জানো, কতজন মারা গিয়েছে? যাও না, মিলিটারী আর পুলিশের কাছে গিয়ে শান্তির কথা শোনাও।'

শিবাজী পার্কে মিলিটারী বেপরোয়া গুলি চালায়। ঘরের ভিতরেও অনেকের গায়ে গুলি লাগে। এই ঘটনার ফলে শিবাজী পার্ক অঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রী ও শ্রমিক—সবাই ইঁট পাথর নিয়ে মিলিটারী লরীর জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে। বার বার গুলি চলে, কিন্তু জনতা সরে না কিছুতেই। জনতাকে ধ্বংসের নেশায় পেয়ে বসল। পাশের পেট্রল পাম্প ভেঙে তারা

পেট্রল জোগাড় করল—তারপর কোহিনূর মিল ও তুষা উলেন মিলে আগুন লাগিয়ে দিল। দুটোই বিদেশী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান। সন্ধ্যায় দাদারের কাছে রেলগাড়িতে এবং বি. বি. ও সি. আই. রেল স্টেশনে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। মাতুঙ্গা স্টেশনের বুকিং অফিস পুড়ে ছাই।

ফার্গুসন রোডে সকাল সাড়ে দশটা থেকে মিলিটারী গুলি চালাতে শুরু করে। বারবার এখানে শ্রমিক ও মিলিটারীর মধ্যে সংঘর্ষ বাধে।

এই যখন শহরের অবস্থা—অন্য দিনের মতো আজও সমুদ্রতীরে হাজার হাজার লোকের ভীড়। তারা দূর থেকে বিদ্রোহী জাহাজগুলির দিকে তাকিয়ে—ফল, রুটি, মিষ্টি ও জল নিয়ে নৌ-সেনাদের জন্য প্রতীক্ষারত। তারা তাদের জাহাজে'র দর্শন নিতে এসেছে—কিছুতেই তারা খবরের কাগজের কথা বিশ্বাস করছে না। এরা কখনও আত্মসমর্পণ করতে পারে না।

তখন সমস্ত জাহাজে কালো পতাকা উড়ছে—আত্মসমর্পণের সঙ্কেত। মাইক্রোফোনে ইন্ডিয়া গেটে সমবেত ছাত্র ও জনসাধারণের উদ্দেশে শেষ ইস্তাহার ঘোষিত হল :

'এই ধর্মঘট আমাদের জাতির জীবনে নতুন ইতিহাস রচনা করেছে। ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম সৈনিক ভারতবাসী ও অসামরিক ভারতবাসীর রক্ত একই আদর্শের প্রেরণায় প্রবাহিত হল। আমরা সৈনিকরা, এই ঘটনা কখনও ভুলব না এবং আমরা জানি যে আপনারা, আমাদের ভাই-বোনেরাও কখনও ভুলবেন না। আমাদের মহান জনগণ দীর্ঘজীবী হোক্। জয় হিন্দ !'

খাবারের ঝুড়ি হাতে সমুদ্রতীরে 'ইন্ডিয়া গেটে' সমবেত হাজার হাজার মানুষ শিশুর মতো কাঁদতে লাগল। কাল থেকে তারা কী নিয়ে বাঁচবে ?

তেরো

বোম্বাইয়ের ধর্মঘট শুরু হবার সাথে সাথে নৌ-ধর্মঘট শুরু হয় করাচীতে, কলকাতায় ও মাদ্রাজে। ২১শে ফেব্রুয়ারি কলকাতায় বেহালার উপকূলে 'হুগলী' জাহাজের শিক্ষার্থীরা ধর্মঘট করেন। ২১শে ফেব্রুয়ারি মাদ্রাজে 'আডিয়ার' জাহাজের প্রায় দেড়শ নাবিক বোম্বাইয়ের বিদ্রোহী ক্যাডেটদের সমর্থনে 'বোম্বাইয়ের জন্য ধর্মঘট করো' ধ্বনি দিয়ে শহরের প্রধান প্রধান রাজপথ পরিভ্রমণ করে। (এ. পি.)

'স্বাধীনতা'র সংবাদদাতা জানাচ্ছেন :

করাচীর নৌ-বিদ্রোহ বোম্বাইয়ের পথ অনুসরণ করল। সেখানে ধর্মঘটী সেনাদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম শুরু হয়।

করাচীতে ২১শে ফেব্রুয়ারি সকালে ভারতীয় নৌ-বাহিনীর যুদ্ধ জাহাজ 'হিন্দুস্তানে'র ধর্মঘটীদের উপর সামরিক পুলিশ গুলি চালায়। ক্যাডেটরা

দুটি নৌ-কামান চালিয়ে তার জবাব দেন। একজন নিহত ও নয়জন আহত হয় এই সংঘর্ষে। কীমারীতে ক্যাডেটরা ধর্ম্মঘট করেছেন। আজ ওখান থেকে শহরে যাবার রাস্তাগুলিতে পুলিশের পাহারা বসানো হয়েছে। তাছাড়া পাহারা দিচ্ছে টমিগান ও মেশিনগান সজ্জিত ব্রিটিশ পল্টন। কীমারীর পথে সমস্ত যান চলাচল বন্ধ।

যুদ্ধ জাহাজ 'চমক', 'হিমালয়' ও 'বাহাদুর'-এর সমস্ত নাবিক ও তীরে নিযুক্ত যাবতীয় লোকজন সমেত প্রায় দেড় হাজার লোক ধর্ম্মঘটে যোগ দিয়েছেন। সকাল বেলা প্যারেডের সংকেত অগ্রাহ্য করে তাঁরা কেউ বার হননি এবং কাজ করতে অসম্মতি জানান। তারপর কয়েকশ নাবিক শহর-মুখো রাস্তায় এসে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। সমস্ত বন্দর এলাকায় সামরিক পুলিশের পাহারা বসেছে।

করাচীর 'হিন্দুস্তান' যুদ্ধ জাহাজের ভারতীয় নৌ-শিক্ষার্থীরা এক চরম পত্র দিয়েছেন: 'যদি সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে (২১শে ফেব্রুয়ারি) আমাদের দাবি মেনে নেওয়া না হয়, তাহলে আমরা সৈন্যদের উপর গোলাবর্ষণ শুরু করব।' ধর্ম্মঘটীদের অন্যতম দাবি—সৈন্যদল প্রত্যাহার করো।

জাহাজ থেকে সশস্ত্র ধর্ম্মঘটীদের অবতরণে বাধা দিলে, ব্রিটিশ মিলিটারী পুলিশের সঙ্গে ধর্ম্মঘটীদের সংঘর্ষ বাধে। ফলে ২৪ জন আহত হয়। আহতদের সামরিক হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। অফিসাররা ধর্ম্মঘটীদের জাহাজে ফিরে যাবার জন্য অনুরোধ করতে থাকেন।

সংঘর্ষের পর ধর্ম্মঘটী নেতাদের 'হিন্দুস্থান' জাহাজ পরিদর্শন করার অনুমতি দেওয়া হয়। পরিদর্শনের পর নেতারা ধর্ম্মঘটীদের জানান যে গুলিবর্ষণের ফলে দুজন ক্যাডেট নিহত ও পাঁচজন আহত হয়েছেন এবং অপরদিকে একজন ব্রিটিশ সৈন্য নিহত ও তিনজন আহত। তারপর ধর্ম্মঘটীরা নিজ নিজ ঘাঁটি ও জাহাজে ফিরে যান। 'চমক' জাহাজে অনুষ্ঠিত একটি সভায় তারা সামরিক পুলিশ বাহিনী প্রত্যাহারের দাবি জানান। ডকের সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সমস্ত লঞ্চ সামরিক ও বে-সামরিক পুলিশের দখলে। জানা গেল, যুদ্ধজাহাজ 'ত্রিবাঙ্কুর' এর ৪০ জন শিক্ষার্থী ধর্ম্মঘটে যোগ দিয়েছেন। 'হিন্দুস্তান' জাহাজের সব কামান শত্রুর মোকাবিলায় প্রস্তুত।

করাচীতে ২২শে ফেব্রুয়ারি সকালে নৌ-বাহিনীর ধর্ম্মঘট বিদ্রোহের আকার নেয়। কীমারী থেকে বেলা দশটায় গোলা-গুলির শব্দ ভেসে আসে। বেলা সাড়ে তিনটে পর্যন্ত সৈন্যরা গুলি চালায়। সৈন্যদের গুলিতে ১৮ জন নিহত ও আড়াই শতাধিক লোক আহত হয়। শতাধিক আহতের অবস্থা গুরুতর। শহরের তিনটি হাসপাতাল পরিপূর্ণ। অনবরত আহতদের আনা হচ্ছে। ডাক্তার ও নার্সরা সামলে উঠতে পারছেন না।

বিমানবাহিনীর বৃটিশ ছত্রী সেনাদল আজ সকালে 'হিন্দুস্তান' জাহাজের নিকটবর্তী এক বাড়ীর ছাদে অবতরণ করে এবং সেখানে কামান বসায়।

সেখান থেকে ধর্মঘটীদের কাছে চরম পত্র পাঠানো হয়। চরম পত্রের সময় উত্তীর্ণ হবার পরে বৃটিশ সেনারা যুদ্ধ জাহাজ 'হিন্দুস্থানে'র উপর গোলা-বর্ষণ করে। নৌ-সেনারা বড় বড় জাহাজী কামানে প্রত্যুত্তর দেন। গোলার আঘাতে জাহাজে আগুন ধরে যায়। নৌ-সেনারা তখন আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। নৌ-সেনাদের মধ্যে ৪ জন নিহত ও ১৫ জন আহত হয়েছেন। হতাহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। জিপ গাড়িতে চড়ে যখন বৃটিশ ছত্রী সেনারা অ্যাম্বুলেন্স গাড়ীগুলিকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যায়—তখন কুইন্‌স্‌ রোডের কাছে জনতা বৃটিশ সেনাদের লক্ষ্য করে ঝাঁকে ঝাঁকে ইঁট-পাথর ছুঁড়তে থাকে। জনতার মধ্যে অধিকাংশই ছাত্র। বৃটিশ ছত্রী সেনারা জেটির ধারে ধারে ছোট বড় কামান সাজিয়ে পাহারা দিচ্ছে।

২৫শে ফেব্রুয়ারি, সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ গোলাবর্ষণের ফলে ৮ জন ক্যাডেট নিহত ও ৩৩ জন আহত হয়েছেন।

২২শে ফেব্রুয়ারি, ভিজাগাপত্তম থেকে খবর আসে, সেখানে 'সারকাস' জাহাজ ও অন্যান্য ইউনিটের প্রায় ৬০০ নৌ-শিক্ষার্থী ধর্মঘটে অংশ নিয়েছেন।

চোদ্দ

প্রায় এক সপ্তাহব্যাপী রক্তস্নানের পর কলকাতার মানুষ যখন আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসছে—তখনই বোম্বাই ও করাচীর নৌ-বিদ্রোহের সংবাদ এসে পৌঁছাল। নৌ-বিদ্রোহের মতো ঘটনা এই শতাব্দীর ইতিহাসে নজিরবিহীন। তাই বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার পর লোকের মনে হল তাহলে বৃটিশ রাজত্বের আয়ু ফুরিয়েছে। মানুষ দেখতে চায়, কলকাতার কেল্লার সিপাহীরাও এই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছে। এরকম একটা গুজবও রটে গেল একদিন।

নৃপেন ব্যানার্জি বলছেন, 'এখন আর পড়া-পরীক্ষার কোন মানেই হয় না। আই. এস-সি. পরীক্ষা দিতে বসেছি—কেমিস্ট্রির ফার্স্ট পেপার দিয়েছি—সেকেন্ড পেপারে বসতে যাব। কে যেন বলল, বোম্বেতে নৌ-বাহিনীর ক্যাডেটরা ধর্মঘট করেছে—আর ফোর্ট উইলিয়াম থেকে সব সৈন্যরা বিদ্রোহ করে বেরিয়ে পড়েছে। পরীক্ষা না দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে গড়ের মাঠের দিকে হাঁটা দিলাম। কোথায় কী? শুধু আমার পরীক্ষাটা গেল—তার জন্যে অবশ্য দুঃখ নেই।'

একটানা কয়েকদিনের লড়াইয়ের ফলে কলকাতার মানুষ পরিশ্রান্ত—রক্তমোক্ষণে কিছুটা অবসন্ন। বোম্বাইয়ের পাশে দাঁড়াতে কলকাতার একটু দেরি হল। কলকাতার আপাত স্তিমিত সংগ্রামী চেতনাকে উস্কে দিল সোমনাথ লাহিড়ীর 'রক্তের ডাক' লেখাটি।

রক্তের ডাক

'কলিকাতার আগুন নিভিতে না নিভিতে আবার আগুন জ্বলিয়া উঠিল—বোম্বাই ও করাচীতে। সেই কলিকাতার মতই কমিউনিস্ট, লীগ ও কংগ্রেস ঝাণ্ডা একত্রে বাঁধিয়া বোম্বাইয়ের পথে পথে ভারতীয় নৌ-বাহিনীর ধর্ম্মঘটের আগুন জ্বলিল এবং সে আগুন এবার আর গুলির বিরুদ্ধে নিরস্ত্র নাগরিকের ইঁট-পাথর নয়—গুলির বিরুদ্ধে গুলি, কামানের বিরুদ্ধে কামান গর্জিয়া উঠিয়াছে। সশস্ত্র মিলিটারীর আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতীয় নাবিক-দের বিদ্রোহও আজ সশস্ত্র প্রতিরোধের পথ লইয়াছে। ভারতের ইতিহাসে ইহা অপূর্ব্ব।

পরাধীনতার শৃঙ্খল চূরমার করিবার জন্য ভারতবাসী আর এক মুহূর্ত্তও দেরী করিতে প্রস্তুত নয়। স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিদ্রোহের রেখায় সেই অগ্নিবাণী আজ সবার চোখের সামনে জ্বলন্ত। সে লেখা পড়িতে পারেন না শুধু দেশের নেতৃবৃন্দ। যেখানে সাধারণ মানুষ তিন ঝাণ্ডা একত্রে বাঁধিয়া স্বাধীনতার জন্য দিনের পর দিন প্রাণ দেয়—সেখানে জাতির নেতারা বলেন, বৃটিশের প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য আমরা অপেক্ষা করিব এবং ইতিমধ্যে কংগ্রেস লীগের বিরুদ্ধে লড়িবে, লীগ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়িবে, উভয়েই কমিউনিস্টের বিরুদ্ধে লড়িবে। সেই ভরসায়ই আজ, নৌ-বাহিনীর শিক্ষার্থী-দের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ দম্ভভরে ঘোষণা করিতে পারিয়াছে যে "প্রয়োজন হইলে সমগ্র নৌ-বাহিনী ধ্বংস করিতেও দ্বিধা করা হইবে না।"

নেতাদের ভীরুতার ফলে এই বিদ্রোহকে হয়তো রক্তস্রোতে ডুবাইয়া দেওয়া হইবে। বিদ্রোহীদের পথের সঙ্গে যাহার যতই মতান্তর থাকুক, তাহাদের প্রতি দেশের দায়িত্ব অস্বীকার করিলে শুধু এই বিদ্রোহী সৈনিকদেরই অস্বীকার করা হইবে না; অস্বীকার করা হইবে স্বাধীনতাকে, দেশের ভবিষ্যৎকে, তার বর্ত্তমান জ্বালাকে, সমাগতপ্রায় বিপ্লবকে।

ইতিহাস পণ্ডিতের পাঁজি দেখিয়া বা মৌলবীর ফতোয়া লইয়া পথ চলে না। ভারতের ইতিহাস বিপ্লবের অগ্নিময় পথে পা বাড়াইয়া দিয়াছে। বৃটিশ সৈন্যের গুলির মুখে মুখে আজ প্রতিবাদ-আন্দোলন প্রতিরোধ-সংগ্রামে রূপান্তরিত হইতে চলিয়াছে। চট্টগ্রাম হইতে করাচী পর্যন্ত আজ তাই বুকের রক্তে এই আহ্বানই লেখা হইতেছে—সংগ্রাম চাই, ঐক্য চাই, নেতৃত্ব চাই, সঙ্ঘবদ্ধ বিপ্লবী কর্মপন্থা চাই।

"নেতারা সে আহ্বান অগ্রাহ্য করিতে পারেন, কিন্তু সাধারণ ভারতবাসী তাহা অগ্রাহ্য করিবে না।' (স্বাধীনতা, ২২. ২. ৪৬)

এবার আর দ্বিধা-সংকোচের অবকাশ নেই। নেতারা ভীরু—তারা সংগ্রামবিমুখ। অতএব তিন ঝাণ্ডা একত্রে বেঁধে নীচের তলার মানুষ এগিয়ে যাক। বৈপ্লবিক পরিস্থিতির এটাই দাবি।

কলকাতার শ্রমিক, ছাত্র, নাগরিকদের উদ্দেশে লিখিত সোমনাথ লাহিড়ীর আর একটি উদ্দীপিত রচনা প্রকাশিত হয় ২৩শে ফেব্রুয়ারি, 'স্বাধীনতা'র পাতায়।

উহাদের মরিতে দিব না

'বোম্বাই নৌ-বাহিনীর দশ হাজার ভাই রক্তাক্ত মৃত্যুর দ্বার হইতে শেষ ডাক পাঠাইয়াছে—দেশের সমস্ত ভাই-বোনদের কাছে। বৃটিশ বন্দুকের গুলিতে ক্ষণে ক্ষণে তাহারা জীবন হারাইতেছে, বিপুল সৈন্য-সমাবেশ করিয়া বৃটিশ সরকার তাহাদের সকলকে মৃত্যুর চরম পরোয়ানা জানাইয়া দিয়াছে। দশ হাজার ভাইকে একেবারে ধ্বংস করিবার জন্য বৃটিশ নৌ-বহর ও বিমানবহর, দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। যে কোন মুহূর্তে এই দশ হাজার ভারতবাসীর তপ্ত রক্তস্রোতে বোম্বাই ও করাচীর নীল সমুদ্র লাল হইয়া উঠিবে।

সেই চরম পরিণতির মুখোমুখি দাঁড়াইয়া দশ হাজার ভারতবাসী আকুল আহ্বান জানাইয়াছে—চল্লিশ কোটি ভাই-বোনের কাছে। কংগ্রেস, লীগ, কমিউনিস্ট পার্টির কাছে তাহাদের ধর্ম্মঘট কমিটি আবেদন জানাইয়াছে যে, আমাদের বাঁচাও—"আমাদের দেশবাসী ও রাজনৈতিক নেতারাই এখন আমাদের ভরসা।"

মৃত্যুপথযাত্রী এই দশ হাজার মানুষ শেষ ভরসায় যাঁহাদের দিকে কাতর দৃষ্টি ফিরাইল তাঁহারা কি উহাদের মরিতে দিতে পারেন? 'আমাদের বাঁচাও' বলিয়া যাঁহারা শেষ ডাক দিল, কোন ভারতবাসী কি তাঁহাদের দিকে না ফিরিয়া পারেন? এ আহ্বান যদি দেশের মধ্যে আকুল আগ্রহ না জাগায় তবে পৃথিবীর দরবারে ভারতবাসী কি আর কোনদিন মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারিবে?

'শান্তিপ্রিয়' নেতারা কি করিবেন জানি না। কিন্তু 'শান্তি রক্ষার' ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়া তাহার পর উহাদের জন্য তাঁহারা কি চেষ্টা করিবেন তাহা দেখিবার সৌভাগ্য এই দশ হাজারের কাহারও হয়তো হইবে না। তাহার আগেই তাহাদের জীবনে মৃত্যুর স্তব্ধতা নামিয়া আসিবে।

সে মৃত্যু আমাকে, আপনাকে, প্রতিটি ভারতবাসীকে চিরদিন ধিক্কার দিবে—মৃত্যুপথযাত্রী দশ হাজার ভাইয়ের পাণ্ডুর মুখচ্ছবি আমাদের জীবনকে প্রতিদিন অভিশপ্ত করিবে। সে অভিশাপ বহন করিয়া বেড়াইবার দুঃসহ গ্লানিই কি আমাদের ভাগ্যের লিখন?

না, তাহা নয়। লক্ষ কোটী কণ্ঠে সমস্ত ভারতবাসী গর্জ্জন তুলুক—না, উহাদের মরিতে দিব না। আমাদের জীবন দিয়া উহাদের বাঁচাইব। যে আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তির জন্য লক্ষ ভারতবাসী সাড়া দিয়াছেন, সেই দাবীতেই ইহারাও আজ রক্ত ঢালিতেছে, গোরা ও কালার যে বৈষম্য সমস্ত ভারতবাসীর জীবনকে অভিশপ্ত করিয়াছে সেই বৈষম্য দূর করিতেই ইহারা

আজ জীবন দিতেছে। ভারতবাসীর জীবন দিয়াই উহাদের বাঁচাইতে হইবে।

বোম্বাইয়ের মজুর শ্রেণী সেই পথে সবার আগে বাড়িয়াছে। সমস্ত কারখানার লক্ষ মজুর ধর্ম্মঘট করিয়া গর্জ্জন তুলিয়াছে—উহাদের বাঁচাও। ধর্ম্মঘটের পথে কত মজুর জীবন দিয়াছে, সাম্রাজ্যবাদের গুলি স্ত্রীলোককে পর্য্যন্ত হত্যা করিয়াছে, কিন্তু মৃত্যুহীন প্রতিজ্ঞায় মজুর শ্রেণীর লক্ষ নরনারী নির্ভয়ে গর্জ্জন তুলিয়াছে—আমাদের প্রাণ যায় যাক, উহাদের বাঁচাও। নেতাদের 'সময়-অসময়' বাধা-নিষেধ তুচ্ছ বুঝিয়া হাজার হাজার ছাত্র ও জনসাধারণ পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, নিজেদের রক্ত দিয়া আহ্বান লিখিয়াছে—আর সময় নাই, উহাদের বাঁচাও।

উহাদের বাঁচাও—এই ডাক আজ হাজার মাইল পার হইয়া কলিকাতার দুয়ারে আসিয়া আঘাত করিতেছে। কলিকাতার শ্রমিক ভাইদের কাছেই এই ডাক সবার চেয়ে আপনার। যাহারা মরিতে বসিয়াছে, তাহারা মজুর শ্রেণীরই আপন সন্তান। তাই লাল ঝাণ্ডা কাঁধে লইয়া বোম্বাইয়ের মজুর শ্রেণীই সবার আগে তাহাদের বাঁচাইতে বাহির হইয়াছে। কলিকাতার সমস্ত মজুর সে ডাকে সাড়া দিক, মজুরের বিক্ষুব্ধ গর্জ্জনে আকাশে বাতাসে কঠিন প্রতিবাদ বাজিয়া উঠুক—উহাদের মরিতে দিব না।

কলিকাতার বীর ছাত্র, হিন্দু-মুসলমান লক্ষ লক্ষ নাগরিক। দশ হাজার ভাইয়ের জীবনের কাছে সমস্ত যুক্তি-তর্ক, বাধা-নিষেধ কোনো কিছুরই কিছুমাত্র মূল্য নাই। মৃত্যুর সীমান্ত হইতে যাহারা ডাক দিল, আপনাদের সতেজ জীবনে তাহার বিরাট প্রতিধ্বনি জাগুক, লক্ষ নাগরিকদের সক্রিয় ও সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিবাদ সঙ্কল্প জানাক—উহাদের মরিতে দিব না।'

ইতিমধ্যে তিনটি মূল্যবান দিন অতিবাহিত। কলকাতার বুকে উল্লেখ-যোগ্য কোন প্রতিবাদের অভিব্যক্তি প্রকাশ পায়নি। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল ২৩শে ফেব্রুয়ারি ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কলকাতা ও শহরতলির শ্রমিকদের ধর্মঘট পালনের ডাক দেওয়া হবে। এই উপলক্ষে ট্রেড ইউনিয়ন অফিসে ২২শে ফেব্রুয়ারি এক জরুরি সভা ডাকা হয়।

সত্যেন গাঙ্গুলী বলছেন, 'বেলা তখন চারটে। হঠাৎ ইউনিয়ন অফিসে খবর এল, এক্ষুনি ২৪৯ নং বৌবাজার স্ট্রীটে সব কমরেডকে যেতে হবে। বোম্বাইয়ের নৌ-বিদ্রোহের সমর্থনে ও সেখানকার শ্রমিকদের উপর গুলি চালনার প্রতিবাদে ধর্মঘট করতে হবে। এটা পার্টি হেডকোয়ার্টার থেকে নির্দেশ। প্রচার নেই, বিবৃতি নেই—এসব করার সময়ও নেই। ২৪৯ নং-এ সন্ধ্যাবেলা হাজির হলাম। কয়েকশো কমরেড বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন থেকে উপস্থিত। সোমনাথ লাহিড়ী দুটো পা চেয়ারের উপর তুলে একটা সস্তা দামের সিগারেট খাচ্ছিলেন। সেদিন সভা পরিচালনায় অসম্ভব দক্ষতার পরিচয় দিলেন লাহিড়ী। বললেন, জোশী একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে।

সি. সি. (কেন্দ্রীয় কমিটি) ঠিক করেছে, কাল সব বন্ধ করতে হবে। কল-কারখানা, ট্রাম, রেল—সব।

এখন রাত আটটা। কাল ভোরে কোন অবস্থাতেই ধর্মঘট সম্ভব নয়। অন্তত একটা দিন প্রচারের জন্য চাই—এটাই সবাই বলল। দু' ঘণ্টা আলোচনা চলল। লাহিড়ী নিঃশব্দে বসে রইলেন। ধীরেন মজুমদার, চতুর আলি, রেজ্জাক, রহমান, ফারুকি, বসন্ত সিং—সবারই এক কথা—অসম্ভব, কমরেড। ধর্মঘট আমরা নিশ্চয়ই করতে পারব। শুধুমাত্র একটা দিন সময় চাই। একজন মাত্র কমরেড, চীৎপুর ইয়ার্ডের রেল শ্রমিক রামজী উপাধ্যায় বলেছিলেন, 'আমার এলাকায় আমি কাল ভোর থেকেই সব বন্ধ করতে পারব।'

লাহিড়ী এতক্ষণ চোখ বুঁজে কী যেন ভাবছিলেন। এমন সময় তিনি চোখ খুললেন—বললেন, কমরেড, আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু কালকে ধর্মঘট করতে পারব কি পারব না—তা নিয়ে নয়। আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু : কালকে ধর্মঘট করতে হবে। কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ যেভাবে সম্ভব তা পালন করতে হবে। কীভাবে সম্ভব—সেটাই আলোচ্য বিষয়। আপনারা যে যার ইউনিয়ন অফিসে ফিরে যান। এক ঘণ্টার মধ্যে প্রোগ্রাম করে শ্রমিকদের ঘরে ঘরে কড়া নেড়ে নেড়ে প্রচার করুন।

তক্ষুনি ছুটে গেলাম—ছড়িয়ে গেলাম আমরা রেলের কমরেডরা—শিয়ালদায়—নারকেলডাঙ্গায়—চীৎপুরে। কমরেড আবদুল হোসেন, ননীদা ও সুধীর দাশগুপ্তকে সঙ্গে নিয়ে নারকেলডাঙ্গা ইউনিয়ন অফিসে গেলাম। আরও অনেক কমরেড সেখানে জড়ো হয়েছিলেন। রাত তখন সাড়ে এগারোটা।

দু' আনার ভাত-গোস্ত খেয়ে কয়েক বাণ্ডিল বিড়ি নিয়ে শুরু হল আমাদের প্রচার অভিযান। রেল কলোনির ঘরে ঘরে কড়া নেড়ে সবাইকে শোনানো হল আমাদের ধর্মঘটের ডাক। ভোরে সব বিভিন্ন গেটে আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম। সারারাতে আমরা রেল কলোনির দু'শ-তিনশ রেল-শ্রমিক ভলান্টিয়ার জড়ো করে ফেলেছি। শিয়ালদহ সেকশনে রেলের চাকা বন্ধ হয়ে গেল।'

দৃশ্যান্তরে দেখা যাচ্ছে, ২৩শে ফেব্রুয়ারি, সকাল তখন ন'টা—নারকেলডাঙ্গার রাস্তা দিয়ে কয়েক হাজার রেলশ্রমিক মিছিল করে চলেছে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের দিকে। পার্টির মধ্যে শ্রমিকদের সম্পর্কে যাদের বদ্ধমূল ধারণা যে তারা স্বাধীনতার মর্ম বোঝে না—তারা জোর ধাক্কা খেল। সেদিন রেল শ্রমিকরা নিজেদের দাবি-দাওয়ার কথা ভুলে গেছে। তাদের স্লোগান ছিল : নৌ-বিদ্রোহ জিন্দাবাদ। নৌ-সেনা - রেল শ্রমিক ভাই ভাই। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ মুর্দাবাদ।

ঐদিন সকালে এভাবে শোভাযাত্রা করেন—হয়েল, রবসন, বার্নেট, ইন্ডিয়া

ফ্যান, এ. কে. সরকার, পটারি, কর্পোরেশন ওয়ার্কশপ ও রবার কারখানার শ্রমিকরা। (স্বাধীনতা, ২৪. ২. ৪৬)

'স্বাধীনতা'র সংবাদসূত্রে জানা যায়, কলকাতা ও শহরতলির শ্রমিকরা লাল ঝাণ্ডা ইউনিয়নগুলির ডাকে ব্যাপক সাড়া দিয়েছে। লক্ষাধিক শ্রমিক ধর্মঘট করেছে। শিয়ালদহ ও হাওড়ায় রেল বন্ধ। সারাদিন ট্রাম চলেনি। লক্ষাধিক শ্রমিকের সঙ্গে হাজার ছাত্র এই ধর্মঘটে যোগ দিয়েছে। রেল স্টেশনে ও শহরে সর্বত্র মিলিটারি ও পুলিশের টহল। ধর্মঘটীদের মধ্যে রয়েছে খিদিরপুরের ব্রুকবন্ড ও লিপটন চা কারখানা, ভারতিয়া লোহা কারখানা. ম্যাকিনটোস বার্ন, এয়ার কন্ডিশানিং কর্পোরেশন, বেরুক কেমেন্স, অন্নপূর্ণা মেটাল ওয়ার্কস্, ভারত ব্যাটারি, প্রভৃতি কারখানার শ্রমিক।

কর্পোরেশন ওয়ার্কশপের শ্রমিক, ধাঙ্গর ও মেথর কাজ বন্ধ করে। ইউনিয়ন নেতাদের বিশেষ অনুরোধে পাওয়ার হাউস ও পাম্পিং স্টেশনের শ্রমিকগণ ধর্মঘট থেকে বিরত থাকেন।

হাওড়ায় বেলুড় লোহা কারখানা, বেলুড় রেল ওয়ার্কশপ, গেস্টকীন. টার্নার মরিসন, হ্যাড ফিল্ডস্, শালিমার পেন্টস্, শালিমার রোপ. ভিক্টোরিয়া স্টিল রোপ, পোর্ট ইঞ্জিনিয়ারিং, এ. জে মেন কোং, গ্যাঞ্জেস ইংক কোং-এর শ্রমিকরা ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ করে।

ভারতিয়া ও বেরুক্ কেমেন্স্ কারখানায় মালিকের দালাল কয়েকজন 'কংগ্রেস ধর্মঘট ঘোষণা করেনি'—এই ধুয়া তুলে ধর্মঘট ভাঙার চেষ্টা করে। কিন্তু শ্রমিকদের দৃঢ়তার সামনে তারা পিছু হটে।

কলকাতা ও শহরতলির বুকে কোন রক্তক্ষয়ী ঘটনা ঘটেনি। নৌ-বিদ্রোহ আরও কয়েকদিন অব্যাহত থাকলে হয়তো কলকাতার বুকেও আগুন জ্বলত —রক্ত ঝরত। নেতাদের পরামর্শে সেদিনই অর্থাৎ ২৩ শে ফেব্রুয়ারি, শনিবার বিদ্রোহীদের কামান স্তব্ধ হয়েছে। বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করেছে।

সোমনাথ লাহিড়ী 'স্বাধীনতা'র পাতায় 'ভুলিব না' শিরোনামায় লিখছেন,

'দুইশত প্রাণ বলি দিবার পর নৌ-বাহিনীর সংগ্রামকারীরা আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। বৃটিশের বিরাট যুদ্ধ জাহাজ তাহাদিগকে ঘিরিয়া ধরিয়াছিল। বৃটিশ বিমানবহর তাহাদের মাথার উপর উড়িতেছিল। তাহাদের রসদ ফুরাইয়া আসিয়াছিল। তবুও তাহারা অপমানকর আত্মসমর্পণের কথা ভাবে নাই। তাহারা ভাবিয়াছিল দেশ তাহাদের পিছনে দাঁড়াইবে, নেতারা তাহাদের সমর্থনে বিপুল সংগ্রাম জাগাইবেন। সেই ভরসায় প্রতিটি প্রাণ বলি দিতেও তাহারা প্রস্তুত ছিল। নেতাদের কাছে শেষ আহ্বানে তাহারা জানাইয়াছিল: "বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বুটের তলায় আমরা মাথা পাতিয়া দিই—ইহা কোন দেশভক্ত চাহিতে পারেন না।"

কিন্তু দেশভক্ত নেতারা তাহাই চাহিলেন। সর্দার প্যাটেল তাহাদের উপদেশ দিলেন—তোমরা বৃটিশের কাছে আত্মসমর্পণ কর। মিঃ জিন্না

তাহাদের পরামর্শ দিলেন—'তোমরা বৃটিশের আইন অনুমোদিত পন্থা গ্রহণ কর।' বৃটিশের বন্দুক, বিমান ও যুদ্ধ-জাহাজ তাহাদের মাথা নোয়াইতে পারে নাই, দেশনেতাদের দুর্ব্বলতা তাহাদের মাথা নোয়াইতে বাধ্য করিল।

তাহাদের অনেককে হয়তো গুলি করিয়া মারা হইবে। অনেককে হয়তো কঠোর শাস্তি দেওয়া হইবে। যে দাবীর জন্য তাহারা লড়িয়াছিল তাহা হয়তো সরাসরি অগ্রাহ্য হইবে।

ইহা কি আমাদের মাথা পাতিয়া মানিয়া লইতে হইবে? কোন শুভদিনে কংগ্রেস বা লীগ নেতারা হিন্দুস্তান বা পাকিস্তানের জন্য হয়তো সংগ্রাম আরম্ভ করিবেন, সেই অনিশ্চিত আশ্বাসে দেশবাসীকে কি এখন সাম্রাজ্য-বাদের প্রতি পদাঘাত মাথা হেঁট করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে? নভেম্বরে যাহারা গুলি খাইল তাহারাই আবার বৃটিশের আদালতে শাস্তির অপেক্ষা করুক, ক্যাপ্টেন রশিদ ও অন্যান্য বন্দী কারাযন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকুক, নৌ-বাহিনীর সংগ্রামকারীরা বৃটিশের জুতোর নীচে পিষিয়া যাক, কলকাতা হইতে বোম্বাই পর্যন্ত রক্তের ঢেউ তুলিয়াও সাম্রাজ্যবাদীরা নির্ব্বিবাদে থাকুক—কিন্তু কোনো আঘাতের বিরুদ্ধেই আমরা লড়িতে পারিব না, ইহাই কি দেশনেতাদের অভিমত?

নেতারা বসিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ বসিয়া নাই। সে আমাদের বিভিন্ন অধিকার, বিভিন্ন দাবীর উপর দিনের পর দিন নির্ম্মম আঘাত করিয়া চলিয়াছে। প্রতিদিন একটা না একটা নিষ্ঠুর অত্যাচার দেশবাসীর কোনো না কোনো অংশকে বিড়ম্বিত করিতেছে। যদি আমরা সহ্য করিয়া যাই তবে হইলে একটি একটি করিয়া সব অধিকারই তো আমাদের হাত হইতে খসিয়া পড়িবে। তাহাতে কিছুদিনের মধ্যে দেশের মনোবলই যে ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

সাম্রাজ্যবাদী আঘাত আরও আসিতেছে। ব্যাপক ছাটাই আসিতেছে, খাদ্য হ্রাসের অর্দ্ধাহার আসিতেছে, দুর্ভিক্ষের চরম আঘাত আসিতেছে। ভবিষ্যৎ সংগ্রামের অনিশ্চিত আশ্বাসে ইহার প্রত্যেকটি আঘাত যদি আমাদের সহিতে হয় তাহা হইলে আমাদের গোটা জীবনই তো চুরমার হইয়া যাইবে। তখন নেতাদের দোহাই দিয়া পেট ভরিবে না, অপমানের লজ্জা মিটিবে না আত্মবিলুপ্তির চরম পরিণতিও ঠেকানো যাইবে না।

নৌ-বাহিনীর মৃত্যুভয়হীন ভাইগুলির প্রতি নেতাদের আত্মসমর্পণের পরামর্শ শুনিয়া সারা দেশও যদি সাম্রাজ্যবাদী আঘাতের কাছে বিনা প্রতিবাদে আত্মসমর্পণ করিত—তাহা হইলে ভারতবর্ষ আর মুখ দেখাইতে পারিত না। ভবিষ্যৎ সংগ্রামের বাগাড়ম্বর আমাদের লজ্জাকে শুধু আরও লজ্জাজনক করিয়া তুলিত।

কিন্তু ভারতবাসী মরে নাই। দেশের যে সঙ্ঘবদ্ধ মজুরশ্রেণী সবচেয়ে বিপ্লবী ও সবচেয়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ তাহাদিগকেই এই লজ্জা সর্ব্বাধিক পীড়া দিয়াছে। তাই বীর ভারতবাসীর প্রতিভূ হইয়া তাহারাই সকলের আগে

দাঁড়াইয়াছে। বোম্বাই শহরে প্রথম দিন এক লক্ষ, দ্বিতীয় দিন তিন লক্ষ মজুর ধর্ম্মঘট করিয়া লাল ঝাণ্ডা লইয়া বাহির হইয়াছে। মৃত্যুপথযাত্রী নাবিক ভাইদের ম্লান হতাশার সম্মুখে তাহারা আশার গর্জ্জন তুলিয়াছে—আমরা তোমাদের ভুলি নাই, ভুলিতে পারিনা, তোমাদের সংগ্রাম যে আমাদেরই সংগ্রাম। ১৩০ জন শ্রমিকের জীবন দিয়া এই প্রতিজ্ঞার মূল্য দিতে হইয়াছে, শ্রমিকের মেয়েকে পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী গুলি নিহত করিয়াছে, কিন্তু তবুও তাহারা কলরোল তুলিয়াছে—আমরা ভুলি নাই। কলিকাতার লক্ষাধিক শ্রমিক ট্রেন বন্ধ করিয়া, ট্রাম বন্ধ করিয়া, কারখানা বন্ধ করিয়া সেই আহ্বানের প্রতিধ্বনি তুলিয়াছে—ভুলি নাই, ভুলিতে পারিব না। করাচীর হাজার হাজার শ্রমিক, বোম্বাইয়ের জনসাধারণ, কলিকাতার স্কুলের ছাত্র পর্যন্ত তাহাতে যোগ দিয়াছে, প্রতিজ্ঞা জানাইয়াছে—সাম্রাজ্যবাদের প্রতিটি আঘাত প্রতিঘাত করিবার জন্য আমরা আছি, ভারতবাসীর মেরুদণ্ডকে আমরা বাঁকিতে দিব না।' (স্বাধীনতা, ২৪. ২. ৪৬)

পনেরো

বোম্বাই শহরে শান্তি ফিরিয়ে আনতে দুই ব্যাটেলিয়ান খাস বৃটিশ সৈন্য নিযুক্ত করতে হয়। সরকারি হিসেবে এই কয়দিনের সংঘর্ষে ২২৮ জন সাধারণ মানুষ নিহত ও ১০৪৬ জন আহত হয়েছে। সরকারী তরফে তিন জন পুলিশ নিহত ও ৯১ জন আহত হয়। (মডার্ন ইন্ডিয়া, পৃ ৪২৪)

রজনী পাম দত্ত লিখছেন,

যুদ্ধোত্তর কালে ভারতের বুকে ঘনায়মান আগ্নেয় পরিস্থিতিতে নৌ-বিদ্রোহ ও বোম্বাইয়ের রাজপথে জনতার জঙ্গী লড়াই যে এক নতুন শিবির বিন্যাস ঘটিয়েছে—তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। একদিকে দেখা গেল নীচের তলার সাধারণ মানুষ কী অসীম তেজ ও দৃঢ়তা নিয়ে লড়তে পারে এবং সেই লড়াইয়ের আগুনে কীভাবে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ও কংগ্রেস লীগ ঐক্যের জটিল সমস্যাও সহজ সরল পথে সমাধান হয়ে যায়। এটাও দেখাল কীভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের আঙিনায় ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী চলে আসছে এবং তার ফলে ভারতের বুকে বৃটিশ শাসনের অস্তিত্বের শিকড়ে পড়েছে টান। অপরদিকে উদ্‌ঘাটিত জাতীয় নেতৃত্বের যাবতীয় অন্তর্নিহিত দুর্বলতা, তাদের মধ্যে অনৈক্য, দ্বিধাবিজড়িত মনোভাব ও জাতীয় সংগ্রাম পরিচালনার ক্ষেত্রে অক্ষমতা।' (ইন্ডিয়া টুডে, পৃ ৫৮৩)

কংগ্রেস নেতারা একবাক্যে এবং একই সুরে বিদ্রোহী, নাবিক ও জঙ্গী জনতাকে 'হিংসাশ্রয়ী' কাজের জন্য প্রবল নিন্দাবাদ ও গালমন্দ দিতে থাকেন।

সর্দার বল্লভভাই তো বৃটিশ কম্যান্ডার-ইন-চীফের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বললেন —নৌ-সেনাদের অস্ত্র ধারণ করা উচিত হয়নি। 'নৌ-বাহিনীতে শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজন রয়েছে।' বল্লভভাই প্যাটেল (১লা মার্চ, ১৯৪৬) অন্ধ্রের কংগ্রেস নেতা বিশ্বনাথনকে একটা চিঠিতে লেখেন: 'সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা নিয়ে ছেলেখেলা করা উচিত নয়। স্বাধীন ভারতেও আমাদের সেনাবাহিনীর প্রয়োজন পড়বে।'

মহাত্মা গান্ধীও সর্দারের সঙ্গে পুরোপুরি একমত। পুনা, ২৩শে ফেব্রুয়ারি, গান্ধীজী বলেন:

'বোম্বাইয়ের ঘটনাসমূহ আমি দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিয়াছি। নৌ-বাহিনীতে এই বিদ্রোহ এবং তাহার পরবর্তী ঘটনা যাহা ঘটিতেছে তাহাকে কোন ক্রমেই অহিংসা কার্য বলা যায় না। ⋯ কাণ্ডজ্ঞানহীন হিংসার পরিচিত এবং অপরিচিত নেতাদের এইসব কাজ করিবার আগে জানিয়ে রাখা উচিত যে তাঁহারা কি করিতেছেন। ⋯

⋯ভারতীয় নৌ-বাহিনীর লোকরা অহিংসা কি তাহা যদি জানেন এবং বুঝিতে পারেন, তাহা হইলে সম্মিলিত অহিংস প্রতিরোধের পন্থা মর্যাদা-সম্পন্ন, পুরুষোচিত এবং সম্পূর্ণ কার্যকরী হইতে পারে—আর ব্যক্তিগত অহিংস প্রতিরোধ হইলে তো হইবেই। চাকুরী যদি তাঁহাদের নিকট বা ভারতের পক্ষে অমর্যাদাকর হয়, তবে তাঁহারা চাকুরী করেন কেন? তাঁহারা ভারতের পক্ষে খারাপ এবং অযোগ্য উদাহরণ সৃষ্টি করিতেছেন।

হিংসা কার্যের জন্য হিন্দু মুসলমান এবং অন্যান্যের মিলন অপবিত্র এবং ইহার পরিণাম পরস্পরের বিরুদ্ধে হিংসা—ইহাও ভারত ও পৃথিবীর পক্ষে অশুভ।' (স্বাধীনতা, ২৪. ২. ৪৬)

২৬শে ফেব্রুয়ারি বোম্বাই শহরে চৌপট্টীর জনসভায় জহরলাল নেহরু ও প্যাটেল বিদ্রোহী নাবিক ও লড়াকু মানুষদের আরেক প্রস্থ নিন্দাবাদ করলেন। তাঁরা কংগ্রেসের নির্দেশ অমান্য করে ধর্মঘট ও হরতাল করাতে ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

প্যাটেল বললেন, কংগ্রেস যখন বিদ্রোহ করার কোন নির্দেশ দেয়নি তখন জনসাধারণ কেন সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথা চিন্তা করে, একথা আমি বুঝতে পারি না। বোম্বাইয়ের ঘটনাবলির জন্য তিনি কমিউনিস্ট পার্টিকে দায়ী করে বলেন, 'কমিউনিস্ট পার্টি জনসাধারণকে ভুল নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং জনসাধারণের দেশপ্রেমের সুযোগ গ্রহণ করার জন্য চেষ্টা করছে। সম্প্রতি কয়েক বৎসর তাদের দলের মর্যাদা নষ্ট হয়েছে—এখন তারা সেই লুপ্ত মর্যাদা পুনরুদ্ধার করার উদ্দেশ্যে এরকম করছে।'

পণ্ডিত নেহরু বক্তৃতা প্রসঙ্গে গত কয়েকদিনের ব্যাপক হিংসাত্মক কার্য-কলাপের নিন্দা করে বলেন, 'ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে হিংসাত্মক আন্দোলনের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের

জন্য যদি হিংসাত্মক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি, তা হলে আমিই সর্বপ্রথম আহ্বান জানাব এবং তা প্রকাশ্যেই ঘোষণা করব। কিন্তু বর্তমানে আমি মনে করি যে অহিংসাই ভারতবর্ষকে স্বাধীনতার পথে নিয়ে যেতে পারবে।' (স্বাধীনতা, ২৮.২.৪৬)

বস্তুত নৌ-বিদ্রোহ ও পরবর্তী ঘটনাবলি প্রসঙ্গে কংগ্রেসের উপরতলার নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি এক ও অভিন্ন। 'ফ্রী প্রেস জার্নাল'-এর তদানীন্তন সম্পাদক এস. নটরাজন বলছেন, 'সে সময় কয়েকদিনের জন্যে আসফ আলি বোম্বাই সফরে আসেন। তিনি আমায় বলেন যে শিগ্গীরই ভারতীয়রা ক্ষমতার আসনে বসতে যাচ্ছে, যদি এখন থেকে সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা কঠোর-ভাবে রক্ষিত না হয়, তখন আমাদের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে এ নিয়ে ঝামেলায় পড়তে হবে।' (মিউটিনি অফ দি ইনোসেন্টস, ভূমিকা)

এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম হলেন কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট নেত্রী অরুণা আসফ আলি। বস্তুত বোম্বাইয়ের হরতাল ও ধর্মঘট সফল করার ক্ষেত্রে অরুণা আসফ আলি ও অচ্যুত পটবর্ধনের অবদান ছিল। অরুণা গান্ধীজীর পুনা-বিবৃতির জবাবে বলেন, 'যে কংগ্রেসীরা নিজেরা আইনসভার সদস্য হয়ে ক্ষমতায় বসতে যাচ্ছে, নাবিকদের চাকরি ছেড়ে দেবার কথা বলা তাদের মুখে শোভা পায় না।' অরুণা বলেন, 'হিন্দু মুসলমান ঐক্যের মীমাংসা তো নির্বাচনী যুদ্ধে না গিয়ে লড়াইয়ের ব্যারিকেডেই সমাধান করা সহজ।'

গান্ধীজী তার উত্তরে বলেন, 'অরুণা চান, ব্যারিকেডের পিছনে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রশ্নের মীমাংসা। তার অর্থ তো উচ্ছৃঙ্খল দঙ্গলের হাতে ভারতকে সঁপে দেওয়া। এ দৃশ্য দেখার জন্য আমি ১২৫ বৎসর বাঁচতে চাই না। তার আগে আমি আগুনে আত্মাহুতি দেব।' (হরিজন, ৭ই এপ্রিল, ১৯৪৬)

রজনী পাম দত্ত বলছেন, 'অথচ কংগ্রেসের এই নেতারাই তো সুভাষবাবু ও আজাদ হিন্দ ফৌজের শৌর্য বীর্য নিয়ে কত প্রশস্তিবাক্য উচ্চারণ করেছেন। এঁরাই তো বড় বড় জনসভার মঞ্চ থেকে ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলনের মহিমা কীর্তন করেছেন। আজ এঁদের হল কী।' (ইন্ডিয়া টুডে পৃ ৪৮৪)

আজ যখন গণ-অভ্যুত্থান শুরু হয়েছে এবং হিন্দু-মুসলিম ঐক্য লড়াইয়ের মধ্যে বাস্তবায়িত হয়ে হয়ে উঠেছে—যখন সশস্ত্রবাহিনী এসে স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল প্রবাহে মিশে গিয়েছে এবং স্বাধীনতার রুদ্ধ দুয়ার উন্মুক্তপ্রায়—তখন সেই নেতৃত্বের এ কী পরিবর্তিত মনোভাব!

আবার যেন ১৯২২ সালের চৌরিচোরা ও ১৯৩২ সালের গান্ধী-আরুইন চুক্তির পুনরাবৃত্তি। গণজাগরণ ও সংস্কারবাদী নেতৃত্বের মধ্যে বিচ্ছেদ এবং তার পরিণতিতে সাম্রাজ্যবাদের কাছে সংস্কারবাদী নেতৃত্বের আত্ম-

সমর্পণ এবার আরও প্রকট। গণজাগরণের মধ্যেই যেন আজ এই সংস্কারবাদী নেতৃত্বের মৃত্যুবীজ নিহিত—তাই সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্বের চেয়েও গণবিদ্রোহ আরও ভয়াবহ। গণ-বিদ্রোহ যদি জয়ী হয় তাহলে এই নেতৃত্বের আসন টলে যাবার সমূহ সম্ভাবনা।

জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বের এই দুর্বলতা চিনে নিতে সাম্রাজ্যবাদের এতটুকু দেরি হয়নি। তারা এর পুরো সদ্ব্যবহার করেছে। একদিকে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা পাবার লোভ এবং গণ-আন্দোলন সম্পর্কে অপরিসীম ভীতি ও অপরদিকে পারস্পরিক বৈরিতা ও অবিশ্বাস—কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃত্বের এই দ্বৈত চরিত্রকে, কেবিনেট মিশন আলাপ-আলোচনার সময় পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছে।

১৮ই ফেব্রুয়ারি বোম্বাইয়ে নৌবিদ্রোহ শুরু হয়।

১৯শে ফেব্রুয়ারি হাউস অব কমন্সের সভায় বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী এটলী ভারতে কেবিনেট মিশন প্রেরণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। (ইন্ডিয়া টুডে, পৃ ৫৮৪-৫৮৫)

সামান্য দেরিতে হলেও বোম্বাইয়ের ঘটনার প্রেক্ষাপটে জাতীয় নেতৃত্বের দিক পরিবর্তন সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ নতুন উপলব্ধির পরিচয় দিলেন। 'জাতীয় নেতৃত্ব কোন্ পথে—ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম না ঘৃণ্য আত্ম-সমর্পণ?'—এই শিরোনামায় গঙ্গাধর অধিকারীর এক মূল্যবান রচনায় পার্টির সর্বশেষ উপলব্ধির স্বাক্ষর বর্তমান। গঙ্গাধর অধিকারী লিখছেন:

২১শে হইতে ২৩শে ফেব্রুয়ারী, বোম্বাইয়ে যে সব ঘটনা ঘটিয়া গেল তাহাতে তিনটি বৈশিষ্ট্য খুব স্পষ্ট হইয়া দেখা দিয়াছে। জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই তিন বৈশিষ্টা অবিস্মরণীয় হইয়া রহিবে এবং জনগণের জীবন ধারায় চূড়ান্ত পরিবর্তন সূচনা করিবে।

সুবিচার ও সমানাধিকার আদায় করার জন্য নৌসেনারা শান্তিপূর্ণ হরতাল করেন। তাঁহাদের উপর গুলি চালানো হইলে তাঁহারা আত্মরক্ষার জন্য ও আদর্শরক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করেন। সত্য বটে, মাত্র ৭ ঘণ্টা লড়াইয়ের পর তাঁহারা শান্ত হন, কিন্তু জনগণের কাছে আত্মসমর্পণ করার আগে পর্যন্ত তাঁহারা অস্ত্রহাতে প্রস্তুত ছিলেন।

আমাদের দেশের মহান জনগণের সন্তান তাঁহারা। তাই যেদিন তাঁহারা অস্ত্রধারণ করেন সেইদিনই তাঁহাদের সমর্থনে জনসাধারণকে ধর্মঘট ও হরতাল করিতে তাঁহারা অনুরোধ জানান। কংগ্রেস, লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টিকে তাঁহারা ডাক দিয়াছিলেন। কিন্তু একা কমিউনিস্ট পার্টিই সে ডাকে সাড়া দেয়। শুধু বোম্বাইয়ে নয়—মাদ্রাজ, মাদুরা, ত্রিচি ও কলিকাতার জনসাধারণ কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের নিষেধ সত্ত্বেও সে ডাকে আগাইয়া আসে, বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর গুলির সামনে বুক ফুলাইয়া দাঁড়ায়। শহরের পথে পথে গড়া প্রতিরোধের প্রাচীরে প্রাচীরে উড়ে শহীদের রক্তরঞ্জিত তিনটি

পতাকা। ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের পথে আলো জ্বালাইতে যাঁহারা আজ শহীদ হইলেন তাঁহারা চিরকালের জন্য জাতির জীবনে মহান হইয়া রহিলেন। বাচাল রাজনৈতিক নেতারা এই ঘটনাকে 'রাজকীয় নৌবাহিনী'র ঘটনা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান। সাম্রাজ্যবাদের রক্তচক্ষু বড় সাহেবেরা ইহাকে 'বিদ্রোহ' ও 'নিয়মানুবর্তিতার অভাব' বলিয়া ধমকায়। কিন্তু ভবিষ্যতে স্বাধীন ভারতের ঐতিহাসিক ইহাকে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের গৌরবময় শেষ অধ্যায় বলিয়া অভিহিত করিবেন।

বোম্বাই ঘটনার তাৎপর্য

কোন বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনার খুব নিকটে থাকিলে অনেক সময় তাহার সম্পূর্ণ তাৎপর্য্য বুঝিতে অসুবিধা হয়। তবু রাজনীতিতে যাহারা অন্ধ ও দেউলিয়া তাহারা ছাড়া সকলেই বুঝিবে এই ঘটনা আগামী বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের পূর্ব্বাভাষ। সাম্রাজ্যবাদী শাসনে আমাদের দেশের জনসাধারণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে একথা কে না জানে। ছয় বছরের যুদ্ধ যে দুর্দ্দশা ও দারিদ্র্য গভীরতর করিয়াছে, ১৯৪৩ সালে যে দুর্ভিক্ষ হইয়া গিয়াছে তাহা হইতেও ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সামনে আমরা দাঁড়াইয়াছি।

শ্রমিকের সামনে আজ বেকারী, মজুরী হ্রাস ও অনাহার নিশ্চিত মৃত্যুকে আগাইয়া আনিতেছে। ইহার উপর প্রহরে প্রহরে সাম্রাজ্যবাদী প্রভুর চাবুকের আঘাত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ আজ দিনে দিনে উপচাইয়া পড়িতে চায়। বোম্বাই-এর ঘটনা বিদ্যুতের চমকের মত বিদ্রোহের এই ঘন জমাট মেঘকে দেখাইয়া দিয়াছে, জানাইয়া দিয়াছে এই সংকট কত গভীর! কি মহান! অপূর্ব সুযোগ এবং অনুকূল অবস্থা আমাদের করতলগত। সাম্রাজ্যবাদী শাসন আর আমাদের দাবাইতে পারিবে না। কারণ তাহার শাসনের যন্ত্র, তাহারই সৈন্য, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী, আজ তাহাদের হাত হইতে ফসকাইয়া যাইতেছে। তাহারই অস্ত্র আজ তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেছে। এমন ঘটনা যখন ঘটে তখন বুঝিতে হয় মৃত্যুর হাত হইতে সাম্রাজ্যবাদের আর রক্ষা নাই। পরাধীন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে পা মিলাইয়া আওয়াজের সঙ্গে আওয়াজ তুলিয়া যখন সেই দেশের সশস্ত্রবাহিনী অগ্রসর হয় তখন সে দেশে সাম্রাজ্যবাদের বিজয় অভিযান মিথ্যা হইয়া যায়। সত্য হয় কেবল স্বাধীনতা ও ক্ষমতা লাভের জন্য জনগণের জয়যাত্রা।

বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের যুগ সমাগত

জীর্ণ সাম্রাজ্যবাদী শাসনে বিরক্ত হইয়া যখন জনসাধারণ সেই শাসন চূর্ণ করিতে হাজারে হাজারে পথে পথে প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ে ও সেই প্রাচীরের পাশে জান কোরবানী করে, বুঝিতে হইবে তখন নূতন যুগ, জীর্ণ ব্যবস্থার বৈপ্লবিক উচ্ছেদের যুগ সুরু হইয়া গিয়াছে। বোম্বাই, করাচী,

মাদ্রাজ ও কলিকাতার ঘটনা বর্তমান অবস্থার সেই বৈশিষ্ট্যই চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিতেছে। এই ঘটনা কেবল লোকের অসন্তোষের পরিমাণ বুঝাইয়া দিতেছে না, ভারতের সাম্রাজ্যবাদী শাসনে যে বৈপ্লবিক সংকট সুরু হইয়াছে তাহাও দেখাইয়া দিতেছে। এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, ভারতীয় প্রধান দলগুলির নেতারা বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান সংগঠিত করিয়া যথাযোগ্য রূপ দিয়া, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য ইহাকে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে পরিণত করিবেন, না ইহাকে অস্ত্রহীন করিয়া নিজেদের মধ্যে বিরোধ বাড়াইবার কাজে ব্যবহার করিবেন? কিংবা সাম্রাজ্যবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়া জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবেন? এই ঘটনাকে কংগ্রেস কি দৃষ্টিতে বিচার করিয়াছে, কি নেতৃত্ব দিয়াছে এবং ভবিষ্যতে কি কি দিবে তাহা বিচার করা কর্তব্য।

এই কি কংগ্রেসের নেতৃত্ব!

২১শে ফেব্রুয়ারী যখন নৌ-বাহিনীর ছেলেদের উপর গুলি চলিতেছিল তখন সর্দার প্যাটেলকে হরতালের আহ্বান জানাইতে বলিলে তিনি মুখের উপর তাহাও অস্বীকার করেন। তাঁহার পরবর্ত্তী বিবৃতিতে তিনি বলিয়াছেন, 'নৌসেনাদের অস্ত্রধারণ করা উচিত হয় নাই'। যাহারা হরতালের সংকেত দিয়াছিল তাহাদের তিনি নিন্দা করিয়াছেন। যাহারা মরিয়াছে তাহাদের জন্য তিনি চোখের জল ফেলিলেন বটে, কিন্তু গুণ্ডাগিরির বিরুদ্ধে বক্তৃতায় সে চোখের জল পড়িতে না পড়িতেই শুকাইয়া গেল। বৃটিশ সমরযন্ত্রের যে গুণ্ডাগিরির ফলে শত শত নরনারী গুলির আঘাতে প্রাণ দিল—সে গুণ্ডাগিরির বিরুদ্ধে তাঁর মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না। যাহারা সাহসের সঙ্গে পুলিশ ও সামরিক জুলুমের সামনে দাঁড়াইয়া প্রাণ দিয়াছে তাহারা নিন্দিত হইল এবং তিনি প্রধান সেনাপতির কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিলেন, 'নৌবাহিনীর মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ থাকা উচিত'। সাম্রাজ্যবাদের সামরিক রীতিনীতির তুলাদণ্ডে তিনি এমনি করিয়া নৌবাহিনীর বীর যুবকদের বিচার করিলেন। জাতির নেতার মুখ দিয়া একথা বাহির হইল না যে, দেশপ্রেম ও দেশের সম্মানের মাপকাঠিতে আইনের বিরুদ্ধে তোমাদের অতুলনীয় 'বিদ্রোহ' সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে। বোম্বাইয়ের সর্বত্র ধর্মঘট ও হরতালের ফলে সৈন্যবাহিনী ও জনগণের মধ্যে যে অভূতপূর্ব সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়িয়া উঠিয়াছিল সর্দারের মুখে তাহা কেবল বিষোদ্গার উঠাইল: 'অরাজকতা ও গুণ্ডামিকে প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে'। কংগ্রেস নেতৃত্বের এই হেয় আচরণ জনগণের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারের প্রকাশ্য সাফাই হইয়া দাঁড়াইল। পুলিশ ও সামরিক বাহিনী ইহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে এতটুকু অবহেলা করে নাই। নৃশংস অত্যাচার চালাইয়াছে। শহরের নিরস্ত্র জনগণের বিরুদ্ধে দুইটি গোরা সৈন্যবাহিনী ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া গাড়ী, ব্রেনগান ও রাইফেলে সজ্জিত হইয়া পুরো সামরিক কায়দায়

লড়িয়াছে এবং ৪৮ ঘণ্টায় ২০০ জনকে খুন ও ২০০০ জনকে আহত করিয়াছে। সিপাহি বিদ্রোহের পর এইরকম ঘটনা আর কখনো ঘটে নাই।

সরকারী অত্যাচারের নৈতিক সমর্থন

এই একই রকমভাবে নৌবাহিনীর 'বিদ্রোহ'-কে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ নিন্দা করার ফলে সমর ও নৌবিভাগের কর্তাদের নৈতিক সমর্থন মিলিয়া গিয়াছে। তাহারা 'দলের পাণ্ডাদের' বরখাস্ত করিয়া সামরিক আদালতে বিচার করিতেছে। বিনা বাধায় তাহারা এই অন্যায় করিয়া যাইতেছে। গান্ধীজীও সর্দার প্যাটেলের নীতি সমর্থন করিয়াছেন। পুলিশ ও মিলিটারীর বিরুদ্ধে যে মহান হিন্দু মুসলিম ঐক্য গড়িয়া উঠিয়াছিল তিনি তাহারও নিন্দা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে হিংসার পথে যে হিন্দু মুসলিম একতা সৃষ্টি হয় তাহা পরস্পরের মধ্যে হিংসা সৃষ্টি করিয়া ক্ষান্ত হয়। ইহা তাজ্জব যুক্তি। মিলিটারীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চালাইবার জন্য জনসাধারণ যে যুক্তি সহজেই মানিয়া লয় তাহা হইতে নেতারা শিক্ষালাভ করিতে চাহেন না। এই উদাহরণ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সারা ভারতে ঐক্যবন্ধ সংগ্রামের জন্য নেতাদের উৎসাহিত করে না।

আপোষের লোভে তোষণ নীতি

প্রকৃত ব্যাপার হইতেছে এই যে ঐক্যবন্ধ সংগ্রামের কথা দূরে থাক কংগ্রেস নেতারা কোনরূপ সংগ্রামের কথাই এখন চিন্তা করিতেছেন না। লাহোরে মওলানা আজাদ যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে একথা স্পষ্ট আছে : এখন ধর্মঘট, হরতাল বা কর্তৃপক্ষকে অগ্রাহ্য করা চলিবে না। বিদেশী শাসন সাময়িকভাবে 'তত্ত্বাবধায়ক' সরকারের কাজ করিতেছে। বর্ত্তমানে এমন কিছু ঘটে নাই যাহার জন্য তাহার সঙ্গে লড়িতে হইবে। ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে অস্বীকার না করা পর্যন্ত সংগ্রাম স্থগিত। এবং সংগ্রাম এখন দীর্ঘকালের জন্য বন্ধ রহিল। সময় আসিলে কংগ্রেস ডাক দিতে ইতস্ততঃ করিবে না। ইতিমধ্যে সমস্ত শক্তি সঞ্চিত করা ও সংকট এড়াইয়া চলা কর্ত্তব্য।

সাম্রাজ্যবাদের উপর অগাধ বিশ্বাস

"সংগ্রামের জন্য ভবিষ্যতে চাতকপাখীর ন্যায় তাকাইয়া থাক এবং ইতিমধ্যে বিদেশী শাসকের উপর বিশ্বাস করিয়া দেখ।" কারণ তাঁহারা এখন 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার'। আশ্চর্য্য বিশ্লেষণ! যাহারা এদেশকে মুহূর্ত্তে 'ইন্দোনেশিয়া' বানাইবার জন্য লক্ষ লক্ষ সশস্ত্র বাহিনী প্রস্তুত রাখিয়াছে—তাহারা বর্ত্তমানে 'তত্ত্বাবধায়ক' বলিয়া কথিত হইতেছে। তাহারা যদি নৌবাহিনীতে আমাদের সন্তানদের গুলি করিয়া মারে আমরা তাহার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাইতে পারিব না। যে সরকারের অনুপযুক্ত ও চোরা আমলাতন্ত্র তিন বছরের মধ্যে দুইবার দুর্ভিক্ষ পয়দা করিতেছে তাহাদের

'তত্ত্বাবধায়ক' বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। এই সরকারী খাদ্য ব্যবস্থাকে 'স্বেচ্ছায় সহযোগিতা' দিতে হইবে। কংগ্রেস নেতারা 'হৃদয় পরিবর্তনের' অপূর্ব্ব উদাহরণ সৃষ্টি করিতেছেন। অথচ সাম্রাজ্যবাদের দিক হইতে পরিবর্ত্তনের কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।

নেহরুর কথায় ও কাজে বিরোধ

পণ্ডিত নেহরু বোম্বাইয়ের ঘটনা জানিবার জন্য বিশেষভাবে আসিয়াছিলেন। অন্য রাজনৈতিক নেতাদের তুলনায় তিনি এই হরতালের 'রাজনৈতিক গুরুত্ব' বেশী বুঝিয়াছিলেন। স্বীকার করিয়াছিলেন, 'ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর মন কোথায় যাইতেছে তাহা এই ঘটনায় অভিব্যক্ত হইয়াছে এবং বৃটেন ভারতের সৈন্য ও জনসাধারণের মধ্যে যে লোহার প্রাচীর খাড়া করিয়াছেন তাহা আজ ধ্বসিয়া পড়িয়াছে এবং টুকরা টুকরা হইয়া যাইতেছে'। (২রা মার্চ, ঝাঁসিতে প্রদত্ত বক্তৃতা)

চমৎকার কথা ! কিন্তু কাজের মধ্য দিয়া ঘটনাকে যাচাই করিতে গিয়া পণ্ডিত নেহরু প্যাটেল ও আজাদের সুরে সুর মিলাইলেন। ক্যাসেল ব্যারাক হইতে নৌ-সেনারা বৃটিশ সামরিক পুলিসের প্রথম গুলির প্রত্যুত্তরে যে '৭ ঘণ্টার বন্দুকের লড়াই' করিয়াছিলেন পণ্ডিত নেহরু তাহাকে ঠাট্টা করিয়াছেন : ···বলিতে গেলে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজের ফলে সহরে খুব উত্তেজনা দেখা যায়। সহরের মধ্যে নানাপ্রকার দল তাহার সুযোগ লইতে থাকে।'

বিরাট শক্তির বিরুদ্ধে ইহা নিতান্ত সামান্য বন্দুকের আওয়াজই বটে। ইহারই আওয়াজে ভারতের নৌবাহিনী ও জনগণের মধ্যেকার বহুকালের লৌহ প্রাচীর গুঁড়া হইয়া গিয়াছে। এই আওয়াজ ঐতিহাসিক গোলাবর্ষণের আওয়াজ। এই আওয়াজে জনসাধারণ যেরকম ব্যাপক আকারে সাড়া দিয়াছে তাহাকে কোন ছোট দলের কাজ কেবল অন্ধেরাই বলিতে পারে। নেহরু নৌবাহিনীর কেন্দ্রীয় কমিটির ১৫ জনকে ভৎসনা করিয়া বলিয়াছেন যে তাহারা বোম্বাই, ভারত ও দুনিয়ার অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানে না। তাহারা হামবড়াই করিয়া ধর্মঘটের আহ্বান দিয়া ভাল কাজ করে নাই। নেহরুর এই ভৎসনা একেবারেই কালোপযোগী নহে। ন্যায্য দাবী ও সমানাধিকারের জন্য যে ধর্মঘট কমিটি ২০ হাজার নৌসেনাকে ঐক্যবদ্ধ করিয়াছে সেই ধর্মঘট কমিটির জনসাধারণের সাহায্য চাহিবার অধিকার নিশ্চয় আছে। বিশেষ করিয়া নিশ্চিত ধ্বংসের সামনে দাঁড়াইয়া তাহারা সাহায্য চাহিয়াছে। জনসাধারণ তাহাদের অধিকার স্বীকার করিয়াছিল, তাই তাহারা প্যাটেল ও নেহরুর বাধাসত্ত্বেও অভূতপূর্বভাবে সাড়া দিয়াছে।

বিপ্লবের নূতন মতবাদ না ভীরুতা ?

বোম্বাইয়ে নেহরু দেড় ঘণ্টা ধরিয়া সংবাদপত্রের রিপোর্টারদের কাছে যে বিবৃতি দেন তাহাতে মিলিটারীর নৃশংস গুলিচালনার বিরুদ্ধে একটি কথা

উচ্চারণ করিলেন না। ব্যারিকেডের সামনে দাড়াইয়া যাহারা পুলিশ ও মিলিটারীর অত্যাচারের প্রতিবাদে প্রাণ দিয়াছে তাহাদের বীরত্বের কোন প্রশংসা তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। তাহার পরিবর্তে বর্তমান যুগে ব্যারিকেড যুদ্ধ যে বৃথা তাহার উপর দীর্ঘ বক্তৃতা তিনি দিলেন। তিনি বলিলেন ইহা অষ্টাদশ শতাব্দীর বিপ্লবের অস্ত্র, এখন একেবারে অচল হইয়া পড়িয়াছে। 'মেশিনগানের বিরুদ্ধে রাইফেল, কামানের বিরুদ্ধে বন্দুকের লড়াই চলে না।'

কোন প্রকৃত বিপ্লবী একথা কখনো বিশ্বাস করে না যে, জনগণের সম্পর্ক ছাড়া কোন ছোট দল স্বতঃস্ফূর্ত হিংসাত্মক কাজের দ্বারা ক্ষমতা লাভ করিতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া একথা কখনো বলা চলে না যে. অত্যাচারীর অস্ত্র বড় বলিয়া অত্যাচারিত ও পরাধীন দেশের লোক এখনো অস্ত্রধারণ করিতে পারিবে না। ইহা বিজ্ঞের কথা নয়—ভীরুতার যুক্তি। পরাধীন দেশের লোক কখনো তাহার অত্যাচারীর বিরুদ্ধে ভাল যোগাড় করিতে পারে না।

বিপ্লবের চিরন্তন নীতি

কিন্তু পরাধীন দেশের জনগণ ব্যাপক আন্দোলনের ফলে অধিকাংশ লোকের সমাবেশ করে এবং তাহার সঙ্গে সংযুক্ত করে সশস্ত্রবাহিনীকে। ফলে তাহাদের দুর্বল অস্ত্র সবল হইয়া অত্যাচারীকে হারাইয়া দেয় ও শ্রেষ্ঠ অস্ত্র ছিনাইয়া লয়। বিপ্লবের এই হইল সনাতন কালের আইন। এ আইন যেমন ১৮/১৯ শতাব্দীতে চলিয়াছে—তেমনি আজও চলিবে। বিপ্লব ও সশস্ত্র বিদ্রোহ সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরুর গবেষণার প্রকৃত অর্থ হইল আসল সমস্যাকে ধামা চাপা দেওয়া। বোম্বাইয়ের রাস্তায় রাস্তায় যাহা ঘটিয়াছে তাহা ছোট ছোট দলের দ্বারা সংগঠিত হিংসাত্মক ঘটনা ও গুণ্ডাদের লুণ্ঠনের ব্যাপার নয়। এইরূপ ব্যাপার সামান্যই ঘটিয়াছে। আসলে সহরের অধিকাংশ জায়গায় জনসাধারণ ও শ্রমিকেরা খুনী পুলিশ ও মিলিটারীর বিরুদ্ধে মৃত্যু-ভয়হীন প্রতিরোধ লড়াই লড়িয়াছে।

১৯৪২ সাল ও ১৯৪৬ সাল

১৯৪২ সালে জনগণের প্রতিরোধের অনুরূপ ঘটনাকে যদি পণ্ডিত নেহরু প্রাণ খুলিয়া প্রশংসা করিতে পারিলেন, তাহা হইলে ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ঘটনায় সেই প্রশংসা কোথায় গেল? কংগ্রেস ডাক দেয় নাই বলিয়া? কমিউনিস্টরা হরতালের আহ্বান জানাইয়াছে বলিয়া? ইহার জন্য মিলিটারীর অত্যাচারকে আর অত্যাচার বলা হইবে না? জনগণের অপূর্ব বীরত্ব তাহার মহিমা হারাইয়া ফেলিবে? আসল কথা হইতেছে এই যে, যে কংগ্রেস নেতারা কয়েক মাস আগে ১৯৪২ সালের সংগ্রামের এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের মহিমায় হুঙ্কারনাদ করিতেছিলেন, আজ যুদ্ধোত্তর যুগে

বিপ্লবের উত্তাল তরঙ্গ তাঁহাদের হাত-পা ঠাণ্ডা করিয়া দিতেছে। দলগত স্বার্থের খাতিরে ১৯৪২ সালের সংগ্রাম ও আজাদ হিন্দ ফৌজের স্মৃতির ঢাক পিটানো খুব সহজ। আজিকার কর্ত্তব্য হইতেছে যে দেশের সকল শ্রেণীর লোক ও সেনাবাহিনীর মধ্যে যে অসন্তোষ গর্জ্জিয়া উঠিয়াছে তাহাকে সংগঠিত করা। প্রত্যেকের কাছে আজ সাম্রাজ্যবাদী শাসন অসহ্য। যেমন তেমন করিয়া ইহার অবসান ঘটাইতে সকলে আজ ব্যগ্র। কোন একটি দল এই বিরাট গণজাগরণকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া নেতৃত্ব দিতে পারে না। কংগ্রেস. লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টি কোন দল একা এই কাজ করিতে পারে না।

ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের আহ্বান

আমাদের পার্টি প্রস্তাব করিয়েছে যে সকলের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আদায় করিয়া দিবার ভিত্তিতে যদি শেষ সংগ্রামের জন্য ঐক্যবদ্ধ পরিকল্পনা কংগ্রেস ও লীগ গ্রহণ করে তাহা হইলে আমাদের মিলিত শক্তির সামনে সাম্রাজ্যবাদ ধ্বসিয়া পড়িবে এবং অত্যন্ত কম রক্তপাতে আমাদের দেশের নূতন যুগের সূচনা হইবে। কিন্তু কংগ্রেস ও লীগ নেতৃত্ব স্বাধীনতা বা ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের জন্য কোন ঐক্যবদ্ধ পরিকল্পনার কথা চিন্তা করিতে পারেন না। একতার উপর উভয়দলের বিশ্বাস নাই। নিজ নিজ দলের উপর অগাধ বিশ্বাস লইয়া দুই দলের নেতৃত্ব ভাবিতেছেন যে, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তাঁহারা পৃথকভাবে আপোষ করিতে পারিবেন। 'প্রত্যেকের দৃঢ় বিশ্বাস' এই যে বৃটিশ শান্তিপূর্ণভাবে ভারতবর্ষের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করিবে। এই কারণে আজ তাঁহারা প্রত্যেকেই সাম্রাজ্যবাদের আস্থা অর্জন করিতে ও তাহাকে একপক্ষের সহিত পৃথক আপোষে রাজী করাইতে ব্যস্ত। সকলের স্বাধীনতা একত্রে আদায় করার ব্যবস্থার দিকে কাহারো নজর নাই ' (স্বাধীনতা, ৮.৩.১৯৪৬)

প্রবন্ধের উপসংহারে অধিকারী লিখছেন, 'সাম্রাজ্যবাদে বিশ্বাস নয়—গণবিপ্লবের প্রস্তুতি চাই।'

অধিকারীর এই রচনা যুদ্ধোত্তর ভারতের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির এক সার্থক বিশ্লেষণ। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লিখেছেন : 'বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের যুগ সমাগত।' বিপ্লবের চিরন্তন নীতি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'পরাধীন দেশের জনগণ ব্যাপক আন্দোলনের ফলে অধিকাংশ লোকের সমাবেশ করে এবং তাহার সঙ্গে সংযুক্ত করে সশস্ত্র বাহিনীকে।' নৌবিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে এটা দিনের আলোর মতো স্বচ্ছ যে অনুরূপ অবস্থা ভারতে সৃষ্টি হয়েছে। অধিকারী সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন করেছেন, 'ভারতের প্রধান দলগুলির নেতারা বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানকে সংগঠিত করিয়া যথাযোগ্য রূপ দিয়া, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য ইহাকে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে পরিণত করিবেন···কিংবা সাম্রাজ্যবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়া জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবেন ?'

কিন্তু বোম্বাইয়ের সমুদ্রে ও শহরের রাস্তায় নৌ-সেনা ও সাধারণ মানুষের লড়াই যখন তুঙ্গে তখন জাতীয় নেতাদের ভূমিকাটা কী? অধিকারী বলছেন, 'যে কংগ্রেস নেতারা কয়েকমাস আগে ১৯৪২ সালের সংগ্রামের এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের মহিমায় হুঙ্কারনাদ করিতেছিলেন, আজ যুদ্ধোত্তর যুগ বিপ্লবের উত্তাল তরঙ্গ তাঁহাদের হাত-পা ঠাণ্ডা করিয়া দিতেছে।'

এসব সত্ত্বেও দেখা যায় পার্টি নেতৃত্ব এই সংগ্রামবিমুখ ও সাম্রাজ্যবাদের সাথে আপসকামী কংগ্রেস-লীগ নেতৃত্বের মুখাপেক্ষিতা কাটিয়ে উঠতে পারলেন না। সমকালীন পরিস্থিতি সম্পর্কে অধিকারীর বিশ্লেষণ পার্টি লাইনে প্রতিফলিত হল না। দেশের পরিস্থিতির বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটা সত্ত্বেও সাবেকী বিচারবুদ্ধির জের অব্যাহত। তারই নিদর্শন: ১৯৪৬ সালের মার্চে প্রকাশিত, পি. সি. জোশী রচিত 'শেষ সংগ্রামের আহ্বান'। সেখানে একই কথা পুনরুচ্চারিত:

১. জাতীয় কংগ্রেস স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল প্রবাহের প্রতিনিধি।

২. সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও স্বাধীনতাকামী মুসলমানদের বেশির ভাগ অংশ মুসলিম লীগের সমর্থক।

৩. কমিউনিস্ট পার্টি সংগ্রামী ও সংগঠিত শ্রমিক-কৃষকের দল।

৪. অতএব স্বাধীনতা সংগ্রামের সফল পরিসমাপ্তির পূর্বশর্ত হল এই তিনটি প্রধান দলের ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠন। কমিউনিস্ট পার্টি তখনও পর্যন্ত নেতাদের দোদুল্যমানতা ও কোন কোন ক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় পেয়েও কংগ্রেস-লীগ নেতাদের উপেক্ষা করে সাধারণ মানুষকে এগিয়ে চলার আহ্বান জানায়নি বা জানাবার ভরসা পায়নি। কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন ভূমিকা প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে বি. টি. রণদিভে লেখেন,

'সীমাবদ্ধ শক্তির অধিকারী হয়েও কমিউনিস্টরা ক্রমবর্ধমান অভ্যুত্থানগুলিতে সাধ্যমত অংশগ্রহণ করেছে; কিন্তু যথেষ্ট শক্তি না থাকায় তাকে সংগঠিত করে সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে পারেনি। কমিউনিস্ট পার্টিই একমাত্র পার্টি যারা সচেতনভাবে অভ্যুত্থানে অংশ নিয়েছে এবং মানুষের ক্রুদ্ধ বিক্ষোভকে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে।' (কমিউনিস্টস অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়ান ফ্রিডম স্ট্রাগল, পৃ. ২৮)

তবুও বলতে হয় কমিউনিস্ট পার্টি সময়োপযোগী ভূমিকা পালনে অক্ষম। তার কারণ, বি. টি. রণদিভের ভাষায়, 'কংগ্রেস নেতৃত্বের প্রভাব কাটিয়ে ওঠার মতো শক্তি তাদের ছিল না।' (ঐ, পৃ. ৩৩)

কংগ্রেস যেখানে গণ-অভ্যুত্থানের রাশ টেনে ধরছে—তাদের ক্ষতিকারক প্রভাবের সঙ্গে পাল্লা দেবার মতো শক্তি কমিউনিস্ট পার্টির ছিল না। তাই পার্টি শুধু ঘটনার মিছিলের পিছু পিছু চলতে থাকে—অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণের অসামর্থ্য হেতু—উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে ব্যর্থ।

ষোলো

সেনাবাহিনীর বিক্ষোভকে সংগঠিত রূপ দিতে কমিউনিস্ট পার্টি অক্ষম। কংগ্রেস আতঙ্কিত—কারণ, উত্তরোত্তর পরিস্থিতি কংগ্রেস নেতাদের আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। তবুও দেখা যাচ্ছে, বোম্বাই ও করাচীর নৌ-সেনাদের আত্মসমর্পণের পরও অবাধ্যতার ঢেউ ভারতীয় স্থলবাহিনীতে ছড়িয়ে পড়ছে। এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার সংবাদ প্রকাশিত হয় 'স্বাধীনতা'র পাতায়।

ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে জাতীয়তাবোধের নূতন জাগরণ

'অমৃতসর স্টেশনে সৈন্যবাহী ট্রেন কিছুক্ষণের জন্য থামিয়া যায়। যুদ্ধের সময় এমনি ট্রেন কত আসিয়াছে গিয়াছে কাহারো লক্ষ্য পড়ে নাই। কিন্তু আজ এক নূতন দৃশ্য। আর একটি ট্রেনে তখন মৌলানা আজাদ ছিলেন এবং গাড়ীর উপর কংগ্রেস পতাকা দুলিতেছিল। সৈন্যবাহী ট্রেনের ভারতীয় সৈন্যরা বারংবার 'জয় হিন্দ' ধ্বনি করিতে থাকে। প্রথম শ্রেণীতে অবস্থিত ইংরাজ অফিসার হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়াছে।' (১. ৩. ১৯৪৬)

বহুদিনের নিরুদ্ধ ক্ষোভ ও সুপ্ত অসন্তোষ আজ যেন আত্মপ্রকাশের রাস্তা খুঁজছে। যুদ্ধের বছরগুলিতে ভারতীয় সেনাদের মধ্যে তিলে তিলে জমাট বেঁধেছে ইংরাজ প্রভুদের বিরুদ্ধে সীমাহীন ক্রোধ। তার পটভূমি বর্ণনা করছেন নিজের অভিজ্ঞতা থেকে :প্রাক্তন বিমান-সেনা রবীন সেন। তিনি লিখছেন :

'এখানেও ভারতীয় বাহিনীর মধ্যে অসন্তোষ। নিকৃষ্ট খাবার, যুদ্ধক্ষেত্রের হেভী ডিউটিগুলি ওদের উপর। হুকুম দেওয়ার জন্যে আছে ইংরেজ অফিসার। ড্যাম-ব্লাডি ফুল-বাস্টার্ড তো মুখে লেগেই আছে। ভারতীয় বাহিনী জানে ইংরেজের দৌড়। বার্মা-সিঙ্গাপুর থেকে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে এসেছিল জাপানীদের তাড়া খেয়ে—ফেলে এসেছিল দেশীয় সৈন্যদের। তাদের অনেকেই আজ ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি'তে।

আজও এরা লড়ছে ইংরেজের পক্ষে, কিন্তু বেনগাজি, ত্রিপোলি, ভারত-বর্মা যুদ্ধক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা চোখ, কান খুলে দিয়েছে। দেশটা এদের, কিন্তু দেশের প্রভুত্ব কর্তৃত্ব ইংরেজের! এতদিন এরা জানতো তারা ইংরেজের বেতন-ভুক সৈনিক, ইংরেজ ওদের প্রভু। আজ এই বোধটাই উল্টেপাল্টে যাচ্ছে। কেমন যেন একটা আত্মসম্মানবোধ ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে ঘৃণা জেগে উঠছে।··· জাঠ রেজিমেণ্টের সাত নম্বর কোম্পানির হাবিলদার চন্দ্র সিং একদিন রাত্রে ব্যারাকে চুপি চুপি সেপাইদের বলছিলো—"আমাদেরও এই ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। ক্যাপ্টেন সাহেব যেমন আমাদের ফল-ইনের নির্দেশ দেয়, আমরা ফল্ ইন্ করি, প্যারেড করি, চার্জ বললেই বেয়নেট

চার্জ করি—কিন্তু এই ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়তে কে হবে আমাদের ক্যাপ্টেন! বাইরের নেতাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ নেই। ওরা বোধহয় আমাদের ভাড়াটে সৈনা হিসাবেই দেখেন"। —একটা অস্থিরতা চঞ্চলতা ওর মাঝে।' (পাঁচ অধ্যায়, পৃ ১২০-১২১)

তারপর ফৌজি ছাউনিতেও অংকুরিত হল গোপন সংগঠন। রবীন সেন লিখছেন:

'রানওয়ের এককোণে আমরা—সার্জেণ্ট অ্যাণ্ডরুজ, করপোরাল সিপ্রা, সার্জেণ্ট দত্ত, গাঙ্গুলী, বেবী, মামুদ, তেজা সিং ইকবাল—বসে আছি। সার্জেণ্ট দত্ত বলছেন—'এবার আমাদের সংগঠন মজবুত করতে হবে। যোগাযোগ আরও বাড়াতে হবে সংকর্তার সঙ্গে—বিশেষ করে ফ্রণ্ট থেকে যারা আসবে তাদের সঙ্গে। কোহাটের বাইরে বিভিন্ন সামরিক ঘাঁটিগুলির সঙ্গেও যোগাযোগের ব্যবস্থা করতে হবে। যোগাযোগের চেষ্টা করতে হবে রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গেও। যুদ্ধের শেষে আবার একটা অস্থির পরিস্থিতি আসছে। সংগ্রাম সুরু হবে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। সশস্ত্র বাহিনীরও একটা ভূমিকা থাকা উচিত এই সংগ্রামে"।' (ঐ, পৃ ১২৬)

'...লালকেল্লায় শুরু হোল আজাদ হিন্দ ফৌজের সামরিক কোর্টে বিচার। সারা দেশে চরম উত্তেজনা। বন্দীদের মুক্তির দাবীতে কোলকাতায় রাজপথে লক্ষ লোকের প্রতিবাদ। দিল্লী, বোম্বাই, লাহোর, কানপুর, বড় বড় শহরগুলিরও রাজপথে লক্ষ লোকের প্রতিবাদ।

বাইরের এই সংগ্রামের ঢেউ লাগলো সশস্ত্র বাহিনীতেও। কোহাটের সশস্ত্র ঘাঁটিগুলিতে গুঞ্জন, উত্তেজনা। বিমানবাহিনীর তিনজন সার্জেণ্ট, একজন করপোরাল ও স্থলবাহিনীর দু'জন সুবাদারকে নিয়ে বসলো গুপ্ত সভা। সিদ্ধান্ত হোল আজাদ হিন্দ ফৌজ ডিফেন্স কমিটিতে এক সপ্তাহের মধ্যে ত্রিশ হাজার টাকা পাঠাতে হবে। পেশোয়ার, জব্বলপুর, করাচী, বোম্বাই-এর সঙ্গে যোগাযোগ করা হোল। ওরাও সিদ্ধান্ত নিয়েছিল—ডিফেন্স কমিটিতে টাকা পাঠাবে।

সাত দিনের আগেই ত্রিশ হাজার টাকা উঠে এলো। স্কোয়াড্রন লিডার হায়দার-কে দিয়ে টাকাটা ডিফেন্স ফাণ্ডের সেক্রেটারী আসফ আলীর কাছে পাঠানো হোল। হায়দার দিল্লী থেকে ফিরলেন। একটা রসিদ দিলেন—আসফ আলীর সই—কোহাটের বন্ধুর কাছ থেকে ধন্যবাদের সঙ্গে গৃহীত হোল—ত্রিশ হাজার টাকা।' (ঐ, পৃ ১২৮-১২৯)

অবশেষে বিস্ফোরণ এবং ঘটনাস্থল জব্বলপুর। ২৩শে ফেব্রুয়ারি, জব্বলপুর থেকে প্রথম, সরাসরি সেনা-বিদ্রোহের খবর এল। আজাদ হিন্দ ফৌজের ক্যাপ্টেন বুরহানউদ্দিনের সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের প্রতিবাদে জব্বলপুরের ভারতীয় সিগন্যাল কোর এবং ইলেকট্রিকাল ও মেকানিকাল

ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপোর প্রায় তিনশ' সৈন্য ধর্মঘট করেন এবং কংগ্রেস, লীগ ও কমিউনিস্ট পতাকা নিয়ে তাঁরা মিছিলও করেন। পরে ধর্মঘটী ভারতীয় সেনারা 'তিলক ভূমি' ময়দানে সমবেত হয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের সমস্ত বন্দীদের মুক্তি, ইন্দোনেশিয়া থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার, খাদ্য সঙ্কটের জন্য বিজয়োৎসব বাতিল, মাহিনা ও রেশন বৃদ্ধি এবং বাসস্থানের সুব্যবস্থা প্রভৃতির দাবী জানিয়ে বক্তৃতা করেন। এডমিরাল গডফ্রে ও প্রধান সেনাপতির বক্তৃতার তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় এই সভায়। এই সভায় কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট নেতারা ছাড়াও বিপুল জনসমাগম হয়। 'সৈন্যরা ভেদাভেদ ভুলিয়া সকল রাজনৈতিক দলকে ঐক্যবদ্ধভাবে স্বাধীনতার সংগ্রাম চালাইবার জন্য অনুরোধ করেন। রাজনৈতিক দলের নেতাদের পরামর্শে সৈন্যরা সুভাষচন্দ্রের প্রতিকৃতি-কে অভিবাদন জানাইয়া শান্তভাবে ব্যারাকে ফিরিয়া যান। বর্তমানে ব্যারাকে বন্দী অবস্থায় আটক। সৈন্যদের সমর্থনে ছাত্ররা ধর্মঘটে করে ও দোকানদাররা হরতাল পালন করে।' (স্বাধীনতা, ১. ৩. ৪৬)

বহু বছর পর, পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে আলোকপাত করেন ইংরেজ লেখক জন ওয়েব। তিনি লিখছেন:

'২৮শে ফেব্রুয়ারি, কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা জায়গায় সমারসেট লাইট ইনফেন্ট্রি সঙ্গীন উঁচিয়ে আড়াইশ' জন আটক ভারতীয় সেনাদের ভয় দেখানো শুরু করে। একজন মেজর ও লেফটান্যান্ট পাণ্ডাদের নাম জানার জন্যে জেরা শুরু করে। সমস্ত আটক সৈন্য একযোগে চীৎকার করে এ ধরনের জেরার প্রচেষ্টাকে বানচাল করে দেয়। তারপরেই শুরু ধস্তাধস্তি এবং এই ফাঁকে অনেক ভারতীয় সৈন্য পালিয়ে যায়।

জব্বলপুরের অবস্থা বেশ অশান্ত। হাজার চেষ্টা করেও জেলা শাসক শহরের বেসামরিক লোকজনদের সাথে ভারতীয় সেনাদের অবাধ মেলামেশা বন্ধ করতে ব্যর্থ হন। সৈন্যদের সঙ্গে বিশেষভাবে ঘনিষ্ঠদের মধ্যে ছিল ডাক ও তার বিভাগের কর্মচারী—যারা জানুয়ারিতে ধর্মঘটের হুমকি দিয়েছিল এবং কামানবাহী শকট কারখানার মজুর, যারা কারখানার মধ্যে যত্রতত্র 'জয় হিন্দ' লিখেছে। এজাতীয় লোকদের সঙ্গে মেলামেশার ফলেই হয়তো এই সেনাবিদ্রোহ।

পরিস্থিতি সামাল দেবার জন্যে স্থানীয় কংগ্রেস কমিটি উদ্বিগ্ন হয়ে পণ্ডিত নেহরুকে জব্বলপুরে আসার জন্যে তার পাঠান: 'Pray drop Jubbulpore wire arrival'। নেহরু অবশ্য আসেননি যদিও তিনি সেনাদের আশ্বস্ত করে একটি বিবৃতি দেন।

কয়েক সপ্তাহ ধরে চলল সামরিক আদালতে বিদ্রোহীদের বিচার। সেনারা জানান, তাঁরা নৌ-সেনাদের ধর্মঘটের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। তাঁরা বেতন

ভাতা ও রেশনের ব্যাপারে শ্বেতাঙ্গ ও ভারতীয় সেনাদের মধ্যে বৈষম্যের অবসান চান। মূলত এই বৈষম্যের প্রতিবাদে তাঁরা ধর্মঘট করেছেন। তাঁদের আনুগত্য এখন দেশের প্রতি—বৃটেনের প্রতি নয়। অভিযোগ যদিও গুরুতর এবং কুড়িজন পাণ্ডাকে বাছাই-ও করা হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদের সাজা দেওয়া হল না এবং মে মাসের মধ্যে সমস্ত মামলা প্রত্যাহার করা হয়।' (এ মিউটিনি ইন ১৯৪৬, দি স্টেটসম্যান, ৫. ৩. ৪৬)

পরবর্তী বিদ্রোহের ঘটনা ১৫ই মার্চ দেরাদুনে। 'স্বাধীনতা' (১৭ই মার্চ ১৯৪৬)-র সংবাদসূত্রে জানা যায়:

'গুর্খা সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য ৯নং কেন্দ্রের ৫ শত গুর্খা সৈন্য, বৃহস্পতিবার (১৫ই মার্চ) প্যারেড কালে মেজর ওয়াইল্ডস নামক জনৈক অফিসারের আপত্তিকর মন্তব্যের প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখান। প্রকাশ যে, অ্যাডজুটেন্ট হেরিংস্ একটি রাইফেল লইয়া গুলি করিবার ভয় দেখান। হাঙ্গামার ফলে উপরোক্ত দুইজন অফিসার সহ পাঁচজন অফিসার আহত হইয়াছেন। তাঁহাদের অস্ত্র কাড়িয়া লওয়া হয় এবং কাগজপত্র নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। আহত অফিসারদের হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে।'

ভারতীয় সেনাবাহিনীর আনুগত্য আর যে প্রশ্নাতীত নয়—এ বিষয়ে বৃটিশ কর্তৃপক্ষও ওয়াকিবহাল। অজিত রায় লিখছেন, 'স্বরাষ্ট্র সচিব স্যার জে. থর্ন ১৯৪৬ সালের ৫ই এপ্রিল, এক গোপন প্রতিবেদনে মন্তব্য করেন: রাজকীয় বিমানবাহিনী, রাজকীয় নৌ-বাহিনী ও সিগন্যাল কোরের ইউনিটগুলির মধ্যে যথেষ্ট অসন্তোষ দানা বেঁধেছে. এমনকি সরাসরি বিদ্রোহ ঘটার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।' (সোশিও-পলিটিক্যাল ব্যাক-গ্রাউন্ড অফ মাউন্টব্যাটেন অ্যাওয়ার্ড)

অজিত রায় লিখছেন, 'ক্যাবিনেট মিশনের সদস্যবৃন্দ ও প্রধান সেনাপতি জেনারেল অকিনলেক-এর মধ্যে অনুষ্ঠিত এক গোপন আলোচনাসভার বিবরণ থেকে জানা যায় যে, জেনারেল অকিনলেক-এর মতে, রাজনৈতিক নেতারা যদি ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে সশস্ত্র বাহিনীকে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদানের আহ্বান জানায়, সে ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে মোতায়েন ব্রিটিশ ফৌজ দিয়ে পরিস্থিতির মোকাবিলা সম্ভব নয়। বড়জোর তারা কতকগুলি বন্দর ও দিল্লী শহরের দায়িত্বভার নিতে পারে।' (ঐ)

নৌ-সেনাবিদ্রোহ ও স্থলবাহিনীতে ব্যাপক বিক্ষোভের মাধ্যমে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের মৃত্যু-পরোয়ানা ঘোষিত। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনে কংগ্রেস নেতৃত্ব এবং বৃটিশ শাসককুল উভয়েই বিব্রত, সন্ত্রস্ত ও চিন্তাকুল এবং অবশ্যই আপস মীমাংসার জন্যে উদ্‌গ্রীব।

এও লক্ষণীয় যে নৌ-বিদ্রোহের সমর্থনে সাধারণ মানুষের অসাধারণ ত্যাগ ও বীরত্ব—কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের পক্ষ থেকে বাহবার বদলে

পেল তিরস্কার। এ প্রসঙ্গে 'স্বাধীনতা'র সম্পাদকীয় মন্তব্য যথার্থ ও সময়োপযোগী :

'· নেতাদের এখন একমাত্র কর্তব্য হইয়া পড়িয়াছে, দাসত্বের দূত মন্ত্রী-ত্রয়কে খুশী করা। কংগ্রেস নেতারা ভাবিতেছেন : ইহাদের খুশী করিতে পারিলে লীগকে বাদ দিয়াই সমস্ত ক্ষমতা পাওয়া যাইবে। লীগ নেতারা ভাবিতেছেন : ইহাদের না চটাইলে কংগ্রেসের বিরোধিতা সত্ত্বেও পাকিস্তান পকেটে আসিবে। ' (স্বাধীনতা, ২৪. ২. ৪৬)

সতেরো

নেতাদের নিষেধের ভ্রূকুটিতে তবু নিরস্ত হয় না সাধারণ মানুষ। গণ-অভ্যুত্থানের দাপটে কেঁপে ওঠে গোটা দেশ। এবং দেশজোড়া সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিক্ষোভের প্লাবনের সঙ্গে যুক্ত হয় শ্রমিক আন্দোলনের বিশাল তরঙ্গ।

১৯৪৬ সাল। প্রকৃতপক্ষে শ্রমিক আন্দোলনের বজ্র নির্ঘোষে নতুন বৎসরের সূচনা। ১৯৪৬ সালের প্রথম দিনেই দেখা যাচ্ছে অন্তত পঞ্চাশ হাজার শ্রমিক ধর্মঘটরত। দিনের পর দিন যায় আর দাবানলের মতো শ্রমিক ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ে শিল্প থেকে শিল্পান্তরে। অসংগঠিত অজ্ঞাত অবজ্ঞাত শ্রমজীবী মানুষও লড়াইয়ের পথ চিনেছে। 'এত বিদ্রোহ কখনো দেখেনি কেউ'—সুকান্তের এই উক্তিটি যেন আক্ষরিক অর্থে সত্য।

যুদ্ধ শেষ হতেই শ্রমিকের মধ্যে এক অদ্ভুত পরিবর্তন। গত ছ' বছর ধরে যাবতীয় বিক্ষোভ যেন আগ্নেয়গিরির লাভার মতো জমাট বেঁধে ছিল। যুদ্ধ থামতেই তার আত্মপ্রকাশ প্রতিটি কলে-কারখানায়। সত্যেন গাঙ্গুলী বলছেন, 'রেল শ্রমিকদের মধ্যে সে সময় এক অদ্ভুত পরিবর্তন চোখে না পড়ে পারে না। পুরনো ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠকরা এতদিন দেখেছে—রেল কলোনিতে সারাদিন চোঙা ফুঁকে অবিরত প্রচার করার পরও মিটিং-এ কুড়িজন শ্রমিক যোগাড় করা কত শক্ত কাজ। যুদ্ধ থেমে যাবার পর সমস্ত জড়তা কাটিয়ে উঠে শ্রমিকরা দলে দলে লাল ঝাণ্ডার নীচে জমা হতে থাকে। আগে আমরা যেতাম মিটিং ডাকার জন্য প্রচার করতে। আর এখন শ্রমিকরা মিটিং ডাকার জন্য লাল ঝাণ্ডা বাবুদের খোঁজ করছে।'

এরকম একটি দৃষ্টান্ত আলমবাজারের শ্রমিক ধর্মঘট। চন্দ্র রায় বলছেন, 'রেশন কাটার প্রতিবাদে স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল হল আলমবাজার জুট মিলে। হঠাৎ একদল শ্রমিক ইউনিয়ন অফিসে দৌড়ে এসে ঝাণ্ডাটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় চেঁচিয়ে বলে গেল—কমরেড সব চলা আইয়ে।'

বীরেন রায় বলছেন, 'তখন ফোন করলেই স্ট্রাইক হয়ে যেত। যেতে হত

না শ্রমিকদের কাছে। ট্রাম স্ট্রাইক দিয়ে তার সূচনা। এই স্ট্রাইকের পেছনে কী জনসমর্থন!'

গোপাল আচার্যের মতে, ট্রাম স্ট্রাইক দিয়েই যুদ্ধকালীন দীর্ঘস্থায়ী জড়তার অবসান। তিনি বলছেন, '১৯৪৫ সালের জুলাই বা অগাস্টে অথবা সেপ্টেম্বরে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের তিনজন শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়। তার প্রতিবাদে ন' দিন স্ট্রাইক চলে। তিন জনই আবার কাজে বহাল হয়। এই স্ট্রাইক-এর একটা 'সিগনিফিক্যান্ট' (উল্লেখযোগ্য) বিষয় হল—ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মিটিং থেকে স্ট্রাইক ঘোষিত হয়—বিভিন্ন কল-কারখানার শ্রমিক-কর্মচারী সেই জমায়েতে আসে—যদিও তাদের ডাকা হয়নি। ইউনিয়নের তরফ থেকে সাহায্য চাওয়া হয়নি—তবুও ঐ ন' দিনের স্ট্রাইকের সময় ডালহৌসি পাড়া ও কল-কারখানার বিভিন্ন ইউনিয়ন 'কালেকশন' করে তের হাজার টাকা জমা দেয়। এই সমাবেশ ও 'কালেকশন' একটা জিনিসকেই 'সিগনিফাই' (চিহ্নিত) করছে—গোটা যুদ্ধ পর্বে তারা কোন কিছু করতে পারেনি—এটা তার স্বতঃস্ফূর্ত 'আউটবার্স্ট' (বিস্ফোরণ)।'

দিকে দিকে শুরু হয়েছে শ্রমিক জাগরণ। এমন কি পুরুলিয়াতেও। প্রবীর মল্লিক বলছেন, '১৯৪৫-৪৬ সালে বলরামপুরে (পুরুলিয়া) লাক্ষা শিল্পের শ্রমিকদের সংগঠন গড়ে ওঠে। মধ্যপ্রদেশের সীতারাম গুপ্ত এসে জমি প্রস্তুত করেন। ১৯৪৬ সালে বলরামপুরে শ্রমিকদের সফল ধর্মঘটের ফলে—তাদের মজুরি ডবলেরও বেশি বাড়ে। এই আন্দোলনের ফলে আমরা আদিবাসীদের মধ্যে শেকড় ছড়ালাম। বাইরে থেকে লোক এনে ধর্মঘট ভাঙাব চেষ্টা করেছিল মালিক। মাঝে মাঝে তাদের পিটিয়ে তাড়াতে হত। এই পেটানোব কাজে মেয়েরা বেশি উৎসাহী।'

১৯৪৬ সাল শুরু এবং বৎসরের প্রথম দিনেই 'স্বাধীনতা'র সংবাদসূত্রে জানা যায়: কলকাতা ও শহরতলির কারখানাগুলিতে এখন পঞ্চাশ হাজার শ্রমিক ধর্মঘটরত। পঞ্চাশ হাজার ধর্মঘটী শ্রমিকের মধ্যে রয়েছেন: কেশোরাম—৮ হাজার; পটারি—৩ হাজার; রবার্ট হাডসন ও মার্টিন—১ হাজার; লিভার ব্রাদার্স—৫০০ ও অন্যান্য কারখানার শ্রমিক মিলিয়ে মোট পঞ্চাশ হাজার শ্রমিক। তাঁরা একমাস থেকে তিনমাস পর্যন্ত ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছেন। মালিকের হিংস্র আক্রমণ এবং সরকারের বিরূপতা ও দমননীতি সত্ত্বেও শ্রমিক ধর্মঘট অব্যাহত।

১৯৪৬ সালের দিনগুলি অতি দ্রুত পাল্টাচ্ছে। নৃপেন ব্যানার্জি বলছেন, 'একসঙ্গে তিনটি ধর্মঘট—অমৃতবাজার, ট্রাম আর পোর্ট—কলকাতাকে নাড়িয়ে দিল। ছাত্রদের যুক্ত মিছিল বেরুল এসব ধর্মঘটের সমর্থনে। প্রথমে পুরবীরা (ছাত্র কংগ্রেস) আপত্তি করেছিল। তারা অমৃতবাজারের মধ্যবিত্ত কর্মচারী ছাড়া আর কাউকে সমর্থন করতে রাজী নয়। আমাদের চাপের ফলে অবশেষে তারাও একসঙ্গে মিছিল করল সব ধর্মঘটীর সমর্থনে। অবস্থা সত্যিই পাল্টাচ্ছে।'

তারপর ইতিহাস সৃষ্টি করল পটারি আর কেশোরামের ধর্মঘট। গুরুসদয় দত্ত রোডে বিড়লার বাড়ির চারপাশ ঘিরে মেয়েদের পিকেট। সেই পিকেট ভাঙার জন্যে রাস্তায় বরফ ছড়িয়ে দেওয়া হল। 'আনন্দবাজার পত্রিকা' লিখল, এরা সব বাজারের মেয়ে। তার জবাবে 'স্বাধীনতা'য় সোমনাথ লাহিড়ী লিখলেন, 'দেহ-ব্যবসায়ী কারা? মেয়েরা না 'আনন্দবাজারে'র সাংবাদিকরা?'

যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিলিটারি একাউন্টসে ছাঁটাই শুরু। তাদের সমর্থনে ডালহৌসি পাড়ার মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের মধ্যে তোলপাড়। সত্যিকারের ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে উঠতে লাগল মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের—আব্দুল মোমিনের নেতৃত্বে।

চিত্ত মৈত্র বলছেন, '১৯৪৫ সালে ন্যাশনাল ব্যাংকে ধর্মঘট করাতে গিয়ে চাকরিটা গেল। কাশীপুর থেকে এক চোঙা এনে ব্যাংকের গেটে বক্তৃতা দিতাম। তখন ব্যাঙ্কিং শিল্পে সংগঠনের অঙ্কুর সবে গজিয়ে উঠেছে। মধ্যবিত্ত কর্মচারীরা আন্দোলনে আসতে চায় না—চাকরি যাবার ভয়ে তারা অস্থির। ধর্মঘট ভেঙে গেল। ব্যাংকের মালিক কিরণশংকর রায় আমাকে ডেকে বললেন, 'তুমি খুব ভালো ছেলে—তুমি কমিউনিস্ট—তুমি তো শোষণ চাও না। আমরা শোষণ করি। কাজেই তুমি যত পার আমাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন কর! চাকরি করে সময় নষ্ট করবে কেন? তুমি চোঙা মুখে বক্তৃতা করেছ। ব্যাংকের সামনে কেউ চোঙা ফোঁকে?' আমার চাকরি গেল। সোমনাথ লাহিড়ী বললেন, 'ভালোই হয়েছে, আমাদের একজন হোল-টাইমার বাড়ল'।'

দেখা যাচ্ছে সরকারি দপ্তরে দাবি-দাওয়া পেশ করতে গেলেও যথেষ্ট বিড়ম্বনা ভোগ করতে হয়। 'স্বাধীনতা'র খবরে প্রকাশ:

'গত ২৭শে ডিসেম্বর ব্রেথওয়েটের শ্রমিকরা এডজুডিকেশনের রায় চাহিয়া একদিন কারখানা বন্ধ রাখিয়া সরকারী দপ্তরে অভিযোগ পেশ করিবার সিদ্ধান্ত করেন। ম্যানেজারের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও ২৮শে ডিসেম্বর কারখানা বন্ধ রাখিয়া রাইটার্স বিল্ডিং অভিমুখে তাহাদের এক মিছিল বাহির হয়। মনুমেণ্টের নিকট কয়েক ডজন সার্জেণ্ট ও প্রায় একশত পুলিশ ডালহৌসী স্কোয়ার সংরক্ষিত এলাকা এই অজুহাতে মিছিলের পথরোধ করে।' (স্বাধীনতা, ২৯.১২.৪৫)

কেশোরামের ধর্মঘট চলেছে মালিকের যাবতীয় প্ররোচনা ও হামলা সত্ত্বেও। ২৬শে ডিসেম্বর মালিকের দালালরা ধর্মঘটী শ্রমিকদের মারপিট করে। '…শ্রমিকরা কাজে না যাওয়ায় লাইনে যাইয়া জবরদস্তী করা হইতেছে এবং লাইন ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য করা হইতেছে। ১৫ জন উড়িয়া শ্রমিককে এইভাবে লাইন হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।' (স্বাধীনতা, ২৯.১২.৪৫)

শ্রমিকদের উপর মারপিটে গুণ্ডাদের সঙ্গে এবার পুলিশও যোগ দিল। 'স্বাধীনতা'র খবরে প্রকাশ, 'বিড়লার কেশোরাম কটন মিলে ৮ হাজার শ্রমিকের

ধর্মঘট ৫ সপ্তাহ পার হইয়া গেল—৩১শে ডিসেম্বর মেটিয়াবুরুজের পুলিশ আব্দুল খালেক ও কেষ্ট নামে দুইজন শ্রমিককে বস্তি হইতে কারখানার মধ্যে লইয়া আসে ; তাহার পর কারখানার দারোয়ান পুলিশের সামনে মারপিট করে।' (স্বাধীনতা, ২.১.৪৬)

এবার আর বিচ্ছিন্ন একজন বা দুজনের উপর নয়। ধর্মঘটীদের উপর পাইকারি হামলা শুরু :

'২রা জানুয়ারি ভোর সাড়ে পাঁচটায় ৫০/৬০ জন কোম্পানীর দালাল পিকেট লাইনের উপর 'জয়হিন্দ' ধ্বনি করিতে করিতে লাঠি সোটা লইয়া আক্রমণ করে। ধর্মঘটীরা তবুও স্থানচ্যুত হইল না। ইতিমধ্যে হট্টগোলের ফলে আকৃষ্ট হইয়া আশেপাশের বস্তি হইতে শত শত শ্রমিক ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলে গুণ্ডার দল পলায়ন করে। তারপর একবার পুলিশ বোঝাই কেশোরাম কোম্পানীর বি.এল.এল. ৪৪৫৫ নং লরীখানি শ্রমিক পিকেটের উপর চালাইবার উপক্রম হয়। এঞ্জিনের শত গর্জন সত্ত্বেও পিকেটিংরত শ্রমিকরা এতটুকুও বিচলিত হইল না দেখিয়া অবশেষে পুলিশ বোঝাই লরীকে পিছু হটিতে হয়।' (স্বাধীনতা, ৩.১.৪৬)

অন্যান্য কারখানার শ্রমিকরা এবং এই রুটের বাসকর্মীরা কাজে যাবার পথে রোজ একবার ধর্মঘটীদের অভিনন্দন জানিয়ে যান।

শ্রমিক আন্দোলনের উপর পুলিশী হামলা ক্রমবর্ধমান। শুধু কেশোরাম নয়, অন্যত্রও পুলিশকে মালিকের লাঠিয়ালের ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ২রা জানুয়ারি বামার লরি শ্রমিকদের এক শোভাযাত্রার উপর পুলিশ লাঠি চার্জ করে।

ধর্মঘটী শ্রমিকদের জন্য কলকাতার শ্রমজীবী মানুষ নানাভাবে সাহায্য পাঠাতে থাকে। কমিউনিস্ট পার্টি ও বি. পি. টি. ইউ. সি.-র উদ্যোগে ধর্মঘটী শ্রমিকদের জন্য কেন্দ্রীয় সাহায্য তহবিল চালু করা হয়। তাছাড়া কেশোরাম ও এন্টালির পটারি কারখানার শ্রমিকদের জন্য কিছুটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ৩৫, ৩৬, ৩৮নং রুটের বাসকর্মী, রাজাবাজারের ট্রাম শ্রমিক ও প্রেমনাথ কোম্পানির শ্রমিকরা সাহায্য পাঠাতে থাকে। কেশোরাম কারখানার শ্রমিকদের সাহায্য করার জন্যে কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের শ্রমিক ও কৃষকরাও এগিয়ে এল। আই. জি. এন.-এর শ্রমিকরা রোজই চাল পাঠাতে থাকে। ঐ পর্যন্ত তারা তের মণ চাল পাঠিয়েছে।

অবশেষে কেশোরাম ও পটারি কারখানার শ্রমিকদের ধর্মঘটের নিষ্পত্তি ঘটল—যদিও পরিণাম এক নয়।

'স্বাধীনতা'র সংবাদ শিরোনামা

২৬ দিন ধর্মঘটের পর পটারী শ্রমিকদের বিপুল জয়

বিজয়োৎসবে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি গভীর আস্থা জ্ঞাপন

'৮ই জানুয়ারী মালিকের সহিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল তাহাতে প্রতিজন পুরুষ শ্রমিকের দৈনিক মজুরী বাড়িয়া দাঁড়ায় পাঁচ আনা হইতে চৌদ্দ আনা এবং প্রতিজনা নারী শ্রমিকের মজুরী তিন আনা হইতে বাড়িয়া দাঁড়াইল এগার আনা। তাহা ছাড়া সকলের জন্য মাগ্‌গী ভাতা ১৭ টাকা! আশাতিরিক্ত এই জয়।

বিজয়োৎসবের সভায় কুমুদ বিশ্বাস (কমিউনিস্ট পার্টির কলিকাতা জেলার সম্পাদক) ও জগৎ বসু বক্তৃতা করেন। তাঁহাদের ফুলের মালা পরাইবার জন্য শ্রমিকদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়। মেয়েরাও কোঁচড়ভর্ত্তি ফুল আনিয়াছে। কমরেড পি. সি. জোশী সভায় উপস্থিত হইলে শ্রমিকরা তাঁহাকে কাঁধে তুলিয়া নেন।' (স্বাধীনতা, ১০. ১. ৪৬)

৮ই জানুয়ারি পটারি ধর্মঘট মিটে যায়। ৯ই জানুয়ারি সন্ধ্যা থেকে কেশোরাম কটন মিলের ধর্মঘটী শ্রমিকের মা-বৌ ও মেয়েরা বিড়লা পার্কের সামনে (বিড়লা ভবনের দরজায়) সত্যাগ্রহ শুরু করেন। সত্যাগ্রহীদের উপর পুলিশ জুলুম যথারীতি চলতে থাকে। এমনকি পুলিশের ধাক্কায় ৬০ বছরের বৃদ্ধা রমণীও পড়ে গিয়ে আহত হন।

অবশেষে ৪৬ দিন পর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যস্থতায় কেশোরামের শ্রমিক ধর্মঘটের অবসান ঘটে। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় আফশোসের সঙ্গে বলেন, 'কোনরূপ বোনাস মঞ্জুর করিতে কর্তৃপক্ষকে রাজী করাইতে পারিলাম না। কোনরূপ প্রতিহিংসামূলক শাস্তিবিধান হইবে না এবং মামলাসমূহ প্রত্যাহার করা হইবে।' (স্বাধীনতা, ১৩. ১. ৪৬)

প্রতিদিনই শ্রমিক ধর্মঘট ও তার উপর মালিক ও সরকারের যৌথ আক্রমণের খবর আসছে। কলকাতায় নয় শুধু, গোয়ালিয়রেও বিড়লা মিলে শ্রমিক ধর্মঘট এবং তার উপর সরকারি হামলা মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। জানা গেল, ধর্মঘটী শ্রমিক ও জনতার উপর অবিশ্রান্ত গুলি চলেছে। নারী শিশু কেউ রেহাই পায়নি। ঘোড়সওয়ার পুলিশ তাদের দলিত মথিত করেছে। লাঠি চার্জ, বেয়নেট চার্জ—কিছুই বাদ যায়নি। ঘটনা এত গুরুতর যে স্বয়ং পণ্ডিত নেহরু অবিলম্বে নিরপেক্ষ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। তিনি ঘটনার সত্যাসত্য নির্ধারণের জন্য ডাঃ অটলকে গোয়ালিয়রে পাঠিয়েছেন। (স্বাধীনতা, ১৬. ১. ৪৬)

অবশেষে ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপর কলকাতায়ও গুলি চলল। ব্রেথওয়েট কারখানার শ্রমিকদের উপর গুলি চালনা ও কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগের প্রতিবাদে খিদিরপুরে হাজার হাজার শ্রমিক ধর্মঘটে সামিল হয়। তাদের মধ্যে রয়েছে মেটাল বক্স, ব্রুক বন্ড, জে স্টোন ও অর্ডন্যান্স কারখানার শ্রমিক। (স্বাধীনতা, ১৭. ১. ৪৬)

শ্রমিক আন্দোলনের এই নতুন তরঙ্গ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার প্রেরণার উৎসভূমি। তিনি লিখলেন:

জবাব চাই

রক্তের ধার রক্তে শুধবো কসম ভাই !
ব্রেথওয়েটের গোয়ালিয়রের জবাব চাই ।
লাখো লাখো হাত, এক হলে বলো
পরোয়া কাকে ?
আমাদের দাবী রোখে কে ? কে রোখে
লাল ঝাণ্ডাকে ?

শিকলে বেঁধেছো ; হাত দিলে শেষে
মুখের গ্রাসে !
শয়তান, চাও ভাঙতে কলিজা
গুলিতে গ্যাসে ?
পার পাবে নাকো । দেওয়ালে ঘোষণা :
শেষ লড়াই—
বারুদে লাগালে আগুন যখন,
পুড়ে হও ছাই ।।

দিকে দিকে আজ দুঃশাসনের ভিৎ পড়ো-পড়ো
যুগসন্ধির মোড়ে মোড়ে ভুখা-নাঙ্গারা জড়ো ।
শানানো কাস্তে, হাতুড়ির মুখে
সোজা জিজ্ঞাসা :
দু'শো বছরের রক্ত শুষেও
মেটেনি পিপাসা ?
বজ্রনিনাদে ঘরে ঘরে আজ পৌঁছোয় ডাক :
যেখানে যে আছে, ময়দানে সব এক হয়ে যাক ।
কড়া-পড়া হাতে শিকল ভাঙার
শপথ কঠিন—
আমাদের হবে কলকারখানা, জায়গা জমিন ।

রক্তের ধার রক্তে শুধবো কসম ভাই ।
ব্রেথওয়েটের, গোয়ালিয়রের জবাব চাই ।
লাখো লাখো হাত এক হলে বলো পরোয়া কাকে ?
আমাদের দাবী কে রোখে ? কে রোখে লাল ঝাণ্ডাকে ?

(স্বাধীনতা, ১৭.১.৪৬)

সব ধর্মঘট, সব লড়াইয়ে শ্রমিকরা জয়ী হয়নি। যেমন হয়নি কেশোরামের শ্রমিক। কিন্তু দেখা গেল তারা রক্তবীজের বংশ। ১৯৪৬ সালের মে দিবসে মেটিয়াবুরুজে লাল ঝাণ্ডার মেলা বসে গেল। কমরেড রজনী পাম দত্তের অভ্যর্থনা-সভায় শ্রমিকরা বিপুল সংখ্যায় যোগদান করেন।

'মেটিয়া বুরুজের শ্রমিকের উপর গত ৭/৮ মাস ধরিয়া মালিক ও পুলিশের দমননীতির ঝড় বহিয়া চলিয়াছে। গত এক মাসের মধ্যে লাল ঝাণ্ডার সমস্ত নেতা ও কর্মীকে লইয়া পুলিশ ৪১ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাঁহারা গত একমাস যাবৎ এই এলাকায় ঢুকিতে পারেন না। সুতাকলে এমন একটি ডিপার্ট নাই, যেখানে লাল ঝাণ্ডার উৎসাহী শ্রমিক গ্রেপ্তার হয় নাই। এখনও পর্যন্ত ২ হাজার শ্রমিকের উপর মারামারির অভিযোগ ঝুলিতেছে। মালিক-পুষ্ট গুণ্ডাদলের ক্রমাগত আক্রমণে বহু শ্রমিক আহত হইয়াছেন। …কিন্তু রক্তবীজের মতো শ্রমিকরা আগাইয়া আসিয়াছেন। এখানে একজন দুইজন নন, সকল শ্রমিকই নেতা।'

পাম দত্তের অভ্যার্থনার বিপুল সাড়া

'…হ্যাণ্ডিকলের 'হাড়ভাঙ্গা' খাটুনির পর অনেকের চা খাইবারও অবসর নাই—সভায় আসিতে সকলে ব্যস্ত।

এরা মরিয়াও মরে নাই। বদরতলা, রাজাবাগান, সাবুন কল ফতেপুর হইতে দলে দলে শ্রমিক আসিয়াছেন।' (স্বাধীনতা, ৩. ৫. ৪৬)

আঠারো

কলকাতা ও শহরতলি শুধু নয়—ট্রাম, পটারি, কেশোরাম ও ব্রেথওয়েটের বাহাদুর শ্রমিকের জঙ্গী লড়াই—সারা বাংলার শ্রমিক আন্দোলনের উপর এক প্রবল অভিঘাত সৃষ্টি করল। শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে যারা এতদিন শোষণ ও বঞ্চনাকে বিধিলিপি বলে মেনে এসেছে—তাদের মধ্যে জাগল আলোড়ন। যারা ছিল সংগঠনের বাইরে—তাদের মধ্যে গড়ে উঠল ইউনিয়নের পর ইউনিয়ন। চটকল, সুতাকল, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের শ্রমিকের দেখাদেখি লড়াইয়ের ময়দানে নামল চা-বাগিচার শ্রমিক। দক্ষ শ্রমিকের পাশে অদক্ষ শ্রমিক—মজুরের পাশে কলমপেষা কেরানী। শিল্প-শ্রমিকের পাশে দোকান-কর্মচারী—সবাই শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে সোচ্চারে সামিল। চেতনা-সংগঠন-সংঘাত—এই তিনটি শব্দের মধ্যবর্তিতায় শ্রমিক আন্দোলনের নতুন পর্যায়কে চেনা যেতে পারে। শ্রেণী-সংগ্রামের চেতনা ছড়িয়ে পড়েছে নতুন নতুন শিল্পে নতুন নতুন এলাকায়। যারা অসংগঠিত—তারা আজ সংগঠনের কদর বুঝেছে—সংগঠিত হচ্ছে। যাদের কোন ধরনের লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা ছিল না—তারা লড়াইয়ের রাস্তায় সামিল। ১৯৪৬ সালের মার্চ-এপ্রিল-মে'র দিনগুলি তার সাক্ষী। তার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত :

২রা মে, বজবজ ১নং ও ৪নং জুট মিল এবং ক্যালেডোনিয়ান মিলের মজুররা মিলের ভিতর ধর্মঘট করে বসে থাকে। প্রস্তাবিত বেতন বৃদ্ধির

নোটিশ না থাকায় তারা মিল কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান। একই দাবীতে ওরিয়েন্ট এবং চিত্তরঞ্জন মিলেও শ্রমিক ধর্মঘট হয়। মোট আঠার হাজার শ্রমিক ধর্মঘটের সঙ্গে জড়িত। (স্বাধীনতা, ৪. ৫. ৪৬)

তিন মাস পরে নারায়ণগঞ্জের সূতাকলে ধর্মঘটের মীমাংসা

সর্বদলীয় সম্মেলনে শ্রমমন্ত্রীর উপস্থিতিতে

শ্রমিকদের অধিকাংশ দাবী স্বীকৃত।

দাবি ছিল: ১. এক মাসের বোনাস ২. প্রত্যেক শ্রমিক পিছু আধ মণ চাউল খয়রাতি সাহায্য ৩. ২১ জন ছাঁটাই শ্রমিকের পুনর্নিয়োগ ৪. আগামী সেপ্টেম্বর মাসে শ্রমিকদের আরো এক মাসের বোনাসের প্রতিশ্রুতি ৫. বার টাকা মণ দরে প্রতি শ্রমিকের জন্য এক মণ চাউল ৬. গুলিতে নিহত শ্রমিক পরিবারকে সাহায্য করার জন্য অতুল সেনকে সম্পাদক করে রিলিফ কমিটি গঠন।

ঢাকা জেলা টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি কমরেড অনিল মুখার্জি রিলিফ কমিটির তহবিলে ইউনিয়ন ফান্ড থেকে একশ টাকা দান করেন।

ধর্মঘটের ইতিহাস

শীতলক্ষ্যা নদীর দুই তীরে অবস্থিত ঢাকেশ্বরী, চিত্তরঞ্জন ও লক্ষ্মীনারায়ণ কটন মিলের প্রায় আট হাজার শ্রমিক গত ১৭ই ফেব্রুয়ারি থেকে ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছিলেন। শ্রমিকদের দাবি: মাসে দশ টাকা দরে প্রতি শ্রমিককে এক মণ চাউল ও ২১ জন ছাঁটাই শ্রমিকের পুনর্নিয়োগ। আপোষ আলোচনা ব্যর্থ হওয়ায় ধর্মঘটের নোটিশ দেওয়া হয়।

—ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে শ্রমিকদের উপর কাঁদুনে গ্যাস ও লাঠি চলে।

—২৫শে মার্চ চলে গুলি। পুলিশ চালায় ৫৫ রাউন্ড গুলি এবং মিল কর্তৃপক্ষ চালায় ৯ রাউন্ড। তার ফলে ৪ জন শ্রমিক নিহত, ৪ জন চিরদিনের জন্য পঙ্গু ও শতাধিক শ্রমিক আহত হয়। এই নৃশংস গুলিবর্ষণে ঢাকেশ্বরী মিলের অংশীদাররা পর্যন্ত বিক্ষুব্ধ। সূর্যকুমার বসুর বিরোধিতা সত্ত্বেও তাঁরা তদন্ত কমিটি গঠন করেন এবং তদন্ত কমিটি শ্রমিকদের ন্যূনতম দাবি মেনে নেন। সূর্যবাবু কিন্তু অনমনীয়।

ধর্মঘট ভাঙার শেষ চেষ্টা হিসেবে এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে গুণ্ডা লাগিয়ে শ্রমিকদের উপর মারপিট চলে। কিন্তু শ্রমিকদের মনোবল ভাঙা গুণ্ডাদের সাধ্যের বাইরে। ধর্মঘটীদের পক্ষ থেকে শ্রমমন্ত্রী সামসুদ্দিন আহমদের কাছে ডেপুটেশন নিয়ে যাওয়া হয়। সামসুদ্দিন সাহেব তখন ঢাকায় গিয়ে ধর্মঘটের মীমাংসা করেন। (স্বাধীনতা, ৪. ৫. ৪৬)

কী অসহনীয় পরিস্থিতিতে শ্রমিক বেঁচে আছে তার অন্যতম উদাহরণ অ্যানড্রু ইউল কারখানার শ্রমিকদের অবস্থা। সংবাদে প্রকাশ, প্রতি মাসে

কারখানায় এমন কিছু লোক কাজ করে যারা কোন মাইনে পায় না। তিন-চার মাস বিনা বেতনে খাটার পর দু আনা—তিন আনা—চার আনা রোজ দেওয়া হয়। একজন সুদক্ষ মিস্ত্রী পায় দু টাকা বা দু টাকা চার আনা রোজ। মহম্মদ ইয়াকুব খাঁর বর্তমান বয়স ষাট। তিনি মাসিক পঁচিশ টাকায় কাজে ঢুকেছিলেন। চল্লিশ বৎসর পর তাঁর বর্তমান বেতন পঁয়ত্রিশ টাকা।

অমানুষিক শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে তাই দিকে দিকে শ্রমিক আন্দোলন ফেটে পড়েছে। তার একটি তালিকাবদ্ধ ছবি ৬ই জুন 'স্বাধীনতা'র সংবাদদাতা তুলে ধরেছেন।

কলিকাতার শিল্পাঞ্চলে বিভিন্ন কারখানায় ধর্মঘট ও লকআউট

(স্বাধীনতার রিপোর্টার)

'গৌরীপুরের জেলসন নিকলসনের রং কল ও ইলেকট্রিক ওয়েল্ডিং কারখানার ১২০০ শ্রমিক ধর্মঘট করেছিলেন। কোম্পানী তাঁদের সকলকে বরখাস্ত করে কারখানায় লক আউট ঘোষণা করেছেন।

... ...

কলকাতার সরকারি ছাপাখানার প্রায় এক হাজার শ্রমিক গত ২রা এপ্রিল থেকে ধর্মঘটরত।

... ...

ইণ্ডিয়ান মেশিনটুল কারখানার প্রায় ১৫০ শ্রমিক ১৯শে এপ্রিল থেকে ধর্মঘট করে আছেন।

... .

হাওড়া পোর্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার প্রায় বারশ শ্রমিক গত ১লা মে ধর্মঘট করেন। কোম্পানি ২রা মে থেকে লক আউট ঘোষণা করেছেন।

... ...

বেলঘরিয়ায় টেক্সম্যাকো কারখানায় ৯ই মে থেকে লক আউট ঘোষিত হয়েছে। ফলে প্রায় সাতশ শ্রমিক বেকার।

... ...

২১শে মে বেঙ্গল ইমিউনিটিতে লক আউট ঘোষিত হওয়ার ফলে প্রায় তেরশ শ্রমিকের রোজগার বন্ধ হয়েছে!

... ...

শ্রীগণেশ জুট মিলের প্রায় পাঁচশ শ্রমিক গত ২১ মে থেকে ধর্মঘট করে আছেন।

... ...

২৩শে মে আগরপাড়া চটকলে লক আউট ঘোষিত হয়। তার ফলে আট হাজারেরও বেশি শ্রমিক বেকার।

... ...

বেঙ্গল ট্যানারির ১৮০০ শ্রমিক গত ১লা জুন থেকে ধর্মঘট করে আছেন।

কলকাতায় ও শহরতলিতে আরও কতগুলি ছোটখাট কারখানায় ধর্মঘট চালু রয়েছে। ধর্মঘট ও লক আউটের ফলে বেকার শ্রমিকের মোট সংখ্যা ষোলো-সতেরো হাজার।

'স্বাধীনতা'র সংবাদদাতা আরও জানাচ্ছেন যে অত্যাচারিত ও উৎপীড়িত প্রায় ১৮০০ ট্যানারি শ্রমিক ধর্মঘট করার পর তাঁদের কয়েকজন প্রতিনিধি অ্যাসিস্টেন্ট লেবার কমিশনার মিঃ ব্যানার্জি'র সঙ্গে দেখা করে বলেন: 'অন্তত এই ব্যবস্থা করুন যে চীনা মালিকরা ভারতীয় শ্রমিকদের উপর মার-পিট বন্ধ করুক।' অ্যাসিস্ট্যান্ট লেবার কমিশনার প্রতিনিধিদের হাঁকিয়ে দেন!

হাওড়া পোর্ট ইঞ্জিনিয়ারিং-এর শ্রমিকদের উপর সেখানকার সাহেব ম্যানেজার গুলি ছোঁড়ে এবং তার ফলে কয়েকজন শ্রমিক আহত হয়। পুলিশ সাহেব ম্যানেজারকে গ্রেপ্তার না করে শ্রমিকদের গ্রামে গ্রামে গিয়ে ঘর থেকে তাদের টেনে বের করে গ্রেপ্তার করেছে।

স্বদেশী মালিক বিড়লা একজন বিখ্যাত কংগ্রেসভক্ত। শ্রমিকদের দাবি-দাওয়ার কথা শোনা তো দূরের কথা—তাঁর সাহেব ম্যানেজার পুলিশের সাহায্যে শ্রমিকদের কারখানা থেকে বার করে দিয়ে লক আউট করে দিল। শ্রমিকদের কয়েকজন প্রতিনিধি তাঁকে একথা জানালে তিনি সাফ জবাব দেন—ঠিকই করেছে।' (স্বাধীনতা, ৪. ৬. ৪৬)

উনিশ

সেদিন হাওয়ায় হাওয়ায় অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্যের বীজাণু ভেসে বেড়াচ্ছে: সমতলের বিদ্রোহী বাতাসের ঝাপটা লেগেছে পাহাড়ের গায়ে। এতদিন মূক পশুর মতো যাদের দারিদ্র্য, বঞ্চনা ও শোষণ অত্যাচার গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল—আজ তাদের মুখে প্রতিবাদের ভাষা, হাতে লাল ঝাণ্ডা। দার্জিলিং-এ শুরু হয়েছে শ্বেতাঙ্গ চা-করদের বিরুদ্ধে লাল ঝাণ্ডার অভিযান। অভূতপূর্ব শ্রমিক জাগরণ শ্বেতাঙ্গ মালিকের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে।

'স্বাধীনতা'র সংবাদদাতা জানাচ্ছেন:

'হ্যাপি ভ্যালি চা বাগানের ভিতর দিয়া সোজা রাস্তা নীচে নামিয়া গিয়াছে। দূরে পাখীর বাসার মতো ছোট ছোট একচালা ঘরে শ্রমিকের বস্তি। পথে নামিতে নামিতে যে কয়দল লোকের সঙ্গে দেখা হইল, তাঁহারা সকলেই 'ময়লা-বাজকে' (রতনলাল ব্রাহ্মণ) দেখিবামাত্র লাল সেলাম দিলেন। ইঁহারা শুধু চা-বাগানের কুলী নন—দুধওয়ালা, ব্যাপারী, শিশু, বৃদ্ধ সকলেই।'

দার্জিলিং জেলার তিন লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ৯৬টি চা-বাগানে আড়াই লক্ষের বেশি চা-শ্রমিকের বাস। তারা সবাই অমানুষিক শোষণের শিকার। মালিক যখন খুশি তখনই তাদের উৎখাত করতে পারে। সুতরাং যে কোন কঠিন শর্তে তারা কাজ করতে বাধ্য। গোটা পরিবার মালিকের কেনা গোলামের মতো—মেয়ে, পুরুষ, বৃদ্ধ, শিশু সকলকেই বাগানের কাজ করতে হয়। সকলেই দিন মজুর।

নিখিল ভারত গুর্খা লীগের সম্পাদক, শ্রীযুত শিব কুমার রায় বলছেন, 'যে জমিতে শ্রমিকরা পুরুষানুক্রমে বাস করছেন, যেখানে মাটি খুঁড়লে তাঁদের পূর্বপুরুষদের দেহাবশেষ মিলতে পারে, সেই জমির উপরেও চা-বাগান শ্রমিকের কোন দখলী স্বত্ব নেই; ম্যানেজার সাহেবের মর্জি হলে তাঁদের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে উচ্ছেদ করে দিতে পারেন। সারাদিন পরিশ্রম করেও একজন সবল পুরুষ পাঁচ আনা, মেয়ে শ্রমিক চার আনা ও একজন কিশোর তিন আনার বেশি রোজগার করতে পারে না।'

লাল ঝাণ্ডার ডাক

সংবাদদাতা লিখছেন:

'চা শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক কমরেড হামালের সহিত পাণ্ডাম চা-বাগানে গিয়েছিলাম। চালাখোলা একটি ভাঙ্গা ঘরে ঢুকিতেই একজন বৃদ্ধ হাত উঁচু করিয়া জানাইলেন—'লাল সেলাম'। শুধু তিনি নন, ঘরে স্ত্রী, পুরুষ, শিশু—সকলেই এই অভিবাদন করিলেন। ইউনিয়নের কাজ করিবার অপরাধে বৃদ্ধটির কাজ গিয়াছে।'

পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি

রাত্রে সভা। আগে হইতে কোনও বন্দোবস্ত নাই। পাহাড়ের উপর হইতে শ্রমিক কিশোরেরা আওয়াজ তুলিল—'লাল ঝাণ্ডা জিন্দাবাদ', 'কমিউনিস্ট পার্টি জিন্দাবাদ', 'ময়লাবাজ জিন্দাবাদ'। সেই আওয়াজের প্রতিধ্বনি চলিয়া গেল দূরের পাহাড়ে পাহাড়ে। সকলে বুঝিল রাত্রে সভা।'

প্রথমে বিশ্বাস হয় নাই। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই দেখিলাম পাহাড়ের গা বাহিয়া পিঁপড়ার সারির মত মেয়ে-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ আসিতেছেন। হাতে তাঁহাদের জ্বলন্ত মশাল। রাত্রি ১০ টায় সভা আরম্ভ হইল। পুলিশ জুলুমের তীব্র নিন্দা এবং ইউনিয়ন সম্পাদক কমরেড অম্বর সিং-এর পুনর্নিয়োগ দাবী করা হইল: তারপর গভীর রাত্রি পর্যন্ত চলিল কমরেড যোশী আর 'ময়লাবাজের' নামে রচিত লাল ঝাণ্ডার গান।'

শ্বেতাঙ্গ মালিকের হৃৎকম্প

'নির্ব্বাচনের পরাজয়ের পর হইতে চা-মালিক একসঙ্গে প্রায় ৮/১০টি বাগানের সমস্ত কমিউনিস্ট কর্ম্মীর বিরুদ্ধে মামলা শুরু করিয়াছে। (সদ্য সমাপ্ত

নির্ব্বাচনে কমরেড রতনলাল ব্রাহ্মণ নির্বাচিত।) এই মামলায় কমরেড রতনলাল, সুব্বা, হামাল, মদন, চন্দ্রকুমার, ভীমদাস, প্রেমবাহাদুর, পত্রবালম, পলম্যান প্রভৃতি কমিউনিস্ট পার্টির প্রায় সমস্ত নেতা ও কর্ম্মী অভিযুক্ত।

পুলিশ জুলুম

প্রত্যেক বাগানে পুলিশ শ্রমিকদের ধমকাইতেছে; মালিক বরখাস্ত করিতেছে। চা-শ্রমিকের ভিতর হইতে লাল ঝাণ্ডাকে নষ্ট করিবার প্রাণপণ চেষ্টা চলিতেছে।

শ্রমিকরা আজ আক্রমণের সম্মুখে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। পাণ্ডাম চা-বাগানে একটি বালক লাল টুপি পরিয়া কাজে আসে। ম্যানেজার সাহেব রাগে আগুন হইয়া তাহাকে বরখাস্ত করেন। পরের দিন বাগানের সমস্ত শ্রমিকের মাথায় লাল টুপিতে সমস্ত বাগানই লাল হইয়া গেল।' (স্বাধীনতা, ৩. ৬. ৪৬)

'স্বাধীনতা'র পাতায় পরপর কয়েকদিন দার্জিলিং জেলার চা-বাগিচার মালিকের বিরুদ্ধে শ্রমিকের লড়াইয়ের সংবাদ প্রকাশিত হয়। ৪ঠা জুনের সংবাদে জানা যায়, গতকাল সুম্ চা-বাগানের শ্রমিকদের উপর পুলিশ বেয়নেট চার্জ করেছে। ১৬ জন শ্রমিক গ্রেপ্তার। পুলিশ জুলুমের প্রতিবাদে সুম্ চা-বাগানের ৫ শত শ্রমিক ধর্মঘট করেছেন। কংগ্রেস, কমিউনিস্ট ও শ্রমিক ইউনিয়নের মিলিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আশেপাশের বিভিন্ন বাগানের শ্রমিকগণ এক বিরাট শোভাযাত্রা করে দার্জিলিং শহরে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন।

৬ই জুন, সুম্ চা-বাগানের ইউনিয়ন-সম্পাদককে বরখাস্ত করা হয়েছে এবং অনধিকার প্রবেশের দায়ে ছ' জন কর্মীর ত্রিরিশ টাকা অর্থদণ্ড—অনাদায়ে এক মাস কারাদণ্ডের আদেশ হয়েছে।

১২ই জুন, লেবার কমিশনার শ্রমিক নেতাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, আপস-আলোচনা চলতে থাকাকালীন কোন শ্রমিককে শাস্তি দেওয়া হবে না। কিন্তু চা-বাগানের মালিকরা এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে ফুকুৎ বাগানের তিনজন শ্রমিককে জবাব দিয়েছে। এই শ্রমিকরা ইউনিয়নের উৎসাহী কর্মী। তাছাড়া মালিক ভাড়াটে গুণ্ডা এনে শ্রমিকদের মারপিটের ভয় দেখাচ্ছে।

'স্বাধীনতা'র সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, কার্সিয়াং চা-বাগানে শুরু হয়েছে শ্রমিক ছাঁটাই, বস্তি উচ্ছেদ ও লক আউট।

কার্সিয়াং ১৩ই জুন। কার্সিয়াং-এর নিকটবর্তী আম্বাটিয়া চা-বাগানের ম্যানেজার গত ১১ই জুন ৬ জন শ্রমিককে ইউনিয়ন করার অপরাধে বরখাস্ত করে এবং অবিলম্বে বাগান ছেড়ে যাবার হুকুম দেয়। শ্রমিকরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে তার প্রতিবাদ করলে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে লক আউট ঘোষণা করা হয়। আম্বাটিয়া চা-বাগানের শ্রমিকগণ এই জুলুমের প্রতিবাদে কার্সিয়াং শহরময় শোভাযাত্রা করে বিক্ষোভ দেখান। স্ত্রীলোক

ও বালকসহ প্রায় পাঁচশ শ্রমিক মিছিলে যোগদান করেন। শোভাযাত্রার শেষে মার্কেট স্কোয়ারে এক সভা হয়। সভায় কমিউনিস্ট নেতা কমরেড গণেশলাল সুব্বা এই জুলুমের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কংগ্রেস ও গুর্খা লীগের সহযোগিতার জন্যে আবেদন জানিয়ে বক্তৃতা দেন।

চা-কর ও আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের জন্য কমিউনিস্ট পার্টির আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন নিখিল ভারত গুর্খা লীগের নেতা শিবকুমার রায়। তিনি বলেন, 'যুদ্ধের সময় অর্ধেক লোকই সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। তাদের বেতন থেকে প্রেরিত মনি অর্ডারের সাহায্যেই শ্রমিক পরিবারগুলির দিন গুজরান হত। বর্তমানে তাদের অধিকাংশকেই সৈন্য-বাহিনী থেকে বিদায় দেওয়া হয়েছে। ফলে, সেসব পরিবারে দেখা দিয়েছে হাহাকার।'

শিল্প-শ্রমিকের লড়াই মেহনতী মানুষের অন্য অংশের মধ্যেও জাগিয়ে তুলেছে আশা ও উদ্দীপনা। কলকাতার হাজার হাজার দোকানের লক্ষাধিক কর্মচারীর অভিশপ্ত জীবন নৈরাশ্যের অন্ধকারে ডুবেছিল এতদিন। তারা এতদিন যাপন করছিল সীমাহীন বঞ্চনা ও দারিদ্র্যের জীবন। একজন দোকান কর্মচারীর দৈনিক বার ঘণ্টা খাটুনি। চাকরির কোন নিশ্চয়তা বা নিরাপত্তা নেই। আজ কাজ, কাল বেকার। একদিন কামাই হলেই পরদিন কর্মচারী সন্ত্রস্ত থাকেন, চাকরিতে জবাব হয়ে যাবে কিনা—এই আশঙ্কায়। দশ-পনেরো টাকা মাসিক বেতনে যুবা বয়সে কর্মচারীরা দোকানে ঢোকেন। দীর্ঘ পনেরো-কুড়ি বৎসর চাকরির পর বেতন হয় বড়-জোর তিরিশ-পঁয়ত্রিশ টাকা। পাঁচ-সাতজনের পুষ্যি নিয়ে এই টাকাতেই সংসার চালাতে হয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই অধিকাংশ কর্মচারী অকালে অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হন যক্ষ্মা কিংবা হাঁপানি রোগের আক্রমণে। ভিক্ষা ছাড়া তখন সেই সর্বস্বান্ত পরিবারের অন্য কোন উপজীবিকা থাকে না। শরীর যখনই অসুস্থ হতে আরম্ভ করে মালিক তখনই তাকে কাজ থেকে সরিয়ে দেন বিনা খেসারতে, বিনা ভাতায়, বিনা মজুরিতে।

আজ ধরিত্রীর মতো সর্বংসহা মানুষেরাও মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। ১লা জুন, 'স্বাধীনতা'য় প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায়, মিষ্টান্নের দোকান ভীম নাগের ভবানীপুর শাখার কর্মচারীরা ২৪শে ও ২৫শে মে—এই দুদিন হরতাল করে তাঁদের দাবি আদায় করেছেন। ১. প্রত্যেক কর্মচারীর ৬ টাকা হারে মাসিক বেতন বৃদ্ধি ঘটেছে। ২. সপ্তাহে চার আনা করে বেশি খোরাকি। ৩. বৎসরে পুরো বেতনসহ ২৪ দিন ছুটি পাবে সকলে।

দোকান কর্মচারীদের অবস্থার পাশাপাশি প্রসঙ্গত এসে পড়ে মধ্যবিত্ত কেরানী ভদ্রলোকদের কথা—চিত্ত মৈত্রের ভাষায় যারা সর্বদা চাকরি যাবার ভয়ে অস্থির—সে জন্যে কোন আন্দোলনে সহসা নামতে চায় না। মধ্যবিত্ত কর্মচারী সংগঠনের চেহারাও আধা ক্লাব - আধা স্টাফ কাউন্সিলের মতো।

১৯৪৬ সালের গোড়ায়, যুদ্ধের প্রয়োজনে যাদের চাকরি—সেই মিলিটারি

একাউন্টসে ছাঁটাই এবং তার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। রেল ও ডাকতার কর্মীদের সর্বভারতীয় ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। রেলকর্মীদের ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত ডালহৌসি স্কোয়ারের কেরানীকুলে সৃষ্টি করল এক নতুন উন্মাদনা। যুদ্ধোত্তর যুগের বিদ্রোহের বাতাস তাদের স্পর্শ করেছে। বিনা প্রতিবাদে এতদিন তাঁরা মেনে এসেছেন স্বল্প বেতন ও চাকরির অনিশ্চয়তা। অথচ মধ্যবিত্ত সংসারের যাবতীয় ঠাট তাদের বজায় রাখতে হয়েছে। সন্তানের শিক্ষা, মেয়ের বিয়ে, ধর্মকর্ম, লোক-লৌকিকতা।

'স্বাধীনতা'য় (১৫.৭.৪৬) প্রকাশিত কেরানীদের আর্থিক অবস্থার একটি সমীক্ষা এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

'ক্লাইভ স্ট্রীটের সাহেব সওদাগরেরা তাঁহাদের কেরানী ও কর্মচারীদের কি দেন :

অফিস	কেরানীর সংখ্যা	চাপরাসী/ দরওয়ান সংখ্যা	মূলবেতন টাকা		মাগ্‌গীভাতা টাকা	
			কেরানী	চাপরাসী	কেরানী	চাপরাসী
১। ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জী	৬৮৫	৩৩৭	৪০	১৮	২৫	১৮
২। বর্ম্মা শেল	৪১২	২০০	৪৫	১৮	২৩	১৮
৩। বার্ড এণ্ড হিল্‌জারস	৫৯০	২৫০	৩৫	১৪	১৫	১৫
৪। অ্যান্ড্রু ইউল	৫০০	১৫০	৩০	১৫	১৬॥০	১৬॥০
৫। গিলেণ্ডার্স	৩১৫	১০০	৩০	১৫	২৫	১০
৬। শ'ওয়ালেস	৪০০	২০০	৩৫	১৬	১৮	১৮
৭। জেমস ফিন্‌লে	৩১৬	১৪৩	৩০	১৮	১৫	১৫
৮। হোর্‌মিলার	১২০	৬৬	৩০	১৭	১৭	১২
৯। স্ট্যাণ্ডার্ড ভ্যাকুয়াম অয়েল	২০০	৩০	৪০	১৬	২৪	১৫॥০
১০। ভলকার্ট ব্রাদার্স	১৮৪	১০৭	৪৫	১৮	২৫	২৫
১১। লিপটন	১৬৩	২২	৫০	১৮	১৪	১২॥০

এই সমীক্ষা পূর্ণাঙ্গ না হলেও এর থেকে মধ্যবিত্ত কেরানীকুলের আর্থিক সঙ্গতির একটা আভাস ফুটে ওঠে। আব্দুল মোমিন বলেছেন, একদিন বি. পি. টি. ইউ. সি. অফিসে তাঁর সঙ্গে কয়েকজন ভদ্রলোক এসে দেখা করেন। ডালহৌসি পাড়ার বিভিন্ন অফিসে তাঁরা কাজ করেন। তাঁদের বিড়ম্বিত জীবনের কাহিনী সবিস্তারে মোমিনকে শুনতে হয়। ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না তাঁদের। সন্তানের শিক্ষা ও মেয়ের বিয়ে দেবার সামর্থ্যটুকু পর্যন্ত অনেকের নেই। তার উপর নেই চাকরির নিরাপত্তা। সুতরাং মোমিন সাহেব যেন তাঁদের পথ দেখান। আব্দুল মোমিন বলেন, পথ একটাই, কারখানার মজুরের পথ। প্রথমে সংগঠন ও পরে লড়াই।

তাঁরা রাজি হন। পরে মোমিন ডালহৌসি পাড়ার অফিসে-অফিসে ঘুরতে থাকেন। সাড়াও পান ভালোই। তাপর গঠিত হয় ২৫ হাজার কেরানীর সংগঠন—মার্কেন্টাইল ফেডারেশন।

'স্বাধীনতা'র ১৪.৭.৪৬ সংবাদ সূত্রে জানা যায় ১৯৪৬ সালের ১৩ই জুলাই মৃণালকান্তি বসুর সভাপতিত্বে কলকাতার সওদাগরি অফিসগুলোর কেরানী ও কর্মচারীদের এক সভায় কর্মচারী ইউনিয়নগুলিকে একত্র করে একটি ফেডারেশন গঠিত হয়।

দাবি— বেতনহার :

কেরানীদের জন্য : ৮০—১০—১৫০—১৫—৩০০ টাকা।

অন্য কর্মচারীদের জন্য : ৪০—৫—১০০ টাকা।

এই দাবি মোটেই অযৌক্তিক নয়। কারণ শিল্পে মুনাফার সূচক-সংখ্যা তখন :

১৯৪০—৪৫

বৎসর	সমস্ত শিল্প	চট	বস্ত্র	কাগজ	লোহ ও ইস্পাত	কয়লা	সিমেন্ট
১৯৪০	১৩৮·০	৩৫৯·১	১৪২·৫	২৩৬·৩	১০৩·৮	১০০·৮	১০২·৮
১৯৪১	১৮৭·০	৩৪৪·৪	৩১৬·৬	২৮৪·৭	১৩৩·৭	৮২·৬	১২৮·৮
১৯৪২	২২১·৮	৩৫১·১	৪৯১·৩	৩২১·৭	১১০·১	৮০·৫	১৬৯·১
১৯৪৩	২৪৫·০	২৭৬·৩	৬৪০·০	৩৫২·৮	১১১·৮	৯৫·৮	১৪৭·৯
১৯৪৪	২৩৮·৯	৩১০·৬	৪৯২·১	২৭১·৫	১১৭·৮	২৩৭·০	২১৪·৪
১৯৪৫	২৩৩·৬	৩২৭·৬	৪২৩·৩	২৭৯·৫	১২০·২	২৫৮·২	২১৬·৬

উপরের সমীক্ষা থেকে এটা স্পষ্ট যে বিভিন্ন শিল্পে যুদ্ধচলাকালীন পুঁজিপতিদের মুনাফা প্রায় দুই গুণ থেকে তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। (সুকোমল সেন, ভারতের শ্রমিক আন্দোলন, পৃ: ২৪৯)

এই বই থেকে আরও জানা যায় যে যুদ্ধের সময় ভারতে শিল্প-শ্রমিকের সংখ্যা যুদ্ধপূর্বকালের তুলনায় শতকরা ৫০ ভাগেরও কিছু বেশি বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯৩৯ সালে বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা যেখানে ছিল ১৭,৫১,১৩৭ জন—সেখানে ১৯৪৫ সালে সংখ্যাটা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ২৬,৪২,৯৭৭ জন—অর্থাৎ শতকরা ৫০·৯ ভাগ বৃদ্ধি। যুদ্ধের পর শ্রমিক শ্রেণীর সামনে মূল সমস্যা, যুদ্ধকালীন নিয়োগপ্রাপ্ত শ্রমিকদের ব্যাপক ছাঁটাই ও মজুরি হ্রাস।

লন্ডনের 'টাইমস্' পত্রিকার হিসাব অনুযায়ী, যুদ্ধ শেষ হবার পর ভারতের শিল্প-শ্রমিক, বিভিন্ন আনুষঙ্গিক কাজে নিযুক্ত শ্রমিক-কর্মচারী, সরকারী কর্মচারী ও সৈন্যবাহিনীর সদস্যসহ মোট ৫০ লক্ষ থেকে ৭০ লক্ষ মানুষ বৃত্তিচ্যুত হয়েছিল। (ঐ, পৃ: ২৬৯-৭০)

এই পটভূমিতে এসে পড়ল সারা ভারত রেল ধর্মঘটের ডাক। মধ্যবিত্ত কর্মচারী আন্দোলনের প্রেরণার অন্যতম উৎস রেল শ্রমিক-কর্মচারীর সংগ্রামী তৎপরতা।

কুড়ি

সত্যেন গাঙ্গুলী বলেছেন, '১৯৪৫ সাল থেকে রেল শ্রমিক আন্দোলন এক নতুন মোড় নিল। রেল শ্রমিকদের মধ্যে আমাদের প্রভাব তখন বাড়তির দিকে। অবশ্যি মধ্যবিত্ত কেরানী বা সাবঅর্ডিনেট স্টাফ-এর লোকেরা আমাদের দিকে তত ঝোঁকেনি। আমরা বেশি পেয়েছিলাম লোকো ও রানিং স্টাফের লোকদের। আন্দোলনে তারা ছিল অগ্রণী। বলা চলে সারা ভারতে এরাই লাল ঝাণ্ডার প্রাণশক্তি। তারপরে স্থান—সবচেয়ে নিষ্পেষিত ও বেশ খানিকটা পেছিয়ে-পড়া গ্যাংম্যানদের। আর পেয়েছিলাম বড় বড় ওয়ার্কশপের দক্ষ, আধা-দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকদের। এর মূলে রয়েছে কাঁচড়াপাড়া ওয়ার্কশপ ও দক্ষিণ ভারতের গোল্ডেন রক ওয়ার্কশপে আমাদের সংগঠনের পুরনো ভিত। সারা ভারত রেলওয়ে মেনস্ ফেডারেশনের কাউন্সিলে আমরা সংখ্যায় বেশি না হলেও, সারা ভারতে রেল শ্রমিকদের মধ্যে তখন আমাদের বেশ প্রভাব। আমাদের নিজস্ব ইউনিয়ন—বি. এ. আর. ওয়ার্কার্স ইউনিয়নকে ফেডারেশন নেতৃত্ব বা সরকার কেউ স্বীকৃতি দেয়নি। পরে আমরা বি. এ. রেলরোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন গড়ি। প্রধানত উত্তরবঙ্গের কমরেডরা এটা গড়ে তোলেন—তার সঙ্গে সংযুক্তির ফলে বি. এ. আর. ওয়ার্কার্স ইউনিয়নকে ফেডারেশন স্বীকৃতি দেয়। কিছুটা টালবাহানার পর রেল কর্তৃপক্ষও স্বীকৃতি দিল।

১৯৪৫-এর আগে ও পরে অবস্থার কত তফাৎ। ১৯৪৫-এর স্বতঃস্ফূর্ত শ্রমিক আন্দোলনের স্রোত লাল ঝাণ্ডার দিকে প্রবাহিত। এই প্রথম বলা চলে সারা দেশে বিভিন্ন জায়গায় স্টেশনে জংশনে শেডে বা শপে অগণিত স্বতঃস্ফূর্ত স্থানীয় ধর্মঘট ফেটে পড়ছে। এমন একটা দিন নেই ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় অফিসে এরকম ঘটনার খবর না-আসছে। রোজই স্থানীয় ঘটনার তার আসত। তখন কমরেডদের নাওয়া-খাওয়ার ফুরসুত পর্যন্ত ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনে করে হেড অফিসে ছুটতে হত—ধর্মঘটের ফয়সালা করার জন্য।

এমন একটা দিন ছিল না, যে-দিন অন্তত পাঁচজন শ্রমিক ছাঁটাই বা সাসপেনশনের নোটিশ পাচ্ছে না। জেনারেল ম্যানেজার থেকে শুরু করে ডিভিসনাল কমিশনার পর্যন্ত বহু অফিসার ট্যুর বাতিল করে অফিসে বসে থাকতেন। জ্যোতি বসু তখন বেঙ্গল আসাম রেলওয়ে ইউনিয়নের সাধারণ

সম্পাদক। শ্রমিকদের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের ফলে রেল কর্তৃপক্ষ লাল ঝান্ডা ইউনিয়নকে স্বীকৃতি জানাতে বাধ্য হল।

কমপক্ষে ৩৬ টাকা মূল বেতন ও অন্য কতকগুলি দাবি আদায়ের জন্য ফেডারেশন ধর্মঘটের ডাক দিতে বাধ্য হল। সারা ভারত জুড়ে রেল ধর্মঘটের প্রস্তুতি শুরু। নয় লক্ষ শ্রমিক। তাদের সকলকে ধর্মঘটের জন্য প্রস্তুত করতে হবে এবং কাজটা বেশ কঠিন। ২৭শে জুন 'চাক্কা বন্ধ'-এর আওয়াজ দেওয়া হল—কার্যকর করার দায়িত্ব পার্টির ক্যাডারদের। ফেডারেশনের সুবিধাবাদী নেতৃত্ব যে কোন মুহূর্তে বেঁকে বসতে পারে—পিছিয়ে আসতে পারে—ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নিতে পারে। মে ও জুন—এই দুটি মাস ধরে চলল ধর্মঘটের সপক্ষে অবিরাম প্রচার-অভিযান। জ্যোতি বসু তখন নতুন এম. এল. এ.। এই দুমাস তিনি বাংলা ও আসাম চষে বেরিয়েছেন। তাঁকে রোজ দু'তিনটি বড় বড় সভায় বক্তৃতা করতে হয়েছে।'

সত্যেন গাঙ্গুলী বলছেন, 'জেল থেকে বেরিয়ে নেহরু যে-রকম সম্বর্ধনা পেয়েছিলেন—রেল শ্রমিকদের মধ্যে আমরাও সেরকম সম্বর্ধনা পেতাম। ধর্মঘটের প্রচারে শিয়ালদহ থেকে ট্রেনে করে আমরা আসামের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত গিয়েছিলুম। লাল ঝান্ডায় সুসজ্জিত একটা বগিতে মাইক লাগিয়ে সারা পথে আমরা স্টেশনে স্টেশনে মিটিং করেছি। ফলে আসাম মেল সেদিন দশ ঘণ্টা লেটে লামডিং পেঁছাল। বক্তৃতা দিতে দিতে জ্যোতি বসুর গলা বসে গেল।'

জ্যোতি বসু লিখছেন :

'৬ই জুন হইতে ১৪ই জুন পর্যন্ত আমি পূর্ববঙ্গ ও আসামের প্রধান রেলওয়ে কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করিতে যাই। আমি যেখানেই গিয়াছি সেখানেই দেখিয়াছি শ্রমিকদের মধ্যে অভূতপূর্ব্ব জাগরণ ও বিরাট বিরাট সমাবেশ। সর্ব্বত্রই শ্রমিকদের চোখে মুখে প্রতিজ্ঞার ছাপ—আসন্ন রেলওয়ে ধর্ম্মঘটকে সাফল্যমণ্ডিত করিতেই হইবে।

চট্টগ্রাম পাহাড়তলীতে ৭ই জুন প্রায় সাড়ে তিন হাজার হিন্দু ও মুসলমান শ্রমিকের এক সভা হয়। সভার পূর্ব্বে শ্রমিকদের এক বিরাট শোভাযাত্রা শহর প্রদক্ষিণ করে। চট্টগ্রাম শহর হইতে একটি স্পেশাল ট্রেনেও বহু শ্রমিক আসেন।

পরদিন চট্টগ্রাম শহরে ৫০০০ শ্রমিক ও নাগরিকের এক সভা হয়। চট্টগ্রাম কিষানসভা ও কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ হইতে যথাক্রমে কমরেড সাত্তার ও কমরেড রণধীর দাশগুপ্ত সভায় বক্তৃতা করেন। পাঁচ হাজার শ্রোতা হাত উঠাইয়া তাঁহাদের সমর্থন ও সহানুভূতি জানান।

লাকসাম

৯ই জুন : এখানে মধ্যরাত্রিতে পেঁাছিলে, ইউনিয়নের কর্ম্মীরা সকাল ৭টায় একটি সভা ডাকিবার সিদ্ধান্ত করেন। এই অল্প সময়ের ব্যবধানে

সভার ব্যবস্থা করার অসুবিধা সত্ত্বেও সকাল সাতটায় তিন শতাধিক লোক সভাস্থলে সমবেত হন।

আখাউড়া

৯ই জুন সন্ধ্যায় এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন ও বি-এণ্ড-এ রেলওয়ে ইউনিয়নের সংযুক্ত উদ্যোগে ২০০০ লোকের একটি সভা হয়। এই সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন কমিউনিস্ট নেতা কমরেড নেপাল নাগ। একজন মুসলমান কংগ্রেস নেতা ও ছাত্র কংগ্রেসের একজন কর্ম্মী আসন্ন রেল ধর্ম্মঘটকে সমর্থন জানাইয়া বক্তৃতা করেন।

লামডিঙ

লামডিঙে আসিয়া দেখিলাম প্রায় পাঁচ হাজার লোকের এক সভা। একদল সংগঠিত ভলাণ্টিয়ার-দল শ্রমিক বস্তিতে টহল দিয়া ফিরিতেছেন। সভায় আমি যখন বলিলাম, রেলওয়ে ফেডারেশন শ্রমিকদের লড়াইয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়াইতে দৃঢ়সংকল্প, তখন সভাস্থলে সকলে উচ্ছ্বসিত হইয়া হাততালি দিয়া উঠিলেন।

ডিব্রুগড়

ডিব্রুগড়ে অনেকদিন পরে আসিলাম। কর্তৃপক্ষ ও পুলিশের বহু আক্রমণকে প্রতিহত করিয়া এখানে আমাদের ইউনিয়ন সগর্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এইজন্য ৪ জন সংগঠককে চাকুরী পর্য্যন্ত হারাইতে হইয়াছে। ইতিমধ্যেই ধর্ম্মঘটের জন্য ১০০ ভলাণ্টিয়ার সংগৃহীত হইয়াছে।

তিনশ শ্রমিকের এক মিছিল চলিল। শ্রমিক এলাকার বাইরে শহরে সভা—তবুও সেখানে তিন হাজার লোকের সমাবেশ দেখা গেল। আমার বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি সুরু হইল। দেড় ঘণ্টা ধরিয়া বক্তৃতা চলিল, কিন্তু শ্রোতাদের একজনও সভা হইতে উঠিয়া গেল না।

তিনসুকিয়া

যুদ্ধের সময় এটা ছিল সংরক্ষিত এলাকা। এখানকার ইউনিয়নের সেক্রেটারী বিজয়শ্রী ভট্টাচার্য্যকে বরখাস্ত করা হয় তখন। আমাকে সেই সময়ে আসিতে অনুমতি দেওয়া হয় নাই। কিন্তু তাহা হইলেও আমাদের কমরেডরা অমানুষিক পরিশ্রম করিয়া এখানে লাল ঝাণ্ডা উর্ধ্বে তুলিয়া রাখিয়াছেন। এখানে ৩০০০ লোকের সভা হইল। সুদক্ষ মুসলিম শ্রমিকরাই এখানে আমাদের ইউনিয়নের সংগঠক।

ফেরার পথে

ফিরিবার পথে আমি অভিভূত হইয়া গেলাম। শত শত শ্রমিক ভাই লাল ঝাণ্ডা নিয়া বিদায় দিতে আসিতেছেন। লামডিঙের লোকো কারখানার সমস্ত ভাইয়েরা আর একবার তাঁহাদের মনের কথা ব্যক্ত করিলেন—'২৭শে মধ্য রাত্রিতে আমরা সমস্ত ট্রেন বন্ধ করিয়া দিব।'

ট্রেনের কাছে আসিয়া দেখিলাম—ইঞ্জিনখানি লাল ঝাণ্ডা দিয়া সাজানো। শুনিলাম স্টেশনে আসিবার জন্য তাঁহারা কর্তৃপক্ষের নিকট ছুটির অ্যাবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা না পাইয়া তাঁহারা একসঙ্গে কাজ বন্ধ করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন।

ইহার পর আমার ফেরার পথে একে একে আসিল চম্পারমুখ জংসন. গৌহাটি, পাণ্ডু। সর্বত্রই স্টেশনে স্টেশনে বিপুল জনতা। বর্ষা নাই, বাদল নাই, ঝড় নাই, কর্তৃপক্ষের বাধাবিপত্তি নাই—সবকিছু অতিক্রম করিয়া রেলের শ্রমিক ভাইরা ঐক্যবদ্ধভাবে আমাকে জানাইতে আসিয়াছেন—২৭শে জুন মধ্যরাত্রি হইতে আমরা একখানি ট্রেনও চলিতে দিব না।' (স্বাধীনতা. ২০. ৬. ১৯৪৬)

রেল শ্রমিকের সংগ্রামী মনোবল এখন তুঙ্গে। তার মূলে রয়েছে সংগ্রামী কৃষকের জোরালো সমর্থন—অন্তত উত্তর বাংলার সংগ্রামী কৃষক।

সত্যেন সেন লিখছেন :

'ধর্মঘট সম্পর্কে মতামত যাচাই করে দেখবার জন্য লালমণির হাটে রেল-শ্রমিকদের এক আঞ্চলিক সম্মেলন ডাকা হল। লালমণির হাট উত্তরবঙ্গের একটা গুরুত্বপূর্ণ জংসন। এই অঞ্চলের শ্রমিকরা কি করবে না করবে, তার উপর উত্তরবঙ্গের ধর্মঘটের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে। সেইজন্য সম্মেলনের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল…

…সম্মেলনের দিন এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গেল। কত জায়গায় কত শ্রমিক সম্মেলন হয়ে আসছে, কিন্তু ইতিপূর্বে আর কোন শ্রমিক সম্মেলনে এমন দৃশ্য দেখা গেছে কিনা সন্দেহ। রেল শ্রমিকরা অবাক হয়ে দেখল, গ্রামাঞ্চল থেকে কৃষকরা দলে দলে লালঝাণ্ডা নিয়ে মিছিল করে এগিয়ে আসছে। তারা আওয়াজ তুলছে, 'রেল শ্রমিকদের দাবী মানতে হবে,' 'দুনিয়ার মজুর চাষী এক হও।' শ্রমিকরা এতক্ষণ তাদের নিজস্ব দাবী দাওয়া নিয়ে আওয়াজ তুলছিল। সচেতন কৃষকদের আহ্বানে অনুপ্রাণিত হয়ে তারাও সাড়া দিল 'তেভাগার দাবী মানতে হবে', 'দুনিয়ার মজুর-চাষী এক হও'।

লালমণির হাটের চারদিককার গ্রামগুলিতে কৃষক সমিতি সে সময় জালের মত ছড়িয়ে ছিল। শ্রমিকদের সংগ্রামের মুখে তারা তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে চলে এসেছে। তাদের উৎসাহ দেখে মনে হচ্ছিল, এ যেন তাদের নিজেদের সম্মেলন। শ্রমিক সম্মেলনে পাঁচ হাজার রেল শ্রমিক যোগ দিয়েছিল, অপরপক্ষে কৃষকদের সংখ্যা ছিল পনেরো হাজার।' (সত্যেন সেন, গ্রাম বাংলার পথে পথে, পৃ ৪৫)

কৃষক সমিতির নেতা ঘোষণা করলেন : 'কৃষক ভাই সব, আমি আপনাদের পক্ষ থেকে শ্রমিক ভাইদের এই ওয়াদা দিচ্ছি যে, রেল ধর্মঘট

যতদিন চলবে ততদিন আমাদের ধর্মঘটী শ্রমিক ভাইদের ভাত-ডাল যুগিয়ে চলব। বলুন, আপনারা এই ওয়াদা রক্ষা করে চলতে প্রস্তুত আছেন তো ?

এক মুহূর্ত দেরী নয়, হাজার হাজার কৃষকের কণ্ঠে আওয়াজ উঠল—প্রস্তুত, প্রস্তুত। একজন কৃষক উঠে দাঁড়িয়ে বলল, যতদিন তারা নিজেরা খেতে পাবে ততদিন ধর্মঘটী শ্রমিক ভাইদের খাওয়ার অভাব হবে না।

এবার কৃষক ও মজুরের মিলিত কণ্ঠের আওয়াজ উঠল—দুনিয়ার মজুর চাষী এক হও। সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। সম্মেলনে উপস্থিত পাঁচ হাজার রেল শ্রমিক ধর্মঘটে সামিল হবার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্তগ্রহণ করল।' (ঐ. পৃ ৪৫-৪৯)

আরও কিছুদিন কেটে গিয়েছে। এবার দৃশ্যান্তর। বি. ডি. আর. (বেঙ্গল ডুয়ার্স রেলওয়ে)-এর একটা ট্রেন মাঝে মাঝে যেসব জায়গায় দাঁড়াবার কথা নয়, বিনা কারণে তেমন সব জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ত। প্যাসেঞ্জাররা এমন জায়গায় গাড়ি থামাবার কারণ বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে যেত। সমস্ত ব্যাপারটা তাদের কাছে কেমন যেন রহস্যজনক বলে মনে হত। ট্রেনটা যেখানেই দাঁড়াত, সেখানেই দেখা যেত লাইনের কাছে ধানক্ষেতের মধ্যে বহু চাষী সারি বেঁধে ধান কেটে চলেছে। ক্ষেতের চারিদিকে লাঠিধারী ভলান্টিয়ার পাহারা দিচ্ছে। একধারে একটা লাল ঝাণ্ডা উড়ছে। তেভাগার সংগ্রামের সময় এ দৃশ্য নতুন কিছু নয়, অনেকেরই দেখা আছে। কিন্তু আশ্চর্য কথা, ট্রেনটা এসে দাঁড়াতেই চাষীরা তাদের হাতের কাজ রেখে ট্রেনটার দিকে তাকিয়ে আওয়াজ তুলত—দুনিয়ার মজুর চাষী এক হও! আরও আশ্চর্য, এই আওয়াজ উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই ইঞ্জিনের বাঁশিটা ঘন ঘন বাজতে থাকত, যেন তাদের ডাকে সাড়া দিচ্ছে।

ইঞ্জিনের সাহেব ড্রাইভার সেই চাষীদের দিকে তাকিয়ে ঘন ঘন হাত নাড়তেন। ড্রাইভারটি জাতে আইরিশম্যান। দুনিয়ার মজুর চাষী এক হও—এই আওয়াজের সার্থকতা তিনিও মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। (ঐ, পৃ ৫০-৫১)

ধর্মঘটের পক্ষে, 'হাঁ' বা 'না' জানানোর জন্যে ফেডারেশন যে ব্যালট গ্রহণ করে—তাতে দেখা যাচ্ছে, শতকরা প্রায় ৯৫ জন শ্রমিক ধর্মঘটের পক্ষে রায় দিয়েছেন।

১লা জুন এক দাবি-তালিকাসহ ভারত সরকারকে ধর্মঘটের নোটিশ দেওয়া হয়।

রেল শ্রমিকের মূল দাবি: ১. ছাঁটাই বন্ধ করা; ২. বেতনের গ্রেড পরিবর্তন; (ক) অনিপুণ শ্রমিকের ক্ষেত্রে: ৩৬- ৩- ৪৫ টাকা, (খ) অর্ধ নিপুণ শ্রমিকদের ক্ষেত্রে ৪০-৪-৬০ টাকা, (গ) নিপুণ শ্রমিকদের জন্য ৬০- ৫- ১০০- ১০- ২০০ টাকা; ৩. রাও কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী মাগ্‌গীভাতা; ৪. তিন মাসের বোনাস।

ফেডারেশনের পক্ষ থেকে আসন্ন ধর্মঘটের প্রস্তুতি সম্বন্ধে বিভিন্ন ইউনিয়নের সঙ্গে যোগাযোগ ও আপসের শর্তাদি সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্যে এক 'কমিটি অফ একশন' গঠিত হয়। তাতে রয়েছেন : খেদগিকর, শিবনাথ ব্যানার্জি, ডি. এস বৈদ্য, কল্যাণসুন্দরম, জি. এইচ. কালে, হুমায়ুন কবীর, জ্যোতি বসু, মির্জা ইব্রাহিম, আবদুর রেজাক, শিব বিশাল, জে. এন. মুখার্জি. এ. এন. উইলিয়ামস্, এম. এ. খাঁ ও এস. গুরুস্বামী।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু রেল ধর্মঘট হল না। গোড়া থেকেই কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আজাদ রেল ধর্মঘটের বিরোধিতা করে আসছিলেন। তিনি ৫ই মে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন, দাবি ন্যায়সঙ্গত হলেও ধর্মঘট করা উচিত হবে না। কারণ ক্যাবিনেট মিশনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলছে এবং দেশে দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি রয়েছে।

৬ই মে মৌলানা আজাদ বড়লাটকে একটা চিঠিতে আবেদন জানান যে রেল ধর্মঘট রোধ করার জন্যে, রেল শ্রমিকদের ন্যূনতম দাবি মানা কিংবা মূল দাবিগুলির উপর সালিশী বোর্ড গঠন করার কথা বড়লাট যেন বিশেষভাবে চিন্তা করেন।

আজাদের চিঠির উত্তরে বড়লাট জানান যে এই প্রস্তাব তাঁর বিবেচনাধীন। ঠিক একই ধরনের আরেকখানা চিঠি বড়লাটকে লেখেন মাদ্রাজের শ্রমমন্ত্রী গিরি। তাতে বলা হয় দক্ষিণ ভারতে আসন্ন দুর্ভিক্ষের অবস্থায় যেন রেল ধর্মঘট না ঘটে। তার জন্যে বড়লাট যেন তাঁর ভূমিকা পালন করেন। (স্বাধীনতা, ৬ ও ৭. ৫. ৪৬)

ইতিমধ্যে ১লা জুন যথারীতি বিভিন্ন ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ধর্মঘটের নোটিশ জারি করা হয়। জি. আই. পি. এবং বি. বি. সি. আই. রেল কর্মচারী সমিতিদ্বয়, নর্থ ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে কেন্দ্রীয় ধর্মঘট কমিটি; এম. এস. এম. ও সাউথ ইন্ডিয়ান রেলকর্মচারী সমিতিদ্বয়, বি. এ. রেলরোড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে ধর্মঘটের নোটিশ পাঠায়।

১লা জুন, বোম্বাইয়ের প্যারেল ও মাতুঙ্গাতে জি. আই. পি. রেল কারখানার শ্রমিকরা দুপুর বারোটার সময় কারখানার বাইরে এসে শোভাযাত্রা বার করেন। দাবি মানা না হলে তাঁরা ধর্মঘট করার দৃঢ় সংকল্প জানান।

১লা জুন রেল ধর্মঘটের সমর্থনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ডাকে আহূত সভায় মৃণালকান্তি বসু জানান : ভারতের দশ লক্ষ রেল শ্রমিক যদি ২৭শে জুন থেকে ধর্মঘট আরম্ভ করে, তাহলে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের তরফ থেকে আমি আশ্বাস দিচ্ছি যে ভারতের সমস্ত শ্রমিক একযোগে সাধারণ ধর্মঘট করে সাহায্য করবে। রেল শ্রমিকের সংগ্রাম ভারতের সমস্ত শ্রমিকের সংগ্রাম।

১লা জুন সাংবাদিক সম্মেলনে রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান স্যার এডওয়ার্ড বেন্থল রেল ধর্মঘট বে-আইনী ঘোষিত হবে বলে জানান।

রেল ধর্মঘট বাস্তবায়িত হল না। ২০শে জুন রেলশ্রমিক ফেডারেশনের

১৯ জন প্রতিনিধির সঙ্গে রেলওয়ে বোর্ডের এক আলোচনার পর স্থির হয়—রেল ধর্মঘট হবে না। তারপর ফেডারেশনের জেনারেল কাউন্সিল ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এক প্রস্তাব নেয়। প্রকাশ, আলোচনা প্রসঙ্গে বোর্ড প্রতিশ্রুতি দেন যে এডজুডিকেশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত ছাঁটাই করা হবে না এবং বেতনহার ইত্যাদি সম্বন্ধে পে-কমিশনকে স্মারকলিপি দেবার আগে ফেডারেশনের সঙ্গে পরামর্শ করা হবে।

ধর্মঘট প্রত্যাহারের পটভূমি প্রসঙ্গে সত্যেন গাঙ্গুলী বলেছেন, '১১ই জুন পি. অ্যান্ড টি. সারা ভারত জুড়ে ধর্মঘট শুরু করল অনির্দিষ্ট কালের জন্য। পি. অ্যান্ড টি. শ্রমিক ধর্মঘটে রেল শ্রমিক উদ্দীপিত হয়। বহু জায়গায় লোকো ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফের মুখে শুনেছি—আসুন আমরাও এখুনি শুরু করে দিই। ফেডারেশন তখন সুবিধাবাদী নেতৃত্ব কবলিত। তারা বলল ২৭শে জুন পর্যন্ত সবুর কর। তবুও বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, পেশোয়ারে ছোট ছোট বিক্ষোভ দেখা দিল। ১৫-১৬ জুন হঠাৎ ফেডারেশনের জরুরি সভা তলব করা হল। সেই মিটিং-এ হুমায়ুন কবীর, গুরুস্বামী, মনিবেন কারা প্রমুখ নেতারা জানালেন, যেহেতু রেলওয়ের চীফ কমিশনার ঘোষণা করেছেন যে, অবিলম্বে পে কমিশন বসবে—বেতন ও চাকরির শর্তাবলি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে দেখা হবে—অতএব ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হোক। আমরা প্রথমে বিরোধিতা করলাম এবং পরে মেনে নিলাম। শ্রমিকের কাছে হুমায়ুন কবীরদের বিশ্বাসঘাতক ডাকলুম জোরালো গলায়। কিন্তু আমরাও যে তাদেরই মতে সায় দিয়েছি—সে কথাটা আর বলিনি।

ধর্মঘট হবে না শুনে পেশোয়ারের মির্জা ইব্রাহিম তো একেবারে ফেটেই পড়লেন। সেদিন যদি হুমায়ুন কবীরদের বিরুদ্ধে ভোটটা দিয়ে তারপর বাধ্য হয়ে ধর্মঘট তুলে নিতাম—তাহলে আমাদের মর্যাদা বাড়ত।'

রেল ধর্মঘট না-হওয়ার প্রকৃত কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ২১ শে জুন 'স্বাধীনতা'র পাতায় 'লাল ঝান্ডার ডাক' শিরোনামায় লেখা হয় :

'…শ্রমিকরা ধর্মঘটে প্রত্যাহারে এত বেশী ক্ষুব্ধ হয়েছেন যে তাঁরা আজ কৈফিয়ৎ দাবী করছেন—এর জন্যে দায়ী কে?

দিল্লী মিটিংয়ের বিবরণ থেকে সবাই বুঝতে পারবেন, মিঃ কবীর, কালাপ্পা, চমনলাল ও শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কংগ্রেসপন্থী ও নরমপন্থী নেতারা ধর্মঘট বাতিল করার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা নিয়েই সভায় এসেছিলেন।

…এই নেতারা যেভাবে একসঙ্গে এবং একবাক্যে ধর্মঘট ওঠানোর দাবী নিয়ে দাঁড়ালেন তাতে বোঝা শক্ত নয় যে, কংগ্রেসের বড় বড় নেতারা তাঁদের ঐরকম নির্দেশই দিয়েছিলেন। লীগের বড় নেতারা তো স্ট্রাইকের বিরুদ্ধে ছিলেনই; এবার কংগ্রেস নেতারাও স্ট্রাইকের বিরোধিতা করার সিদ্ধান্ত নিলেন।…

…লাল ঝাণ্ডাওয়ালারা যথাসাধ্য এর বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। তাঁদের বিরোধিতার ফলেই অন্তত ফাইনান্স কমিটির রায়ের ওপর ধর্মঘট বাতিল হয়নি, রেল বোর্ডের কাছ থেকে আরও নূতন প্রতিশ্রুতি আদায় করা গেছে। রেল শ্রমিকদের কাছে এইটুকুই জিত।

·· লালঝাণ্ডাপন্থীরা বুঝেছিলেন যে এখন ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নিলে শুধু কবীর, কালাপ্পা প্রভৃতির কাছ থেকেই বিরোধিতা আসবে না, বিরোধিতা আসবে কংগ্রেসের কাছ থেকে, বিরোধিতা আসবে লীগের কাছ থেকে। কারণ কংগ্রেস ও লীগ দুজনেই ভাবছিলেন যে ক্ষমতা দখলের স্বর্ণ মুহূর্তে রেল ধর্মঘট একটা বড় আপদ।

…তখন জনসাধারণের অনেকেই তো ধর্মঘটের বিরুদ্ধে যেতেনই, কংগ্রেস বা লীগ ভক্ত অনেক রেল শ্রমিকও হতবুদ্ধি হয়ে যেতেন, ভাবতেন কংগ্রেস বা লীগের বিরোধিতায় ধর্মঘট কখনই সফল হতে পারে না, কিংবা ভাবতেন সত্যিই বোধহয় কমিউনিস্টদের কোনো বদ মতলব আছে।

সে অবস্থায় ধর্মঘটকে সফল করার মত শক্তি ও একতা রেল শ্রমিকদের থাকত না, ধর্মঘট যদি দপ করে জ্বলেও উঠত তবুও এই বিরোধিতার বিষ-হাওয়ায় তা সফল হওয়ার আগেই নিভে যেত। লাভের মধ্যে রেল শ্রমিকের মনোবল একেবারে নষ্ট হত, ঐক্যের মস্ত বড় ফাটল ধরত, কর্তৃপক্ষও সেই সুযোগে যথেচ্ছাচার চালাতেন।'

রেল ধর্মঘট প্রত্যাহারের প্রধান কারণ হিসেবে সোমনাথ লাহিড়ী বলছেন, 'কংগ্রেস ও লীগ ধর্মঘট থেকে সরে যাওয়ায় একা কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে ধর্মঘট টিকিয়ে রাখা সম্ভব হত না। কমিউনিস্টদের আত্মবিশ্বাসে তখন চিড় ধরেছে—কারণ সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল কমিউ-নিস্টদের বিপক্ষে গিয়েছে। ১৯৪৬-এর মার্চের নিবাচনে কমিউনিস্ট পার্টি বাংলায় তিনটি, বোম্বাই-এ দুটি ও মাদ্রাজ-এ দুটি আসন জয়লাভ করে। এই ফলাফল পার্টির প্রত্যাশার তুলনায় অনেক অনেক কম। দ্বিতীয়ত, এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সারা দেশে কংগ্রেসের নেতারা কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষের বাতাবরণ সৃষ্টি করে। সাধারণ মানুষও তাতে মেতে ওঠে এবং কমিউনিস্ট-বিরোধী জিগিরে শ্রমিকদের একাংশও ভেসে যায়।'

এই প্রসঙ্গে সুমিত সরকার লিখছেন :

'কমিউনিস্ট পার্টির যা ক্ষতি হবার তা তো হয়েছে ; তার চেয়েও বড় কথা—নীচুতলার লড়াকু মানুষের ঐক্যে দেখা দিয়েছে ফাটল। ১৯৪৫-এর নভেম্বর থেকে ১৯৪৬ এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কলকাতা, বোম্বাই ও করাচীর রাস্তায় রাস্তায় জাতিধর্ম নির্বিশেষে যে ব্রিটিশ-বিরোধী ঐক্য গড়ে উঠেছিল—সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভোটদান পদ্ধতির দৌলতে সে ঐক্যে চিড় ধরেছে।' (মডার্ন ইন্ডিয়া, পৃ ৪২৭)

যেখানে নিজেদের প্রার্থী নেই সেক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টির ঘোষিত নীতি ছিল, অ-মুসলমান কেন্দ্রে কংগ্রেসকে সমর্থন করা ও মুসলমান কেন্দ্রে মুসলিম লীগকে সমর্থন করা। এই নীতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এন. কে. কৃষ্ণান লিখছেন :

'…সাধারণ কেন্দ্রে আমরা যে কারণে কংগ্রেসকে সমর্থন করিব, ঠিক সেই কারণেই মুসলমান কেন্দ্রে আমরা সমর্থন করিব মুসলিম লীগকে ; উভয় ক্ষেত্রেই যেখানে আমাদের প্রার্থী থাকিবে সেখানে ছাড়া…মুসলিম লীগ মুসলমানদের সবচেয়ে প্রতিনিধিমূলক ও জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান, এবং ইহার মূল উদ্দেশ্য মুসলিম আবাসভূমিগুলির স্বাধীনতা—ঠিক যেমন কংগ্রেসের উদ্দেশ্য গোটা ভারতের স্বাধীনতা। এই দুইটিই হইল মূল বিষয়, যাহা অন্ধ এবং দলাদলি-প্রিয় ব্যক্তি ছাড়া আর কেহই অস্বীকার করিতে পারে না।

…আমরা কংগ্রেস নেতৃবর্গের দোষ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেসকে সমর্থন করি। কারণ আমরা শুধু নেতাদেরই দেখি না ; সংগঠনের পিছনের জনগণকে এবং ইহার প্রধান লক্ষ্যকে আমরা কখনো ভুলিয়া যাই না।

মুসলিম লীগের ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা। সোজা কথা এই যে, মুসলিম লীগের নেতাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও আমরা তাহাকে সমর্থন করি শুধু এই জন্যই নয় যে লীগ মুসলমানদের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান ; বরং এইজন্যও যে আমরা তাহার মূল আদর্শ অর্থাৎ মুসলিমপ্রধান জাতি-সমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীকে সমর্থন করি।

মূলতঃ, ভারতবাসীর স্বাধীনতার দাবীর মতনই পাকিস্তানও স্বাধীনতার দাবী।' (কমিউনিস্ট পার্টি ও মুসলিম লীগ, পৃ ১, ৩, ৪)

কংগ্রেস ও লীগ এবং স্বাধীনতা ও পাকিস্তান—সমপর্যায়ে ফেলার দৃষ্টি-ভঙ্গি কংগ্রেসের পক্ষে নিতান্ত আপত্তিকর। কংগ্রেসের প্রধান নির্বাচনী স্লোগান ছিল :

কংগ্রেসকে ভোট দিন
দেশবন্ধু, দেশপ্রিয় ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের
বাঙ্গলার সুনাম রক্ষা করুন।

কংগ্রেস ও জাতীয়তাবাদী মুস্লিম প্রার্থীগণকে ভোট দেওয়ার অর্থ ভারত হইতে সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের উচ্ছেদ সাধন।

একমাত্র কংগ্রেসই ভারতকে পরাধীনতার নাগপাশ হইতে মুক্ত করিয়া শোষিত ভারতবাসীর জন্য কৃষক-মজদুর রাজ প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম।

কংগ্রেস ও জাতীয়তাবাদী মুস্লিম প্রার্থিগণকে ভোট দিয়া সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার চক্রান্তজালে ভারতবাসীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি-

কারী চতুর বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে বুঝাইয়া দিন যে ভারতবাসী অখণ্ড ভারতে পরস্পর ভাইয়ের মত বাস করিতে চাহে।

জয়হিন্দ্

(যুগান্তর, ১৭. ৩. ৪৬, পৃ ১)

... ...

দেশবাসী সতর্ক হউন

* পঞ্চাশের মন্বন্তরে ৩৫ লক্ষ নরনারীর মৃত্যুর জন্য যে মুস্লিম লীগ ও লীগ মন্ত্রিসভা দায়ী আবার তাহাদের খপ্পরে পড়িবেন না।

* আসমুদ্র হিমাচল আলোড়নকারী আগস্ট বিপ্লবের বিরোধিতায় যাহারা নানারূপ হীনপথ অবলম্বন করিয়াছিল, তাহাদের মিথ্যা প্রচারে বিভ্রান্ত হইবেন না।

* আসন্ন নির্ব্বাচনে প্রমাণ করুন স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীর অন্তরে সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও সুবিধাবাদীদের স্থান নাই। মুক্তিকামী কংগ্রেস প্রার্থী ও জাতীয়তাবাদী মুস্লিম প্রার্থীদের ভোট দিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করুন।

(যুগান্তর, ১৭. ৩. ৪৬, পৃ ৬)

অর্থাৎ নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ্ হিন্দ ফৌজ ও আগস্ট আন্দোলনের গরিমাপুষ্ট কংগ্রেস অখণ্ড ভারতের জন্য স্বাধীনতার দাবিতে নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়েছে। নেতাজী সুভাষ ও আগস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা কংগ্রেস-ভক্তদের কাছে অত্যন্ত আপত্তিকর। উপরন্তু কমিউনিস্ট পার্টি মুসলিম লীগকেও দেশপ্রেমিক প্রতিষ্ঠান বলে অভিহিত করেছে এবং পাকিস্তান দাবিও নাকি ন্যায়সঙ্গত। অতএব কংগ্রেস-ভক্তদের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির ব্যবধান এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আরও বেড়ে গেল। কমিউনিষ্ট পার্টি কংগ্রেসের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত।

কমল চ্যাটার্জি (চন্দননগর) বলছেন, '১৯৪৬-এ জহরলাল এলেন চাঁপদানিতে মিটিং করতে। আমি সেই সভায় ছিলুম। জহরলাল বলেন—ইংরেজের সঙ্গে কমিউনিস্টদের আসানি ছিল—অর্থাৎ ভালবাসা ছিল। কমিউনিস্টরা বিশ্বাসঘাতক। পরের দিন কমল সরকার গেট-মিটিং করতে এলে—শ্রমিকরা আমাদের দিকে ছুরির মতো ফেঁসো কাঁটা বাগিয়ে ধরে। তেলিনিপাড়ায় সন্তোষ ভড়কে ঘিরে ধরে তারা থুতুতে ভিজিয়ে দেয়। তবুও বাঁশবেড়ের গেঞ্জেস্ জুট মিলের মুসলমান শ্রমিকরা আমাদের ভোট দেয়।'

কমিউনিস্ট প্রার্থীকে মুসলমান শ্রমিকের ভোট দেওয়ার প্রধান কারণ হল মুসলিম লীগের একটি অংশের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির নির্বাচনী বোঝাপড়া। যদিও এই বোঝাপড়া পুরোপুরি সার্থক হয়নি। এই প্রসঙ্গে বাঙ্গালা প্রাদেশিক মুসলিম লীগের তৎকালীন সম্পাদক আবুল হাশিম লিখছেন:

'বাংলার সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঠিক হয়েছিল ১৯শে থেকে ২২শে মার্চ'। মুসলিম লীগের বামপন্থীদের সংগে বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। আমি বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের সাবধান করে দিলাম যে কোন মুসলিম নির্বাচনী এলাকায় যদি মুসলিম লীগ প্রার্থী ও কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় তবে মুসলিম লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ক্ষতি হবে। আমরা কমিউনিস্ট পার্টিকে আশ্বাস দিলাম, রেল শ্রমিকদের জন্য সংরক্ষিত আসনে আমরা তাদের সমর্থন করব। কমিউনিস্ট পার্টি রাজি হল না। তারা বলল, মুসলিম-প্রধান এলাকাতেও তাদের কিছু কমিউনিস্ট পকেট (ঘাঁটি) আছে আর নিশ্চিত কমিউনিস্ট-পকেটে তাদের প্রার্থীদের জয় সম্বন্ধে তারা নিশ্চিন্ত। নোয়াখালি ও মৈমনসিংহে তারা কয়েকজন প্রার্থী দিল। সব কমিউনিস্ট পার্টি সদস্যই হেরে গেল ও তাদের জামানত জব্দ হল। আমরা, আমাদের প্রতিশ্রুতিমতো, শ্রমিক নির্বাচনী এলাকায় কমিউনিস্ট পার্টিকে সমর্থন করলাম।' (ইন রেট্রস্পেকট, পৃ ১০১-১০২)

দেখা গেল, লীগের সমর্থন সত্ত্বেও কমিউনিস্ট প্রার্থীরা কলকাতা ও জেলা-গুলির শ্রমিক আসনে কংগ্রেসের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছেন।

যুগান্তর (২৮.৩.৪৬)-এর সংবাদ-শিরোনামায় নির্বাচনী ফল :

বাঙ্গলার নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের সাফল্য

শ্রমিককেন্দ্রে কম্যুনিস্টদের পরাজয়

কলিকাতা

শ্রীসুরেশ চন্দ্র ব্যানার্জী (কংগ্রেস)—৩৪৭২৩
সোমনাথ লাহিড়ী (কম্যুনিস্ট)—১৩৫২৪

হাওড়া

শিবনাথ ব্যানার্জী (কংগ্রেস)—২৬৩৪৮
মীর খুর্সিদ আলী (স্বতন্ত্র)—৪৫৭৫
বঙ্কিম মুখার্জী (কম্যুনিস্ট)—৩৮০৮

হুগলি—শ্রীরামপুর

এ. কে. জামান (কংগ্রেস সমর্থিত)—১৯৯৫৮
মহম্মদ ইসমাইল (কম্যুনিস্ট)—৪০৭৯

ব্যারাকপুর

নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার (কংগ্রেস)—৪৯৮২৩
চতুর আলী (কম্যুনিস্ট)—১১৮২৩

তাছাড়া আসানসোল আসনে কংগ্রেস প্রার্থী দেবেন সেনের কাছে কমিউনিস্ট প্রার্থী ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত পরাজিত।

এই নির্বাচনী ফলাফল বাংলার কমিউনিস্টদের কাছে একেবারে অভাবনীয়—অনেকটা দুঃস্বপ্নের মতো। অনেক রক্তাক্ত অভিজ্ঞতা এই নির্বাচনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। প্রায় প্রতিটি বুথ-এ কমিউনিস্ট কর্মী ও নেতাদের গণ-রোষের মুখোমুখি হতে হয়েছে—হামলার শিকার হতে হয়েছে এবং অজস্র পার্টি সভ্য ও দরদীর রক্ত ঝরেছে।

অথচ জোশী মাত্র তিন মাস আগে বেশ প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন, কংগ্রেস নেতাদের কমিউনিস্ট-বিরোধিতা সত্ত্বেও প্রতিটি শ্রমিক আসনে কমিউনিস্ট প্রার্থী জয়যুক্ত হবে। তিনি লিখেছেন :

'আমরা জানি নির্বাচনের পর, কমিউনিস্ট বিরোধী অভিযান যদি বন্ধ না করেন তবে আপনারা দেখিবেন, আপনাদের প্রাণপণ বাধাদান সত্ত্বেও শ্রমিক আসনগুলি হইতে তাহারা নির্বাচিত হইতে পারিয়াছে।' (জবাব, ২য় খণ্ড, শেষাংশ, পৃ ৪৬)

এই বইয়ে অন্যত্র তিনি লিখেছেন : 'আমাদের পার্টি যে শক্তি সংগঠন করিয়াছে তাহার দ্বারা আমরা অন্য কাহারও সাহায্য ছাড়াই ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অধিকাংশ শিল্পকেন্দ্রে ধর্মঘট চালু করিতে পারিতাম।' (জবাব, ১ম খণ্ড, পৃ ১৬৫)

নির্বাচনী ফলাফল দেখে মর্মাহত জোশীর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ; 'উই আর বিটেন ইন আওয়ার ওন ডেন' (নিজেদের জায়গাতেই আমরা হেরে গেলুম)। অনুরূপ প্রতিক্রিয়ার শরিক নৃপেন চক্রবর্তী। সেদিনের কথা এখনো তাঁর মনে পড়ে : কী সেই দিনটি। পার্টি অফিসে আহত কমরেডদের আনা হচ্ছে। পার্টি অফিস হাসপাতালে পরিণত : তাঁর উপর 'স্বাধীনতা'র সম্পাদকীয় রচনার ভার। ঘরের দরজা বন্ধ করে বসেছেন। অথচ কলমে একটা অক্ষরও সরছে না। কমিউনিস্টরা মজুর অঞ্চলে বিধ্বস্ত।

মণিকুন্তলা সেন লিখছেন :

'আমরা ঘরে ঢুকে দেখি সব অন্ধকার করে ওরা বসে আছে। আর ভার্তিয়া কারখানার প্রায় ২০/২২ জন আহত শ্রমিক সেখানে শায়িত। আমরা যেতেই ওরা বললো—জগবন্ধু স্কুলে ভার্তিয়া কারখানার বুথ হয়েছিল। পার্টি থেকে যে ক্যাম্প খোলা হয় সেখানে শ্রমিকদের আসতে দেখে কংগ্রেসী ছেলেরা চটে যায়। ওরা ক্যাম্পে আগুন লাগিয়ে দেয় ও শ্রমিকদের বেধড়ক পেটায়··· শুনলাম, সারা কলকাতাতেই এই অবস্থা। বৌবাজারে ট্রেড ইউনিয়ন অফিসটা হাসপাতাল হয়ে গেছে।' (সেদিনের কথা, পৃ ১৫৬-৫৭)

সোমনাথ লাহিড়ীর মতে, কমিউনিস্টদের উপর এই হামলার জন্য মূলত দায়ী জোশীর এক ক্ষতিকর স্লোগান : এক লাঠির জবাবে দশ লাঠি।

'স্টুপিড স্লোগান। আমাদের তখন খুব খারাপ অবস্থার মধ্যে দিন কাটছিল। আমাদের তখন এক লাঠি মারার ক্ষমতাও ছিল না—দশ লাঠি দূরে থাক। দরকার ছিল পরিস্থিতিকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করা। ময়মনসিংহের হাজং এলাকায় নির্বাচনের দিনকয়েক আগে এক কংগ্রেস কর্মী মারা পড়ল। তার জবাবে কংগ্রেসীরা সারা বাংলায় আমাদের মেরে রক্তাক্ত করে দিল। হাজং অঞ্চল তো গোটা বাংলা নয়। জোশীর স্লোগান প্ররোচনার কাজ করেছে। কংগ্রেস সেটা ভালোভাবে ব্যবহার করল। একটা 'ফ্রেনজি' (উন্মত্ততা) সৃষ্টি করল সারা কলকাতায়। নির্বাচনের পরের দিন আমাদের একটা হাসপাতাল খুলতে হল। পোলিং এজেন্ট ও অন্যান্য কমরেডরা রক্তাক্ত অবস্থায় বুথ থেকে ফিরছে।'

এই নির্বাচনের আনুষঙ্গিক যাবতীয় অনিয়ম, অনাচার, বে-আইনী কার্যকলাপ ও আরও অভিজ্ঞতা ঠাসা এক প্রতিবেদন—'স্বাধীনতা'য় প্রকাশিত হয় (২৩. ৩. ৪৬)। তার সংক্ষিপ্তসার নীচে পেশ করা হল :

কলিকাতা ও শহরতলীর শ্রমিক নির্বাচন কেন্দ্রে জয় হল কার ?

১. অধ্যাপক নীরেন রায়, মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার আসামী রাধারমণ মিত্র ও কয়েকজন পার্টি কর্মী লালঝাণ্ডার পক্ষে নির্বাচনের কাজ শেষ করে বজবজ থেকে ট্রেনে ফিরছিলেন। সেই সময় বজবজ স্টেশনে আক্রমণ করে মাথায় আঘাত করে একদল কংগ্রেসভক্ত যুবক।

২. শনিবার সন্ধ্যা (২৩শে মার্চ '৪৬) সোমনাথ লাহিড়ীর সেণ্ট জেমস্ স্কোয়ারের বাড়ির দরজা ভেঙে ঢুকে পড়ে 'কংগ্রেসী' যুবকরা বাড়ীর মহিলাদের অশ্লীল ভাষায় গালাগাল করে। সে সময় বাড়ীতে কোন পুরুষ ছিলেন না। মেয়েরা সহ্য করতে না পেরে উনানের কয়লা ছুঁড়ে মারতে থাকে—তখন 'কংগ্রেসী' যুবকরা রণে ভঙ্গ দেয়।

৩. হুগলী জেলার বাঁশবেড়েতে পোলিং অফিসারের পাশে বসে ম্যানেজারের লোক ভোটারকে সনাক্ত করে দিচ্ছিল।

৪. জগদ্দল গোলঘর কেন্দ্রে ৪নং বুথের পোলিং অফিসার নিজে ভোটারদের কোন্ বাক্সে ভোট দিতে হবে বলে দিচ্ছিলেন। কমিউনিস্ট প্রার্থীর এজেণ্ট তার প্রতিবাদ করলে তিনি পুলিশের সাহায্যে কমিউনিস্ট এজেণ্টকেই বুথ থেকে বার করে দিলেন। তারপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চলল জাল ভোট।

৫. হাওড়ায় লিলুয়াতে পোলিং অফিসার নিজেই ভোটারকে তার নাম, বাপের নাম পড়িয়ে শুনিয়ে দিচ্ছিলেন যাতে জাল ভোটারদের কোন অসুবিধা না হয়। তা সত্ত্বেও কমিউনিস্ট পোলিং এজেণ্ট কয়েকটি জাল ভোট ধরে দেওয়ায় পোলিং অফিসার ক্ষেপে যান এবং ঐ এজেণ্টকে বের করে দেন।

৬. বালিগঞ্জে সকাল থেকে কমিউনিস্ট কর্মীদের উপর আক্রমণ চলতে থাকে। 'কংগ্রেসী' সমর্থকরা লাঠি ও অন্যান্য হাতিয়ার নিয়ে চারিদিকে

হল্লা করতে থাকে এবং জোর করে বুথে ঢুকে পড়ে। কিছুক্ষণ পর একজন ভোট দেবার নাম করে বাক্সগুলির কাছে গিয়ে কমিউনিস্ট প্রার্থীর বাক্স থেকে ভোটের কাগজ একটা চিমটা দিয়ে তুলে আগুন লাগিয়ে দেয়। পোলিং অফিসার আপত্তি করায় তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলার ভয় দেখিয়ে চুপ করিয়ে দেওয়া হয়।

৭. পদ্মপুকুর ইন্‌স্টিটিউশনের ভোট কেন্দ্রে কংগ্রেসীরা জোর করে বুথে ঢুকে পড়ে, বুথের বেড়া ভেঙে ফেলে। পোলিং অফিসারকে আক্রমণ করে। কমিউনিস্ট প্রার্থীর বাক্স থেকে ব্যালট নিয়ে কংগ্রেস প্রার্থীর বাক্সে ভরে দেয়।

৮. বজবজ এলাকায় কমিউনিস্ট প্রার্থীর পোলিং এজেন্ট হারাধন সন্ন্যাসীকে এমন নৃশংসভাবে মারা হয়েছে যে তিনি মরণাপন্ন অবস্থায় হাসপাতালে রয়েছেন। ভাটপাড়ার বুথের মধ্যে ঢুকে আক্রমণ করে কমিউনিস্ট প্রার্থীর পোলিং এজেন্ট অমিয়বাবুর চশমা ভেঙে দেওয়া হয়।

নৈহাটীতে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয় যে কমিউনিস্ট পোলিং এজেন্ট বুথ ছেড়ে যেতে বাধ্য হন। চিত্রগঞ্জে কমিউনিস্ট পোলিং এজেন্টকে একদল গুণ্ডা জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে এক বাড়ীতে আটক করে রাখে।

৯. বেলেঘাটা রোডের ওপর এফ. এন. গুপ্তের কারখানা ভোটকেন্দ্রে সকাল থেকে শত শত কমিউনিস্ট সমর্থক-ভোটার জড়ো হতে থাকেন। হঠাৎ কয়েক লরি ভর্তি লোক এসে হাজির হল কংগ্রেস পতাকা উড়িয়ে। তারা এসেই লাঠি-ডাণ্ডা ইত্যাদি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ভোটারদের ওপর। এবং আধঘণ্টা পর আরও একদল এসে আক্রমণ করল কমিউনিস্ট ক্যাম্পের ওপর। এরই সঙ্গে শুরু হল পাশের লক্ষ্মী জুট মিল ও আশেপাশের বাড়ীর ভেতর থেকে ক্যাম্পের উপর ইঁট বৃষ্টি। তারপর গুণ্ডার দল ঢুকে পড়ল মজুর বস্তিতে। বেপরোয়া আক্রমণ চলল বস্তিবাসীদের ওপর। সমস্তক্ষণ তারা দাঁড়িয়ে রইল রাস্তার মোড়ে মোড়ে লাঠিসোটা নিয়ে—ভোটার এলেই তারা তাড়া করতে থাকে।

ট্যাংরা এলাকায় ঠিক এমনই দৃশ্য। কিন্তু এখানে শ্রমিকদের ওপর আক্রমণ করতে গেলে তারাও রুখে দাঁড়ায়। বিফল হয়ে গুণ্ডার দল আক্রমণ করল পাশের মতিঝিল বস্তি। সেখানে গিয়ে তারা বস্তিতে আগুন লাগিয়ে দেয়। বহুক্ষণ পর দমকল এসে যখন আগুন নেভাল, তখন গোটা বস্তি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

১০. মেটিয়াবুরুজ কেশোরাম সুতাকলে বেলা ৯টা নাগাদ হঠাৎ মিলের লাইন ও মিলের ভেতর থেকে লাঠি, লোহার রড প্রভৃতি নিয়ে প্রায় তিনশ মিলের দারোয়ান ও ভাড়াটিয়া গুণ্ডা এসে শ্রমিকদের আক্রমণ করল। কমিউ-নিস্ট ক্যাম্প ভেঙে দিল। কাগজপত্র ভোটার লিস্ট প্রভৃতি নষ্ট করে দিল। প্রায় তিনশ শ্রমিক আহত হয়।

১১. হাওড়া—এখানে নির্বাচনের দিন গুণ্ডামি চরমে ওঠে। বেলুড়ে

বিকেল সাড়ে চারটের সময় তিন লরি বোঝাই গুণ্ডা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে শ্রমিকদের ওপর। মজুরদের রক্ষা করতে গিয়ে গুরুতরভাবে আহত হলেন নেপাল নাগ। আহত অবস্থায়ও তাঁর উপর প্রহার চলতে থাকে।

শিবপুর লালঝাণ্ডার শক্ত ঘাঁটি। সেখানে সকাল থেকেই এক হাজার লাঠিয়াল গুণ্ডা আক্রমণ শুরু করল। তারা কমিউনিস্ট ক্যাম্প ভাঙল—কর্মীদের জখম করল। আক্রমণ শুরু হওয়ার সংগে সংগে কাছাকাছি যেসব পুলিশ মোতায়েন ছিল—তারা সরে পড়ল। কিন্তু আক্রমণ শেষ হওয়ার পরেই সশস্ত্র পুলিশবাহিনী হাজির। তারা শান্তিরক্ষার অজুহাতে মজুরদের দিকে বন্দুক তাক করে দাঁড়াল—তাদের আর ভোট কেন্দ্রে যেতে দিল না। অথচ তাদেরই পিছন দিয়ে শিবনাথবাবুর লাঠিয়ালরা অবাধে যাতায়াত করতে লাগল। লরি বোঝাই হয়ে জয়হিন্দ্ ধ্বনি তুলে তারা জাল ভোটে শিবনাথবাবুর বাক্স ভরিয়ে দিল।

বালিতে কংগ্রেসীরা বড়বাগান বস্তিতে ঢুকে আগুন ধরিয়ে দিল, বাড়ি ঘর লুঠ করল—এমনকি মেয়েদের গায়ে পর্যন্ত হাত তুলল। সব হয়ে যাবার পর পুলিশ এসে অমর মুখার্জীকে গ্রেপ্তার করল। কংগ্রেসীরা এসে কমরেড অমরের হাতে দড়ি বেঁধে দিল। সেই দড়ি ধরে পুলিশ বিজয় দর্পে অমরকে হাজতে নিয়ে গেল। এমনিভাবে গ্রেপ্তার হয়েছেন কেশোরামের ১৫ জন শ্রমিক, ট্যাংরার অরূপ রায়, বজবজ মেটিয়াবুরুজের কমিউনিস্ট কর্মীরা। ১৪৪ ধারার অজুহাতে কেশোরাম মিল, জগদ্দল, বেলঘরিয়া, কলকাতার টাঁকশাল সংলগ্ন ক্যাম্প—সর্বত্র পুলিশ কমিউনিস্টদের হাত থেকে আত্ম-রক্ষার অস্ত্র লাঠি, এমনকি ঝাণ্ডাগুলো পর্যন্ত কেড়ে নেয়। কিন্তু তাদেরই চোখের সামনে যখন সশস্ত্র গুণ্ডারা কমিউনিস্টদের আক্রমণ করল—তখন পুলিশ কিন্তু নীরব দর্শক।

১২. সোমবার (ভোটের পরের দিন) কেশোরামের মজুররা যখন কাজে যাচ্ছেন, তখন হঠাৎ মিলের লাইন থেকে তাদের ওপর ইট পড়া শুরু হয়। মজুররা রুখে দাঁড়ালেন। মিলের ভেতর থেকে ছুটে এল পুলিশের দল এবং লাঠি চালাল মজুরদের ওপর। আহত হলেন ৩০ জন মজুর। আর আহতদের মধ্য থেকেই বেছে বেছে গ্রেপ্তার করা হল কমরেড ফারুকি এবং আরও ১৪ জন কর্মীকে।

১৩. নির্বাচনের পরের দিন কলেজ স্ট্রীট বোবাজার স্ট্রীটের মোড়ে খগেন দাশগুপ্ত নামে এক ভদ্রলোক আক্রান্ত হলেন—কারণ তাঁকে 'দেখে' কমিউনিস্ট বলে মনে হয়। অনুরূপভাবে আহত হয়েছেন আরও অনেকে—সেণ্ট জেমস্ স্কোয়ারের কাছে সুরী লেনে, বেলেঘাটায়, হাওড়ায়।

এই প্রতিবেদন থেকে কমিউনিস্টদের সার্বিক অবস্থা অনুমেয়: বিস্ময়-ক্ষোভ-হতাশা মেশানো অদ্ভুত এক যন্ত্রণাহত অভিজ্ঞতা নিয়ে তাঁরা সেদিন নির্বাচন কেন্দ্র থেকে ঘরে ফেরেন। এই প্রসঙ্গে অমিয় মুখার্জি বলছেন,

'২৪৯ বৌবাজার স্ট্রীটের ঘরে মিটিং করে আমাদের বোঝানো হল—আমাদেরই জেতার কথা—কিন্তু ওরা মারামারি করে জিতবে। দরকার তার বিরুদ্ধে প্রস্তুতি। লাঠি ও ইটের বস্তা ক্যাম্প অফিসে থাকবে। আমাদের ক্যাম্প খুব ভালো করে সাজানো দরকার। যাতে ভোটাররা ওদের ক্যাম্পে না গিয়ে আমাদের ক্যাম্পের ভেতর দিয়ে যায়। সবই করা হল। ভোটের দিন আমাদের ক্যাম্পে আমরা বারোজন আর ওদের ক্যাম্পে পাঁচ-ছয় জন। বুথের মুখে দাঁড়িয়ে আমাদের কয়েকজন কমরেড স্লোগান দিচ্ছিল—বিড়লার দালাল কংগ্রেসকে ভোট দেবেন না। সকাল থেকে কংগ্রেস কর্মীদের সংগে আমাদের সম্পর্ক বেশ ভালোই ছিল। তাঁরা একটু আপত্তিও করেছিলেন—কেন এরকম স্লোগান দেওয়া হচ্ছে! তারপর তারা জবাব দিল। পাশের বাড়ীতে মাইক লাগিয়ে সেখান থেকে অনবরত আমাদের বিরুদ্ধে বক্তৃতা চলতে থাকে। বিডন স্ট্রীট লোকে লোকারণ্য। প্রায় পাঁচ হাজার লোক—আমরা চুপসে গেলাম। ভোট শেষ হবার মিনিট পাঁচেক আগে তারা আক্রমণ করল। আমাদের জনা পাঁচ-ছয় যে কোথায় মিলিয়ে গেল! তারা আমাদের ঘরে ঢুকে লাঠি আর ইটের বস্তা বার করে সবাইকে দেখাল যে আমরা মারামারি করার জন্যে কিরকম সাজগোজ করেছি। কয়েকজন কমরেড নিয়ে আমি ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে রইলাম। পুলিশ এসে আমাদের অ্যারেস্ট করল। লোকেও গালাগাল দিচ্ছে—পুলিশও দিচ্ছে। হাজার হাজার লোকের বিদ্রূপ আর ধিক্কারের মাঝে আর মাথা তুলতে পারলাম না। খোলা ভ্যানে মাথা নীচু করে বসে রইলাম।'

সেদিনের কথা কুমুদ বিশ্বাস সারাজীবনে আর ভুলতে পারেননি। তিনি বলছেন, 'বাহাত্তর ঘণ্টা ধরে আমি কেঁদেছিলুম—বিশ্রাম নিইনি—ঘুমোইনি। ২৪৯ বৌবাজার স্ট্রীটে বসে আমি দিনরাত কাজ করেছি। জীবনের খুবই ইণ্টারেস্টিং অভিজ্ঞতা। শ্রমিকদের মধ্যে আমরা এতদিন নিঃস্বার্থভাবে কাজ করেছি—আমরা সুপ্রিম (প্রধান)—আমরা সুপিরিয়র (শ্রেষ্ঠতর)। সাতটা শ্রমিক সিট-এর সাতটাই আমরা জিতব—এই ছিল আমাদের ধারণা। কিন্তু যে শ্রমিক আমার ফ্ল্যাগ-এর নীচে এতদিন লড়েছে—সে বলল, কংগ্রেসকে হারাতে চাইছেন আপনি! তফাৎ যান—না হলে মার খাবেন। তাই ঘটল—আমরা মার খেলাম। আমার সারা জীবনের শিক্ষা এবার পেলাম—পেট্রিয়টিজম (দেশপ্রেম) কী জিনিস জানলাম। লোকে তাদের নিজের কায়দায় বুঝেছিল—স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষ ঘণ্টা বেজে গেছে। স্বাধীনতা আসছে। আমরা বুঝিনি, পিপ্‌ল্ বুঝেছে।'

গোপাল আচার্য বলছেন, 'নির্বাচনের অনেক আগে থেকেই আক্রমণ শুরু। 'রেড এইড কিওর হোম' বৌবাজার থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। নির্বাচনের দিন ওরা আমাদের পিটিয়ে লাশ বানিয়ে দিল। সে অবস্থায় হয়তো এই ছিল অনিবার্য—আমরা কেন ফ্যাসি-বিরোধী যুদ্ধের সমর্থন করেছি এবং তার তাৎপর্য কী—তা মানুষকে বোঝাতে পারিনি। তার

ভিত্তিতে কোন গণ-আন্দোলন গড়ে তুলিনি। সেটা না করার ফলে যারা 'ভারত ছাড়' আন্দোলন করল তাদের অতীত জনসাধারণ ভুলে গেল এবং আমরা হলাম সাধারণ মানুষের চোখে বেইমান। সুতরাং যা ঘটেছে সেটা অনিবার্য।'

সমর মুখার্জি বলছেন, 'আমাদের মিটিং-এ লোক হয়েছে। কিন্তু নির্বাচনের দিন আমরা জেনুইন ভোট পোল করতে পারিনি। গুণ্ডাবাজির বিরুদ্ধে দাঁড়াবার প্রস্তুতি আমাদের ছিল না। ফেয়ার ইলেকশন হলে হয়তো জিততে পারতুম। লেবর সিট-এর সঙ্গে রুটির লড়াই জড়িত ছিল। কংগ্রেসও জিতবে বলে কনফিডেণ্ট (নিশ্চিত) ছিল না। তাহলে তারা গুণ্ডাবাজির আশ্রয় নিত না। সাধারণভাবে বাঙালি ও মুসলমান শ্রমিক আমাদের পক্ষে ছিল। অবাঙালী শ্রমিকরা কংগ্রেসের পক্ষে। যদিও বঙ্কিম মুখার্জি পপুলার টি. ইউ. লিডার, কিন্তু অবাঙালি হিন্দুস্থানী শ্রমিক গ্রামের সঙ্গে সাঁটা। হিন্দুস্থানী খাটালওয়ালা ও লরিওয়ালারা এখনও আমাদের বিরুদ্ধে ভোট দিচ্ছে—এই আশির দশকেও।'

১৯৪৬-এর মার্চের নির্বাচনী বিপর্যয়ের আরও গভীরে যেতে চেয়েছেন বীরেন রায়। তিনি বলছেন, 'কমিউনিস্টদের প্রভাব শ্রমিকদের মধ্যে তখন দারুণ—যদিও অর্থনৈতিক প্লেন (স্তর)-এ। এটা যে খুব সত্যি তার প্রমাণ পাওয়া গেল ৪৬-এর নির্বাচনে। সে নির্বাচনে কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক ছাপ পড়ল না। ম্যাসেস (জনগণ) কমিউনিস্টদের বিশ্বাসঘাতক বলে মনে করল। বহু শ্রমিক এই কথাটা বলেছে—রুটিকে লিয়ে লালঝাণ্ডা—রাজকে লিয়ে কংগ্রেস। পেটিবুর্জোয়ারা পার্টির প্রতি শত্রুভাবাপন্ন—তারও প্রভাব গিয়ে শ্রমিকদের উপর পড়েছে। বুথ থেকে আমাদের ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিল। ৪৬-এর নির্বাচন আমাদের চোখ খুলে দিল। কেন এমন হল ?'

বীরেন রায়ের ধারণায়, যুদ্ধোত্তর উত্থানের তাৎপর্য বুঝতে না পারাটা সব ভুলের মূলে। কমিউনিস্টরা ঠিকই বুঝলে কিছু জমি হয়তো কমিউনিস্টদের দখলে থাকত। হয়তো মুক্ত এলাকা সৃষ্টি হত। কংগ্রেস নেতৃত্বের বিশ্বাস-ঘাতকতাও এত সহজ হত না।

খোকা রায় বলছেন, 'কংগ্রেস কিছু না করলেও ৪২ সালে অন্তত জেলে গিয়েছে। কাজেই তাদের দারুণ ইজ্জত। কমিউনিস্ট-বিরোধিতা কোন ডেপথ্ (গভীরতা)-এ গিয়েছে দেখুন ; আর কংগ্রেসের প্রতি সমর্থনের বহর দেখুন। মণি সিং-এর নির্বাচন কেন্দ্র কিশোরগঞ্জে ভোটের দিন সাইকেলে করে ঘুরছি; হঠাৎ একটা দৃশ্য চোখে পড়ল। কিশোরগঞ্জের পাশের গ্রাম যশোদল। সেখানে ধনী জমিদার গোঁসাইদের বাড়ি। গোঁসাইরা অত্যন্ত রক্ষণশীল—সে বাড়ির মেয়েরা পাল্কি ছাড়া গ্রামের রাস্তায় আধ মাইলও যায় না। আজ গোঁসাইদের বড় শরিকের বড়-বৌ-এর হাতে কংগ্রেস পতাকা। তার পেছনে অন্তত কুড়িজন মেয়ে। তারা সব এক মাইল হেঁটে চলেছে ভোট দিতে। বুঝলাম আমরা হেরে গেছি। মহেন্দ্র দাসের মৃত্যুও আমাদের

ক্ষতি করেছে। কিন্তু সেটা ঘটেছে সুসং-এ। তাতে হাজং ভোট নষ্ট হয়নি।' হেরে গেলাম বটে, কিন্তু আমাদের সলিড ভোট নষ্ট হয়নি। এই অবস্থা সর্বত্র। কৃষ্ণবিনোদ রায় ভেবেছিলেন তিনি জিতবেন—তাঁর জামানত জব্দ।

হিন্দুদের মধ্যে কংগ্রেসের পক্ষে যেমন সাড়া; মুসলমানদের মধ্যে লীগের পক্ষে সেরকম সাড়া। আমাদের প্রার্থী ওয়ালি নওয়াজ ভেসে গেল। কংগ্রেস-সমর্থিত ন্যাশানালিস্ট মুসলিম তো পোস্টার মারার লোকও জোটাতে পারেনি। সে একহাতে বালতি আর বগলে পোস্টারের বাণ্ডিল নিয়ে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে।

টেলিগ্রাম পেয়ে কলকাতায় চলে এলাম। ভবানী সেন জিজ্ঞেস করলেন, অবস্থা কী? বললাম, হেরে গেছি। কারণ যশোদলের ঘটনা একটা ইণ্ডিকেশন (নির্দেশ)।

হ্যাঁ, সত্যি কংগ্রেস গুণ্ডামি করেছে। কিন্তু শুধু গুণ্ডামি করে জেতা যায় না। তাদের পক্ষে বিরাট জন-সমর্থন ছিল। ব্যারাকপুরে চতুর আলি দাঁড়িয়েছিল—আমাকে সেখানে পাঠানো হয়। চতুর আলি মুসলমান—শ্রমিকদের সমর্থন ছিল তার প্রতি—সুতরাং দুই তরফেই প্রচুর লাঠির সমাবেশ। অতএব গুণ্ডামি হয়নি। কলকাতায় এসেই দেখছি পার্টি অফিসে বাক্স বোঝাই লোহার ডাণ্ডা। আত্মরক্ষা করতে হবে। কংগ্রেসের কমিউনিস্ট-বিরোধী শ্রমিক শাখা ঠিক করছে, এবার কমিউনিস্টদের জুতমতো পাওয়া গেছে—পিটিয়ে শেষ করে দাও।

ব্যারাকপুরে গুণ্ডামি হল না বটে—কিন্তু সর্বত্র কমিউনিস্টরা মার খেল। হাওড়ায় ছিল নেপাল নাগ। নেপাল নাগ অনেক করে বঙ্কিমদাকে বোঝান—আপনি চলে যান, নাহলে আপনাকে বাঁচানো যাবে না। ভোট শেষ হবার আগেই গাড়ি করে বঙ্কিম মুখার্জি চলে গেলেন। বালী ব্রিজের উপর হাজার হাজার লোক তখন কমিউনিস্ট খুঁজছে। ধরতে পারলেই মারছে—আর বলছে—বল শালা জয় হিন্দ্। বারকয়েক মার খাবার পর এলিয়ে যেতে যেতে বলছে—জয় হিন্দ্।

ব্যারাকপুর থেকে ফেরার পথে দেখি আমাদের একটা ইলেকশন ক্যাম্প বাঁচেনি—সব চুরমার।'

এসব সত্ত্বেও কিন্তু তিনজন কমিউনিস্ট প্রার্থী বাংলা আইনসভায় নির্বাচিত হন: জ্যোতি বসু, রতনলাল ব্রাহ্মণ ও রূপনারায়ণ রায়।

আরও দেখা যাচ্ছে, ১৯৪৬ সালে প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচনে শ্রমিক কেন্দ্রগুলিতে কমিউনিস্ট পার্টি পেয়েছে ১,১২,৭৩৬টি ভোট এবং কংগ্রেস পেয়েছে ৩,২১,৬০২টি ভোট। (ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস. পৃ ২৭৭)

কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসের সভায় নির্বাচনী ফলাফল বিশ্লেষণের পর এক দীর্ঘ প্রস্তাব গ্রহণ করে। তার গুরুত্বপূর্ণ অংশবিশেষ এখানে তুলে দেওয়া হচ্ছে:

১। নির্বাচনের ফলাফল

'গত নির্বাচনের ফল একেবারেই আমাদের আশানুরূপ হয় নাই। যাহা আশা করিয়াছিলাম তাহার চেয়ে অনেক কম আসন আমরা জিতিয়াছি।... তাছাড়া যেসব জায়গায় আমরা জেতা সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিত ছিলাম ঠিক সেখানেই আমরা হারিয়াছি। আমাদের জানিতে ও বুঝিতে হইবে কেন আমাদের এরকম পরাজয় হইয়াছে, কেন যতটা প্রত্যাশা করিয়াছিলাম ততখানি সফল হই নাই।

...যুদ্ধের সময় দেশে অত্যাচারের তাণ্ডবলীলা চলিয়াছিল, লোকের কষ্টের সীমা পরিসীমা ছিল না। এই পর্বের শেষে নির্বাচন আরম্ভ হয়। কংগ্রেস নেতারা মুক্তিলাভ করিবার পর দেশে নতুন প্রেরণা ও উৎসাহ জাগিয়া উঠে, লোকে বুঝিল কেবল স্বাধীনতাই সব সমস্যার সমাধান করিতে পারে। তাই স্বাধীনতার দরকার এখনই। গত কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবে আমরা ইহাকেই ব্যাখ্যা দিয়াছিলাম নতুন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জাগরণ।

আজাদ হিন্দ সৈন্যদের মুক্তির জন্য দেশময় যে বিপুল আন্দোলন চলে, নভেম্বর-ডিসেম্বরে কলিকাতায় জনসাধারণ যেভাবে ঐক্যবদ্ধ হইয়া সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে, তাতে এই চেতনারই পরিচয় পাই। তারপর আসে বোম্বাই ও করাচীর নৌ-সেনাদের বিপ্লব। সারা দেশ প্রবল উৎসাহে এই বিপ্লবের সমর্থন করে, এতেও পরিচয় জাগরণের নতুন বৈপ্লবিক চেতনার। সেনাবাহিনীর অন্য অংশেও এই জাগরণ ছড়াইয়া পড়ে।

এইসব ঘটনার ঠিক পরেই নির্বাচন সংগ্রাম শুরু হয়। বৃটিশ সরকার ঘোষণা করিল নির্বাচন হইয়া গেলেই স্বাধীনতার দলিল তৈরী হইবে। তাই নির্বাচনের মধ্যেও দেশের লোকের স্বাধীনতার জন্য উদ্দীপনা আর একটা প্রকাশ লাভ করিল।

কংগ্রেস ও লীগের অভূতপূর্ব জয়লাভের পিছনে আছে এই বিরাট সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণজাগরণ। দেশের লোকের মধ্যে কংগ্রেসের প্রভাব ও প্রতিপত্তি কতখানি তার আর একটা প্রমাণ পাওয়া গেল এই নির্বাচনে। কংগ্রেসকেই তাহারা স্বাধীনতার প্রধান যোদ্ধা বলিয়া ভাবে। মুসলিম লীগকে ভোট দিয়া মুসলিম জনসাধারণ ঘোষণা করিল যে লীগই তাহাদের স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠান, তাই তাহারা লীগকেই শক্তিশালী করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ : এই হইতেছে নির্বাচন সংগ্রামের একটা দিক। আর একটা দিক আছে, সেটা ভয়াবহ :

(১) শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি এই বিরাট গণ অভ্যুত্থান হইতে একদম বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে :

(২) জনসাধারণের মধ্যে কংগ্রেস ও লীগের প্রতি যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে তাহা কাজে লাগানো হইতেছে গৃহযুদ্ধের আবহাওয়া তৈরি করার জন্য, এবং কমিউনিস্ট পার্টি ও মজুরশ্রেণীর বিরুদ্ধে জেহাদের জন্য। তাই স্বাধীনতার জন্য ভোট একই সাথে পরস্পরের বিরুদ্ধেও ভোট।

কংগ্রেস ও লীগ বিপুলভাবে জয়লাভ করিল। শুধু যে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল শত্রুদের তাহারা ধ্বংস করিল তাহা নয়; যেসব কেন্দ্রে আমরা নিশ্চিত ছিলাম যে আমরা জিতিব সেখানেও তাহারা আমাদের পরাস্ত করিল।

··আমাদের প্রথম ও সবচেয়ে বড় ভুল হইয়াছিল: নভেম্বর, ডিসেম্বর ও ফেব্রুয়ারীর পিছনে যে বিরাট গণজাগরণ ছিল তাহাকে আমরা যথেষ্ট গুরুত্ব দিই নাই। জনসাধারণ নিজ নিজ দলের পিছনেই সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু এই বিশাল শিবিরগুলি ছিল পরস্পর বিরোধী।

দ্বিতীয়তঃ, কংগ্রেস-লীগের বুর্জোয়া নেতৃবৃন্দের এই গণজাগরণকে নিজেদের স্বার্থে এবং আমাদের ও অপর দলের বিরুদ্ধে কাজে লাগানোর ক্ষমতা সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট অবহিত ছিলাম না।

তৃতীয়তঃ, আমাদের ধারণা ছিল সহজেই এই জাগরণকে আমরা স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য সম্মিলিত সংগ্রামে টানিয়া আনিতে পারিব।

···গুণ্ডামি করিয়া বা কুৎসা করিয়া কংগ্রেস আমাদের হারাইয়াছে বা কংগ্রেস ফ্যাসিস্ট প্রতিষ্ঠান, এ-সব ব্যাখ্যা কোনও কাজে আসিবে না।

···এই ভোট শুধু স্বাধীনতার পক্ষে ভোট নয়, পরস্পরের বিপক্ষেও বটে। জনসাধারণ শুধু স্বাধীনতার পক্ষে ভোট দেয় নাই। লীগ ও কংগ্রেসকে ভোট দিয়া তাহারা লীগ-কংগ্রেসের নেতৃত্বে আস্থা ঘোষণা করিয়াছে। তাহারা জানাইয়াছে যে লীগ ও কংগ্রেসের নেতারা যে পথে লইয়া যাইতেছেন তাহাই স্বাধীনতার পথ।

···নির্বাচনের পরে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক আরও খারাপ হইল। কংগ্রেস-লীগ ঝগড়া না মিটাইলে দেশময় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা শুরু হইবে। যাহারা হইতে পারিত স্বাধীনতার সৈনিক তাহারা হইবে দাঙ্গাবাজের দল, শত্রুকে ভুলিয়া তারা ভাইয়ের বুকে ছুরি বসাইবে। (পৃ ১-৪)

৩. কমিউনিস্ট পার্টি এই প্রথম জনগণের সামনে আসিল স্বতন্ত্র পার্টি হিসেবে নিজের পরিকল্পনা ও আদর্শ লইয়া।

···কংগ্রেস কমিউনিস্ট পার্টিকে আক্রমণ করিল বিশ্বাসঘাতকের পার্টি বলিয়া, আগস্ট সংগ্রাম ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে বলিয়া। লীগও কমিউনিস্টদের আক্রমণ করিল বিশ্বাসঘাতক বলিয়া, মুসলিম সংহতির শত্রু বলিয়া। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি বলিল, কংগ্রেস লীগ উভয়েই দেশভক্তের পার্টি।

সবকটা সাধারণ কেন্দ্রে কংগ্রেস কমিউনিস্ট পার্টিকে হারাইল। মুসলিম কেন্দ্রে লীগ জয়লাভ করিল।

···কংগ্রেস কি করিয়া শ্রমিক কেন্দ্রে জিতিল? শ্রমিকরা যেখানে অগ্রসর ও ট্রেড ইউনিয়নে সঙ্ঘবদ্ধ নয় সেখানে তারা স্বাভাবিক দেশপ্রেমের প্রেরণায় কংগ্রেসকে ভোট দিয়াছে। যেখানে তারা সঙ্ঘবদ্ধ সেখানে কংগ্রেস সুযোগ লইল তাদের লীগ বিদ্বেষের। তাছাড়া কংগ্রেস সব জায়গাতেই মালিক

শ্রেণীর দালালদের সাহায্য লইল। বহুক্ষেত্রে পুলিশ ও গুণ্ডারা লাল ঝাণ্ডাকে আক্রমণ করিল।

লক্ষ্য করিবার বিষয়, গ্রামাঞ্চলে আমাদের অভিযান তপশীলী শ্রেণীর ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু আর একটা লক্ষণীয় বিষয়, মধ্যবিত্ত চাষীদের আমরা আমাদের দিকে আনিতে পারি নাই।

…গরীব চাষীদের মধ্যে আমরা উদ্দীপনা আনিতে পারিয়াছিলাম কেবল উত্তর বাংলার কেন্দ্রগুলিতে ও অন্ধ্রের কোনও কোনও জায়গায়।

যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে মধ্যবিত্ত চাষীদের মধ্যে আমাদের ভিত্তি নষ্ট হইয়া যায়। সেখানকার পশ্চাৎপদ ও নিপীড়িত চাষীরা আমাদের সমর্থন করিয়াছিলেন কিন্তু নিষ্ক্রিয়ভাবে।

কেবল চট্টগ্রামে আমরা নিম্ন মধ্যবিত্তদের সমর্থন অর্জনের আন্দোলন চালাইতে পারিয়াছি।…

পার্টির নির্বাচন সংগ্রাম

সাধারণভাবে আমাদের এই ত্রুটিগুলি ছিল :

(১) আমাদের বিরুদ্ধে 'বিশ্বাসঘাতক' বলিয়া যে কুৎসা রটনা করা হয় আমরা তার আত্মরক্ষামূলক প্রতিবাদ করিয়াছি মাত্র। আমরা জবাব দিয়াছিলাম আদালতের কাঠগড়ায় আসামীর মত। এরকম কুৎসা প্রচার যে দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনেরই ক্ষতি করিতেছে তাহা ব্যাখ্যা করি নাই।

(২) কংগ্রেসের কুৎসা অভিযানের বিরুদ্ধে আমাদের জবাব হইয়াছিল, স্থূলভাবে বামপন্থী জাতীয়তাবাদী—'আমরা চাই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মিলিত সংগ্রাম, তোমরা চাও সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষ।'

কিন্তু আমাদের নিজস্ব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রামের উপর আমরা যথেষ্ট জোর দিই নাই, যথা :—আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ঐক্যবদ্ধ করা ও স্বাধীনতা লাভ করা।

নতুন সমাজ ও নতুন জীবনের জন্য গণতান্ত্রিক পুনর্গঠন এখনই শুরু করা।

আমাদের শত্রুরা আমাদের আক্রমণ না করিয়া নিজের ঘর সামলাইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িত যদি আরও স্পষ্ট করিয়া আত্মনিয়ন্ত্রণের অর্থ সাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে পারিতাম। উপরন্তু আমাদের প্রচার হইয়া পড়িয়াছিল পাকিস্তান-ঘেঁসা। কংগ্রেসের সঙ্গে পার্থক্য যতটা স্পষ্ট ছিল লীগের সঙ্গে পার্থক্য ততটা স্পষ্ট ছিল না। তাই দল-নিরপেক্ষদের মধ্যে আমরা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারি নাই।…

…এই নির্বাচনের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ছিল : স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। কিন্তু আমরা কিভাবে প্রচার আন্দোলন পরিচালনা করিয়াছিলাম? আমরা কেবল আশু ঐক্যবদ্ধ জাতীয় সংগ্রামের উপর জোর

দিই ও এইভাবে অন্যসকল প্রশ্ন এড়াইয়া যাই। আমাদের ধারণা ছিল কেবল সমাবেশের উপর জোর দিলেই চাষী ও মজুরের সমর্থন লাভ করিতে পারিব ; গ্রামে চাষীদের সঙ্ঘবদ্ধ করিতে পারিলে ও শিল্পাঞ্চলে আংশিক সংগ্রাম চালাইতে পারিলেই আমরা জয়ী হইব। কাজেই প্রধান রাজনৈতিক সমস্যা ও প্রশ্নটিকে আমরা ঠিকভাবে ধরিতে পারি নাই। তাহা না করিয়া আমরা মূল রাজনৈতিক প্রশ্নটিকে অর্থনীতিবিদ্ ও বাক্চতুরের দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলাম।

তাই লোকে আমাদের কথা শুনিলেও তাহারা বিশ্বাস করে নাই যে রাজনৈতিক সংগ্রামে আমরা নেতৃত্ব করিতে পারিব। তাহাদের ধারণা থাকিয়া গেল যে কংগ্রেসকে ভোট দেওয়া বেশি ফলদায়ক। (পৃঃ ১২-১৪)

২। নির্বাচন-সংগ্রামের ফলাফল

(১) সব জায়গাতেই লোকে আমাদের কথা শুনিয়াছে। নতুন একটা ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক শক্তি বলিয়া আমাদের স্বীকার করিয়াছে।

(২) সকলেই দেখিল আমরা একটা স্বতন্ত্র রাজনৈতিক শক্তি। সকলেই দেখিল, এমন কি জাতীয় প্রতিষ্ঠান মহান কংগ্রেসও আমাদের ধ্বংস করিতে পারিল না ; আমাদের কর্মীরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াইতে পারে, প্রবল বাধা সত্ত্বেও একটি বিরাট জনসংখ্যাকে পার্টি নিজের ঝাণ্ডার নীচে সমবেত করিতে পারে, লাল ঝাণ্ডার জন্য কাজ করাইতে পারে।

যে ভোট আমরা পাইয়াছি তাতেও মোটামুটিভাবে সাধারণ লোকে আমাদের শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমরা যে দেশের তৃতীয় পার্টি একথা এতদিন শুধু আমরাই বলিতাম, এবার তাহা বর্তমানের সীমাবদ্ধ ভোটাধিকার সত্ত্বেও প্রমাণিত হইয়া গেল।

(৩) বহু ভুল ধারণা ও আশা এই নির্বাচন যুদ্ধে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ফলে পার্টির ভিতরে দুর্বলতা ঢুকিয়াছে। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, পার্টিভক্ত জনগণ হইতে যত পার্টির উপরের দিকে যাই তত বেশী হতাশা দেখিতে পাই। অবশ্য কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বড় বড় কথা বলিয়া এবং 'এবার খাঁটি শ্রেণী সংগ্রামের নীতি গ্রহণ করা হউক' ইত্যাদি বলিয়া এই দুর্বলতা ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। অথবা দেখা যায় কর্মীরা একেবারে দিশেহারা হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁরা রাজনৈতিক অবস্থা কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না।

(৪) পার্টি সংগঠন হিসাবে আরও জোরালো, আরও ঐক্যবদ্ধ না হইয়া বরং অপেক্ষাকৃত দুর্বল হইয়াছে, পার্টির ভিতরকার মত-বিভিন্নতা বাড়িয়াছে। উপর হইতে নির্দেশ আসিবে তবে কাজ করিব—এই মনোবৃত্তি বাড়িয়া যাওয়ায় পার্টির মধ্যে আমলাতন্ত্র আসিয়া গিয়াছে। পার্টির নেতাদের কার্যকরীভাবে চিন্তা করার বা সংগঠনের প্ল্যান তৈরী করার ক্ষমতা নষ্ট হইতেছে, এতে নিজেদের মধ্যে বিভেদ আসিয়া পড়িতেছে। পার্টির ভিতরের অবস্থা এত খারাপ কোন দিন হয় নাই।

সাধারণ উপায়ে পার্টি আর কিছুতেই নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারিতেছে না। নির্বাচনের পরের কর্তব্যগুলি সমাধান করার কাজে সোজাসুজি অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। এই সংকট কোন মতেই অস্বীকার করা চলে না, তাহা হইলে আজকের সবচেয়ে বড় সমস্যাকে অস্বীকার করা হইবে। (পৃ: ১৭-১৯)

৩। নির্বাচনের পরের অবস্থা ও আমাদের কাজ

...আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম একটা দারুণ সংকটপূর্ণ সন্ধিক্ষণে পৌঁছিয়াছে।

...লোককে দেখাইতে হইবে যে কংগ্রেস-লীগ ঝগড়ার ফলে তিনটি বিরাট বিপদ উপস্থিত হইয়াছে :

(১) ব্রিটিশরা ভারতবর্ষের ঘাড়ে তাহাদের প্ল্যান চাপাইয়া দিতে সক্ষম হইতেছে।

(২) ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধার সমূহ বিপদ বাড়িতেছে। স্বাধীনতা-প্রিয় হিন্দু-মুসলমানের অন্ধ ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবোধ বাড়িয়া চলিবে।

(৩) জনসাধারণের সমস্যার কোনই সমাধান হইবে না। কংগ্রেস মন্ত্রীরা এজন্য কিছু চেষ্টা করিলে লীগ তাহা পণ্ড করিবে, লীগ মন্ত্রীরা কিছু করিতে গেলে কংগ্রেস পণ্ড করিবে। আসল ক্ষমতা থাকিয়া যাইবে পুঁজি-পতিদের হাতে।

...পার্টির সবচেয়ে বড় বিপদ, কংগ্রেসের কমিউনিস্ট বিরোধী আন্দোলনের দরুণ ও ক্রমবর্ধমান কংগ্রেস-লীগ ঝগড়ার দরুণ পার্টি ক্রমেই জন-সাধারণের মধ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে। (পৃ: ২২-২৬)

৪। কাজের নতুন ধারা

পার্টির সংকট দূর করিতে হইলে, রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা ও গণ-প্রতিষ্ঠানগুলি ভাঙ্গিয়া যাওয়ার আশংকা দূর করিতে হইলে, আমাদের সবচেয়ে জোরালো কাজ করিতে হইবে আমাদের নিজেদের শ্রেণীর মধ্যে। ট্রেড ইউনিয়ন ও কিষাণ ফ্রণ্টে সবচেয়ে বেশী কাজ করা দরকার।

নতুন যুগে কমিউনিস্ট পার্টি বাঁচিয়া থাকিতে ও শক্তি বাড়াইতে পারিবে কেবল যদি পার্টি হিসাবে নিজের শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী করিতে পারে। তার অর্থ এই নয় যে আমরা নিম্নমধ্যবিত্ত সম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে বলিতেছি। আমাদের বেশী জোর দিতে হইবে নিজেদের শ্রেণীর উপর, সেখানে শক্তিবৃদ্ধি ঘটিলে তবে আমরা নতুন গণ-তান্ত্রিক সঙ্গী যোগাড় করিতে পারিব। নতুবা বুর্জোয়া নেতৃত্ব জনগণ হইতে আমাদের বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতে পারিবে।

…তাই আমাদের লক্ষ্য হইবে মজুর কিষাণ ঐক্য গড়িয়া তোলা—তাহলে আমাদের রাজনৈতিকভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ার ভয় থাকিবে না, আমাদের পার্টি নতুন সম্মিলিত ফ্রণ্টের প্রচারক হিসাবে দাঁড়াইতে পারিবে!

যদি আমরা সফল না হই তাহলে মজুর-চাষীর মধ্যেও অন্ধ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ঢুকিয়া পড়িবে, তারা হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় কংগ্রেস ও লীগের সেনাবাহিনীর কাজ করিবে। ঐক্যবদ্ধ গণসংগঠনগুলির বিরুদ্ধে ও পাল্টা সংগঠন গড়ার পক্ষে প্রবণতা কংগ্রেস ও লীগের নিজ নিজ মন্ত্রিসভাগুলির সাহায্যে ক্রমশ বাড়িতে থাকিবে।

তাই আমাদের এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ও নতুন পরিবর্তন, এখনই অত্যন্ত প্রয়োজন। না হইলে পার্টির বাঁচিয়া থাকা সম্ভব নয়, পার্টিকে শক্তিশালী করা ও জাতীয় আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করাও সম্ভব নয়।' (পার্টি-সংগঠন, চতুর্থ সংখ্যা, ২২শে জুন, ১৯৪৬ পৃ ২৩-২৫)

সদ্যসমাপ্ত নির্বাচনের ফলাফল পর্যালোচনা প্রসঙ্গে গভীর উপলব্ধির পরিচয় দিয়েছেন কেন্দ্রীয় কমিটি। এই সুদীর্ঘ প্রস্তাবে প্রতিফলিত চরম ব্যর্থতার অকপট স্বীকৃতি। এই ব্যর্থতার জন্যে দায়ী পার্টির ভ্রান্ত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সঠিক ধারণার অভাব—বিশেষ করে যুদ্ধোত্তর বৈপ্লবিক পরিস্থিতি ও গণজাগরণের তাৎপর্য সম্পর্কে। পার্টি আপাতত জনসংযোগ-বিচ্ছিন্ন ও হতাশায় আচ্ছন্ন। এবং দেশের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে এক সাম্প্রদায়িক বিভেদের পরিবেশ—যে কোন মুহূর্তে যা হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার আকারে ভয়াবহ গৃহযুদ্ধের চেহারা নিতে পারে। অতএব আশু করণীয়—নতুনভাবে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও নিজের শ্রেণীর ভিত্তিতে পার্টিকে নিজের পায়ে দাঁড় করানো।

'জনযুদ্ধে'র যুগে ও পরবর্তীকালে মধ্যবিত্তদের নিজের দিকে আকর্ষণ করাই ছিল পার্টিতে প্রধান ঝোঁক। নিজেদের মধ্যবিত্ত সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলাই ছিল অভিপ্রায়। নাচ গান নাটক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ও কবি শিল্পী লেখকদের সমাবেশ ঘটিয়ে মধ্যবিত্ত সমাজে আসর গড়ে তোলার আপ্রাণ প্রয়াসঃ যে শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক জয় আনে না—নির্বাচনী ফলাফল তার অকাট্য প্রমাণ। গণনাট্য আন্দোলনের জনপ্রিয়তা ও 'নবান্ন' নাটকের সার্থক প্রযোজনার প্রভাব—নিজের শ্রেণী—শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে কতখানি প্রতিফলিত—এই প্রশ্ন নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক নয়। 'নবান্নে'র সৌরভ কত দ্রুতই না মিলিয়ে গেল!

নিজের শ্রেণীর দিকে মুখ ফেরাও—এই স্লোগানই নির্বাচনী পর্যালোচনার শেষ কথা। মধ্যবিত্ত মানুষের কাছে পৌঁছনোর ব্যাকুলতায় পার্টি যে নিজের শ্রেণী সত্তাকে ভুলে যেতে বসেছিল! দেখা গেল দেশপ্রেমের প্লাবনে মধ্যবিত্ত ভেসে গেল এবং তার টানে শ্রমিকদের মধ্যে পার্টির অস্তিত্বও বিপন্ন। নিছক অর্থনৈতিক আন্দোলনে আকণ্ঠ ডুবে থাকলে যে পার্টির রাজনৈতিক

প্রভাব বাড়ে না—শেকড় গভীরে যায় না—অনেক দাম দিয়ে পার্টিকে এই সত্য উপলব্ধি করতে হল।

নির্বাচনের প্রধান ইস্যু ছিল স্বাধীনতা। ভোটারদের প্রধান বিবেচ্য বিষয়ও তাই—কে পারে স্বাধীনতা আনতে—কংগ্রেস না কমিউনিস্ট পার্টি। স্বভাবতই কংগ্রেস।

মুসলমান ভোটারদের সামনে প্রধান ইস্যু—পাকিস্তান। কে পারে তাকে পাকিস্তান দিতে—মুসলীম লীগ না কমিউনিস্ট পার্টি। অবধারিতভাবেই মুসলিম লীগ।

নির্বাচনের মূল ইস্যু-কে কেন্দ্রীয় কমিটি এভাবে উপস্থাপিত করেছেন। সঠিক বিশ্লেষণ। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে কমিউনিস্ট পার্টির দাঁড়াবার মতো এক ইঞ্চি জমিও থাকার কথা নয়।

কিন্তু কার্যত তা হয়নি। 'বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও ওড়িশার আইন-সভায় মোট আটটি আসন কমিউনিস্ট পার্টি লাভ করেছে—যদিও ১০৮ জন কমিউনিস্ট প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। মোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা আড়াই ভাগ কমিউনিস্ট প্রার্থীরা লাভ করেন। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষদের শতকরা চোদ্দ জন মাত্র যে ক্ষেত্রে ভোটদানের অধিকারী—সেক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টি যা ভোট পেয়েছে—সেটা নিতান্ত উপেক্ষণীর নয়।' (ওভারস্ট্রিট ও উইণ্ডমিলার, কমিউনিজম ইন ইন্ডিয়া, পৃ ২৩৬)

বাইশ

এক প্রবল আঁধির কবলে দিগ্‌ভ্রান্ত শ্রমিকশ্রেণী আবার সঠিক রাস্তায় ফিরে এল। মার্চ-এপ্রিলের নির্বাচনের সময় কলকাতা ও শহরগুলির যে শ্রমিক লাল ঝাণ্ডার পরিবর্তে তেরঙ্গা বেছে নিয়েছিল—১৯৪৬-এর ২৯শে জুলাই সেই শ্রমিক আবার লালঝাণ্ডাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরল।

যদিও ফেব্রুয়ারি-মার্চের ব্যারিকেডের দিনগুলি এখন শুধু স্মৃতি। মানুষের বিদ্রোহী মেজাজ আর যখন-তখন বিস্ফোরণ ঘটায় না। অপরদিকে শহীদের রক্তের বিনিময়ে কংগ্রেস ও লীগের নেতারা পৌঁছে গিয়েছে ক্ষমতার কাছাকাছি এবং নেপথ্যে শুরু হয়েছে ক্ষমতালোভী নেতাদের সঙ্গে মন্ত্রী-মিশনের নিভৃত আপোস আলোচনা। ফাটল ধরেছে নীচুতলার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ঐক্যের বুনিয়াদে। হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কেও চিড় ধরেছে। প্রত্যাহার করা হয়েছে রেল ধর্মঘটের ডাক। তবুও ছোট বড় লড়াই চলছে কলে কারখানায় অফিসে অফিসে। সব লড়াই আর সব লড়াকু মানুষ অবশেষে এক মহৎ সংহতি গড়ে তুলল ডাক-তার ধর্মঘটের সমর্থনে। জন্ম নিল এক উজ্জ্বল দিন—যার নাম ২৯শে জুলাই। স্বাধীনতার জন্য সর্বাত্মক

রাজনৈতিক ধর্মঘটের দিন—২৯শে জুলাই : আপস আর আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে মূর্ত প্রতিবাদের অভিজ্ঞান—২৯শে জুলাই।

। ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত লিখেছেন, '২৯শে জুলাই, শত সংগ্রামী পতাকার স্রোত মিলে মিশে এক অভ্যুদয়ের রূপ নিল। সে এক অনন্যসাধারণ মজলিস। ধর্মঘটী পোস্টাল কর্মীদের প্রতি কেবল শ্রেণী-ঐক্য আর সংহতির পরিচয় রাখেনি, হিন্দু মুসলমানের ভ্রাতৃত্বের মধ্যে নজির সৃষ্টি করেছিল ঐ সমাবেশ' (দৈনিক কালান্তর, ২৯।৭।১৯৬৬)। ডাক-তার ধর্মঘটী ভাইদের পাশে ঐদিন সব মেহনতী মানুষ একজোট। বিরলদৃষ্ট সংহতির এক আশ্চর্য উন্মোচন। তাই সংহতির কলতান বেজে ওঠে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় :

মরদানে চলো

স্ট্রাইক ! স্ট্রাইক ! যেখানেই থাকি, ময়দানে হবো সকলে সামিল আজকে।
স্ট্রাইক ! স্ট্রাইক। একবার লাখো হাত এক হোক্ দেখে নেবো পশুরাজকে।
স্ট্রাইক ! স্ট্রাইক ! দোকানে কপাট দপ্তরে চাবি ট্রামে-বাসে চাকা বন্ধ।
স্ট্রাইক ! স্ট্রাইক ! বিজলীর চোখ গেলে দাও, করো চৌরঙ্গীকে অন্ধ।
স্ট্রাইক ! স্ট্রাইক ! ডাক-তার ভাই ! টেলিফোন বোন ! ভয় নেই পাশে আমরা।
স্ট্রাইক ! স্ট্রাইক ! দুশমনের পাঁজর খুলবে, গা থেকে খসা চামড়া।

যে ডাক-তার শ্রমিক ধর্মঘটের তরঙ্গশীর্ষে ২৯শে জুলাই-এর গৌরবময় অস্তিত্ব—তার সূচনা ও প্রসারের ইতিবৃত্ত সেদিন 'স্বাধীনতা'র সংবাদস্তম্ভে বিধৃত।

'স্বাধীনতা'র পাতায় ডাক-তার শ্রমিক ধর্মঘটের দিনপঞ্জি

৫ই জুলাই : ১১ই জুলাই হইতে ডাক ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বাংলা ও বিহারের ডাক শ্রমিকগণ।

১১ই জুলাই : ডাক শ্রমিকের ধর্মঘট আরম্ভ।

১২ই জুলাই : বাঙ্গালা, দিল্লী, বোম্বাই ও পাঞ্জাবে ডাক ধর্মঘট সাফল্য-মণ্ডিত।

১৩ই জুলাই : আগ্রা, বেনারস, এলাহাবাদ, বেরিলী, কানপুর, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি নূতন নূতন কেন্দ্রে ডাক ধর্মঘটের প্রসার।

১৪ই জুলাই : এলাহাবাদে মেলভ্যানের সম্মুখে শুইয়া পড়ায় ১৭জন ডাক শ্রমিক গ্রেপ্তার। ১৫ই জুলাই হইতে টেলিগ্রাফ লাইনম্যানদের ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত। বোম্বাইয়ে একদিনের জন্য ডাক শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতি-সূচক শ্রমিক ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত।

১৫ই জুলাই : মাদ্রাজে ডাক ও তার বিভাগের ধর্মঘটের বিস্তৃতি। নারায়ণগঞ্জে ধর্মঘট শুরু। এলাহাবাদে মোট ৩১ জন গ্রেপ্তার।

১৭ই জুলাই : চট্টগ্রাম, মুসৌরী, সাতারা, ভূপালে ডাক ধর্মঘটের

প্রসার। বোম্বাই, তাঞ্জোর ও হুবলীতে তার বিভাগের ধর্মঘট। এলাহাবাদে ৫৪ জন গ্রেপ্তার।

১৮ই জুলাই : ২২শে জুলাই ডাক, তার ও টেলিফোন বিভাগ সম্পূর্ণ-রূপে অচল হইবে। সারা ভারত টেলিগ্রাফ ইউনিয়নের ধর্মঘটের নোটিশ। ডাক-শ্রমিক ধর্মঘটের নোটিশ। ডাক-শ্রমিক ধর্মঘটের সপ্তম দিবসে বোম্বাইয়ে ১৫ হাজার সুতাকল শ্রমিকের সহানুভূতি-জ্ঞাপক ধর্মঘট।

২১শে জুলাই : বাংলার ডাক ও তার কর্মচারীগণ সাধারণ ধর্মঘটের জন্য প্রস্তুত। ডাক, তার, টেলিফোন, আর. এম. এস. কর্মচারীদের ঐতিহাসিক সাধারণ ধর্মঘট আরম্ভ।

'স্বাধীনতা'র রিপোর্টার লিখছেন :

কলিকাতা ২১শে জুলাই (রাত্রি তিনটা)

'কাঁটায় কাঁটায় রাত্রি বারটা। সমস্ত অফিস এলাকা নিঝুম। বিভিন্ন টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ও সেণ্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিসের সম্মুখে সাংবাদিক ও ধর্মঘটী ভলাণ্টিয়ারদের ছোট-খাট ভীড় জমিয়া উঠিয়াছে। বাইরে সবাই উৎকণ্ঠিত। সবাই অফিস ছাড়িয়া আসিবে তো?

ঠিক বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে বড়বাজার এক্সচেঞ্জ হইতে টেলিফোনের মেয়েরা বাহির হইয়া আসিলেন। টেলিফোন অফিসের দরজায় আনন্দের ধুম পড়িয়া গেল। জনতার কাছে আজ ফিরিঙ্গী মেয়েরা নূতন মর্য্যাদা পাইলেন। খবর পাওয়া গেল সাউথ, পার্ক সমস্ত এক্সচেঞ্জেই একই অবস্থা।'

সকলের মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে ঘটল আরেকটি ঐতিহাসিক দৃশ্যের অবতারণা। কলকাতার বুকে যুদ্ধোত্তর শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হল মধ্যবিত্ত কর্মচারী আন্দোলন এবং তারই সঙ্গে এক অসামান্য পর্বের সূচনা। সুভাষ মুখোপাধ্যায়-এর 'ডাক - তার - টেলিফোনের গল্প' শীর্ষক রচনা তারই এক বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ। তিনি লিখেছেন :

'সোমবার। ভোর পাঁচটা থেকে টেলিগ্রাফ অফিসের সামনে অসংখ্য লোকের ভীড়। স্ট্রাইক—মুখে মুখে একটা কথাই ভেসে বেড়াচ্ছে—স্ট্রাইক। কথাটা নতুন নয়, 'ছোটলোক' মজুরের মুখ থেকে ভদ্রলোক মধ্যবিত্তের ওভাবে কেড়ে নেওয়াটাই নতুন।

সকলেই এসেছে দেখতে—অফিসে সবাই গেল কিনা। দলে ভারী কারা?

যাক্, কেউ যায়নি। অনিশ্চিত দ্বিধাগ্রস্তরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে জনতার বিদ্যুত-স্পর্শে। ব্যক্তিগত ভয়, সংশয় কোথায় মুছে যায়। ডালহাউসী ইনস্টিটিউটের পাদপীঠে, লালদীঘির ময়দানে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে চাকুরের দল বুকে ঠিক সেই জায়গায় লাল অক্ষরে লেখা ব্যাজ আঁটে যে জায়গাটা ভয়ে দ্বিধায় দুরু দুরু করছিল।

বুকে স্ট্রাইক ব্যাজ লাগানো। মোড়ে মোড়ে সবাই দাঁড়িয়ে। জন

পঞ্চাশ সারারাত জেগে পাহারা দিয়েছে। সারাদিন অনেকে খায়নি, ঘুমোয়নি। এমন অভিজ্ঞতা জীবনে এই প্রথম। দেশব্যাপী সংকট বুঝেও নিজের কিছুটা আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য আর মা-বাপ স্ত্রী-পুত্র নিয়ে শান্তির সংসার—এর বেশী উঁচু আদর্শ হয়ত কারো ছিল না। 'তাহলে তো সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে 'স্বদেশীই' হতে পারতাম।'

কিন্তু আজ যেন পুরানো চিন্তা, পুরানো সংস্কার সব চূর্ণ হয়ে গেছে। একার জন্য নয়, অফিসের সকলের জন্যে এইভাবে রাত জেগে না খেয়ে দুঃখ আর বিপদ বরণ কবার মধ্যে দারুণ রোমাঞ্চ আছে। বীরত্বও আছে। টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সামনে—মনে হল কোন টেলিগ্রাফিস্ট—সগর্বে তারই এক সহকর্মীকে বলছে, 'জানিস কাল আটটা থেকে বাইরে আছি, বাড়ী যাবার ফুরসতই পাইনি।' বন্ধুটিও কম যাবে কেন? 'আর আমি, সেই পরশু থেকে বাইরে আছি, আজ পর্য্যন্ত মেসেই যাইনি।'

এতদিন যারা কলকাতা-জোড়া গোলা-গুলি আর হত্যাকাণ্ডের মধ্যেও মুখ বুজে সরকারী দপ্তর নির্ব্বিবাদে চালিয়ে এসেছে, আজ তাদের মধ্যেও এই বেপরোয়া বিদ্রোহের মনোভাব কোথা থেকে এল?

'খুব শান্তিপূর্ণ থাকতে হবে, শুধু হাতজোড় করে অনুরোধ জানাতে হবে—তারপর যে যাবে, সে যাবে।' কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে ওসব হিতোপদেশ মানা চলে না। পিকেটিং করতে হয়, বাড়ী ফেরার পথে বিশ্বাসঘাতকদের পিছু নিয়ে ঠেঙাতেও হয়। আর তার জন্যে সব থেকে উৎসাহ ডালহাউসীর অফিস রাজ্যের যত পিওন, দারোয়ানদের। এই ধর্মঘটে বাবুদের সঙ্গে তারা এক হয়ে গেছে।' (স্বাধীনতা, ২৪. ৭. ৪৬)

আবার ঝড় উঠেছে। ২২শে জুলাই থেকে সারা ভারত জুড়ে একদিকে যেমন ডাক-তার শ্রমিক ধর্মঘটের সর্বাত্মকরূপে আত্মপ্রকাশ—অপরদিকে তার সমর্থনে শ্রমজীবী মানুষের গভীরে এক প্রবল আলোড়ন। সৃষ্টি হয়েছে সংহতির জোয়ার। গৌহাটি, যশোহর, নারায়ণগঞ্জ ও অন্যত্র সভা ও শোভাযাত্রীর মাধ্যমে ডাক-তার ধর্মঘটের প্রতি ঘোষিত হয় দৃঢ় সমর্থন। সুরাটের শ্রমিকরা প্রতীক ধর্মঘট করে জানান তাঁদের একাত্মতা। সর্বোপরি শ্রমিক সংহতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করল বোম্বাই ও মাদ্রাজ। ২৩শে জুলাই বোম্বাইয়ে পালিত হয় সর্বাত্মক ধর্মঘট। পাঁচ লক্ষ মজুর কাজ বন্ধ করে জানায় তারা ডাক-তার ধর্মঘটীদের লড়াকু ভাই। বোম্বাই শহরের পথে পথে ছাত্র ও মজুর মিছিলে ধ্বনিত হয় সংহতির দৃপ্ত ঘোষণা। আবার বুঝি বোম্বাইয়ের বুকে নৌ-বিদ্রোহের দিনগুলি ফিরে এল।

২৪শে জুলাই বোম্বাইয়ের পথে অনুসরণ করে মাদ্রাজ শহরের মজুর। সেদিন শহরে ট্রাম-বাস কলকারখানা স্কুল কলেজ সব অচল। এমনকি সংবাদপত্র প্রকাশও বন্ধ থাকে।

এবার কলকাতা। ২৫শে জুলাই বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের

জেনারেল কাউন্সিলের এক সভায় ২৯শে জুলাই সাধারণ হরতাল পালন ও বেলা ১১টায় ময়দানে এক জনসভা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত হয়। এ প্রসঙ্গে সমর মুখার্জি বলেছেন, 'এই হরতালের বিরুদ্ধে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ রেডিওতে প্রচার করেন। সুরাবর্দি এই হরতালে যোগ না দেবার জন্যে মুসলমান শ্রমিকদের আহ্বান জানান। অর্থাৎ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের যে জোয়ার চলেছে—তাতে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লড়াইয়ের নেতৃত্ব শ্রমিকশ্রেণীর হাতে চলে যাচ্ছে—বুর্জোয়া নেতারা আতঙ্কিত।'

কিন্তু সেদিন তাঁদের কথায় কেউ কর্ণপাত করেনি। ২৮শে জুলাই 'স্বাধীনতা'র সংবাদিক জানাচ্ছেন :

'২৯শে জুলাই-এর প্রতীক্ষায় কলকাতার নাগরিক

শ্রমিক শ্রেণী প্রস্তুত

কলিকাতার ট্রাম শ্রমিকরা ওয়েলিংটনে জনসভা করিয়া ধর্ম্মঘটের সংকল্প করিয়াছেন। কলিকাতা কর্পোরেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন এবং হাওড়া মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশন একমাত্র জলের কল ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত কাজ বন্ধ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

কলিকাতা পোর্ট ট্রাস্ট এমপ্লয়ীজ এসোসিয়েশন ও কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ধর্ম্মঘটের জন্য ডাক দিয়াছেন।

ইছাপুরের গান অ্যাণ্ড শেল ফ্যাক্টরীর শ্রমিকরা আজ এক সভায় ধর্ম্মঘটে যোগ দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

সংবাদপত্রও বন্ধ থাকিবে

ধর্ম্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া ডাঃ মল্লিক, এম. এল. এ-র সভাপতিত্বে এক সভায় প্রেস এমপ্লয়ীজ এসোসিয়েশন স্থির করিয়াছেন যে ঐ তারিখে সংবাদপত্র বন্ধ না রাখিলে সেখানে পিকেটিং করা হইবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে জার্নালিস্টস এসোসিয়েশনের কর্মীরাও প্রয়োজন হইলে সংবাদপত্র [illegible] অফিসের সম্মুখে পিকেটিং করিবার সংকল্প করিয়াছেন।

ক্লাইভ স্ট্রীটের নূতন রূপ

এই সাধারণ ধর্ম্মঘটের ডাকে বিভিন্ন অফিসের কর্ম্মচারীরা যেভাবে সাড়া দিয়াছেন, তাহার তুলনা পৃথিবীর কোন দেশে মিলিবে কিনা সন্দেহ। কর্পোরেশন এমপ্লয়ীজ এসোসিয়েশন [illegible], [illegible], [illegible] শ্মশান ও গোরস্তান প্রভৃতি বাদে সমস্ত কর্ম্মচারীকে ধর্ম্মঘটে যোগ দিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। ফেডারেশন অব অল ইণ্ডিয়া মিলিটারী একাউণ্টস ইউনিয়ন, একাউণ্ট্যান্ট জেনারেল [illegible] কর্ম্মচারী সঙ্ঘ, [illegible] অফিস

কর্ম্মচারী সংঘ, সওদাগরী অফিসের কর্ম্মচারী সংঘ, ক্যালটেক্স এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ভারতীয় কর্ম্মচারী সংঘ এবং কলিকাতা ব্যাংক এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন ধর্ম্মঘটের ডাক দিয়াছেন।

আগামী ২৯শে জুলাই ক্লাইভ স্ট্রীটের বুকে নূতন ইতিহাস রচনা হইবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ক্লিয়ারিং হাউস বন্ধ

ক্লিয়ারিং হাউসের সেক্রেটারী অন্তর্ভুক্ত ব্যাংকগুলিকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, ২৯শে তারিখে ক্লিয়ারিং হাউস বন্ধ থাকিবে। বেঙ্গল টেক্সটাইল এসোসিয়েশনও ঐদিন ছুটি দিয়াছেন।

বাংলা জুড়িয়া হরতালের ডাক

বেঙ্গল ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড ট্রেডার্স ফেডারেশন বাংলার শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীদের প্রতি আগামী ২৯শে জুলাই প্রদেশব্যাপী হরতাল পালনের জন্য আবেদন জানাইয়াছেন।

হুগলী জেলা কংগ্রেস কমিটি ঐদিন জেলাব্যাপী হরতাল ও ধর্ম্মঘট সংগঠনে সাহায্য করিবেন স্থির করিয়াছেন। কমিউনিস্ট পার্টির কলিকাতা, ও হাওড়া, হুগলী ও ২৪ পরগণা জেলা কমিটি ঐদিনের ধর্ম্মঘট, হরতাল, শোভাযাত্রা ও মনুমেন্টের নীচে সমাবেশকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য আহ্বান দিয়াছেন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন এবং নিখিলবঙ্গ মুসলিম ছাত্র লীগ আগামীকল্য (২৮শে জুলাই) বৈকালে সম্মিলিতভাবে ধর্ম্মঘটের সাফল্যের জন্য লাউডস্পীকার সমেত ভ্যানে করিয়া প্রচারে বাহির হইবে।

কলিকাতার প্রতিটি নরনারী উন্মুখ উৎসাহে ২৯শে জুলাইয়ের প্রতীক্ষায় আছে।' (স্বাধীনতা, ২৮. ৭. ৪৬)

২৯শে জুলাই-এর জন্যে শ্রমিক শ্রেণী প্রস্তুত। বি. পি টি. ইউ. সি. অফিসে খবর এসেছে—তিন লক্ষ চটকল শ্রমিকের শতকরা একশজনই ধর্মঘটে যোগ দিচ্ছেন। তাছাড়া পঞ্চাশ হাজার নাবিক, পনেরো হাজার সুতাকল শ্রমিক, কুড়ি হাজার কর্পোরেশন শ্রমিক, পঞ্চাশ হাজার ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিক এবং লক্ষাধিক ট্রান্সপোর্ট, বিজলী ও প্রেস শ্রমিক ধর্মঘট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পঞ্চাশ হাজার কেরানীও এই প্রথম সর্বাত্মক ধর্মঘটে নামছেন।

বি. পি. টি. ইউ. সি. সম্পাদক, আব্দুল মোমিন মনে করেন, '২৯শে জুলাই বাংলার শ্রমিক আন্দোলনে সূচিত হবে নতুন যুগ।' সাম্রাজ্যবাদী স্পর্ধার বিরুদ্ধে ঐদিন শুরু হবে বিপ্লবী বাংলার দুর্জয় অভিযানে এবং তার পুরোভাগে থাকবে কলকাতা ও শহরতলীর দু'লক্ষ শ্রমিক ও মেহনতী মানুষ।

রচিত হচ্ছে এত নতুন ইতিহাস। এবং তার জন্যে অস্থির আগ্রহে

অপেক্ষমান গোটা বাংলাদেশের মানুষ। মানুষের এই আকৃতি—এই সংগ্রামী উচ্ছ্বাস জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র 'যুগান্তর'-এরও দৃষ্টি এড়ায়নি। 'যুগান্তর' (২৯. ৭. ৪৬) লিখেছেন :

ভারতের জাতীয় আন্দোলনে নূতন অধ্যায়
সর্ব্বাত্মক ধর্ম্মঘটের ঐতিহাসিক আয়োজন

'অদ্য সোমবার ডাক তার টেলিফোন কর্ম্মচারীদের ধর্ম্মঘটের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য কলিকাতা ও পাশ্বর্বতী অঞ্চলসমূহে সর্ব্বাত্মক ধর্ম্মঘট অনুষ্ঠিত হইবে। সমস্ত যানবাহন দোকানপাট অফিস কারখানা ইত্যাদি ধর্ম্মঘটে যোগদান করিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। নাগরিক জীবনের দৈনন্দিন কার্য্যকলাপ আজ বন্ধ হইয়া যাইবে। নগরীর বিভিন্ন অংশের সহিত সংযোগ রক্ষা করিবার জন্য অদ্য কেবলমাত্র কিছুসংখ্যক মোটর ও সাইকেল বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতীক চিহ্ন ধারণ করিয়া চলাচল করিবে। অদ্য বেলা ১১টার সময় গড়ের মাঠে মনুমেন্টের পাদদেশে এক বিরাট জনসভা আহ্বান করা হইয়াছে।'

এবং তারপর ঐতিহাসিক ২৯শে জুলাই-এর উজ্জ্বল আবির্ভাব ও সংবাদ-পত্রের শিরোনামায় তার দৃপ্ত আত্মঘোষণা :

কলিকাতার ইতিহাসে অভূতপূর্ব্ব ব্যাপক হরতাল
গড়ের মাঠে লক্ষ লক্ষ নরনারীর বিরাট সমাবেশ
(আনন্দবাজার, ৩১. ৭. ৪৬)

ডাক কর্ম্মীদের প্রতি জাতির আন্তরিক সমর্থন
সমগ্র কলিকাতা নগরীতে অভূতপূর্ব্ব হরতাল
নাগরিক জীবনে সম্পূর্ণ অচলাবস্থা
যানবাহন চলাচল বন্ধ : কর্ম্মকোলাহল মুখর ডালহৌসী স্কোয়ার নীরব নিথর
(যুগান্তর, ৩১. ৭. ৪৬)

লক্ষ মজুর ও মেহনতকারীর অভ্যুত্থান : ২৪ ঘণ্টার জন্য বাংলার প্রাণকেন্দ্র অচল
ধর্ম্মঘটের সমর্থনে বাংলার ঐক্যবদ্ধ বিপ্লবী শপথ
ডালহৌসী স্কোয়ারে অপূর্ব্ব দৃশ্য : হিন্দু-মুসলিম ছাত্রদের রাইটার্স বিল্ডিং-এ পিকেটিং
ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ডাকে ময়দানে তিন লক্ষ জনতার সমাবেশ
(স্বাধীনতা, ৩০. ৭. ৪৬)

'স্বাধীনতা'র সাংবাদিক লিখছেন :

'২৯শে জুলাই বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিল। কলিকাতা ও শহরতলীর কলকারখানা ও যানবাহনের পাঁচ লক্ষ

সংগঠিত শ্রমিক, অফিস, আদালত, দোকান ও বাজারের দশ লক্ষ মেহনতী জনগণ; স্কুল কলেজের এক লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী; পাড়া ও মহল্লার ছেলে-বুড়ো-নারী-পুরুষ এক কোটী জনতা সর্ব্বব্যাপী ধর্ম্মঘটে ডাক-তার-টেলিফোন-আর. এম. এস. কর্ম্মচারীদের সংগ্রামের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় সুরু করিল।

রাত্রির অন্ধকার না কাটিতেই যেখানে ট্রাম-বাসের ঘর্ঘর শব্দে মানুষের ঘুম ভাঙ্গে সেখানে আজ সব স্তব্ধ। লাল পতাকা হাতে প্রভাতফেরীর দল স্মরণ করাইয়া দিল 'সাধারণ ধর্ম্মঘটের কথা ভুলিও না'।

ট্রাম বাস ট্যাক্সি লরী রিক্সা ঘোড়ার গাড়ী ঠেলাগাড়ী—সবই বন্ধ। কলিকাতা পোর্টে হুগলী পয়েণ্ট হইতে ডায়মণ্ড হারবার পর্য্যন্ত সকল কাজ-কর্ম্ম অচল, ডকের ক্রেনগুলি মাল তোলে না। জাহাজীরা কাজের জন্য ভীড় করে না। ভোর হইতেই দেখা যায় কর্ম্মমুখর পোর্ট দানবের মত ঘুমাইতেছে, জীবনে ইহাই প্রথম ঘুম।

রেল ধর্ম্মঘট হওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু শিয়ালদহ স্টেশনে লোক্যাল ট্রেন চলাচল বন্ধ হইয়া গেল।

মেটিয়াব্রুজ, খিদিরপুর, বেলিয়াঘাটা, কাশীপুর হইতে সুরু করিয়া নৈহাটি, কাঁচড়াপাড়া পর্য্যন্ত; হাওড়ার একপ্রান্ত হইতে হুগলীর অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত কোন কারখানা চালু নাই। বাহির হইয়া আসিয়াছে চটকলের মজুর, সুতাকলের মজুর, হোসিয়ারীর মজুর, লোহাকলের মজুর, চা কারখানা আর রংকলের মজুর, গ্যাস আর কাশীপুর ইলেকট্রিক কারখানার মজুর, রবার আর প্রেসের মজুর। কর্পোরেশনের ধাঙগর মেথররাও কাজে আসে নাই। অফিসে তালা পড়িয়াছে, জলকল ছাড়া সকল ডিপার্টে ও কারখানায় তালা পড়িয়াছে।

ভোর হইতে সুরু হইয়াছে গেটে গেটে লালঝাণ্ডার মেলা, কণ্ঠে কণ্ঠে আওয়াজ উঠিয়াছে, 'দুনিয়ার মজুর এক হো'।

কিছুটা বেলা হইতেই ধর্ম্মঘটের প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র হইয়া উঠিল ডালহৌসী স্কোয়ার। এবার সাদা কালো সকল মালিকের হেড অফিসে তালা পড়িবে তো?

ব্যাংক, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, ইন্সিওরেন্স অফিস, রেলওয়ে অফিস, সরকারী দপ্তর, কোথাও কেহ কাজে যোগ দিতে রাজী নয়। রিজার্ভ ব্যাংক, কারেন্সি, লালদীঘির সেক্রেটারিয়েট ও বার্ডকোম্পানীর যত জাঁদরেল মালিক একজন দারোয়ানের মাথাও কেহ নোয়াইতে পারে নাই। অফিসের সবচেয়ে বড় সাহেবকেও ছাত্র-ছাত্রী পিকেটের নিকট ধমক খাইয়া বাড়ী ফিরিতে হইয়াছে। গ্রেট ইস্টার্ণ, ফিরপো আর গ্র্যাণ্ডে সাহেবদের বাবুর্চি, খানসামারাও কাজ ছাড়িয়া মিছিলে যোগ দিল।

ধর্ম্মঘটের জন্য 'স্টেটসম্যান' পত্রিকা বন্ধ রাখা ইহাই প্রথম।

বড় রাস্তার দুইপাশে ছোটবড় সকল দোকানের বুকে তালা লাগানো।

অলিতে গলিতে পানবিড়ির দোকান পর্য্যন্ত বন্ধ ; চায়ের দোকান, মিষ্টির দোকান, হোটেল রেস্তোরাঁ কোথাও কেহ কাজ করিতে রাজী নয়। মাড়োয়ারী-প্রধান বড়বাজার, হিন্দু-প্রধান দক্ষিণ কলিকাতা, মুসলমান-প্রধান চীৎপুর, চীনা-প্রধান চীনাবাজার কাহারো সহিত কাহারো তফাৎ নাই, এই ধর্মঘটে সকলে সমানভাবে সামিল।

বাজারে আজ মাছ আসে নাই, গ্রাম হইতে কৃষকরা সব্জি লইয়া আসে নাই, একজন ঝাঁকামুটেও আসে নাই। হরতালের কথা তাহারা জানিত।

সেক্রেটারিয়েটের গেটে ছাত্র ফেডারেশন এবং মুসলিম ছাত্র লীগের স্বেচ্ছা-সেবকদের মিলিত বাহিনী মন্ত্রীদেরও অফিসে প্রবেশ করিতে দেয় নাই।

পুলিশের প্রস্তুতি একেবারে বৃথা যায় নাই, রেডিও অফিসের সামনে, বার্ড কোম্পানীর সামনে তাহাবা স্বেচ্ছাসেবকদের উপর মারপিট করে, জীপ-গাড়ীর ধাক্কায় ছাত্রী পিকেটারদের আহত করে।' (স্বাধীনতা, ৩০.৭.৪৬)

কলিকাতা যেন হারানো দিনগুলি আবার ফিরে পেয়েছে। ফিরে এসেছে ফেব্রুয়ারির দিনগুলি। ডালহৌসী খাঁ খাঁ করছে। ব্যাংক-ইন্সিওরেন্স-সরকারি-সওদাগরি সমস্ত দপ্তরে তালাবন্ধ। জীবনে এই প্রথম দল-বেঁধে মাথা তুলে দাঁড়ানোর উদ্দীপনা ডালহৌসির পথে পথে বিপ্লবী আওয়াজে মুখর হয়ে উঠেছে। রাইটার্স বিল্ডিংস-এর গেটে গেটে পুলিশের জিপের সামনে দুঃসাহসী ছাত্ররা বুক পেতে শুয়ে আছে।

ততক্ষণে চিৎপুরে, মানিকতলায়, বড়বাজারে রাস্তার ওপরে ভিড় জমে ওঠে। পতাকা না উড়িয়ে কোন গাড়ি যেতে পারবে না। একবার গুলি চললে হয়। সবাই তৈরি। মিলিটারি লরি ভয়ে বার হয়নি। সশস্ত্র সৈন্য ও পুলিশের জাল-দেওয়া সাঁজোয়া গাড়িরও সব রাস্তায় ঢোকার সাহস নেই। দু-চারটে ইঁট পাথর নির্বিকারে হজম করে বড় বড় রাস্তার বুক চিরে মাঝে মাঝে সাঁজোয়া গাড়ি ছুটে যাচ্ছে। ফিরে দাঁড়ানোর সাহসও তাদের নেই।

রাস্তায় সকলের মুখে মুখে শুধু একটি কথা—এই দৃশ্য কেউ জীবনে চোখে দেখেনি। চিন্মোহন সেহানবীশ বলছেন, '২৯শে জুলাই-এর কলকাতা দেখে মনে হল—আমরা 'ক্ষমতা'র কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। জি. পি. ও.-র নীচে আমাদের জমায়েত করলেন নৃপেন চক্রবর্তী। তারপর আমরা রিপোর্ট নিতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লাম। একঘণ্টা পর আবার যখন জড়ো হলাম—তখন দেখি জায়গাটা গুর্খারা 'রি-অক্যুপাই' (পুনর্দখল) করেছে। এদিকে মেয়ে পিকেটাররা গাস্টিন প্লেসে রেডিও অফিস দখল করে নিয়েছে। গীতার (গীতা মুখার্জি) সঙ্গে এক সার্জেন্টের ধস্তাধস্তি হল। উমাকে (উমা সেহানবীশ) দেখা গেল যেখান থেকে ব্রডকাস্টিং হয়—সেই চেয়ারে বসে থাকতে।'

শহরতলির ট্রেন আসছে ইঞ্জিনের সামনে লাল ঝাণ্ডা উড়িয়ে। শিল্পাঞ্চলের

ধর্মঘটীরা কলকাতার ময়দানের সভায় চলেছে। ছোট ছোট মিছিল এসে মিশে যাচ্ছে ময়দানের মহাসমুদ্রে।

সোমনাথ লাহিড়ী লিখছেন :

'লক্ষ লক্ষ শ্রমিক মিছিল করে এসেছিল ময়দানে। মিছিল বললে কথাটা পুরো বোঝানো যাবে না। সেদিন তামাম শ্রমিক শ্রেণী একটা উৎসবের মেজাজে মেতেছিল। বজবজ, মেটিয়াবুরুজ, কাঁকিনাড়া, জগদ্দল, চাঁপদানী—সর্বত্র থেকে দলে দলে মজুর লালঝাণ্ডা হাতে আসছে তো আসছেই। ছেয়ে ফেলেছে চৌরঙ্গীর পথ-ঘাট, ময়দান সব কিছু। আর তাদের চোখে মুখে ফেটে পড়ছে আনন্দ। একটা বিরাট জয় হয়েছে—তার ফূর্তিতে সারা বাংলার শ্রমিক শ্রেণী সেদিন মশগুল। অনেক ধর্মঘট, অনেক মিছিল আমি দেখেছি। এরকম সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত, দিলখোলা উদ্দাম মিছিল ও জনস্রোত আমি আর কখনও দেখিনি।' (কালান্তর, ২৯. ৭. ১৯৮১)

সেদিন সদ্য তরুণ অসীম রায়ের দ্বিতীয় জন্ম। চোখের সামনে ঘটেছে এ কী আশ্চর্য দৃশ্যের অবতারণা। তিনি লিখেছেন :

'বাঁশের পোল থেকে খুলে তেরঙ্গা চাঁদ-তারা আর লাল পতাকা দিয়ে মনুমেণ্টের পাদদেশ মোড়া হয়েছে। একটা প্রকাণ্ড লাল শালুর ওপর চকচকে রুপোলী রঙে লেখা 'অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস'। এছাড়া নানা রঙে আঁকা দেশ-বিদেশের নেতৃবৃন্দের ছবি। ভাত-কাপড় রুজির জন্যে আলাদা আলাদা পোস্টার, বাঁশের চাঁচের ওপর খবরের কাগজে লাল কালিতে স্লোগান। একখানা ছবিতে একজন ঝাঁকড়া চুলওয়ালা মানুষ কোমর বেঁকিয়ে শেকলে বাঁধা তার পেছনের হাত দুখানি খুলবার চেষ্টা করছে। সেই চেষ্টার দরুণ তার কাঁধের পেশী ফুলে উঠেছে—মুখের চোয়াল ধারালো শক্ত হয়ে উঠছে। বর্ষার দিন হলেও আকাশ খুব পরিষ্কার। গ্র্যাণ্ড হোটেলের মাথার ওপর জাফরানি মেঘ আর গঙ্গা থেকে হাওয়া—দিনটা ছিল ঊনত্রিশে জুলাই, ঊনিশশো ছেচল্লিশ।' (একালের কথা, পৃ ৩)

সোমনাথ লাহিড়ীর মতো তাঁরও মনে হয়েছে :

'সেদিনের জমায়েত অন্যান্য মিটিং থেকে বেশ পরিমাণে আলাদা। যেন গ্রামে মেলা বসেছে, ঠিক সেই রকম, একটা সহজ আনন্দের ভাব আর ফূর্তির মেজাজ ছিল সমাবেশটিতে। অনেক দূর থেকে অনেক ধরনের লোক জমেছে। মেটেবুরুজ থেকে শোভাযাত্রা করে মুসলমান শ্রমিকরা যখন বাজনা বাজাতে বাজাতে এসে পেঁছাল তখন ঠিক মনে হচ্ছিল পুজোর ঢাক বাজছে।

তাছাড়া তিন রঙা, সবুজের ওপর চাঁদ-তারা আর লাল রঙের ওপর কাস্তে হাতুড়ির ফ্ল্যাগগুলো শ্রমিকরা যেখানে সেখানে পুঁতে এমনভাবে তার নীচে বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে নিজেদের ঘরোয়া গল্প করছিল যে রাজনীতির কঠিন

মার-প্যাঁচ অনেকটা পিছিয়ে পড়েছিল। মনে হচ্ছিল, প্রত্যেক দল আর তার নির্দিষ্ট বিভিন্ন পতাকার চেয়েও একটা বড় জিনিস আছে। সেটা হল যারা পতাকা বয় তারা আর তাদের মন।

সভায় অনেক নেতাই বক্তৃতা করেন। এদিক থেকে কলকাতা পোর্টের যে শ্রমিকটি বললেন তাঁর কথা ছিল চমৎকার। ছ' ফুট লম্বা তামাটে চেহারা আর আড়াই মণ শরীরের ওপরের অর্ধেকটা ঢাকা পড়েছে কালো দাড়িতে। ছাঁকা বাঙাল ভাষায় বললেন, 'অঙ্ক কষে দেখাও আমি কি করে বাঁচব? ছেলেটা বরাবর প্রথম হয়ে উঠেছিল ইস্কুলে, মাইনে দিতে পারি না—ছাড়িয়ে এনেছি।' তারপর গলা নামিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। বিকেলের আলো কাত হয়ে তাঁর চওড়া কপালে এসে পড়ল। তারপর তাঁর বিশাল হাত দুটো আজানের সময় যেভাবে লোকে তোলে ঠিক সেইভাবে তুলে বললেন, 'জানেন আমাদের মত লোক না হলে কলকাতার পোর্ট চলবে না।' মাত্র এই কথাটা বলে যখন নেমে গেলেন তখন হাততালি দিতে পর্যন্ত লোকে ভুলে গেল।

খুব অস্পষ্ট আর আবছা হলেও ঐ শেষ কথাটাই ছিল জমায়েতের কথা। যেন একটা মিঠে গানের মত সেই কথাটাই লোকগুলো শুনছিল মন দিয়ে। সত্যিই কি তারা এতখানি দরকারী?

বছর পঁয়তাল্লিশেক বয়স কিন্তু চুলগুলো ধবধবে সাদা, পরণে পাজামা আর গলাবন্ধ কোট—মিটিং-এর শেষ বক্তা গ্র্যান্ড হোটেলের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বেশ গর্বের সঙ্গে হেসে বললে, 'আজ, সাহাব লোগোঁকো লাঞ্চ নেহি হুয়া, কিত্না তক্‌লিফ্। ম্যয় তো আভি ডলহৌসি স্কোয়ার সে আ-রহা। বড়া রাস্তামে কৈ ট্রামভি নেহি, বাসভি নেহি, প্রাইভেটভি নেহি। সড়ককা উপরমে আজ গানা চল রহা।' শেষে গলা নামিয়ে থুতনিটা আকাশের দিকে বাড়িয়ে মিটিঙের শেষ প্রান্তের লোকগুলোর মাথা ছাড়িয়ে এক বহু দূরের স্বপ্নের দিকে যেন তাকিয়ে বললে, 'ইয়াদ রাখিয়ে হামলোগ যব সব এককাট্টা হো সাকেঙ্গে তব্ তামাম হিন্দুস্তানকো হিলা দেঙ্গে।' বলে তার হাতখানা কানের কাছে রেখে দরদ দিয়ে গাইবার সময় লোকে যে ভঙ্গী করে ঠিক সেই ভঙ্গীতে একটি গানের ধুয়োকেই পুনরাবৃত্তি করলে, 'ইয়াদ রাখিয়ে, হামলোগ তামাম হিন্দুস্তানকো হিলা দেঙ্গে।'

লোকগুলো রোদ্দুরে ঘাসের ওপর বসে মাতালের মত পান করছিল এই মিঠে গানের সুর। যেন তারা স্বপ্ন দেখছিল তারিয়ে তারিয়ে। ঠিক তাদের মতো লোকই কিভাবে তামাম হিন্দুস্তানকে হেলিয়ে দেবে, একথাটা ভাবতে ভীষণ অবাক লাগে তাদের।' (একালের কথা, পৃ ৫-৬)

তেইশ

একটি অধ্যায় শেষ। ২৯শে জুলাই এসে শিখর স্পর্শ করল যুদ্ধোত্তর অভ্যুত্থান। ১৯৪৫-এর ২১শে নভেম্বর থেকে ২৯শে জুলাই পর্যন্ত বিস্তৃত কালসীমা—জাতির জীবনে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। তার মধ্যবর্তী দিনগুলি যেন লড়াইয়ের আঁচে ঝলসানো।

প্রসঙ্গান্তরে যাবার আগে সেই উত্তাল দিনগুলি আর একবার স্মরণ করা যাক।

১৯৪৬ সালের জুলাই পর্যন্ত সংগ্রামী দিনগুলি :

জানুয়ারি

১০ গ্রামে মিলিটারির অত্যাচারের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামে একলক্ষ লোকের শোভাযাত্রা।

১২ গোয়ালিয়রে শ্রমিকদের উপর গুলি চালনার ফলে ১৭ জন শ্রমিক নিহত ও ১৩০ জন আহত।

১৬ কলকাতায় ব্রেথওয়েট স্টীলের শ্রমিকদের উপর গুলি চালনার ফলে দুজন শ্রমিক নিহত ও কয়েকজন শ্রমিক আহত।

২৭ কোলার সোনার খনিতে কুড়ি হাজার শ্রমিকের ধর্মঘট শুরু।

ফেব্রুয়ারি

৭ বোম্বাইয়ে বিমান বাহিনীর ভারতীয় সদস্যদের অনশন ধর্মঘট।

১৩ কলকাতায় রশিদ আলি দিবসের শোভাযাত্রার উপর গুলিবর্ষণ। জনতা বনাম ব্রিটিশ পল্টনের খণ্ডযুদ্ধ। বার্মা থেকে বিমানযোগে আরও ব্রিটিশ সেনা কলকাতায় আনা হয়েছে।

১৬ মীরাটে রশিদ আলি দিবসে শোভাযাত্রীদের উপর পুলিশের গুলিবর্ষণ।

১৭ বোম্বাইয়ে নৌ-সেনাদের ধর্মঘট শুরু।

২১ নৌ-সেনাদের ধর্মঘট করাচী, কলকাতা ও মাদ্রাজে বিস্তার।

২৩ ধর্মঘটী নৌ-সেনাদের সমর্থনে বোম্বাইয়ে সর্বাত্মক শ্রমিক ধর্মঘট—তিন লক্ষ শ্রমিকের অংশগ্রহণ—ব্রিটিশ সেনাদের বেপরোয়া গুলিবর্ষণে দু'শজন নিহত ও বহু আহত।

২৩ নৌ-সেনাদের ধর্মঘটের সমর্থনে মাদ্রাজে বিমান বাহিনীর সদস্যদের ধর্মঘট।

২৬ নৌ-সেনা ধর্মঘটের সমর্থনে ত্রিচীতে এক লক্ষ শ্রমিকের ধর্মঘট ও মাদ্রাজে পঞ্চাশ হাজার শ্রমিকের মিছিল।

২৮ মাদুরায় নৌ-সেনা ধর্মঘটের সমর্থনে হরতাল।

মার্চ

১ জব্বলপুরে স্থল-সেনাদের ধর্মঘট।
৫ বোম্বাইয়ে প্রাথমিক শিক্ষকদের ধর্মঘট।
৮ দিল্লীতে 'যুদ্ধজয় উৎসব'-বিরোধী মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণ—এগারোজন নিহত।
১৪ মুলুন্দ শিবিরে বন্দী নৌ-সেনাদের অনশন ধর্মঘট।
১৮ দেরাদুনে গোর্খা সৈন্যদের বিদ্রোহ।
১৯ এলাহাবাদে পুলিশদের অনশন ধর্মঘট।
২২ দিল্লীতে পুলিশদের অনশন ধর্মঘট।
২৩ রেশন কাটার প্রতিবাদে বেঙ্গল-আসাম রেলওয়ের শ্রমিকদের ধর্মঘট।
২৭ নারায়ণগঞ্জে ধর্মঘটী সুতাকল শ্রমিকদের উপর পুলিশের গুলিবর্ষণ—চারজন শ্রমিক নিহত ও ষোলোজন আহত।

এপ্রিল

৩ বিহারে দশ হাজার পুলিশের ধর্মঘট।
৫ নিখিল ভারত রেলওযে মেনস্ ফেডারেশনের স্ট্রাইক ব্যালট গ্রহণ।
৬ বোম্বাইয়ে ধাঙ্গর ধর্মঘট।
২৯ ফরিদকোটে সত্যাগ্রহ শুরু।

মে

২ উত্তর-পশ্চিম রেলওয়ে শ্রমিকদের চারঘণ্টা প্রতীক ধর্মঘট।
৫ রেলওয়ে মেনস্ ফেডারেশন-এর ২৭ জুন থেকে ভারতব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
৬ রামপুরে কৃষকদের উপর পুলিশের গুলিবর্ষণের ফলে একজন নিহত ও কয়েকজন আহত।
২২ দক্ষিণ ভারতীয় রেলওয়ে শ্রমিকদের একদিনের প্রতিবাদ ধর্মঘট।

জুন

২১ কাশ্মীরে পণ্ডিত নেহরু গ্রেপ্তার।
২২ পণ্ডিত নেহরুর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে দেশজোড়া বিক্ষোভ।
২৪ অন্তর্বর্তী রিলিফের আশ্বাস পেয়ে রেলওয়ে মেনস্ ফেডারেশন ধর্মঘট প্রত্যাহার করলেন।
২৭ দেশীয় রাজ্য-পাতৌদিতে গুলি চালনা—পঁচিশ জন আহত।

জুলাই

৭ ইন্দোরের ছাব্বিশ হাজার শ্রমিক দাবি আদায় করলেন।
১১ সারা ভারত ডাক ধর্মঘট শুরু।

১৬ রতলামের (পাঞ্জাব) একলক্ষ কৃষক শোভাযাত্রীদের উপর গুলি বর্ষণের ফলে দশ জন নিহত ও তিরিশ জন আহত।

২৩ ডাক ধর্মঘটের সমর্থনে চার লক্ষ শিল্প-শ্রমিকের প্রতীক ধর্মঘট।

২৬ রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে কলকাতায় পনের হাজার ছাত্রের শোভাযাত্রা।

২৯ কলকাতা ও শহরতলীর চল্লিশ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষ ডাক-তার শ্রমিক ধর্মঘটের সমর্থনে সর্বাত্মক হরতাল ও ধর্মঘট পালন করেন।

১৯৪৬ সালের জুলাই পর্যন্ত অসংখ্য জঙ্গী লড়াইয়ের সমাবেশ—সমকালীন ইতিহাসের এক উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য। এবং তাতে সামিল শ্রমিক, ছাত্র, সেনাবাহিনী, পুলিশবাহিনী ও সমাজের অন্যান্য অংশের মানুষ। বোম্বাই ও করাচীর নৌ-বিদ্রোহীদের স্বল্প-মেয়াদী অথচ বীরত্বপূর্ণ লড়াই সূচনা করল এক নতুন অধ্যায়। বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের অধ্যায়। নৌ-বিদ্রোহীদের সাহস ও ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের দৃষ্টান্ত সেনাবাহিনীর অন্যান্য শাখাকে অনুপ্রাণিত করে। সেনাবাহিনী ও অসামরিক মানুষের মিলিত সংগ্রামের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসনের শেষ প্রহর ঘনিয়ে আসে।

ভারতীয় সেনা ও পুলিশ বাহিনীর অবাধ্যতার ঢেউয়ের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিক আন্দোলনের দু'কূল প্লাবী তরঙ্গ। ড. গঙ্গাধর অধিকারীর ভাষায়:

'১৯৪৬ সালের প্রথম ছ'মাসের শ্রমিক ধর্মঘটের ফলে যত শ্রম দিবস নষ্ট হয়েছে—তা গোটা ১৯৪২ সালের দ্বিগুণ। অথচ ১৯৪২ সাল আগস্ট বিদ্রোহের বছর। শ্রমিক ধর্মঘট শুধু অর্থনৈতিক দাবি আদায়ের চৌহদ্দিতে সীমাবদ্ধ নয়। প্রতিটি জাতীয় ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ইস্যুতে শ্রমিকরা ধর্মঘট করেছে এবং সংহতি জানিয়েছে সমাজের অন্যান্য অংশের লড়াইয়ের প্রতি। শ্রমিক ধর্মঘটের উন্মাদনা এই প্রথম, ব্যাঙ্ক ও সওদাগরি অফিসের কেরানীকুল, সরকারি চাকুরে—এমন কি প্রাথমিক শিক্ষকদেরও লড়াইয়ের ময়দানে টেনে আনল।' (রিসার্জেন্ট ইন্ডিয়া)

অতএব দেশের মানুষ সমগ্র বিশ্বের মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে বিদ্রোহের জ্বলন্ত মশাল ঊর্ধ্বে তুলে ঘোষণা করল—তারা ঔপনিবেশিকতার জোয়াল আর একদিনও সহ্য করতে রাজি নয়।

কিন্তু তবুও বাঞ্ছিত লক্ষ্যের নাগাল পেল না সংগ্রামী মানুষ।

এ প্রসঙ্গে অজিত রায়ের মন্তব্য বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। তিনি লিখছেন:

'কংগ্রেস নেতাদের নির্দেশ ও পরামর্শ অগ্রাহ্য করে ভারতীয় জনতার বিভিন্ন অংশের মানুষ বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানে সামিল হয় এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর এক বিরাট অংশের মধ্যে গুরুতর অশান্তি ও বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই সমস্ত ঘটনার অধিকাংশই স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাধীন। তার ফলে বিপ্লবের ভয়ে আতঙ্কিত সাম্রাজ্যবাদ ও কংগ্রেস—উভয়ে দ্রুত সমঝোতার পথে এগিয়ে গেল।' (সোশিও-পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড ইঃ)

চৌত্রিশ

সে এক নিদারুণ স্বপ্ন-ভঙ্গের ট্র্যাজেডি। ২৯শে জুলাই মজুর স্বপ্ন দেখেছিল—সে তামাম হিন্দুস্তানকে হেলিয়ে দেবে। কিন্তু স্বপ্নের ফুল ফুটতে-না-ফুটতেই ঝরে গেল। ঠিক তার আঠেরো দিন পর ভয়াবহ ভ্রাতৃঘাতী গৃহযুদ্ধে মজুরের স্বপ্ন পুড়ে ছাই। বিপ্লব আর প্রতিবিপ্লব যেন একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। সেই ভয়ংকর যুগসন্ধিতে পৌঁছে ইতিহাস এক অভাবনীয় দিকে বাঁক নিল। প্রতিবিপ্লবের পঙ্কিল আবর্তে তলিয়ে গেল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণবিপ্লবের যাবতীয় আয়োজন।

ড. গঙ্গাধর অধিকারী লিখেছেন :

'যে-জনগণ মাত্র কয়েক মাস—এমন কি কয়েক দিন—আগে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাদের যুক্ত হিন্দু-মুসলিম সংগ্রামে অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটিয়েছে ও ব্রিটিশ প্রভুদের ভেতরে আতঙ্কের তরঙ্গ সঞ্চার করেছে, তাদের বিরুদ্ধে সাম্রাজবাদের প্রতি-আক্রমণ হল দাঙ্গা।' (রিসার্জেন্ট ইন্ডিয়া, পৃ ১২)

রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আকারে সাম্রাজ্যবাদ প্রতি-আক্রমণ শুরু করে দিল—যদিও সরাসরি প্ররোচনা এল মুসলিম লীগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' পালনের আহ্বান থেকে। ২৯শে জুলাই-এর ঠিক আঠেরো দিন পর শুরু হল কলকাতার বুকে ভ্রাতৃঘাতী গৃহযুদ্ধ—যার কোন নজির নেই।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান সমস্যা : হিন্দু-মুসলমান সমস্যা। প্রধান প্রশ্ন : জাতীয় ঐক্যের প্রশ্ন—যার ভিত্তি কংগ্রেস-লীগ বোঝাপড়া। কমিউনিস্ট পার্টির এযাবৎ ধারণা ছিল—পাকিস্তানের দাবি যুক্তিসঙ্গত, কারণ এই দাবির পিছনে রয়েছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের জন্য স্বাভাবিক ব্যাকুলতা। কিন্তু ১৯৪৬ সালের এপ্রিলে ভারত সফরে এসে রজনী পাম দত্ত সরাসরি দেশবিভাগের বিরোধিতা করেন এবং মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবিকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে চিহ্নিত করেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে কমিউনিস্ট পার্টি মন্ত্রী-মিশনের কাছে একটিমাত্র সংবিধান পরিষদের দাবি জানায়। পাকিস্তান কথাটা আর উচ্চারিত হয় না। আরও বলা হয় যে সমস্ত ভারতবাসী ঐক্যবদ্ধভাবে এক রাষ্ট্রের মধ্যে বাস করলেই বরং সকলের স্বার্থ সংরক্ষিত থাকবে। ব্রিটিশ সরকারের কাছে, কংগ্রেস ও লীগের সমতার ভিত্তিতে গঠিত অস্থায়ী সরকারকে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানাল কমিউনিস্ট পার্টি।

কিন্তু দেশ যে ক্রমশ গৃহযুদ্ধের কিনারার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এ বিষয়ে পার্টি আগাগোড়া সজাগ এবং বারে বারে পার্টির মুখপত্র 'স্বাধীনতা'য় সতর্ক বাণী উচ্চারিত।

'স্বাধীনতা'র (৬. ৮. ৪৬) সম্পাদকীয় স্তম্ভে লেখা হয় :

'...লীগের খেতাবধারী নেতাদের শিক্ষা-দীক্ষা মিলিয়াছে সাম্রাজ্যবাদের আশ্রয়ে। সেই শিক্ষা-দীক্ষা হইতেছে আমলাতন্ত্রের দপ্তরী কায়দা-কানুনে শিক্ষা এবং সাম্রাজ্যবাদের নির্মম শোষণ ও শাসন সমর্থন করিবার দীক্ষা। দেশের কোটী কোটী নিপীড়িত মুসলমান, কৃষক, শ্রমিক ও গৃহস্থের জীবিকা ও ইজ্জতের সঙ্গে এই শিক্ষা-দীক্ষার কোনও যোগ ছিল না।

...লীগ নেতাদের সংগ্রাম যদি হয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে, তাহাতে হিন্দু ও মুসলিম, কংগ্রেস এবং লীগ উভয়েরই অমঙ্গল—ইহাতে সুযোগ হইবে শুধু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের, সুযোগ হইবে ক্লাইভ স্ট্রীটের, সুযোগ হইবে জমিদার চোরাকারবারী ও দুর্নীতিপরায়ণ আমলাদের। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সরাসরি পৃথক সংগ্রামে পরাজয় নিশ্চিত হইলেও তাহাতে অতীত কংগ্রেসের ইতিহাস গৌরবান্বিত হইয়াছে, কিন্তু কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লীগের সংগ্রামে লীগের ইতিহাস গৌরবান্বিত হইবে না। ঘরোয়া লড়াই ও ব্যাপক দাঙ্গার ফলে দুঃখের অন্ধকারে দেশ ডুবিয়া যাইবে। মিলিত সংগ্রামের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের আসন চিরস্থায়ী হইবে...

...১৬ই আগস্টের প্রাক্কালে আমরা জাগ্রত এবং হুঁসিয়ার মুসলিম জনগণের কাছে আবেদন জানাই—আপনাদের জন্যই নেতারা খেতাব ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন; আপনারাই নেতাদের ঘরোয়া যুদ্ধের রাস্তা হইতে ফিরাইতে পারেন। ভ্রাতৃবিরোধের পথ হইতে নেতাদের ফিরান, কৃষক, শ্রমিক ও কেরানীদের প্রত্যেকটি মিলিত সংগ্রামকে শক্তিশালী করুন, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মিলিত সংগ্রামের শপথ লইয়া নেতাদের আপোষহীন সংগ্রামের পথে লইয়া চলুন।'

হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ও শ্রমিক সংহতি অটুট রাখার জন্যে কমিউনিস্ট পার্টি'র নেতৃত্বাধীন শ্রমিক ইউনিয়নগুলি ১৬ই আগস্ট ধর্মঘটে সামিল হবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

শ্রমিকদের ঐক্য ও সংহতি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে ট্রাম ওয়ার্কার্স' ইউনিয়ন ১৬ই আগস্ট ট্রাম ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৪ই আগস্ট রাত্রে মুসলিম ইন্সটিটিউট হলের সভায় এক সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হয়। তাতে বলা হয় :

'মুসলিম লীগ কর্তৃক প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের ঘোষণা শ্রমিকদের মধ্যে নানারূপ ধারণা (কনফিউশন) সৃষ্টি করিয়াছে—যখন লীগ নেতৃত্ব কাহার বিরুদ্ধে লড়িতে যাইতেছেন সে কথা স্পষ্ট নয়। আমরা ভারত বিভাগ সমর্থন করি না, কারণ, তাহা ক্ষতিকর ও অবাঞ্ছনীয়। সেজন্য উক্ত দিবসের প্রতি আমাদের সহানুভূতি নাই, কিন্তু শ্রমিকদের ঐক্য ও দৃঢ়তা বজায় রাখিবার

জন্য এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অভিযান আগাইবার জন্য আমরা ঐদিন ধর্ম্মঘট করিতে প্রস্তুত আছি…'

একই কারণে ওরিয়েন্টাল গ্যাসের শ্রমিকরাও ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেন। 'সর্ব্বদাই সাম্প্রদায়িকতা ও দলাদলির ঊর্ধ্বে থাকিয়া নিজেদের একতাকে দৃঢ় রাখার জন্যে' তাঁরা ১৬ই আগস্ট কাজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেন।

'১৬ই আগস্ট মুসলিম জনগণের বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামেচ্ছার প্রতি ভ্রাতৃত্বমূলক সহানুভূতি জানাইবার জন্য ঐদিন 'স্বাধীনতা'র অফিস বন্ধ রাখা স্থির হয়।' (স্বাধীনতা, ১৫. ৮. ৪৬)

অনুরূপ দূরদৃষ্টির পরিচয় দেন হুগলি জেলা কংগ্রেস।

হুগলী জেলা কংগ্রেস কর্তৃক ১৬ই আগস্ট ধর্ম্মঘটের নির্দেশ

'হুগলী জেলা কংগ্রেস কমিটির পক্ষ হইতে একটি আবেদনে শ্রমিকদিগকে অনুরোধ করা হইয়াছে, '১৬ই আগস্ট সমস্ত কলকারখানা বন্ধ রাখিয়া সর্ব্ব-সম্প্রদায়ের শ্রমিকরা নিজেদের মধ্যে সংহতি আনিবার চেষ্টা করিবেন।'

মুদ্রিত আবেদনটি অতুল্য ঘোষের নামে প্রচারিত। তাতে বলা হয়েছে, 'পাকিস্তানের দাবীর সঙ্গে কংগ্রেসের সম্পর্ক নাই কিন্তু ১৬ই আগস্টকে উপলক্ষ্য করিয়া মুসলমান ও হিন্দু মজুর ভাইদের মধ্যে ভেদ আনিবার অপচেষ্টা নিবারণ করা কর্তব্য। তাই সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়া জেলা কংগ্রেস কমিটি সকল শ্রমিকদের জন্য হরতাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন।'
(স্বাধীনতা, ১৫. ৮. ৪৬)

কিন্তু তার বিপরীত আচরণ করলেন প্রাদেশিক কংগ্রেস সভাপতি সুরেন্দ্র-মোহন ঘোষ। ১৬ই আগস্ট ছুটি ঘোষণার প্রতিবাদে ১৫ই আগস্ট কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দেশপ্রিয় পার্কে এক জনসভা ডাকা হয়। সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ সেই সভার সভাপতি। আইনসভার কংগ্রেস দলের নেতা সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, কংগ্রেস কোন সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বাধাতে চায় না। 'তাই কংগ্রেস কাহাকেও প্ররোচনা দিবে না অথবা কাহারও দ্বারা প্ররোচিত হইবে না।'

মুসলিম লীগের মধ্যেও দুটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া গেল। আবুল হাশিম লিখছেন:

'খাজা নাজিমুদ্দিন ও লাহোরের রাজা গজনফর আলি খান সভায় ভাষণ দেন। খাজা নাজিমুদ্দিন বলেন, 'আমাদের লড়াই কংগ্রেস ও হিন্দুদের বিরুদ্ধে।' মাইক্রোফোন থেকে তাঁকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে, ফোর্ট উইলিয়ম-এর দিকে আঙুল দেখিয়ে আমি ঘোষণা করি যে আমাদের লড়াই ভারতের জনসাধারণের বিরুদ্ধে নয়, ফোর্ট উইলিয়ম-এর বিরুদ্ধে। আমরা যখন মঞ্চে আছি তখন সবদিক থেকে খবর এল যে কলকাতার প্রত্যেক মহল্লায় ভয়ংকর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়ে গেছে।' (ইন রেট্রস্পেক্ট্, পৃ ১১৭)

অজয় দাশগুপ্ত বলেছেন, 'আলিপুরের সদর মুসলিম লীগের সেক্রেটারি ১৬ই আগস্ট যে বক্তৃতা করেন—সেটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন—আজ ডেলিভারান্স-ডে (মুক্তির দিন)। কিন্তু ডেলিভারান্স কার কবজা থেকে? ডেলিভারান্স চাই অ্যান্ডরু ইউল ও বার্মা শেলের কবজা থেকে: সেজন্যে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য চাই।'

কিন্তু এসব সত্ত্বেও লীগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' অর্থাৎ ১৬ই আগস্ট ১৯৪৬ ভ্রাতৃঘাতী দিবসে পরিণত হল। জনাব আবুল হাশিম স্বীকার করেন: ঐদিন সরকারিভাবে ছুটি দেওয়া ঠিক হয়নি। তিনি লিখছেন:

'মিস্টার সুহরাবর্দী ১৬ই আগস্টকে সর্বাত্মক ছুটির দিন ঘোষণা করলেন। তিনি বিরাট ভুল করেছিলেন। শান্তিপ্রিয় হিন্দু ও মুসলমানদের এই দাঙ্গার সঙ্গে কোন, বা প্রায় কোন, সম্পর্কই ছিল না। এই দাঙ্গা যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদের প্ররোচকরাই সংগঠিত করেছিল তার পুরো সমর্থন পাওয়া গেল সেই ভয়ানক প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের পরের ঘটনাবলি থেকে। ১৬ই থেকে ২০শে আগস্ট পর্যন্ত দাঙ্গা পুরোদমে চলল।' (ঐ, পৃ ১১৭)

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্পর্কে লীগের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব কিন্তু হাশিম সাহেব অস্বীকার করেন। তিনি লিখছেন, এই অভূতপূর্ব হিংস্রতার কোন খবর তাঁরা আগে টের পাননি। ১৬ই আগস্ট সকাল থেকে দাঙ্গা শুরু হল, বিকেলেও তা চলল। অক্টোরলনি মনুমেন্টের (বর্তমানে শহীদ মিনার) তলায় তাঁরা তখন সভা করছেন। মুসলিমরা নিরস্ত্র, পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে অ-প্রস্তুত। তিনি বলেছেন, 'আমি আমার ছেলেদের আর ফরিদ-পুরের লাল মিঞা তার ছ-সাত বছরের নাতিকে নিয়ে ময়দানে গিয়েছিলাম। আমরা যদি কোন বিপদের আঁচ পেতাম, তবে আমাদের ছেলে আর নাতিদের ময়দানে নিয়ে যেতাম না।' (ঐ, পৃ ১১৬)

'২৯শে জুলাই'-এর পর '১৬ই আগস্ট' কী করে সম্ভব হয়? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতারা আজও বিহ্বল। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখছেন:

'আবার ভাবি, কেমন করে যখন '৪৬ সালের ২৯শে জুলাই যে শহর উত্তাল হল গণঅভ্যুত্থানের গরিমায়, সেখানেই তিন সপ্তাহ কাটার আগে ঘটল এমন অমানুষিক সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ যা অকল্পনীয়, যা সবকিছু হিসাবকেই ভেস্তে দিয়েছিল। আমাদের আন্দোলনে নিশ্চয়ই আছে এমন কিছু দুর্বলতা যা এই গোড়ার গলদকে আজও পর্যন্ত কেটে বার করে দিতে পারেনি।' (তরী হতে তীর, পৃ ৪০৪)

'. নইলে '৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট অমন অপ্রস্তুতভাবে কেন আমাদের দেখতে হল তিনদিনব্যাপী দানবীয় তান্ডব, কেন মাঝে মাঝে শান্তি মিছিলের করুণ উপস্থিতি ছাড়া প্রবল হস্তক্ষেপের উপায় খুঁজে পাইনি?' (ঐ, পৃ ৪০৫-৪০৬)

ভ্রাতৃঘাতী গৃহযুদ্ধ নিবারণের জন্য কমিউনিস্ট পার্টির সর্বশেষ ও নিষ্ফল প্রয়াসের নিদর্শন—'স্বাধীনতা'র সম্পাদকীয় নিবন্ধ :

আজ ১৬ই আগস্ট

'…মনে রাখিতে হইবে যে লীগের কোনো কোনো নেতা বলিয়াছেন, এ সংগ্রাম কংগ্রেসেরও বিরুদ্ধে ! যে লীগপন্থী জনসাধারণ কংগ্রেসী ভাইয়ের সঙ্গে ঝাণ্ডায় ঝাণ্ডা মিলাইয়া রসিদ আলি দিবস ও নৌবিদ্রোহে লড়িয়াছেন, কংগ্রেস ও লীগ একসঙ্গে লড়িলেই বৃটিশকে হারানো যায় তাহা দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় শিখিয়াছেন—সেই মুসলিম জনসাধারণ নেতাদের এই কথায় সায় দিবেন না তাহা আমরা জানি, কিন্তু ১৬ই আগস্টের উত্তেজনার মধ্যে যদি তাঁহারা জোর করিয়া কংগ্রেসী ভাইকে হরতালে নামাইতে যান, কংগ্রেস-বিরোধী উত্তেজনায় অংশগ্রহণ করেন তবে ১৬ই আগস্টের সমস্ত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যাইবে, বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামের বদলে বৃটিশই আসিয়া হিন্দু ও মুসলিম উভয়কে শাসাইবে। ১৬ই আগস্টে একথা যেন তাঁহারা কিছুতেই না ভোলেন।

ঐদিন হিন্দু জনসাধারণের কাছে আমরা আবেদন করি : লীগের নেতারা যা কিছুই বলুন না কেন, মুসলিম জনগণের বৃটিশ-বিরোধী উন্মাদনা আপনারা চোখের সম্মুখে দেখিতে পাইতেছেন। আজ তাঁহাদের অন্তরের আবেগকে সমর্থন করিয়া স্বাধীনতা সংগ্রামকে আরও শক্তিশালী করিবেন, না নেতাদের ভেদনীতির দিকে তাঁহাদিগকে ঠেলিয়া দিয়া নেতাদেরই উদ্দেশ্য সাধন করিবেন ? আমরা বিশ্বাস করি যে কোন স্বাধীনতাকামী হিন্দুই এই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী উচ্ছ্বাসকে গৃহযুদ্ধে পরিণত হইতে দিতে চান না। তাই আমরা আবেদন করি : উত্তেজনার বশে সেদিন যদি কোন মুসলমান জবরদস্তি করিয়া বসেন, তবে ভাইয়ের ভুল ভাবিয়া উহা হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন, পরস্পর-বন্ধুত্ব ও সমর্থনের সাহায্যে সকল মলিনতা কাটাইয়া তাঁহাদের বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনকে প্রকৃত লক্ষ্যস্থলে পৌঁছাইয়া দিবেন।' (স্বাধীনতা, ১৬. ৮. ৪৬)

সরোজ মুখোপাধ্যায় লিখছেন :

'কিন্তু বিপরীত ঘটনা ঘটতে শুরু করলো ১৬ই আগস্ট ভোর রাত থেকে। সেই মর্মান্তিক ভ্রাতৃঘাতী ঘটনাবলী বিবৃত করার ভাষা কারোর সেদিন ছিল না। হৃদয় বিদারক দৃশ্য, সকাল থেকে সমস্ত বড় রাস্তার ধারে ধারে সারি সারি মৃতদেহ। হিন্দু সংখ্যাধিক এলাকায় শত শত হিন্দু নরনারীর মৃতদেহ, আর মুসলিম সংখ্যাধিক এলাকায় শত শত মুসলমান নরনারীর মৃতদেহ। শ্রমিক এলাকাগুলিও বাদ নেই। শুধু ইংরেজ সাহেবরা স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কেউ তাদের গায়ে হাত দিচ্ছে না। লালঝাণ্ডা হাতে কমিউনিস্টরা এলাকায় এলাকায় বেরিয়ে পড়ে—কিন্তু জঘন্য নৃশংস হত্যাকাণ্ড চলিতেই থাকে। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের

ধারে হিন্দু-মুসলমান ভাইদের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই চলে। একদল মুসলিম যুবক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বাড়ি আক্রমণ করে। কমিউনিস্ট নেতা মনসুর হবিব মুসলিম জনতাকে সাহসের সঙ্গে এই আক্রমণ বন্ধ করতে, এই ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষ থেকে বিরত থাকতে আবেদন জানান। তারা সাময়িকভাবে নিরস্ত হলেও অলিতে গলিতে প্রবেশ করে হত্যালীলা চালাতে থাকে।' (ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা, পৃ ৪০২-৪০৩)

ঐদিন যা ঘটল তা অবিশ্বাস্য ও অভাবনীয়। এবং তা কমিউনিস্ট পার্টির চোখের সামনেই ঘটল। কমিউনিস্টরা শুধু সময়ের সাক্ষী—তাঁরা রেখে গেলেন সময়ের দলিল।

সোমনাথ লাহিড়ী বলছেন, 'সেদিন মুসলমানরা আসলে চেয়েছিল হরতাল করতে—দোকানপাট বন্ধ করতে। হিন্দুরা যদি মারামারিতে সক্রিয় ভূমিকা না নিত—তাহলে বিক্ষিপ্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে দিনটা পার হয়ে যেত। কিন্তু দেখা গেল—শিয়ালদহ থেকে যে শোভাযাত্রা আসছিল ওয়েলিংটন পর্যন্ত—সেই শোভাযাত্রার উপর হিন্দুরা বেধড়ক ইঁট মারে। রাস্তার দুধারে বাড়ির ছাদে ইঁট জড়ো করেছিল হিন্দুরা। মুসলমানরা বদলা নেয় ওয়েলিংটনের পর থেকে। দোকানপাট ভাঙচুর করে—লুটপাট করে।'

তারপর কলকাতার যে চেহারা দাঁড়াল—তা সকলের অচেনা এবং কল্পনার বাইরে। সেই অচেনা শহরের দৃশ্যপট মূর্ত হয়ে ওঠে 'স্বাধীনতা'র সংবাদ দাতার বিশ্বস্ত প্রতিবেদনে। তিনি লিখছেন :

'...১৬ই আগস্ট এগিয়ে আসার সংগে সংগেই বিপজ্জনক সম্ভাবনার ইঙ্গিত আসতে থাকে। সরকার থেকে ১৬ই আগস্ট ছুটী ঘোষণা করার সংগে সংগে অনেক মুসলমান ছাত্র আমাদের জানান যে লীগ নেতারা 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' শেষ পর্যন্ত বৃটিশ বিরোধী হতে দেবেন না। লাইটহাউসে সেনা-বাহিনীর এক গোপন বৈঠকের খবরে জানা গেল যে তাঁরা ১৬ই আগস্ট হাঙ্গামা হবে বলে মনে করেন। ১৬ই আগস্টকে সামনে রেখে কংগ্রেস কর্তৃক একক মধ্যকালীন সরকার গঠনের জন্য বড়লাটের দ্রুত তদ্বির এবং ঘোষণা নেহাৎ আকস্মিক বা কাকতালীয় নয়—এতে আবহাওয়া বিষাক্ত করার অনুকূল অবস্থা তৈরী হয়। ১৫ই তারিখে বিভিন্ন বস্তি থেকে মুখে মুখে শোনা গেল যে কয়েকজন লীগ নেতা বিভিন্ন বস্তির সর্দারদের বৈঠক করে হরতাল সফল করার জন্য খুব প্রেরণা দিয়েছেন। ঐ দিনই দেশপ্রিয় পার্কের কংগ্রেসের সভায় কোন কোন বক্তা খুব উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা করেন। ১৫ই রাত্রে খবর আসে যে একটি হিন্দু সংগঠনের কর্ম্মীরা হিন্দুদের দোকান খোলা রাখার জন্য জোর প্রচার চালাচ্ছেন।

১৬ই আগস্ট এসপ্লানেডের মোড়েই এক মুসলিম জনতা আমাদের প্রেস স্কোয়াডের গাড়ী আটক করে। একজন সোজাসুজি গাড়ীর চাকা ফাঁসিয়ে দেবার প্রস্তাব করে। কোনও রকমে জনতাকে বুঝিয়ে গাড়ী বাঁচানো যায়।

[সোমনাথ লাহিড়ী বলেন : আমাদের গাড়িতে তিনখানা ঝান্ডা ঢোকানো ছিল। লীগের ঝান্ডাটা সঙ্গে সঙ্গে বার করে দেখালাম। ছেড়ে দিল।] আমরা লক্ষ্য করি যে, সাহেবদের গাড়ী মোটেই আটক করা হচ্ছে না। ডেকার্স লেনে পার্টি অফিসে ফিরে এসে মানিকতলায় মারপিট ও লুটের খবর পাই। স্থানীয় মুসলমানেরা জোর করে দোকান বন্ধের চেষ্টা করার ফলে গোলমাল সুরু হয়। ১১টা নাগাদ বড়বাজার-চিৎপুর এলাকা থেকে একজন কমরেড খবর নিয়ে এলেন যে, মুসলমান দোকানগুলির উপর হামলা হচ্ছে এবং কয়েকটি বিড়ির দোকান ইতিমধ্যে লুট হয়ে গিয়েছে। ওষুধপত্র ও ডাক্তার নিয়ে গাড়ীতে রেডক্রস এঁটে এবার আমরা বার হলাম। ধর্ম্মতলা স্ট্রীট দিয়ে মৌলালী পর্য্যন্ত পৌঁছে দেখি যে রাস্তায় মুসলিম জনতা বেশ একটু চড়া মেজাজে আছে। গোমেশ লেন, সুরী লেন রাস্তাগুলির মোড়ে হিন্দু জনতা জড়ো হয়েছে। ক্যাম্ববেলে পৌঁছে জানলাম যে অনেক আহত এসেছে—বেশির ভাগ মুসলমান : এখানে শুনলাম রিপণ কলেজের সামনে এবং রাজাবাজারের দিকে খুব দাঙ্গা হয়েছে। একটি লরিতে করে মুসলিম ছাত্র ভলান্টিয়াররা শান্তির আবেদন জানাচ্ছে।

আমাদের গাড়ী বৌবাজার স্ট্রীটের মোড়ে পৌঁছতেই—দেখলাম ইষ্টক বৃষ্টির সামনে একটি মুসলিম জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে পিছোচ্ছে। বৌবাজার স্ট্রীটের মধ্যে এক বিরাট হিন্দু জনতাকে উত্তেজিত ভাবে ইট ছুঁড়তে দেখলাম। এইখানেই আমরা গৃহযুদ্ধের চেহারা প্রথম দেখি।

সার্কুলার রোড দিয়ে এগোন ক্রমেই মুশকিল হতে লাগল—উত্তেজিত মুসলিম জনতার জটলা। তাদের অনেকের হাতে লাঠি। রেডক্রসের পতাকা আমাদের বাঁচিয়ে দিল। মীর্জাপুর স্ট্রীট থেকে দুজন আহত মুসলমানকে নিয়ে আমরা মেডিকেল কলেজ যাই। সেখানে তখন চারদিক থেকে আহতদের আনা হচ্ছে।

এবার কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ধরে চললাম। কলেজ স্কোয়ারে কয়েকজন বন্দুকধারী পুলিশ দাঁড়িয়ে। হ্যারিসন রোড দিয়ে একটি মুসলিম জনতা পশ্চিমদিকে চলে যাচ্ছে। একটি পুলিশ ভ্যান আমাদের হাত পঞ্চাশেক আগে যাচ্ছিল। মেছুয়াবাজারের মোড়ে একটি মুসলিম জনতা মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে পথের উপর দাঁড়িয়েছিল। পুলিশ ভ্যান সেখানে থামল—কিন্তু জনতাকে কিছু বলল না। হেদুয়া পর্য্যন্ত গিয়ে পুলিশ ভ্যান ফিরে এল। অথচ তখন হেদুয়ার পর থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত বহু জায়গায় আগুন জ্বলছিল।

গাড়ী ফিরিয়ে চিত্তরঞ্জন এভেনিউতে এলাম। রাস্তায় দুজন আহত হিন্দু পেলাম। তাদের মেয়ো হাসপাতালে পেঁছে দিয়ে স্ট্রান্ড রোড ধরে ফিরলাম। হাওড়া ব্রিজ ছাড়িয়ে হ্যারিসন রোডের ভিতর তখন দাঙ্গার প্রস্তুতি চলছে—হুগলী ও হাওড়া থেকে যেসব মিছিল কলকাতায় আসবে, তারা এখানে আক্রান্ত হবে।

পার্টি অফিসে ফিরেই আমরা—হাওড়া ব্রিজের ওপার থেকেই মিছিল গুলোকে ফিরিয়ে দিতে না পারলে যে ভয়ানক অবস্থা হবে তা লীগ অফিসে ফোনে জানালাম। আমাদের জবাবে লীগ অফিসের লোকেরা নিজেদের অসহায়তার কথা জানালেন।

·· তিনটার সময় আবার আমরা বেরোলাম। তখন ধর্ম্মতলা দিয়ে ভীড় করে লোক ময়দানে চলেছে। প্রায় সকলের হাতেই লাঠি। অনেকের হাতেই লোহার ডাণ্ডা—বোধ হয় পুরানো লোহার দোকান থেকে লুট করা—ছোরাও কিছু কিছু দেখলাম। কমরেড মনসুর হবিব এবং কয়েকজন লীগ কর্ম্মী জনতাকে শান্ত করার চেষ্টা করছিলেন। ছোরায় আহত একজন মুসলমান ছাত্রকে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ধারে ফুটপাত থেকে আমরা তুললাম।

এইবার সার্কুলার রোড দিয়ে এগোন দুর্ঘট। লাঠি হাতে মুসলিম মিছিল আসছে—আর গলির মোড়ে মোড়ে ছাদ থেকে তাদের উপর ইষ্টক বৃষ্টি হচ্ছে। তারাও দোকান লুট করা সুরু করেছে। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পর থেকে লুণ্ঠিত দোকান নজরে পড়ল। কমলালয়ের সামনে দমকল তখন আগুন নেভাচ্ছে এবং খোলা পুলিশ ভ্যানের উপর পড়ে রয়েছে দুটো মৃতদেহ। আর একটু গিয়ে দেখলুম, যে উত্তেজিত জনতা ময়দানের দিক থেকে এগিয়ে আসছে—তাদের হাতে মারাত্মক অস্ত্র। সমবেত জনতা বক্তৃতা শুনতে চায়নি। তারা তখন গৃহযুদ্ধের নেশায় এবং নিজেদের মহল্লা রক্ষা করার জন্য অধীর। ভবানীপুরে মুসলিম মিছিলের উপর নৃশংস আক্রমণের সংবাদ তাদের খুব উত্তেজিত করেছিল। নেতাদের মধ্যে কেউ কেউ মামুলী-ভাবে শান্তির আবেদন করলেও—তাঁদের বক্তৃতায় গৃহযুদ্ধের রাজনীতিই ফুটে উঠেছিল। ময়দান প্রত্যাগত জনতা তাদের ফিরতি পথে গৃহযুদ্ধকে ছড়িয়ে দিল। বহু এলাকায় হিন্দু জনতা আক্রমণ ও প্রতিশোধের জন্য ইতিমধ্যেই প্রস্তুত হয়েছিল।

বড় নেতারা—কংগ্রেসের ধীরেন মুখার্জী, সোহরাবর্দ্দী ও ভূপেশ গুপ্ত—সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোডের মোড়ে গোলমাল হচ্ছে শুনে সেইদিকে যান। সেখানে গিয়ে জানা যায় যে রাজাবাজারের দিকে হাঙ্গামার অবস্থা জটিল। রাজাবাজারের পথে তাঁরা বৌবাজারের মোড়ে আটক হন। সেখানে তখন হিন্দু মুসলমান—দুই তরফের রীতিমতো লড়াইয়ের ক্যাম্প দাঁড়িয়ে গিয়েছে। নেতাদের গাড়ী দুই যুধ্যমান বাহিনীর মাঝখানে থামে। সোহরাবর্দ্দী মুসলমান জনতাকে কিছু বুঝিয়ে হিন্দু জনতার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করতেই দেখা গেল যে হিন্দুরা তাঁর কোন কথা শুনতে প্রস্তুত নয়। উপরন্তু তাদের মধ্যে আক্রমণের মনোভাব খুব বেশি। একটি লাঠির আঘাতে গাড়ীর উইন্ড স্ক্রীন ফেটে যায়। সোহরাবর্দ্দীর গালে একটা ইঁটও এসে লাগে। তখন ভূপেশ গুপ্ত ও ধীরেন বাবু হিন্দু জনতার মধ্যে গিয়ে বুঝাতে থাকেন এবং সোহরাবর্দ্দীকে মুসলমান এলাকায় যেতে বলা হয়। মিলিত শান্তি স্কোয়াডের কাজ এখানেই শেষ হয়। বহুদিনের ইন্ধন দেওয়া

গৃহযুদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠবার পর তাকে খুশীমতো নেভাবার ক্ষমতা নেতাদের থাকে না।' (স্বাধীনতা, ২. ৯. ১৯৪৬)

সেদিন বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার বিষে বিষিয়ে ওঠে কলকাতার বাতাস। আদিম হিংস্রতা নিয়ে হানাহানিতে মেতে ওঠে মহল্লার পর মহল্লা। কলকাতার একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত—গৃহযুদ্ধ দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা—বিক্ষত কয়েকটি মহল্লার খণ্ডচিত্র

মানিকতলা

১৬ই আগস্ট, সকাল থেকেই শুরু হয় হিন্দু দোকান বন্ধ করার জবরদস্তি। এক অবস্থাপন্ন হিন্দু মিঠাইওয়ালা বাধা দেয়। তারপর জোর করে দোকান বন্ধ করা এবং লুটপাট শুরু হয়: কালোয়াররা কতকটা সংঘবদ্ধভাবে বাধা দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের তরফ থেকে ব্যাপক আক্রমণ হানা হয়। মানিকতলা ব্রিজের উপরকার মুসলমানরা বারবার ব্রিজের নীচে দক্ষিণ দিকের হিন্দু এলাকা আক্রমণ করে। রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীট ও ওয়ার্ড' ইনস্টিটিউট স্ট্রীটের হিন্দু বাসিন্দারা বারবার আক্রমণ প্রতিহত করে। কমিউনিস্ট কর্মীরা পাড়ার যুবকদের সহযোগিতায় পাড়া রক্ষা করেন এবং বাগমারীর মুসলমান মহল্লার সঙ্গে যুদ্ধবিরতির মতো অবস্থা বজায় রাখেন। বাগমারীর কয়েকশ' পলাতক ও নিরাশ্রয় হিন্দু নিরাপত্তার খোঁজে এপারের হিন্দু মহল্লায় চলে আসে।

রাজাবাজার

কমরেড ইসমাইল মানিকতলায় দাঙ্গার খবর পেয়েই রাজাবাজারে চলে আসেন; যাতে এখানকার লালঝাণ্ডা শ্রমিকদের প্রভাবে অন্যান্য বাসিন্দাদের সংযত রাখা যায়। বস্তির মোড়লদের বুঝিয়ে তিনি সকলকে শান্ত করার কাজে লাগিয়েও দেন। এদিকে তখন সার্কুলার রোড ধরে পুলিশের খোলা ভ্যানে আহত মুসলমানদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। উদ্দেশ্য দাঙ্গার প্ররোচনা দেওয়া। ইসমাইল এবং স্থানীয় লালঝাণ্ডা শ্রমিক কর্মীদের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁদের কর্ডন ভেঙে জনতা বেলা সাড়ে এগারটার সময় মানিকতলার দিকে এগিয়ে যায়। সায়েন্স কলেজের কাছে এই জনতার উপর ইঁট পড়তে থাকায় তারা আবার হটে আসে। মোড়লরা এবার নিজেদের অসহায় বলে জানায়।

ঘটনাস্থলে ছিলেন শৈলেন মুখার্জি। তিনি বলেন, 'রাজাবাজারে ঐদিন ইসমাইল আর দিলীপ ভাদুড়ীর সঙ্গে স্কোয়াড করতে গিয়ে তিনদিন বাড়ি ফিরতে পারিনি। রাজাবাজারের বস্তির ছেলেরা হল্লা করতে করতে বাইরে বেরুচ্ছিল। মুরুব্বিরা কিছুতেই তাদের সামলাতে পারছিল না। হঠাৎ 'মার ডালা—মার ডালা' চীৎকার। দেখা গেল, পুলিশের খোলা গাড়িতে আহত

মানুষদের রক্তাপ্লুত অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। হচ্ছে কী চারধারে? সত্যিই কি রায়ট আরম্ভ হয়ে গেছে! সায়েন্স কলেজ পর্যন্ত এসে ইসমাইল ও মুসলমান মজুরিরা থমকে দাঁড়াল। তাদের চোখের সামনে তখন গড়-পারের কাছাকাছি জায়গায় খণ্ডযুদ্ধের দৃশ্য।'

ট্যাংরা

জগৎ বোস বলছেন, '১৯৪৬-এর ১৬ই আগস্ট মুসলিম লীগের ভলান্টিয়াররা পিকেট করতে এলে শ্রমিকরা কাজে যায়নি। স্থানীয় ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ গাঙ্গুলীর বাড়ি যখন আক্রান্ত হয়—আলি মহম্মদের নেতৃত্বে অনেক মুসলমান শ্রমিক তাঁর বাড়ি বাঁচাবার চেষ্টা করে এবং বাড়ি রক্ষা পায়। স্থানীয় শ্রমিকরা রায়টে অংশ গ্রহণ করেনি বটে কিন্তু বহিরাগতরা এসে রায়ট বাধায়।

টালিগঞ্জ

টালিগঞ্জের একটি অঞ্চলকে বাইরের দাঙ্গাকারীদের হাত থেকে মিলিত প্রতিরোধের মাধ্যমে বাঁচানো সম্ভব হয়। পশ্চিমে ট্রাম লাইন—উত্তরে রেল লাইন—দক্ষিণে টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপো এবং পূর্বে লেডি ওয়েলিংডন রোড (যাদবপুরের রাস্তা)—এই এলাকায় প্রায় ছ' হাজার হিন্দু-মুসলমানের বাস। সবসুদ্ধ এগার বার বাইরের আক্রমণ প্রতিরোধ করে এখানে শান্তি বজায় রাখা হয়।

খিদিরপুর

ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, জলি কাউল, জুড়ান গাঙ্গুলী, সুজাত আলি মজুমদার, মাখন চ্যাটার্জি, অমূল্য চক্রবর্তী, জাহাজী ইউনিয়নের নেতা ফয়েজ আমেদ, সোনা মিঞা, কংগ্রেস নেতা রাসবিহারী মুখার্জি ও চন্দ্রশেখর আঢ্য মিলিতভাবে শান্তি স্কোয়াড সংগঠিত করেন। কিন্তু তাঁরা পরিস্থিতি সামাল দিতে পারেননি।

পার্কসার্কাস

গৃহযুদ্ধের দাবানলের মধ্যে কমরেড মারুফ হোসেনের উদ্যোগে মহল্লার হিন্দু-মুসলমান ও শিখেরা শেষ পর্যন্ত ভ্রাতৃভাব বজায় রাখেন। দিলখুসা স্টীট ও ঝাউতলা রোড মেসের ট্রাম শ্রমিক ও পার্কসার্কাস এলাকার মহম্মদ হানিফ, হাসান আলি চৌধুরী, বিক্রমপুরী সাহেব প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের চেষ্টায় অনেক হিন্দু পরিবার রক্ষা পান। অবশ্য সমগ্র পার্ক-সার্কাস এলাকার নারকীয় কাণ্ডের তুলনায় যা রক্ষা পেয়েছে—তা একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র।

মৌলালী—তালতলা

কমরেড সামসুল হুদা কংগ্রেস অফিস বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধ জনতাকে সামলাতে থাকেন। তাঁর পাশে এসে দাঁড়ান কয়েকজন লীগ-স্বেচ্ছাসেবক।

১৮ই আগস্ট সকাল দশটায় নবাববাগান ও কর্পোরেশন স্ট্রীট এলাকার হিন্দু এবং সার্কুলার রোড ও কর্পোরেশন স্ট্রীটের মোড়ের মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধবিরতি হয়।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীরা ব্যর্থ। দক্ষিণ কলকাতায় কংগ্রেস নেত্রী বীণা দাস ও লীলা রায় উত্তেজিত হিন্দু জনতাকে সামলাতে পারেননি। তাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করেও দক্ষিণ কলকাতা কংগ্রেস অফিসের পবিত্রতা রক্ষা করতে পারেননি। কংগ্রেস অফিসে আশ্রিত মুসলমান-দের রক্ষা করা গেল না।

শোভাবাজার

নৃশংসতা ও নির্মমতার আর একটি কেন্দ্র শোভাবাজার। এই এলাকার দাঙ্গা ও হত্যাকাণ্ড চরম নৃশংসতার রূপ নেয়। শোভাবাজারে কংগ্রেসী মুসলমান পর্যন্ত রেহাই পাননি। বাজারের বহুদিনের পুরানো ফলবিক্রেতা কংগ্রেসী পাঠান মুসলমানের দোকান লুট হয় এবং ফলওয়ালাকে প্রচণ্ড মারধর করা হয়। স্থানীয় কমিউনিস্ট কর্মীরা ছাড়াও বহু সাধারণ লোক মুসলমানদের আশ্রয় দিয়েছেন। এখান থেকে প্রায় দেড়শ' জন বিপন্ন মুসলমানকে উদ্ধার করা হয়।

সেন্ট্রাল এভেনিউ—হ্যারিসন রোড জংশন এলাকায় পাঞ্জাবী মুসলমানদের সহায়তায় বহু হিন্দু ধনী পরিবার রক্ষা পান। তাছাড়া গুণ্ডাদের টাকা দিয়েও বাঁচেন অনেকে।

সেদিন দাঙ্গার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার দৃষ্টান্তও রয়েছে। দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের অন্যতম নিদর্শন টাওয়ার লজ-এর ঘটনা।

মীর্জাপুর স্ট্রীট ও সার্কুলার রোডের মোড়ের বোর্ডিং হাউসটির নাম টাওয়ার লজ। এখানে আটজন মুসলমান ও চল্লিশজন হিন্দু বোর্ডার। এটা পুরোপুরি মুসলমান এলাকা। বিবেকানন্দ রোডের ছাত্রী নিবাসের মুসলিম ছাত্রীদের ধর্ষণ করা হয়েছে—এই গুজব ছড়াবার ফলে এখানে ভয়ংকর অবস্থা সৃষ্টি হয়। (সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এই গুজব। কারণ, আবুল হাশিম সাহেব বিবেকানন্দ রোডের মুসলিম ছাত্রী হোস্টেল থেকে ছাত্রীদের এনে নিজের ৩৭ নং রিপন স্ট্রীটের বাড়িতে রাখেন এবং পরের দিনই সংবাদপত্রের মাধ্যমে এই সংবাদ সংশ্লিষ্ট অভিভাবকদের গোচরে আনেন)।

১৬ই আগস্ট সন্ধ্যায় টাওয়ার লজ আক্রান্ত হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যা-লয়ের ছাত্র ও রসিদ আলি দিবস - আন্দোলনের অন্যতম নেতা কমরেড সালে আহমদ হিন্দু বোর্ডারদের বাঁচাবার জন্যে বাইরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করিয়ে দরজার বাইরে দাঙ্গাকারীদের রুখে দাঁড়ান। সালের মাথা লক্ষ্য করে একজন শাবল ছোঁড়ে। মাথা সরিয়ে নিয়ে কমরেড সালে মাথা বাঁচান—কিন্তু শাবলের আঘাতে দরজা ভেঙে যায়। তখন সালে জামা ছিঁড়ে ফেলে খোলা বুক পেতে জনতাকে বলেন: 'প্রথমে আমাকে ছুরি মেরে তারপর

তোমরা ভেতরে যাও।' সালের রুম-মেট ইনকাম ট্যাক্স অফিসের কর্মচারী মহম্মদ এবং আর একজন মুসলিম বোর্ডার মতীন এগিয়ে এসে সালের পাশে দাঁড়ান। মুসলিম জনতা ফিরে যায়। পরে হিন্দু বোর্ডারদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেওয়া হয়।

পঁচিশ

১৭ই আগস্ট প্রচারিত হয় শান্তিরক্ষার জন্যে সব দলের নেতাদের আবেদন :

ভাইসব,

ভাই-ভাইয়ের মধ্যে এই যুদ্ধ অবিলম্বে থামাইবার জন্য আমরা আপনাদের নিকট আবেদন জানাইতেছি। যাহা ঘটিয়াছে তাহা অত্যন্ত হৃদয়-বিদারক। আসুন, আমরা এই কাহিনী ভুলিয়া যাই। কে দোষী আর কে নির্দোষ সেই তর্ক করিতে থাকিলে আরও জীবন ও আরও ধন-সম্পত্তি নষ্ট হইবে। যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়াছে—এখানেই তাহার শেষ হউক। এই মারামারি এখন যেমন করিয়া হউক বন্ধ করিতেই হইবে।

প্রত্যেক ভাইকে আমাদের অনুরোধ, আপনারা আমাদের পরামর্শ শুনুন। শীঘ্রই মিলিটারী বসিবে। সাঁঝবাতি আইন জারী করা হইয়াছে, অমান্য করিলে গুলি খাইবার সম্ভাবনা।

১৪৪ ধারা জারী হইয়াছে। লাঠি বা অস্ত্র লইয়া চলাফেরা করিলে জীবন বিপন্ন বা গ্রেপ্তার হইবার আশংকা।

আপনারা যে যাঁহার মহল্লায় থাকুন, অপরের মহল্লায় বা পাড়ায় অনধিকার প্রবেশ করিবেন না। সমস্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি লইয়া মহল্লা শান্তিরক্ষা-বাহিনী গঠন করুন এবং সম্মিলিত ভাবে শান্তি রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করুন।

নিবেদক

স্বাঃ

শরৎচন্দ্র বসু	এইচ. এস. সোহরাবর্দী
খাজা নাজিমুদ্দিন	সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ
দেবীপ্রসাদ খৈতান	কিরণশঙ্কর রায়
ভূপেশ গুপ্ত	মোহম্মদ আকরাম খাঁ
নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার	মোহর সিং গিয়ানী
পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী	সামসুদ্দীন আহমেদ
আবুল হাশিম	ভবানী সেন
খাজা নুরুদ্দীন	হামিদুল হক চৌধুরী

কলিকাতা ১৭ই আগস্ট ১৯৪৬

লক্ষণীয় যে নেতারা মানুষের শুভবুদ্ধির কাছে আবেদন না জানিয়ে, নিছক ভয় দেখিয়ে দাঙ্গাকারীদের নিরস্ত করার চেষ্টা করেছেন। সেদিনের পরিস্থিতিতে তাই বোধহয় বাস্তবসম্মত।

১৮ই আগস্ট কমিউনিস্ট পার্টি'র পক্ষ থেকে 'স্বাধীনতা'র সম্পাদকীয় স্তম্ভে ভ্রাতৃহত্যা বন্ধ করার ডাক দেওয়া হয়:

ভ্রাতৃহত্যা বন্ধ কর!

'ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই এখনই বন্ধ করুন। শরৎবাবু ও সোহ্‌রাবর্দী সাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া সকল দলের নেতাই আপনাদের কাছে আবেদন করিয়াছেন। সে আবেদন সফল করিয়া নিজ নিজ দলের সম্মান বাঁচান। বিরোধ মীমাংসার ভার নেতারা লইতেছেন। সে ভার তাঁহাদের হাতে ছাড়িয়া দিয়া আসুন আমরা সকলে একত্রে আবার আমাদের সেই পুরানো কলিকাতা, হিন্দু-মুসলমানের কলিকাতা, বৃটিশ আধিপত্যের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ কলিকাতা ফিরাইয়া আনি।'

কমিউনিস্ট কর্মীদের প্রতি পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্যে আহ্বান জানান প্রাদেশিক পার্টি সম্পাদক ভবানী সেন:

কমিউনিস্ট কর্মীদের প্রতি

(ক) আত্মঘাতী গৃহযুদ্ধ হইতে কলিকাতার উন্মত্ত নাগরিকদের ফিরান। কংগ্রেস-লীগ-কমিউনিস্ট নেতারা পাড়া ও মহল্লায় সকল সম্প্রদায়ের সহিত একত্রে শান্তিবাহিনী গঠন করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। ঐ নির্দেশ অনুসারে কাজ করুন।

(খ) নিজ নিজ পাড়া ও মহল্লাকে সকলে একত্র হইয়া রক্ষা করুন, বাহিরের কোন উত্তেজনা বা প্ররোচনায় নিজের পাড়া বা মহল্লার শান্তি ভঙ্গ হইতে দিবেন না।

(গ) প্রত্যেকে নিজ নিজ পাড়ার আহতদের সেবার ভার লউন, নিরাশ্রয়দের আশ্রয় দিন, নিঃস্বদের সাহায্য করুন, উপবাসীকে খাদ্য দিবার চেষ্টা করুন।

(ঘ) যেখানে যে ঘটনা ঘটিতেছে, তাহা তৎক্ষণাৎ 'স্বাধীনতা' অফিসে জানাইবার চেষ্টা করুন। গুজব ও আতঙ্কের বিরুদ্ধে প্রচার করুন। শহরে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনিবার পক্ষে ইহা ছাড়া উপায় নাই।

—ভবানী সেন

১৮. ৮. ৪৬ সম্পাদক, বাংলা কমিটি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

(স্বাধীনতা, ২০. ৮. ৪৬)

যা ঘটে গেল—তার জন্যে পার্টি'র কেউ তৈরি ছিলেন না। ঘটনার ভয়াবহতা ও ব্যাপকতা সম্বন্ধে আগে থেকে কেউ আঁচ করতে পারেননি।

না কোন নেতা—না কোন কর্মী। সবাই ছিলেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে—কেউ বা ছিলেন মুসলমান মহল্লায় সাম্প্রদায়িক শান্তি প্রচারে ব্যস্ত।

রণেন সেন বলছেন, 'আমরা সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিপদ আঁচ করতে পেরেছিলুম—কিন্তু তার গভীরতা অনুধাবন করতে পারিনি।' আবদুল্লাহ রসুল বলছেন, 'রায়ট যেদিন বাধল সেদিন আমি পাটনায়। দুপুরের রেডিওতে শুনলাম, পনেরো জন মারা গেছে—আধঘণ্টা পরেই শুনি দু'শ জন মারা গেছে। কলকাতায় রওনা হয়ে মাঝপথে বর্ধমানে নেমে পড়ি। 'স্বাধীনতা'য় বাইরের কমরেডদের জন্যে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হত—কমরেডরা যেন সোজা ডেকার্স লেনের পি. সি. [প্রাদেশিক কমিটি] অফিসে সরাসরি চলে আসেন। কলকাতায় এসে বেশ কিছুদিন পরও এক অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতা হল। একদিন ভূপেন দত্তের সঙ্গে দেখা করে বিবেকানন্দ রোড ধরে যখন হেঁটে আসছি—তখন নাকি চা-র দোকানে কয়েকজন বলাবলি করছে—মুসলমান যাচ্ছে! মুসলমান যাচ্ছে! এই খবরটা আমি পাই পরে পার্টি অফিসে। গোপাল হালদারের মুখে শুনি. তাঁর ভাই চায়ের দোকানে তখন বসা। তাঁরা আমার জন্যে বেশ উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন।'

তখন বদলা-বদলির পালা চলছে রাস্তায়। ১৬ই আগস্টের পর কলকাতা যে পুরোপুরি সাম্প্রদায়িকতার আবর্তে তলিয়ে গিয়েছে—তখনও রসুল সাহেব জানতেন না। সেদিন পার্টি কমরেডরা সবাই এক বিমূঢ় বিস্ময়ের কবলে। সকলেরই যেন জন্মান্তর ঘটছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন :

১৬ই আগস্ট ১৯৪৬ (শুক্রবার)

আজ হরতাল—direct action day। ক্রমাগত গুজব রটছে—চারিদিকে দারুণ উত্তেজনা। কালীঘাট অঞ্চলে শিখদের সঙ্গে মুসলিমদের ভীষণ সংঘর্ষ হয়েছে শুনলাম। ফাঁড়ির ওদিকে নাকি গোল বেধেছে। মসজিদের সামনে ভিড় দেখে এলাম। পাড়ার ছেলেরা উত্তেজিত হয়ে defence party গড়ছে। কি হচ্ছে বুঝতে না পেরে—ছোঁয়াচ লেগে—নার্ভাস হয়ে পড়লাম। সন্ধ্যার পর ফাঁড়ির দিকে আগুন লেগেছে মনে হল।

১৭ই আগস্ট ১৯৪৬ (শনিবার)

বিকালে এ অঞ্চলে শান্তি-সভা হবে শুনলাম। খুসী হয়ে নিজে বার হলাম—যতটা পারি সাহায্য করতে। যাকে দেখছি তাকে বলছি—মিটমাটের জন্য সভায় যেতে। মসজিদের কাছে আনোয়ার শা রোডের একদল মুসলিম স্বীকার করলেন মিটমাট দরকার—কয়েকজন উত্তেজিতভাবে বললেন মেরে পুড়িয়ে এখন মিটমাটের কথা কেন? অন্যেরা তাঁদের থামালেন। ফাঁড়ি পেরিয়ে পুলের নীচে যেতে এল বিরোধিতা—হিন্দুদের কাছ থেকে। কিসের

মিটমাট—মুসলমানরা এই করেছে, ওই করেছে ! 'ব্যাটা কমিউনিস্ট' বলে আমায় মারে আর কি ! প্রায় দেড়শো লোক মিলে ধরেছিল।' (ডায়েরি)

রাম বসু ১৬ই আগস্ট থেকে পরপর তিনদিন পার্টি অফিসে আটক। আটকদের মধ্যে রয়েছেন নৃপেন চক্রবর্তী, রতনলাল ব্রাহ্মণ, গোপাল আচার্য ও অনান্যরা। পার্টি অফিস থেকে রিলিফ যাচ্ছে অ্যাম্বুলেন্সে করে। শ্রান্ত ক্লান্ত নীতীশ শেঠ সন্ধ্যায় রিলিফের কাজ সেরে ফিরলেন। তাঁর সারা গায়ে রক্ত। রাম বসু যেন দেখতে পাচ্ছেন—'এট্ টু ব্রুটে' (তুমিও ব্রুটাস ! —এরকম বিস্ময়ভরা প্রশ্নের ছাপ দাঙ্গায় নিহতদের চোখে মুখে।

ঐদিন আব্দুল মোমিনের ৭৫নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ-র বাসায় বঙ্কিম মুখার্জি, প্রমোদ দাশগুপ্ত ও নীরদ চক্রবর্তী ঘরবন্দী। তারই কাছাকাছি আর একটা বাড়িতে অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য ও গীতা মুখার্জি রয়েছেন। তাঁরাও পথে বেরুতে পারছেন না। চিত্তরঞ্জন এভিনিউর রাস্তা ধরে হাঁটছেন তখন অজিত রায়—স্বভাবতই তিনি তখনও কিছু আঁচ করতে পারেননি। তাঁকে দেখে প্রমোদ দাশগুপ্ত জানালায় দাঁড়িয়ে অনবরত না-এগোবার জন্যে ইশারা করছেন। সংবিৎ ফিরে পেয়ে অজিত রায় দ্রুত সরে গেলেন। অনেক কসরত করে আব্দুল মোমিন তাঁদের তিনদিন নিরাপদে রাখেন। চতুর্থ দিন স্নেহাংশু আচার্য ও মনসুর হবিব মিলিটারির সাহায্যে তাঁদের উদ্ধার করেন।

স্নেহাংশু আচার্য যখন মিলিটারি পোশাকে রিভলবার হাতে উদ্ধারকার্যে ব্যস্ত—তখন দেখেন চিন্মোহন সেহানবীশ, সুধীর বোস আর ফণী দত্ত—এই তিনজনে এক খোলা সিডানে চড়ে 'হিন্দু মুসলমান এক হও' ধ্বনি দিতে দিতে রাজাবাজারের দিকে যাচ্ছেন। তাঁদের গাড়িতে ছিল কংগ্রেস আর লীগের পতাকা। স্নেহাংশু তাঁদের দেখে বললেন, আপনারা কি পাগল ? আপনারা যে খুন হয়ে যাবেন !

কাশীপুর-বরানগরের পার্টি-সংগঠক চিত্ত মৈত্রও সেদিন এক করুণ অভিজ্ঞতার শরিক। তিনি বলছেন, '১৬ই আগস্ট সকালে বেঙ্গল ইমিউনিটি কারখানার শ্রমিকদের নিয়ে এলাকা পরিক্রমা করি। 'হিন্দু মুসলিম এক হও' স্লোগান দিয়ে আমাদের মিছিল গোটা এলাকায় ঘুরে বেড়ায় ; খুব তৃপ্তি সহকারে মিছিল শেষ করার পর দুপুরে খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। এক বিশ্রী চেঁচামেচিতে আমার ঘুম ভেঙে গেল। শুনলাম আমায় নীচ থেকে কারা যেন ডাকছে। বাড়ি থেকে বেরুতেই কয়েকজন চীৎকার করে উঠল—'তোকে আজ মেরেই ফেলব।' অবাক হয়ে দেখি সকলেই দৌড়াদৌড়ি করছে—সকলের হাতেই লাঠি। বরানগর বাজারের কাছে এলাম—দেখি সবাই লাঠি হাতে 'নেড়ে' খুঁজে বেড়াচ্ছে।

—ওরা ওরকম করছে কেন ?

—কেন করছে জান না তুমি শুয়োরের বাচ্চা ? গিয়ে দেখ-না চীৎপুর ব্রীজের কাছে—কত হিন্দু ওরা মেরে ফেলেছে।

তখন একটাই লজিক। যত মুসলমান এপাড়ায় মারবে—ততই ওপাড়ায় হিন্দুরা বাঁচবে। একজন মুসলমান দোকানদার জোগাড় করে আমরা আটজন হিন্দু মুসলমান ঐক্যের আওয়াজ দিয়ে শান্তি মিছিল বার করলাম। সবাই মারতে আসে—কিন্তু মারে না। শুধু ঠেলা দিয়ে বলে—যান-যান, বাড়ি যান। যান, চীৎপুর খালের কাছে যান—দেখুন গিয়ে কী হয়েছে সেখানে।'

পার্টির কলকাতা জেলার সম্পাদক কুমুদ বিশ্বাস বলছেন, 'দাঙ্গার সময় বুঝেছিলুম রিলিজিয়ন (ধর্ম) কী বস্তু। ভানু জগা মুসলমানের ছিন্ন মুণ্ড এনে দেখাল। তখন দেখেছি সত্তর বছরের বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলছে—যবন নিধন করেছ! বেঁচে থাক। ইসমাইলকে ক্রীক রো-র কমিউন ছাড়তে হল। ধরবাগান সাহেববাগান থেকে বিড়ি ওয়ার্কারদের সরাতে হল। হামিদ বসরতদের আমরা গালাগাল দিতাম—তোমরা বস্তিতে হিন্দু মুসলমান ঐক্যের কথা বল না কেন? তারা চুপ করে থাকত। আসলে তারা যদি ঐসব কথা বস্তিতে বলে—তাহলে তাদের কেটে ফেলবে। ১৬ই আগস্টের আগে বুঝতে পারিনি যে এরকম হবে—কিন্তু সেদিন মুসলমানদের শোভাযাত্রা দেখে বুঝতে পারি—'দে আর লুকিং ফর ট্রাবলস্' (ওরা ঝামেলা চাইছে।) ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মুখে প্রথম দেখি তারা এক মনিহারী দোকান লুট করা শুরু করেছে। জবাকুসুম আর লক্ষ্মীবিলাসের শিশি ভাঙা তেল সব গড়াতে থাকে। লাল রক্তের মতো দেখাচ্ছে। বিজয় সিং নাহারও বেরিয়ে এসে লুটপাট বন্ধ করার চেষ্টা করেন। আমরা যখন বুঝতে পারলাম তখন 'টু লেট', বড্ড দেরি হয়ে গেছে। ১৬ই আগস্ট মুসলমানরা লুটপাট শুরু করে আর হিন্দুরা শুরু করে খুন। ১৭ই থেকে শুরু হয় আম কোতল।'

কিন্তু ঐদিন নানা জায়গায় এই অভিজ্ঞতার ব্যতিক্রমও দেখা গেল। গোপাল আচার্য বলছেন, 'মেছুয়াবাজারে যখন এক মুসলমান গুণ্ডা হরিপদ চ্যাটার্জিকে মাটিতে গেড়ে ফেলে তার বুকে ছুরি বসাতে যাবে—কলাবাগানের একজন বাসিন্দা তাকে লালঝাণ্ডার লোক বলে চিনে ফেলে। মৃত্যুর মুখ থেকে হরিপদ ফিরে আসে। সেই হানাহানির মধ্যে পারস্পরিক ঘৃণা ও বিতৃষ্ণার মনোভাব থেকে কমিউনিস্টরা যে সম্পূর্ণ মুক্ত—কোন কোন ক্ষেত্রে তা অন্যরাও বুঝতে পেরেছিল। বীরেন রায় পার্টির কাজে কলাবাগানে গিয়েছিলেন। পাছে মারা যান, সেজন্যে তারা তাঁকে বাইরে আসতে দেয়নি। এই ভয়ংকর অবস্থার মধ্যেও কলাবাগানের কিছু লালঝাণ্ডার 'ফলোয়ার্স' (অনুসারী) বীরেন রায়কে গার্ড দিয়ে রাখে।'

বীরেন রায় বলছেন, '১৬ই আগস্ট আমার ডিউটি ছিল কলাবাগানে। ফলমন্ডীর যত হোলসেলার ছিল পেশোয়ারী আর ইউ পি-ওয়ালা ও বিহারীরা ছিল হকার। ইয়াকুব আর নিসার—এই দুই ভাই মিলে আমাকে ক্লাবে টেনে নিয়ে গেল—বলল, 'তুমি এখানে বসে থাক। বাইরে থাকলে খুন হয়ে যাবে।' ১৭ই আগস্ট ভোরে 'নো ম্যানস্ ল্যাণ্ড'-এর কাছে এসে লুঙ্গি ছেড়ে ফের ধুতি পরে হিন্দু পাড়ায় ঢুকলাম। আমাকে দেখে হিন্দুরা অবাক।

১৯শে আগস্ট 'রেসকিউ' (উদ্ধার) করতে কলাবাগানে গেলাম। সেখানে মুসলমানরা আমাদের দেখে অবাক। বাইরে তাহলে সভ্য জগৎ বলে কিছু এখনও আছে! তারা কয়েকঘর হিন্দু পরিবারের বৌ আর বাচ্চাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। তাদের আমরা মানিকতলার মোড়ে পৌঁছে দিয়েছি। ১৮ই সন্ধ্যাবেলা মুচিপাড়া থানা থেকে একটা পুলিশের গাড়ি নিয়ে এসে বাবা-মা-কে উদ্ধার করি—তার সংগে পথে একজন হিন্দু ডাক্তারের ঘরে লুকিয়ে থাকা এক মুসলমান পরিবারকেও গাড়িতে তুলে নিই। এই তিনদিনের অভিজ্ঞতা হল—দুপক্ষের নিষ্ঠুরতারও যেমন শেষ নেই—তেমনি 'হিউমেনিটেরিয়ান' (মানবিক) কাজেরও শেষ নেই। তবে এ ক'দিন কমিউনিস্ট পার্টি একদম 'ইনএফেক্‌টিভ' (অকেজো) হয়ে গিয়েছিল।'

সে সময় সমর মুখার্জি কমিউনিস্ট পার্টির হাওড়া জেলা কমিটির সম্পাদক। তিনি বলছেন, 'যদিও আগের দিন মুসলিম এলাকায় প্রচার করি বৈঠক করি—কিন্তু এত বীভৎস দাঙ্গা হবে তা ভাবিনি। মুসলমানদের মধ্যে আমাদের জনপ্রিয়তা ছিল—লীগের প্রচ্ছন্ন সমর্থনও ছিল আমাদের প্রতি। লোকে আমাদের ভুল বুঝত—আমাদের ডাকত মুসলিম লীগের দালাল।

১৬ই আগস্ট দাঁড়িয়ে আছি মল্লিক ফটকের কাছে—ইচ্ছে আছে ময়দানে যাব। খুরুট রোড আর জি. টি. রোডের জংশনে মল্লিক ফটক। মুসলমানদের শোভাযাত্রা যাচ্ছে। এমন সময় রাস্তার ধারে হিন্দুস্থানী বাড়ি থেকে মিছিলের উপর ইঁট পড়তে থাকে। মিছিল থমকে দাঁড়ায়। তারপর মিছিলের লোকেরাও ইঁট ছুঁড়তে থাকে।

এসময় পাশের গলি থেকেও ইঁট পড়তে থাকে মিছিলের উপর। সেখানে রয়েছে সি. আই. ডি. অফিস। এই গলি থেকে যারা মারে তারা হিন্দু মহাসভার লোক। মিছিলের প্রধান অংশ তখন খুরুট রোডে ঢুকে পড়ে। বুঝতে পারছি—পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। কয়েকজন লীগ নেতা আমায় চিনতেন। তাঁদের বোঝাতে লাগলাম, আপনারা মিছিল করে সোজা চলে যান। তাঁদের হস্তক্ষেপের ফলে 'মব' (জনতা) আর খুরুট রোডে ঢোকেনি। কিন্তু ঘোলাডাঙার বেশ্যাপল্লীর দিক থেকে ফের ইঁট আসতে থাকে। তখন একদল মুসলমান যুবক বিক্ষুব্ধ হয়ে হাতিয়ার আনতে দৌড়য়। তাদের একজন আমায় ছোরা মারে—ওয়াটারপ্রুফ কাঁধে থাকার জন্যে বেশি চোট লাগেনি। মুসলিম লীগের নেতারা আমায় সরে যেতে বলে। পার্টি অফিসের দিকে পা বাড়ালাম। ২নং ঈশ্বর দত্ত লেনে জেলা পার্টি অফিস। পথে হিন্দুরা তেড়ে এল—মারু শালাকে—শালা মুসলিম লীগের দালাল। সি. আই. ডি. অফিসের লোকরা উস্কানি দিতে থাকে। পার্টি অফিসে ঢুকি। রায়টের উন্মত্ততা বাড়তে থাকে। সারারাত শুধু চেল্লাচেল্লি শুনতে পাচ্ছি। সামনের দোকানের মুসলিম দর্জি আমাদের অফিসে আশ্রয় নেয়। তাকে রাত তিনটেয় সি. আই. ডি. অফিসে পাঠিয়ে

দিই। সেখানে তার চেনা এক মুসলমান পুলিশ আছে। একজন যুবক মুসলিম কমরেডকে দাঁড়ি কামিয়ে হিন্দু করি।

তার পরদিন সকালে পার্টি অফিস আক্রান্ত হল। হিন্দু মহাসভার লোক আর সাদা পোশাকের সি. আই. ডি. একযোগে দরজা ধাক্কাতে থাকে। তোমরা মুসলমানদের আশ্রয় দিয়েছ। আমি নেমে আসি—আমার সঙ্গে অমল গাঙ্গুলী। তারা আমাদের মারে—মাথা ফাটিয়ে দেয়। একতলায় জনরক্ষা সমিতির চাল-ডাল, কাপড়-চোপড়—এসব ছিল। তারা লুটপাট করে চলে যায়। বলে যায়, ফের আসব আর অফিস পুড়িয়ে দেব। কমরেডরা আমাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে হাসপাতালে পাঠায়। অ্যাম্বুলেন্স করে যাবার সময় পথে গুজব শুনতে পাই—আমি মরেছি। পালের গোদাটা মরেছে।

হাসপাতালে আমার জন্যে একটা খাটিয়া জুটেছিল। বাকি আহতরা সব মেঝেতে গড়াচ্ছে। আহত সবাই মুসলমান। তাদের মুখে ভয়ংকর কাহিনী শুনি। এক বেচারা গ্রাম থেকে এসেছিল কেনাকাটা করতে—সে কিছুই জানে না এসবের। তাকে প্রথমে বেধড়ক মারে। মরে গেছে ভেবে—পা-দুটো দাঁড় বেঁধে বাঁধাঘাটের কাছে জলে ফেলে দেয়। মুসলমান খালাসিরা তাকে জল থেকে তুলে হাসপাতালে পাঠায়।

চারদিকে রটে যায় যে আমি মরে গেছি। কাকাবাবু পর্যন্ত বিশ্বাস করেন সে কথা—সমর কি আর বেঁচে আছে? চার-পাঁচ দিন পর রেড্ এড্ স্কোয়াড এসে হাওড়া জেনারেল হাসপাতালে আমায় খুঁজে বার করে।'

১৬ই আগস্টের ঘটনা পার্টি কমরেডদের মনে এক তীব্র অভিঘাত সৃষ্টি করে। বিস্ময় হতাশা অসহায়তায় তাদের প্রাণ-মন আচ্ছন্ন। অক্ষমতাজনিত মানসিক যন্ত্রণায় তাঁরা দিনরাত ছট্‌ফট্ করেছেন। অনেক কিছুই করা উচিত—অথচ কিছুই করা যাচ্ছে না। এজাতীয় অক্ষমতার জ্বালা—সদ্য তরুণ নৃপেন ব্যানার্জির অভিজ্ঞতায় এই প্রথম। তিনি বলছেন, 'সেদিন সকালে আমি আর সরোজদা (সরোজ হাজরা) ময়দানে জমায়েতে গিয়েছিলুম। ফেরার সময় দেখি চাঁদনির গোটা কয়েক দোকান ভাঙচুর হয়েছে। তখনও ঘটনাটা বিক্ষিপ্ত বলে মনে হয়েছে। কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের কাছাকাছি এসে দেখি ইঁট আর সোডার বোতলের কাঁচে রাস্তা ভর্তি। কলেজ স্ট্রীট মার্কেট আর ঠনঠনের মাঝখানটা নো ম্যান্স্ ল্যান্ড। দুদিকে লোক জড়ো হয়েছে। বুঝলাম বড় আকারে কিছু একটা ঘটেছে। সার্কুলার রোডের পার্টি অফিসের দিকে যাওয়া গেল না। পাড়ায় এসে দেখি একই অবস্থা। গ্রে স্ট্রীট আর শোভাবাজার স্ট্রীটের মোড়ে সাধনা ঔষধালয়ের বাড়ির ছাদ থেকে একদল লোক পাড়ার মানুষদের সাথে মোকাবিলা করছে। আমাদের বাড়ির সামনে লালাবাগান বস্তি। সেখানে বেশ কিছু মুসলমান তখন বাস করত—পাড়ার মধ্যেও গরীব মুসলমানরা ছিল। তারপর তিনদিন ধরে চলল বীভৎস কাণ্ড। আমরা যে যার পাড়ায় এই তিনদিন আটক। রাত হলে শুধু ভেসে

আসত—'আল্লা হো আকবর' আর 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি। পরস্পর-বিরোধী মহল্লা থেকে ভেসে আসত। এক ধরনের ভয় পেটের মধ্যে থেকে গুড়্‌গুড়্ করে উঠতে লাগল। কী কাণ্ড! আমরা কত অসহায় 'মব-ভায়োলেন্স' (জনতার হিংস্রতা)-এর সামনে। আমরা 'ইন্টারভেন' (হস্তক্ষেপ) করতে পারছি না। এক ধরনের 'ট্রমাটিক এক্সপিরিয়েন্স' (ভয়াল অভিজ্ঞতা) হল আমার এবং গোটা পার্টির। সব শেষ। বুর্জোয়া নেতারা আমাদের চেয়ে কত শক্তিশালী। তারা ইচ্ছেমতো পিপ্‌লকে নিয়ে খেলতে পারে।'

খোকা রায় বলছেন, 'সাম্প্রদায়িকতাবাদ যে এত মারাত্মক ভাবে নাড়া দিচ্ছে—তা আমরা বুঝিনি। 'আন্ডারএস্টিমেট' করেছি (কম মূল্য দিয়েছি) তাকে। বুঝতে পারলাম যখন ১৬ই আগস্ট 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন'-এর ডাক দেওয়া হল—তার তিন-চার দিন আগে। সেদিন ময়দানে যারা শোভা-যাত্রা করে গিয়েছিল—তারা গিয়েছিল খালিহাতে। সেখানে নাজিমুদ্দিন প্ররোচনামূলক বক্তৃতা করে—'আজাদ' কাগজেও মৌলানা আক্রাম খাঁ খুব খারাপ লেখা লেখে। সভা থেকে এই জনতা ফেরার পথে লুঠ করতে করতে এগুতে থাকে। সকাল থেকেই পার্টির মুসলিম কমরেড খাঁ সাহেব, শামসুল হুদা ও অন্যান্যরা টের পাচ্ছিলেন—খারাপ কিছু ঘটবে। হুদা সাহেব আমায় বললেন চলে যেতে। আমার উপর ভার ছিল মৌলালি অঞ্চলের। লুঠ হয়ে গেল ওয়েলিংটন স্কোয়ারের সামনের বাটা-র দোকান। প্রথমে ছ-সাতজন ছেলে কোলাপ্‌সিবল্ গেট ভাঙতে থাকে। তারপর গোটা মিছিল ঢুকে পড়ে দোকান সাফ করে দিল। ইসমাইল আর মনসুর হাবিবের সামনে এই ঘটনা ঘটল। তারা চেষ্টা করেও কিছু করতে পারল না।

কিন্তু এতে কোন লজ্জা নেই। কারণ ধর্মযুদ্ধ শুরু হয়েছে। লুটের মাল তো 'মালে গণিমত', 'বুটি অফ দ্য হোলি ওয়ার'। ডেকার্স লেনের পার্টি অফিসে ট্রামের জহীরের চেলারা এসেছে—পরনে নতুন চকচকে পাজামা-পাঞ্জাবি—পায়ে চকচকে নতুন জুতো। ব্যাপার কী! না—হ্যারিসন রোডের উপর বিড়লার এক ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্স লুঠ হয়েছে। অতএব মালে গণি-মত। তেমনি আমার শালা ঝণ্টু আমায় বেশ দামী একটা সিগারেট খাওয়াল। খান না—খান না।

এত দামী সিগারেট। হ্যাঁ, পাড়ার সব সিগারেট দোকান লুট হয়ে গেছে।'

আবদুল মোহাইমন লিখছেন:

'মোড়ের দোকানটি যখন লুট হচ্ছিল তখন লক্ষ্য করলাম আশেপাশে আরও দু-চারটি বড় বড় হিন্দু দোকানের দরজা ভাঙ্গার আয়োজন প্রায় শেষ হয়ে গেছে এবং বহু লোক, অধিকাংশই গুণ্ডা ও বদমায়েস প্রকৃতির মানুষ, ভিতরে ঢুকবার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে। আমার তখন হঠাৎ মনে হলো

অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, যেভাবে লুটপাট আরম্ভ হয়েছে কতদিনে যে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে তা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। ততদিন খাব কি? তাই হঠাৎ আমার মনে হলো লুটের মধ্য থেকে আমারও কিছু রসদ যোগাড় করে নেওয়া উচিত। একথা মনে পড়তেই আমি মোড়ের বড় দোকানটায় ঢুকে পড়লাম। ঢুকে দেখি অধিকাংশ লোকই আলমারী ভেঙ্গে জ্যাম, জেলী, মাখনের টিন প্রভৃতি লুট করে নিচ্ছে। অনেকে মুদিখানা থেকে চিনি, মসলাপাতি, ভাল সাবান প্রভৃতি থলে ভরে নিচ্ছে। আমি আশেপাশে তাকিয়ে কোন থলি পেলাম না। একপাশে একটি ছোট বেতের ঝুড়ি দেখতে পেলাম। কি নেব ভাবতে ভাবতে দেখলাম দোকান প্রায় খালি হয়ে এসেছে। বেতের ঝুড়িতে করে আমি তখন সের দশেক চাল নিয়ে নিলাম। ভাবলাম এদিয়ে আমার মাস খানেক চলে যাবে।' (দুই দশকের স্মৃতি, পৃ ৩৭-৩৮)

খোকা রায় বলছেন, 'প্রথম দুদিন চলল ধর্মযুদ্ধ। রেডক্রসের পতাকা দেখলে ছেড়ে দেয়। এমন কি দাওয়াই চায়। আমাদের পি. আর. সি.-র (পিপলস্ রিলিফ কমিটি) গাড়ি করে চলতে কোন অসুবিধে হয়নি। ক্রমশ নৃশংসতা মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। হিন্দুদের কাণ্ড দেখে—হিন্দু কমরেডরা বলত, হিন্দুদের দিয়ে কিসসু হবে না। জহীর-রেজাকরা বলত, মুসলমান-দের দিয়ে কিসসু হবে না। আর এরাই দাঙ্গা করছে—যারা কয়েকমাস আগে মিলিটারি লরি পুড়িয়েছে! এই পরস্পর-বিরোধী মানসিকতা—এই উল্টো-পাল্টা আচরণ একই ছেলের মধ্যে—যার গলায় নেতাজীর লকেট!

আমরা কিছু করতে পারছি না—শুধু রেসকিউ অপারেশন ছাড়া! একেবারে অসহায় আমরা—সে এক 'নার্ভ-স্ট্রেনিং' (স্নায়ু-পীড়াকর) অভিজ্ঞতা। শুধু সাদা চামড়া সার্জেন্টদের কদর। ভূপেশের সাথে গিয়ে নাবওয়ার্দি'র সঙ্গে দেখা করলাম। সে মজা করে বলল, 'দে আর ভেরি প্রেশাস' (তারা খুব দামী)—তার চেয়ে গোটা কয়েক এম. এল. এ. দিতে পারি। তারা তো জননেতা!

এইভাবে তিন-চার দিন চলল। (সোমনাথ) লাহিড়ী বলে বসল—বৃষ্টিও পড়ে না। ঝমঝম্ করে বৃষ্টি পড়লে দাঙ্গাবাজরা পালাত। হঠাৎ একদিন ঘর্ঘর শব্দ শুনলাম। কিসের শব্দ! না - ফোর্ট উইলিয়াম থেকে ট্যাঙ্ক বেরিয়েছে। যাক্, এ যাত্রা রক্ষা পাওয়া গেল। কী লজ্জার কথা! এখন আমরা ব্রিটিশ সৈন্যের মুখাপেক্ষী। তারাই কেবল দাঙ্গা ঠেকাতে পারে।'

ছাব্বিশ

১৬ই থেকে ১৮ই আগস্ট—এই তিনদিন, কলকাতা ছিল একদল রক্তলোভী উন্মাদের দখলে। গোটা শহরটাকে দেখাচ্ছিল নিস্পন্দ শবের মতো। সমগ্র পরিস্থিতির এক সংক্ষিপ্ত খতিয়ান প্রকাশিত হয় ২০শে আগস্ট 'স্বাধীনতা'র

পাতায়। কিন্তু সংবাদ শিরোনামায় তখনো অকুণ্ঠ আশ্বাসের ভাষা ফুটে ওঠেনি।

তিন দিন রক্ত ক্ষয়ের পর কলিকাতায়
গৃহ যুদ্ধের উন্মত্ততা প্রশমিত

হিন্দু ও মুসলিম এলাকা হইতে হাজার হাজার
বিপন্ন উদ্ধার

লুটতরাজ বন্ধ : রেশনের দোকান খোলার চেষ্টা
স্বাভাবিক অবস্থার লক্ষণ

'স্বাধীনতা'র নিজস্ব সংবাদদাতার প্রতিবেদন থেকে :

'কলিকাতা (১৯. ৮. ৪৬)। হিন্দু মুসলিম ভ্রাতৃবিরোধে ক্ষত-বিক্ষত কলিকাতার বুকে উন্মত্ততা কিছুটা কমিয়া আসে। যানবাহন, দোকানপাট, অফিস-আদালত বন্ধ থাকিলেও তিনদিন পর এই প্রথম কিছু কিছু লোক-জনকে রাস্তায় বাহির হইতে দেখা যায়। অপেক্ষাকৃত শান্ত এলাকায় রেশনের দোকান খোলে। টেলিফোন কিছুটা বেশী কাজ করে।

কোন কোন এলাকায় অতর্কিত আক্রমণ চলিলেও সাধারণভাবে রাস্তাঘাট অপেক্ষাকৃত শান্ত। এখন আর কোন জনতাকে লাঠিসোঁটা লইয়া দাঙ্গা করিতে দেখা যায় না। বিকালের দিকে কালীঘাট এসপ্ল্যানেড ট্রাম চলাচল শুরু হয়। হাজার হাজার মুসলিম জনতাকে আতঙ্কে কলিকাতা ছাড়িয়া হাওড়া স্টেশনের দিকে যাইতে দেখা যায়।

রাস্তা হইতে অধিকাংশ মৃতদেহ সরানো হইয়াছে। এই কয়দিনে কমপক্ষে ২-৩ হাজার লোক নিহত হইয়াছে। আহত ও নিরাশ্রয়ের সংখ্যা হিসাব করা কঠিন।

শ্রমিক অঞ্চল

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হইল শহরতলীর শ্রমিক অঞ্চলগুলির শান্তিরক্ষার আগ্রহ। নানাপ্রকার গুজব ছড়ানো সত্ত্বেও টিটাগড়, আলমবাজার, পানিহাটি, বেলঘরিয়া, বজবজ, মেটিয়াবুরুজ প্রভৃতি এলাকার হিন্দু ও মুসলমান শ্রমিকরা যথাসম্ভব শান্তিরক্ষা করিতে সমর্থ হয়। জগদ্দল, নৈহাটি, হাওড়া ও হুগলী অঞ্চল হইতে কিছু কিছু দাঙ্গা হাঙ্গামার সংবাদ আসে। কিন্তু উহা বেশী ছড়াইতে পারে না।

শ্রমিকদের বিপদ

কলিকাতায় অধিকাংশ শ্রমিক এখনো কাজে যোগদান করিতেছেন না। তাঁহাদের অনেকের বাসস্থান আক্রান্ত হওয়ায় পরিবার পরিজনদের লইয়া

নিরাশ্রয় হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে বিশেষ করিয়া ট্রাম, রিক্সা, ঠেলাগাড়ীর শ্রমিক ও দিনমজুররা আছেন। ইঁহাদের না আছে রেশন, না আছে টাকা, না আছে পরিবার পরিজনদের দেশে পাঠাইবার ভাড়া।' (স্বাধীনতা, ২০. ৮. ৪৬)

সরকারী সূত্রে জানা যায়, কলকাতায় নিহতদের সংখ্যা সাড়ে তিন হাজার ও আহত হয়েছে সাড়ে চার হাজার লোক। ইতিমধ্যে দেড় লক্ষ লোক শহর ত্যাগ করেছে এবং নব্বই হাজার মানুষ এখনো দুঃস্থাবাসে রয়েছে।

শহরের অবস্থা ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে আসছে বটে, কিন্তু তারই সঙ্গে শুরু হয়েছে শহর ছাড়ার হিড়িক। ব্যবসা-বাণিজ্য নষ্ট হয়েছে—বাড়িঘর পুড়ে ছাই—পরিবারের একমাত্র রোজগারী নিহত। লুটপাটে সর্বস্বান্ত এমন মানুষের সংখ্যা কলকাতায় আজ অর্ধ লক্ষাধিক। তারা শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে—শিয়ালদহ ও হাওড়া স্টেশনে তারা ভীড় জমিয়েছে। তারা সঙ্গে নিয়ে চলেছে নৃশংসতার কাহিনী ও সাম্প্রদায়িকতার বিষ।

ননী ভৌমিক লিপিবদ্ধ করেছেন এই হতভাগ্য গৃহহারাদের জবানবন্দী :

'রূপালী স্ট্রীটের বস্তি থেকে ছিটকে এসেছে একদল লোক। প্রথমে চল্লিশজন ছিল তারা। কয়েকজনের খোঁজ নেই। কেউ তারা রিক্সা টানত, কেউ গাড়ী ঠেলত—দোকান দিয়েছিল কেউ।

বুড়োমতো একটা লোক বলল—দেশে পালিয়ে গেল ; বহুত লোক দেশে পালাল।

জিজ্ঞেস করলাম, 'পালাল কেন ?'

উঁচু দিকে মুখ করে বলল—কি করবে ? দেশেই যাবে। না খেয়ে মরতে হবে এখানে—কি করবে ? সাহু মহাজনের কাছে মেঙেগ নিয়ে খাবে মুলুকে—জমি মালগুজারী কিছু তো নেই।

আরো কয়েকজন লোক মাথা নাড়িয়ে নাড়িয়ে সায় দিল বুড়ো লোকটার কথায়—কি করব, গরীব লোক আমরা…

কোন আক্রোশ নেই তাদের কথায়। বিদেশী শহর কলকাতা। বিদেশী শহরের ভুতুড়ে সর্ব্বনাশ থেকে তারা ফিরে যাবে মুলুকে।' (স্বাধীনতা, ২৬. ৮. ৪৬)

কলকাতার বুকে গৃহযুদ্ধ গভীর ক্ষতচিহ্ন এঁকে দিয়েছে। এই দুর্যোগের ঘনঘটার মধ্যেও আশার আলো মিটমিট করে জ্বলতে থাকে। খুশি হবার মতো ঘটনা ঘটেছে ওখানে। 'স্বাধীনতা'র নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন :

'১. মুসলমান-প্রধান হায়াত খাঁ লেন ও মুসলমান পাড়া লেনে হিন্দু-মুসলমান একতা ভাঙিগয়া পড়ে নাই।

২. বিরাট মুসলমান জনতার উদ্যত আক্রমণ হইতে মুসলমান ট্রাম শ্রমিকরা ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশনের ছাত্রীদের রক্ষা করেন।

৩. শোভাবাজারের এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আশ্রয় দিয়াছেন ২টি শিশু সন্তানসহ একজন মুসলমান মাতাকে। অন্যদিকে অসীম সাহসের সঙ্গে গরাণহাটা স্ট্রীটের এক মহিলা ৪ জন মুসলমানকে আশ্রয় দিয়া উন্মত্ত গুণ্ডাদের হাত হইতে বাঁচাইয়াছেন।

৪. গর্চা বস্তীর দুইশত মুসলমানকে গুরুদয়াল সিং-এর নেতৃত্বে পাড়ার হিন্দু ও শিখরা ক্রুদ্ধ জনতার আক্রমণ হইতে রক্ষা করে। ইয়াকুব পার্কের নিকট মসজিদটি পর্যন্ত ইঁহারা পাহারা দেন।

৫. সুইনহো স্ট্রীটের বাসিন্দা ভার্ত্তিয়া কারখানার মুসলমান শ্রমিকদিগকে হিন্দু প্রতিবেশীরা দুইদিন রক্ষা করিয়া পরে নিরাপদ স্থানে পাঠাইয়া দেন।

৬. হাঙ্গামার প্রথমদিন হইতে তিলজলার গরীব হিন্দু-মুসলমান একত্র হইয়া শান্তিরক্ষার চেষ্টা করেন।

৭. এণ্টনিবাগানের ৬টি হিন্দু পরিবারকে স্থানীয় মুসলমান বাসিন্দারা আশ্রয় দেন। বুদ্ধু ওস্তাগর লেন ও এণ্টনিবাগান লেনের নারী ও শিশুসহ হিন্দুকে মুসলমান প্রতিবেশীরা সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেন। গোখানার পাশের বাসিন্দা ২০০ জন মুচি ও ট্রামের হিন্দু মেস স্থানীয় মুসলমানদের রক্ষণাধীনে সম্পূর্ণ নিরাপদ।

৮. উল্টোডাঙ্গা খালের ধারে কয়েকটি ফেস্টুনের গায়ে লেখা : 'উল্টাডাঙ্গা হিন্দু-মুসলমানদের শান্তিপূর্ণ স্থান।' এখানে হিন্দু মুসলমানের দোকান খোলা। মুরলীবাগান, ছোটীবাগান ও বসাকবাগান প্রভৃতি এলাকার বাসিন্দারা যেভাবে ভাই ভাই বসবাস করিতেছে তাহা চোখে না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না।

৯. মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চল বেলগাছিয়ার কুণ্ডু লেনে হিন্দুরা নিরাপদে রয়েছেন।

১০. দেশবন্ধু পার্কে নিকাশীপাড়া বস্তি। ইহা একটি হিন্দু অঞ্চল। বস্তির ৩০ ঘর মুসলমানের জীবন হিন্দু নেতাদের সাহসিক হস্তক্ষেপে রক্ষা পায়। ভূতপূর্ব মেয়র শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জী উন্মত্ত জনতাকে বারবার ফিরাইয়া দেন। ২১শে আগস্ট এখানে শান্তিকমিটি গঠিত হয়।

১১. হাজি জ্যাকেরিয়া লেনে একজন মুসলমান সংবাদদাতার হাত চাপিয়া ধরিয়া জানাইলেন—বড় রাস্তার ঝড় ঝাপটা ভিতরে ঢুকিতে দেই নাই। আমরা সারারাত্রি পাহারা দিয়া হিন্দু বাড়ী রক্ষা করিয়াছি।

তিনি জাহাজী ইউনিয়নের একজন সভ্য। তিনি আরও বলিলেন—আমাদের এই মহল্লা হইতে ১৬ই আগস্ট যাহারা বাহিরে গিয়াছে তাহাদের মধ্যে ৭০-৮০ জন এখনো নিরুদ্দেশ। তারপর তিনি গরীবদের দুরবস্থার কথা বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিলেন। অনেকেই সাতদিন কাজে যায় নাই, কবে যাইতে পারিবে কে জানে। ঘরে একমুঠো চাউল নাই, বাজারে যাওয়ার উপায় নাই। বস্তির গরীবরা এইভাবে কয়দিন বাঁচিবে ?

১২. একটি মুসলিমপ্রধান এলাকায় দেখা গেল, অন্ধকার ঘরের ভিতর ৮-১০ জন হিন্দু শ্রমিক খাইতে বসিয়াছেন, দরজায় কয়েকজন মুসলমান শ্রমিক পাহারা দিতেছেন।' (স্বাধীনতা, ২১-২৩. ৮. ৪৬)

কলকাতার যে সব অঞ্চলে ভ্রাতৃত্ববোধ এত হানাহানির মধ্যেও অটুট এবং যেখানকার মানুষ দেশপ্রেমকে ম্লান হতে দেননি—সে সব অঞ্চল আসলে গৃহ-যুদ্ধের সাইক্লোন-বিধ্বস্ত শহরে সবুজ দ্বীপের মতো। এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপ-গুলো ঘিরে যে কলকাতা তার চেহারা 'স্বাধীনতা'র রিপোর্টারের ভাষায় :

'দেখিলাম একটি মৃতদেহকে ঘিরিয়া প্রচুর শকুনি নৃত্য করিতেছে। রাস্তার আবর্জনা, কুকুর ও গবাদি পশুর মৃতদেহ, পোড়ানো কাপড়-জামা ও আসবাব-পত্র সমস্ত একাকার হইয়া নরককুণ্ড সৃষ্টি করিয়াছে। অনুভব করিলাম দাঙ্গার পরই মহামারীর বিষ-দাঁত উঁকি মারিতেছে।

·· মীর্জাপুর হ্যারিসন রোড এবং চিৎপুর হ্যারিসন রোডের মত বড় বড় মোড়গুলিতে যে কি ভীষণ লড়াই হইয়াছে, তাহা এখনও তাকাইলে অনুমান করা যায়। দোকানপাট নিশ্চিহ্ন হইয়াছে, ইটপাটকেল আর অর্ধদগ্ধ আবর্জনায় রাস্তা ভরিয়া উঠিয়াছে।'

সাতাশ

'···কলিকাতা এবং শহরতলীর লাখ লাখ মজুর যদি এই কয়দিন অপর সবার মত গৃহযুদ্ধে উন্মত্ত হইয়া উঠিতেন তাহা হইলে যে কী হইত তাহা ভাবনার অতীত।' (স্বাধীনতা, ২২. ৮. ৪৬)

এই মন্তব্যের সারবত্তা অস্বীকার করার উপায় নেই। সমাজের অন্যান্য অংশের মানুষ যখন সর্বনাশা ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে মাতোয়ারা—শ্রমিকশ্রেণীর বৃহত্তম অংশ অন্তত তার কলুষ থেকে মুক্ত।

'শ্রমিক এলাকায় শ্রমিকরা রায়ট করেনি···বাইরের লোক এসে রায়ট বাধিয়েছে'—জগৎ বোসের এই কথার সঙ্গে বীরেন রায় কিন্তু পুরোপুরি একমত নন। কর্পোরেশন শ্রমিক নেতা বীরেন রায় দাঙ্গার সময় টালা পাম্পিং স্টেশনে হিন্দু-মুসলমান শ্রমিককে একসঙ্গে কাজ করতে দেখেছেন। তাঁর মতে, 'ইউনিয়নে সংগঠিত শ্রমিক রায়টে অংশ নেয়নি—কিন্তু রায়ট বন্ধ করার জন্যে সক্রিয়ভাবে হস্তক্ষেপও করেনি।' তাঁর প্রশ্ন : 'এটা যে গভীর ষড়যন্ত্র তা বুঝতে না পারলে শ্রমিকদের জানাবেন কী করে আপনি? তাদের তো আগে সাবধান করা হয়নি।'

দাঙ্গার আগুনে যখন সব কিছু পুড়ে ছাই—সব সংগ্রামী ঐতিহ্য ও মানবতাবোধ হারিয়ে মানুষ দেউলে—তখন শ্রমিকের একমাত্র ভরসা তার ইউনিয়ন। গৃহযুদ্ধে গৃহহারাদের কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে গোলাম কুদ্দুস লিখছেন :

'জয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস, ব্রুকবণ্ড প্রভৃতি কারখানার শ্রমিকদের জিজ্ঞাসা করলাম, "কারখানার মধ্যে হিন্দু আছে যে, কি করে কাজ করবেন?"

এই প্রশ্নের যা উত্তর এলো তার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। "ভিতরে আমাদের ইউনিয়ন আছে।" ইউনিয়ন বোধ তাহলে এখনো মরেনি। গরীবের মনের ঘা শুকোতে হয়ত বেশীদিন লাগবে না। তারাই বেশী মরেছে, আবার তারাই বাঁচার পথ দেখাবে।' (স্বাধীনতা, ২২. ৮ ৪৬)

বাঁচার পথ কোন্‌টা—তা চন্দননগরের গোন্দলপাড়ার শ্রমিকও চেনে। তুষার চট্টোপাধ্যায় বলছেন, 'আতঙ্ক আর গুজবে আবহাওয়া কলুষিত। এর মধ্যেও গোন্দলপাড়ার শ্রমিক অঞ্চল একদম 'আন্‌আফেক্‌টেড' (কোন দাগ পড়েনি)। এই পরিবেশেও সেখানকার জুটমিলে একমাসব্যাপী ধর্মঘট চলে—ইউনিয়ন লিডার রুজিতের নেতৃত্বে। রুজিত পরে পাকিস্তানে চলে যায়।'

ইউনিয়নভুক্ত সংগঠিত শ্রমিক দাঙ্গায় ফেঁসে যায়নি—কথাটা সাধারণভাবে সত্য। কিন্তু সবক্ষেত্রে এ কথা খাটে না। লড়াইয়ের ঐতিহ্য-সমৃদ্ধ ইউনিয়ন থাকা সত্ত্বেও মেটিয়াবুরুজে এই ট্র্যাজেডি এড়ানো গেল না। ঝুনু পাকড়াশী বলছেন, 'কেশোরামে সুতাকল শ্রমিকদের মধ্যে দাঙ্গা বাধায় বিড়লা।' রণেন সেনের মতে, মেটিয়াবুরুজে দাঙ্গায় অংশ নিয়েছিল নোয়াখালি শ্রমিকেরা। কিন্তু উর্দুভাষী মুসলমান শ্রমিক বস্তিতে কেষ্ট ঘোষ, মাধব মুন্সী ও ফারুকি নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছিলেন।

প্ররোচনা যে-মহল থেকেই আসুক না কেন—দাঙ্গায় যারাই অংশ নিক না কেন—মেটিয়াবুরুজের ঘটনা শ্রমিক আন্দোলনের এক দুঃসহ অভিজ্ঞতা। শ্রমিকের শ্রেণী-চরিত্রে মেটিয়াবুরুজের দিগ্‌ভ্রান্ত শ্রমিক লেপে দিল কলঙ্কের কালি। এই বিয়োগান্ত ইতিবৃত্ত বর্ণনা করেছেন কেশোরাম সুতাকল শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক মাধব মুন্সী এবং মর্মান্তিক শিরোনামাসহ প্রকাশিত হয়েছে 'স্বাধীনতা'র (৩. ৯. ৪৬) পাতায়:

মেটিয়াবুরুজের দাঙ্গায় ভাইয়ের হাতে ভাইয়ের মৃত্যু

দালালের উস্কানিতে পড়িয়া শ্রমিকের বিরুদ্ধে শ্রমিক ছুরি তুলিল

মাধব মুন্সী লিখছেন:

' ১৬ তারিখ সুতাকল এবং অন্যান্য কারখানা বন্ধ ছিল। সমস্ত দোকানপাট বন্ধ ছিল। সকাল হইতে মাঝে মাঝে মুসলমান জনতার মিছিল চলিতেছিল। উত্তেজনা প্রচুর ছিল। কসাই, দর্জি ও হাড্ডিকলের লোকেরাই এই মিছিলের নেতা। বেলা তিনটার পর হইতে গুজব রটিতে আরম্ভ করিল যে কলিকাতায় বিশেষত ভবানীপুরে নাকি মুসলমানরা আক্রান্ত হইয়াছেন। সন্ধ্যা সাড়ে

ছ'টা আন্দাজ আমরা বাংগালী বাজারের দিকে যাইতেছিলাম। পথিমধ্যে কয়েকজন মুসলমান শ্রমিক আমাদিগকে আর অগ্রসর হইতে মানা করিলেন; কারণ সেখান হইতে পোয়াটাক দূরে পাহাড়পুর রোডের মোড়ে নাকি মারপিট হইতেছিল। একটু পরে আহত কমরেড শৈলেন বৈদ্যের সংগে দেখা। তিনি বলেন, পাহাড়পুরের মোড়ে একজন শিখ মুসলমান জনতার হাতে মার খাইতেছে দেখিয়া তিনি বাধা দিতে যান। তখন জনতা তাঁহার সাইকেল কাড়িয়া লয় এবং জনৈক স্থানীয় লীগ নেতা তাঁহাকে লাঠি দিয়া আঘাত করেন। আমরা স্থির করি যে আমাদের অঞ্চলে এই মারামারি ও লুটপাট যাহাতে ছড়াইয়া না পড়ে সেই দিকেই আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। সে চেষ্টায় মুসলমান ও হিন্দু শ্রমিকরা অনেকেই যোগ দেন এবং তাহার ফলে ১৬ তারিখে এই অঞ্চলে কোন গোলমাল হইতে পারে নাই। তবে অবস্থা প্রচুর উত্তেজনাপূর্ণ ছিল। চটকল এলাকায় গিয়া সেখানকার মুসলমান সর্দারদিগকেও আমরা শান্তিরক্ষার অনুরোধ করি। তাঁহারা রাজি হন। এবং সুখের কথা যে, শেষ পর্যন্ত তাঁহারা তাঁহাদের দায়িত্ব প্রায় সম্পূর্ণরূপেই পালন করিতে পারিয়াছিলেন।

বিড়লা ভক্তদের চক্রান্ত

কেশোরাম মিলের নিয়ম হইল—শ্রমিকদিগকে কারখানায় আসিতে প্রস্তুত করাইবার জন্য প্রথমে ভোর পাঁচটায় ও পরে পোনে ছ'টায় ভোঁ বাজে। তাহার পর ৬টায় আবার ভোঁ বাজে, উহাই কাজে হাজিরা দিবার সময়। কিন্তু এইদিন (১৭ই আগস্ট) পাঁচটার ভোঁর পর পোনে ছ'টা বা ছটার ভোঁ আর শুনিলাম না। আশ্চর্য্য হইয়া বাহির হইযা আমি ও কৃষ্ণ ঘোষ মিল গেটের দিকে চলিলাম।

মিল গেটের সম্মুখে গিয়া দেখি গেট বন্ধ এবং গেটের সম্মুখে রাস্তার উপর মিলের দারোয়ানরা (সকলেই হিন্দু) এবং পরিচিত কয়েকজন লাঠি ও বন্দুক লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। রয়েছে কোম্পানীর লাইনের ইনচার্জ ও লেবার অফিসার। চারিদিকে কোথাও পুলিশকে দেখা গেল না। কেন মিলের ভোঁ দিয়ে শ্রমিকদের ভেতরে যেতে দেওয়া হচ্ছে না—কর্ত্তাদের জিজ্ঞাসা করিলাম। কিন্তু লেবার অফিসার কোন উত্তর করিল না। একদিকে মিলের সশস্ত্র দারোয়ান অপরদিকে শ্রমিকরা খামোকা দাঁড়াইয়া থাকিলে গণ্ডগোল বাধিতে পারে আশঙ্কা করিয়া আমরা তাঁহাদের সকলকে ঘরে ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিলাম। কোনো গোলমাল না করিয়া শ্রমিকরা বস্তির দিকে ফিরিলেন। অমনি মিলের ভিতর হইতে একটি বিশেষ ধরনের ভোঁ বাজিয়া উঠিল (আগুন লাগিলে যা শোনা যায়) এবং সংগে সংগে মালিকের অনুগ্রহ-ভাজন লোকদের ত্রিতল কোয়ার্টার হইতে শ্রমিকদের উপর ইষ্টক বৃষ্টি হইতে লাগিল।

মিল লাইনে হিন্দুরাও আশ্রয় পায় নাই

কয়েকজন শ্রমিক সামান্য আহত হইলেন। কিন্তু অনেক কষ্টে তাঁহাদের শান্ত করিয়া সকলকেই ঘরের দিকে ফিরাইয়া দিলাম। মুসলমান প্রধান বস্তির অধিবাসী উড়িয়া হিন্দু শ্রমিকদের কাছে শুনিয়াছি যে পূর্বোক্ত ঘটনার পরে তাঁহারা আবার মিলের দারোয়ান ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষস্থানীয় লোকের কাছে গিয়া অনুরোধ করেন যে অন্ততঃ কয়েকদিনের জন্য তাঁহাদিগকে মিলের লাইনে থাকিতে দেওয়া হোক, যাহাতে মুসলমান বস্তিতে তাঁহারা প্রাণ না হারান। কিন্তু তাঁহাদের লাইনে ঢুকিতে দেওয়া হয় নাই—বলা হইয়াছে যে তোমরা ধর্ম্মঘটের সময় ধর্ম্মঘটে যোগ দিয়াছিলে সুতরাং তোমরা মিলের লাইনে আশ্রয় পাইবে না। ফলে উড়িয়া শ্রমিকরা বস্তির ভিতরে থাকিতে বাধ্য হন এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকে নিহত হন।

কমরেড ফারুকী, আমি ও কৃষ্ণ ঘোষ প্রথমে স্থানীয় মুসলিম সেক্রেটারী ডাঃ আইয়ুবের কাছে গিয়া সম্মিলিত শান্তি প্রচার ব্যবস্থার কথা বলিলে তিনি তখনি রাজী হন। তখন স্থানীয় কংগ্রেস নেতা শ্রীসুধাকর পালকে ডাকিয়া আনাই। তিনিও তখনি রাজী হন।

উম্মত্ততার বন্যা

শান্তি প্রচারের জন্য একটি গাড়ীর চেষ্টায় ডাঃ আইয়ুবের বাড়ীর বাহিরে আসিবা মাত্র দেখিলাম তুমুল উত্তেজনা। শুনিলাম দালাল অধ্যুষিত মিল কোয়ার্টার ও লাইন হইতে একদল লোক পার্শ্ববর্তী লিচুবাগানের মুসলমান বস্তি আক্রমণ করিয়াছে, একটি মুসলমান হোটেল ও কয়েকটি দোকান লুট করিয়াছে এবং কয়েকজন মুসলমান নিহত হইয়াছে। যত আগাইলাম ততই দেখিলাম যে এই সংবাদের ফলে অনেক শ্রমিকও বিশেষ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন, শান্ত করা অসম্ভব। একজন ছোকরা মুসলমান আমাকে ও কৃষ্ণ ঘোষকে আক্রমণ করিতে আগাইয়া আসিল, অন্যান্য মুসলমানেরা মাঝে পড়িয়া কোন রকমে আমাদের বাঁচাইয়া দিলেন। তখন উত্তেজনার বাঁধ একেবারে ভাঙিয়া পড়িতেছে।

কিন্তু তখনও দলে দলে হিন্দু সাবাড় করার চেষ্টা আরম্ভ হয় নাই। আমরা কোনো রকমে মসজিদ তালাও এলাকার পার্টি ও ইউনিয়ন অফিসে গেলাম। সেই বাড়ীটিতে অন্যান্য অধিবাসী ছাড়া প্রায় ১৫০ উড়িয়া হিন্দু-শ্রমিক বাস করিতেন। কাছাকাছি পীর আলির বাড়ীতে প্রায় ৫০ জন ও গাঁজাওয়ালা বাড়ীতে প্রায় ৪০ জন হিন্দু বাস করিতেন। আমাদের প্রভাবাধীন মসজিদ তালাও-এর মুসলমানেরা এই দুশ হিন্দুকে বাঁচাইবার ভার লইলেন। অত্যন্ত আনন্দের কথা যে শেষদিন পর্য্যন্ত সে ভার তাঁহারা রক্ষা করিয়াছেন। আমরা পার্টি অফিসে তালা লাগাইয়া আবার বাহিরে আসিলাম।

কিন্তু বেলা ১১টা নাগাদ সমস্ত বাঁধ ভাঙিয়া গেল। সকালে যে কয়েক-জন মুসলমান নিহত হইয়াছিল বেলা ১১টা নাগাদ সেই মৃতদেহগুলি সমস্ত মুসলমান এলাকায় দেখাইয়া বেড়ানো হয়। প্রতিশোধের জেহাদের জন্য আগুন ছড়ানো হয়। সে আগুন আর কেহ রোধ করিতে পারিল না। মুসলমান শ্রমিকদের দাঙ্গা প্রতিরোধ ক্ষমতা তো একেবারে ভাসিয়া গেলই—তাহাদেরও কিছু অংশ এই উন্মত্ততায় মিশিয়া গেল। ইহার পর নির্ব্বিচারে হিন্দুকে হত্যা করা, লুঠ, আগুন দেওয়া—বিভীষিকার কালরাত্রি নামিয়া আসিল।

লিচুবাগান বস্তিতে যে সব উড়িয়া হিন্দু শ্রমিক তখনও পালাইতে পারে নাই অধিকাংশকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হইল।

ইউনিয়ন অফিস হইতে প্রায় সিকি মাইল দূরে ইলিয়াস বিল্ডিংয়ের ৫০-৬০ জন উড়িয়া শ্রমিককেও প্রায় একইভাবে হত্যা করা হইল। বাড়ীর মুসলমান মালিক কিছুক্ষণ ঠেকাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—কিন্তু পারেন নাই।

হিন্দু শ্রমিকদের কেহ খাইতে বসিয়াছে, কেহ স্নান করিতেছে, নিরীহ, নিরপরাধ হিন্দু শ্রমিক মুসলমান শ্রমিক ভাইয়ের ভরসায় বাঁচিয়া থাকিবে বলিয়া আশা করিতেছে। আর তাহাদেরই ঘরের ভিতর ঢুকিয়া হত্যা করা হইল। মরণ আশঙ্কার ভিতর কাঁপিতে কাঁপিতে তাহারা ইউনিয়নের কার্ড বাহির করিয়া দেখাইয়াছে, প্রমাণ দিয়াছে যে তাহারা মুসলমান শ্রমিকের সহযোদ্ধা। হয়তো মিল মালিক ও পুলিশের পূর্ব্বতন অত্যাচারের সময় তাহারা মুসলমান শ্রমিকের সহিত একসঙ্গেই জেলে গিয়াছে, একসঙ্গে থানার মধ্যে মার খাইয়াছে। ইহার কোনো স্মৃতিই আজ তাহার মুসলমান ভাইয়ের উন্মত্ত মনে দয়া জাগাইতে পারিল না, পশুর মত তাহাদিগকে একের পর এক হত্যা করা হইল। ভ্রাতৃত্বের অপমৃত্যুর এই দারুণ শোকের মধ্যে সামান্য সান্ত্বনা এই যে আক্রমণকারী মুসলমানের মধ্যে শ্রমিকদের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না।

ওই উন্মত্ততার আর বর্ণনা দিয়া লাভ নাই, কারণ তখন মানুষগুলি আর মানুষ নাই। তাহারা নিজের এলাকা ছাড়িয়া ফতেপুর পর্যন্ত হিন্দুদের আক্রমণের চেষ্টা করিল। মেটিয়াবুরুজ হইতে নুঙ্গী পর্য্যন্ত গ্রামে গ্রামে ভ্রাতৃবিরোধের আগুন জ্বলিল।

এই উন্মত্ত তাণ্ডবের মধ্যেও জীবনের স্ফুলিঙ্গ বাঁচিয়া ছিল ইহাই সামান্য সান্ত্বনা—ইলিয়াস বিল্ডিংয়ের আক্রমণ রোধ করা যায় নাই কিন্তু জহীর প্রভৃতি লালঝাণ্ডা কর্ম্মী ও স্থানীয় কোনো কোনো মুসলমানের চেষ্টায় ঐ বিল্ডিংয়ের জন দশেক উড়িয়া শ্রমিককে বিভিন্ন বাসায় লুকাইয়া রাখিয়া বাঁচানো হয়। মসজিদ তালাও-এ অনেকের আপত্তি সত্ত্বেও আলি হাসান প্রভৃতি কমিউনিস্ট কর্ম্মী প্রায় ৫০জন হিন্দুকে আশ্রয় দেন। পাকুড়িয়া তালাও-এ গোটা মুসলিম বস্তির মধ্যে একটা মাত্র হিন্দু বাসায় জন পঞ্চাশেক

বাস করিতেন। তাঁহাদিগকে স্থানীয় লোকেরা নির্ব্বিঘ্নে রাখেন। ১৭ তারিখ সকালবেলা লিচুবাগান, দর্জ্জিপাড়া, মিঠাতালাও প্রভৃতি অঞ্চলের হিন্দু উড়িয়ারা যখন সন্তোষপুর স্টেশনের দিকে পালাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন তখন জামালউদ্দিন, পিয়ার মহম্মদ, রৈতুল্লা প্রভৃতি কমিউনিস্টপন্থী মুসলিম শ্রমিকরা তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া মুসলিম এলাকা পার করিয়া দিয়াছিলেন। মুসলমান প্রধান ২৪ পরগণা বস্তিতে প্রায় দুশোজন হিন্দু ও মুসলমান একসঙ্গে বাহিরের আক্রমণ রোধ করেন।' (স্বাধীনতা, ৩. ৯. ৪৬)

আঠাশ

শ্রমিক আন্দোলনের যে উত্তাল তরঙ্গ একদা—২৯শে জুলাই—সারা বাংলা ধর্মঘটের শিখর স্পর্শ করেছিল, তা যেন আজ মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়েছে। তার প্রতিফলন ঘটে 'স্বাধীনতা'র (২৮. ৮. ৪৬) শিরোনামায় ঃ

হিন্দু-মুসলমান বিভেদের সুযোগে

মালিকের আক্রমণ সুরু

শ্রমিক আন্দোলনের সম্মুখে নূতন বিপদ

শ্রমিক আন্দোলনকে ভ্রাতৃঘাতী গৃহযুদ্ধের খেসারত দিতে হল বেশ মোটা রকমের। সমগ্র ঘটনাস্রোত এখন উল্টোখাতে প্রবহমান।

১. ১৩ই আগস্ট থেকে লক্ষ্মী জুট মিলে যে ধর্মঘট চলছিল—তাকে আর অব্যাহত রাখা গেল না। ধর্মঘট ভেঙে গেল।

২. পোর্ট ট্রাস্টের ধর্মঘট স্থগিত। কলিকাতা পোর্ট ট্রাস্ট এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশানের সভাপতি নেপাল ভট্টাচার্য এবং সম্পাদক জলি কাউল জানাচ্ছেন ঃ 'কলিকাতার বর্তমান নিদারুণ পরিস্থিতির জন্য আমরা বাধ্য হইয়া ১লা সেপ্টেম্বরের ধর্ম্মঘট স্থগিত রাখিতেছি।'

৩. নারকেলডাঙ্গার গোবিন্দ শীট মেটাল ওয়ার্ক'স-এর শ্রমিকরা ১২ই আগস্ট থেকে ধর্মঘটরত। নারকেলডাঙ্গায় দাঙ্গা হয়নি বটে—কিন্তু ৫০০ জন শ্রমিকের মধ্যে ৩০০ জন শ্রমিক ভয়ে চলে গিয়েছে।

৪. খিদিরপুরের মেটাল বক্স কারখানা ৫১ দিন লক আউটের পর ৩০শে আগস্ট কারখানার গেট খোলে এবং তারই সঙ্গে ৬৩ জন দৈনিক মজুরকে ছাঁটাই করা হয়।

৫. দাঙ্গার পর গত ২৬শে আগস্ট এলবিয়ন পাটকলে কাজ চালু হয়।

শ্রমিকরা সকলে কাজে যান, কিন্তু ১৫০ জন শ্রমিককে ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি।

৬. বহু লড়াইয়ের অভিজ্ঞ ও জঙ্গী ভারতিয়া কারখানার শ্রমিকের মনও দাঙ্গার বিষে বিষিয়ে উঠেছে। গত ২৭শে আগস্ট কারখানা চালু হয় কিন্তু রোলিং মিল এখনও চালু হয়নি। শ্রমিকরা তাই গেটের বাইরে ম্যানেজার রোজ সাহেবের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। রোজ সাহেব এলে শ্রমিকরা তাঁর কাছে কাজ দাবি করে। 'কাজ নেই' বলে ম্যানেজার সাহেব সোজা মোটর হাঁকিয়ে কারখানায় ঢুকে গেলেন। এদিকে ম্যানেজারের মোটরের নীচে পড়ে একজন শ্রমিক আহত হয়। তা দেখে একজন শ্রমিক দুঃখের সঙ্গে বলে—দাঙ্গার আগে যে ম্যানেজার আমাদের ভয়ে কাঁপত, আজ সে আমাদের উপর দিয়ে মোটর চালিয়ে যায়।

৭. দাঙ্গার পর খিদিরপুরের সিগারেট কল আবার চালু হলে দেখা যায় হিন্দু-মুসলমান শ্রমিকরা একে অপরের সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ করে দিয়েছে। কারখানার অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ফোরম্যান তা নিয়ে শ্রমিকদের ঠাট্টা করতে শুরু করে। শেষ পর্যন্ত ফোরম্যানের মধ্যস্থতায় শ্রমিকদের মধ্যে আবার বাক্যালাপ চালু হয়।

এই সর্বনাশা সময়ে ট্রাম শ্রমিক আন্দোলন এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। চারদিকে যখন ধ্বস নামছে—ট্রাম শ্রমিক ঐক্য তখন অটুট। চারদিকে ভাঙচুরের মধ্যে ট্রাম ওয়ার্কার্স' ইউনিয়নের সংহতি অনাহত। দাঙ্গার বিপর্যয়ের মধ্যেও ট্রাম শ্রমিক ধর্মঘট জেতার ভরসা রাখে। ২৯শে জুলাই-এর লড়াকু ঐতিহ্যবাহী পতাকা কেবল ট্রাম শ্রমিকরাই ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে। এ প্রসঙ্গে গোপাল আচার্য বলছেন, 'ট্রামের ইউনিফর্ম পরা ট্রাফিকের ওয়ার্কারদের এই ভয়ঙ্কর দাঙ্গার মধ্যেও দু'পক্ষের লোক সম্মান দিয়েছে। হিন্দু ওয়ার্কার মুসলিম এরিয়া দিয়ে গিয়েছে এবং মুসলিম ওয়ার্কার গিয়েছে ডিউটিতে হিন্দু-অধ্যুষিত অঞ্চল দিয়ে। তাদের গায়ে কেউ কখনো হাত দেয়নি। এই জিনিসটাই আমাদের ৪৬-এর শেষাশেষি সাধারণ ধর্মঘটের দিকে এগিয়ে যেতে ভরসা দেয়। ইউনিয়নের এক্সিকিউটিভ কমিটি লাগাতার ধর্মঘটের জন্যে ব্যালটের সিদ্ধান্ত নেয়। সেই ব্যালটে শতকরা নব্বই জনেরও বেশি শ্রমিক ধর্মঘটের পক্ষে সম্মতি জানায়। ঐক্যের হাতিয়ার নিয়ে আমরা ধর্মঘটে নামি। ৮৬ দিন ধরে এই ধর্মঘট চলে। আমি, লাহিড়ী, ইসমাইল ও মোমিন জেলে যাই। ধর্মঘট মীমাংসার পর বেরিয়ে আসি। ওয়ার্কার-রা 'আনপ্রিসিডেন্টেড ইউনিটি' (অ-পূর্ব ঐক্য)-র পরিচয় দিয়েছে। 'রিলিফ ইন কাইন্ড' (চাল ডাল) ছাড়া এই সময়ে ৭০ হাজার টাকা 'কালেকশন' হয়।'

রাম বসু বলছেন, 'এই হানাহানির মধ্যে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম ট্রাম। ট্রামে দাঙ্গা নেই। ভিক্টোরিয়ার মাঠে প্রেমিকাসহ নির্ভয়ে বসা চলে—কোনরকমে ট্রামে উঠতে পারলে নিশ্চিন্ত।'

ট্রাম শ্রমিক আন্দোলনের প্রবীণ নেতা ধীরেন মজুমদার সেদিনের কথা এখনও ভুলতে পারেননি (কখনও কি পারবেন ?) তিনি বলছেন, '১৯৪৬-এর দাঙ্গাও ট্রাম শ্রমিক ঐক্য ভাঙতে পারেনি। নিজের কানে শুনেছি, মুসলমান শ্রমিককে অন্য মুসলমান বলছে, তুম তো কাফের হ্যায়। হিন্দুদের মহল্লায় এই অভিযোগ হিন্দু ট্রাম শ্রমিকদের বিরুদ্ধে—কেন তারা মুসলমান মারে না। ৪৬-এর ৮৬ দিনের ধর্মঘট জেতার পর ট্রাম-শ্রমিক আন্দোলনের ইজ্জত আরো বেড়ে গেল। আমাদের নিয়ে কী টানাটানি তখন! ডালহৌসি পাড়ার অফিসে রোজ ডাক পড়ত: একবার আমাদের অফিসে আসুন। সারাদিন নাওয়া নেই—খাওয়া নেই। রোজই সম্বর্ধনা আর সম্বর্ধনা। সবাই অবাক চোখ মেলে আমাদের দিকে চেয়ে রয়েছে। চারধারে এত দাঙ্গা—এত হানাহানি—এত বিভেদ। অথচ এদের অটুট ঐক্য—অটুট সংগঠন—কী মজবুত এদের ইউনিয়ন! তাই তো এরা জিততে পারে—আমরা পারি না। অতএব ডাকো এদের—শোনো ওদের মুখ থেকে সংগ্রামের অভিজ্ঞতা। জেনে নাও লড়াইয়ের যাবতীয় কায়দা কানুন।

সরাসরি বলে দিতুম, আমি কমিউনিস্ট মশায়। আপনাদের অফিসে তো কত কংগ্রেসের লোক রয়েছে। আমায় নিয়ে যাচ্ছেন—ওরা কী মনে করবে!

—ওরা কিছু মনে করবে না। আপনি আসুন।'

ঊনত্রিশ

বড় আকারে দাঙ্গা বা গণহত্যা না ঘটলেও কলকাতার বুকে সাম্প্রদায়িক শান্তি ফিরে আসেনি। এখানে ওখানে বিক্ষিপ্ত খুনখারাপি রোজই ঘটতে থাকে। 'স্বাধীনতা'র পাতায় এসব কলঙ্কজনক ঘটনার বিবরণ প্রায় দৈনন্দিন ব্যাপার। যেমন ২৪শে সেপ্টেম্বরের সংবাদ শিরোনামা:

কলিকাতায় পুনরায় হাঙ্গামার ফলে ৩ জন নিহত ৪১ জন আহত

তারপর আনুপূর্বিক ঘটনা:

'সোমবার সকাল হইতে শিয়ালদহ ও হাওড়া ব্রীজের অন্তর্ভুক্ত এলাকার বিভিন্ন স্থানে ছুরিকাঘাত, মারপিট এবং সংঘর্ষের সংবাদ পাওয়া যায়, ঐ সময় ট্রামে যে সশস্ত্র মিলিটারী পাহারাদার ছিল, তাহাকে নিষ্ক্রিয় থাকিতে দেখা যায়। তাহাদের উপর নাকি বন্দুক দেখাইবার হুকুম আছে। ব্যবহার করিবার হুকুম ছিল না।'

তারপর অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি চলতে থাকে বেশ কয়েকদিন। শুধু একঘেঁয়ে সাম্প্রদায়িক অনাচারের সংবাদ:

২৭শে সেপ্টেম্বর (শুক্রবার) কলকাতায় ৫ জন নিহত ও ৩০ জন আহত।
২৮শে সেপ্টেম্বর (শনিবার) কলকাতায় ৭ জন নিহত ও ৩০ জন আহত।
২৯শে সেপ্টেম্বর (রবিবার) কলকাতায় ৪ জন নিহত ও ১১ জন আহত।

পার্টি কমরেডরা অসহায়। এই দুরূহ অবস্থা মোকাবিলা করা তাদের সাধ্যাতীত। অমিয় মুখার্জি বলছেন, ''রায়টের বীভৎস ছবি দেখলাম দিনের পর দিন। আমরা যারা রাজনীতি করি—তারা একদম ফেকলু হয়ে গেলাম। পাড়ায় ফিরে এসে দেখি—নেতৃত্ব করছে খাঁড়া হাতে পাড়ার এক মস্তান। আমরা রেড ক্রসের ব্যাজ পরে পুতুপুতু মন নিয়ে একবার মুসলমানের জটলার মধ্যে আর একবার হিন্দু জটলার মধ্যে ত্রাণ করছি—সেবা করছি!'

আর বীরেন রায় দেখছেন, পার্টির কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেল। ভানু-জগা-গোপাল পাঁঠারাই এখন সমাজপতি।

কেন এরকম হল! ২৯শে জুলাই-এর ঘটনা কি খুব বেশিদিন আগেকার কথা! ২৯শে জুলাই আর ১৬ই আগষ্টের মধ্যে মাত্র তো আঠারো দিনের ব্যবধান। তবে কি সে আরেক যুগের কাহিনী। ২৯শে জুলাই-এর পর ১৬ই আগস্ট কী করে সম্ভব হয়!

অন্নদাশঙ্কর রায় বলছেন, 'আপনাকে খুঁজে বার করতে হবে—২৯শে জুলাইয়ের পর ১৬ই আগস্ট হয় কী করে? কোথায় গেল আপনার কমিউনিজম? এত নৃশংস হিন্দু মুসলমানের প্রতি—মুসলমান হিন্দুর প্রতি হয় কী করে!' (সাক্ষাৎকার: ১৫. ৪. ৮২, ১লা বৈশাখ, ১৩৮৯)

তার উত্তরে একই দিনে সোমনাথ লাহিড়ী বলেন, 'হ্যাঁ, এই দুই পরস্পর-বিরোধী ঘটনার ব্যাখ্যা আছে। এবং তদানীন্তন পরিস্থিতিতেই তার কারণ নিহিত।' (তাকে প্রশ্ন করেছিলুম অন্নদাশঙ্কর রায়ের প্রশ্নের সঠিক জবাব কী?) তিনি বলেন, 'এর জবাব হচ্ছে, 'পাওয়ার ইজ ইমিনেন্ট' (ক্ষমতা আসন্ন)। 'পাওয়ার' হিন্দুর হাতে আসবে না মুসলমানের হাতে। বাংলাদেশে এবং কলকাতায় কারা রাজত্ব করবে—হিন্দু না মুসলমান। বাংলাদেশ কি পুরো পাকিস্তান হয়ে যাবে, কলকাতা সুদ্ধু, না কলকাতা পাকিস্তানের বাইরে আসবে।

শ্রেণী সংগ্রাম! লাল ঝাণ্ডার প্রভাব! সে আর কতটুকু! কতদিন সময় পেয়েছি আমরা কাজ করার! কতটুকু অংশের মধ্যেই-বা আমাদের কাজ! তার পাশে—সাম্প্রদায়িকতাবাদের জন্ম যে ১৯০৫ সাল থেকে। হাজার বছরের পুরোনো ধর্মসংস্কার! তাদের জোর যে অনেক বেশি।'

খোকা রায় বলছেন, 'হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের অবনতি শুরু হয়েছে বহুদিন আগে থেকে। রায়টের জমি ধীরে ধীরে তৈরি হয়েছে। ১৯৩০ সালে যখন আমি এম.এ. পড়ি—বি.পি.এস.এ. করি। এবং সেই প্রথম ২৬শে জানুয়ারি ছাত্ররা শোভাযাত্রা বার করে। মিছিল ঢাকার কলতা বাজার পার হয়ে নাড়িন্দাতে এক মুসলিম-অধ্যুষিত মারাপিটের জায়গায় এসে পড়ে। মুসলমানরা ধ্বনি দেওয়াতে আপত্তি করে—বোধ হয় কাছে মসজিদ ছিল।

সংঘর্ষ হয়। ছাত্রদের সঙ্গে পারবে কেন? রায়টের মত হল। যত রুটি আর বাখরখানির দোকান ছিল—সব লুট হয়ে গেল। সন্ত্রাসবাদী যত দল—শ্রীসংঘ, বাণী সংঘ—সবাই এসব রায়টে অংশ নিত। তারা আমাকেও চেষ্টা করেছে একাজে নামাতে। কত গভীরে ছিল সাম্প্রদায়িকতার শেকড়! রাজনৈতিক দলের হিন্দু ছেলেরাও কত দূষিত!

১৯৩৮ সালে জেল থেকে বেরিয়ে এসে দেখি হিন্দু-মুসলমান দুটি জাত। বিশেষ করে সেটা প্রকট হল ১৯৪১ সালের সেন্সাস-এর সময়। দুপক্ষই উঠে পড়ে লাগল—বেশি করে নিজের সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা দেখানোর জন্যে। নিজের সম্প্রদায়কে প্রমাণ করতেই হবে। দুপক্ষ থেকে 'ক্যাম্পেন' শুরু—এখনো কানে ভাসে কিশোরগঞ্জের মুসলিম ইনস্টিটিউটে মোনেম খাঁর বক্তৃতা। পয়দা কর আর পয়দা কর। দেখছ না হিন্দুরা কী হারে লোকসংখ্যা বাড়িয়ে ফেলেছে। কোনটা কার সন্তান—তারই নেই ঠিক। তোমরাও আর পেছিয়ে থেকো না। বিধবা-বেওয়া বেবাক সব বিয়া কর‍্যা ফেল।

অত্যন্ত ঘৃণ্য, স্থূল আর অশ্লীল বক্তৃতা। এই মোনেম খাঁই আয়ুবের আমলে পূর্ব পাকিস্তানের কুখ্যাত গভর্নর। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জুবিলী পার্কে শ্যামাপ্রসাদের বক্তৃতা। সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াতে শ্যামাপ্রসাদের সাথী নন্দ ঘোষের জুড়ি নেই। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বইতে নাকি 'বিল্বফল খাইতে সুস্বাদু'-র জায়গায় লেখা 'গোমাংস খাইতে সুস্বাদু'। নাটকীয় ভঙ্গিতে বক্তা বলে চলেন, সীতা রামের জায়া—এবার আর বলা চলবে না। বলতে হবে—সীতা রামের জরু; বলতে হবে—ফজরে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি।

শুরু হল মিছিল আর পাল্টা মিছিল। প্রথমে মুসলমানদের, পরে হিন্দুদের—মাঝে দশ-বারো দিনের ফারাক। সব মিছিল সশস্ত্র—লাঠি আর ঠ্যাঙা নিয়ে। হিন্দুদের মিছিলে একজনকে ঢেঁকি নিয়ে যেতে দেখা গেল। ৪০ সালে শুধু একটাই স্লোগান—বাড়াইয়া লেখ আর বাড়াইয়া লেখ। কাজেই হক্-কংগ্রেস কোয়ালিশন সরকার হলেও রায়ট ঠেকান যেত কি? সন্দেহ আছে। দেখেছি ব্রাহ্মণ প্রধান বাণীগ্রামে কংগ্রেস নেতা তালুকদার যশোদা গোস্বামীর বাড়ীতে পাঁচজন ভদ্রলোক জড়ো হয়েছে। সবাই চেয়ারে বসে। একজন মুসলিম জোতদার গেছে—তাকে চেয়ারে বসতে না দিয়ে টুল এগিয়ে দেওয়া হয়েছে। আলাদা হুকায় তামাক খেতে দেওয়া হয়েছে। মুসলিম জোতদারটি তাদের সমাজে একজন গণ্যমাণ্য লোক। এভাবে 'ডিস্ক্রিমিনেট' (বিভেদ) করে করে মুসলিমদের 'অ্যালিয়েনেট' (বিচ্ছিন্ন) করে ফেলেছে হিন্দুরা।'

তার পরিণাম জাতীয় আন্দোলন ও হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ক্ষেত্রে মোটেই শুভ হয়নি। বি. টি. রণদিভে লিখেছেন, কয়েকটি পকেট ছাড়া গোটা দেশের মুসলমান সমাজের মধ্যে কংগ্রেসের প্রভাব বলতে কিছুই নেই। মুসলমান জনসাধারণের কাছ থেকে কংগ্রেস একেবারেই বিচ্ছিন্ন। ১৯৪২

সালের আগস্ট আন্দোলনে মুসলমানরা যে শুধু অংশগ্রহণ করেনি তাই নয় —তারা বিরূপতাই দেখিয়েছে। চল্লিশের দশক শুরু হওয়ার আগেই হিন্দু-মুসলিম সমস্যা এমনভাবে জট পাকিয়েছে যে ১৯৪০ সালে পৃথক রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তান-এর দাবি মুসলমান সমাজের জনপ্রিয় দাবিতে পর্যবসিত হয়।

অতএব অজিত রায়ের মতে, ২৯শে জুলাইয়ের ঐতিহাসিক শ্রমিক ধর্মঘটের পরেও ১৬ই আগস্টের গৃহযুদ্ধ অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে না। তিনি বলছেন, '২৯শে জুলাই আসলে অর্থনৈতিক সংগ্রামের 'হাইট'-এর (শীর্ষসীমা) বেশি কিছু নয়। মানুষ তো আসলে রাজনীতিগতভাবে—কংগ্রেস ও লীগ—এই দুই ভাগে বিভক্ত। দুই মেরুতে হিন্দু মুসলমান বিভক্ত। রায়ট তো এক বচ্ছর ধরে চলল। ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট থেকে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পর্যন্ত। গোটা কলকাতা শহরই তো হিন্দুস্থান আর পাকিস্তানে ভাগ হয়ে গেল।'

তিরিশ

ধীরে ধীরে বছর ঘুরে এল। ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট কলকাতায় যার সূত্রপাত সেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিষে গোটা দেশ জর্জর। কলকাতা (১৬ই থেকে ১৯শে আগস্ট)—তারপর বোম্বাই (১লা সেপ্টেম্বর)—নোয়াখালি (১০ই অক্টোবর)—বিহার (২৫শে অক্টোবর)—গড় মুক্তেশ্বর (নভেম্বর)-গোটা দেশ যেন গৃহযুদ্ধের অলাতচক্রে বন্দী। এবং ১৯৪৭ সালের মার্চ থেকে পাঞ্জাবের বুকে শুরু পৈশাচিক হত্যালীলা।

এই পটভূমিতে নেমে এল বাংলার নববর্ষ—বাংলা ১৩৫৪ সন। 'স্বাধীনতা'র সম্পাদকীয় স্তম্ভে লেখা হল :

কলকাতায় নূতন বৎসর

'দাঙ্গার কলকাতা অভিশপ্ত নগরী। ভাইয়ের হাতে যেন ভাইয়ের মৃত্যু বরাদ্দ। গরীবের দল—যারা সারা কলকাতা চষে গতর খেটে দিনান্তে ফুট-পাতের ওপর বসে ছাতু গিলতো মিরচা দিয়ে—তারা আজ ক্ষুধার শিকার। হিন্দুপাড়া আর মুসলমানপাড়ায় ফেরি করে, ফল বেচে, ঠেলা টেনে যারা ভাঙাচোরা হোটেলে সস্তায় গোস-রুটি গোগ্রাসে গিলতো তাদের ঢোক গিলেই ক্ষান্ত হতে হয়। কলকাতার লক্ষ লক্ষ ছোট দোকানদার, সেলুনওয়ালা, ধোপা, মুচী, বিড়িওয়ালা, রিক্সাওয়ালা, ঠেলাওয়ালা, ফলওয়ালা আর খলিফা দর্জিদের আজকের নববর্ষে ভুখা থাকতে হবে। তাই জীবন বিপন্ন করে হলেও এই গরীবের জনস্রোত 'এলাকার' বাঁধন থেকে কলকাতাকে মুক্তি দিতে চায়। সেরেফ ভুখ মেটাবার জন্য।

মরেও তারা। মধ্যবিত্তের মত ঘরে অন্তত ডাল, তেল, নুন তারা জমা রাখতে পারে না। মাসের প্রথমে থোক টাকা আসে না। ক্ষুধার তাড়নায় তারা আততায়ীর ছোরার মুখে গিয়ে পড়ে—কেউ বাঁচে—কেউ মরে। আজ না মরলে কাল অনাহারে কুঁকড়ে মরবে। কেউ রুখতে পারবে না।' (স্বাধীনতা, ১৬. ৪. ৪৭)

এক শ্বাসরোধকারী অবস্থা। মানুষের হৃদয় কি আজ মৃত? এই জিজ্ঞাসা মূর্ত হয়ে ওঠে বুদ্ধদেব বসুর কবিতায়:

বৃষ্টি দাও

আতঙ্কিত জুন, তুমি আষাঢ়ের দুয়ারে দাঁড়ায়ে
বলো, দাও বৃষ্টি দাও! টেনে নাও দুহাত বাড়ায়ে
তোমার মেঘের মধ্যে ভীত প্রাণ, মৃত হৃদয়ের
খর তাপ! অদ্ভুত করুণা ঢালো, দাও বৃষ্টি দাও!
রক্তমাখা মাটির মূঢ়তা ঢাকো আশ্চর্য আশ্বাসে
সবুজ সুন্দর ঘাসে; দাও বৃষ্টি, ভেঙে দাও ভয়;
হৃদয়ের মৃত্যু কেড়ে নাও, ফিরে দাও জীবন্ত হৃদয়!

(স্বাধীনতা, ১. ৬. ৪৭)

হায়! বৃষ্টি নামে না—অগ্নিবর্ষী আকাশ থেকে। বৃষ্টি নামে না এই দেশের অভিশপ্ত মাটিতে। জ্বলতে থাকে ভারতবর্ষ—জ্বলতে থাকে পাঞ্জাব। সাম্প্রদায়িক হানাহানির তীব্রতায়, বীভৎসতায় ও পৈশাচিকতায় পাঞ্জাব সৃষ্টি করল এক নতুন রেকর্ড। 'ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে আনুমানিক ১ লক্ষ ৮০ হাজার প্রাণ হারাল। মুসলমানরা বেশি সংখ্যায় মারা গেল আর হিন্দু ও শিখদের খোয়া গেল বেশি পরিমাণে ধন-দৌলত। ১৯৪৮ সালের মার্চ নাগাদ পাঞ্জাবের বুকে সৃষ্টি হল ৬০ লক্ষ মুসলমান ও ৪০ লক্ষ হিন্দু-শিখ উদ্বাস্তু।' (মডার্ন ইণ্ডিয়া, পৃ ৪৩৪)

'রক্তক্ষয়ী পাঞ্জাবে'র পটভূমিতে সমগ্র দেশবাসীর উদ্দেশে আহ্বান জানিয়ে ভগৎ সিং-এর সহকর্মী ধন্বন্তরী ও পি. সি. জোশী লিখলেন:

'জনগণের দোহাই, এখনও সতর্ক হউন। …পাঞ্জাবে যা ঘটেছে তাকে সাম্প্রদায়িক মদমত্ত সাধারণ মানুষের দাঙ্গা বলা চলে না। তা সংখ্যালঘুকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্য একটা রীতিমত যুদ্ধ—যার লক্ষ্য পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে হিন্দু ও শিখদের এবং পূর্ব পাঞ্জাব থেকে মুসলমানদের নিঃশেষ করা।

পাঞ্জাবে যা ঘটেছে তার সঙ্গে কলিকাতা, নোয়াখালি, বিহার এমনকি রাওয়ালপিণ্ডির সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার তুলনা হয় না। এসব জায়গায় এক সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষ সাম্প্রদায়িক উত্তেজনায় উন্মত্ত হয়ে তাদের অঞ্চলে সংখ্যালঘুদের হত্যা করেছে, লুটপাট করেছে, ঘর-দোরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, ঘৃণ্যতম অপরাধে লিপ্ত হয়েছে। কিন্তু পাঞ্জাবের এই বিরাট হত্যা-

কাণ্ডে, লুটপাটে, নারীধর্ষণে যারা প্রধানতম অংশ গ্রহণ করেছে তারা হল আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র এবং সজ্জায় সজ্জিত শিক্ষিত বাহিনী। তারা হল বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক দলের 'ঝটিকা বাহিনী'—পশ্চিম পাঞ্জাবে মুসলিম লীগের ন্যাশনাল গার্ড এবং পূর্ব পাঞ্জাবে আকালীদের শহীদী দল এবং হিন্দুসভার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ এবং তাদের সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছে, কখনো কখনো বা কার্যক্ষেত্রে পরিচালনা করেছে সাম্প্রদায়িক বিষে বিষাক্ত সরকারী পুলিশ ও সামরিক বাহিনী।

হিংস্রতায়, পৈশাচিকতায়, নিহতের সংখ্যায়, আধুনিক মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহারে, পাঞ্জাবের ১৪টি জেলা জুড়ে ধ্বংসলীলার ব্যাপকতায়, দাঙ্গা রোধ করার পরিবর্তে দাঙ্গা ছড়িয়ে দিতে পুলিশ, মিলিটারি এবং সমগ্র শাসনযন্ত্রের নৃশংস ভূমিকায় পাঞ্জাবের কলঙ্কিত ইতিহাসের কোন তুলনা নেই। মার্চ মাস থেকে লাট জেঙ্কিন্স সাহেব পাঞ্জাবের বুকে যে ৯৩ ধারার শাসনব্যবস্থা এঁটে রেখেছিলেন তা পাঞ্জাবের দাঙ্গা বিস্তারে কি চূড়ান্ত ভূমিকা গ্রহণ করেছে তা বোঝা সহজ হবে যদি আমরা স্মরণ করি যে শুধুমাত্র পাঞ্জাবেই এই নারকীয় ঘটনা ঘটল—অথচ তখন ভারতবর্ষে ও পাকিস্তানে দুইটি জনপ্রিয় সরকার সংগঠিত হচ্ছে …' (রক্তক্ষয়ী পাঞ্জাব, পৃ ২-৩)

শহরে

'প্রতিশোধের জন্য প্রচার এবং দ্রুত প্রস্তুতি অবাধে চলতে লাগল। জেঙ্কিন্স-রাজ চোখ বুঁজে রইল।

লাহোর এবং অমৃতসরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেদের হত্যা চলল, অপ্রতিহত গতিতে চলল অগ্নিকাণ্ড। কেবলমাত্র সৎ প্রকৃতির নাগরিকরাই ঘরের মধ্যে আটকা থেকেছেন। এদিকে বাইরের ক্রিয়াকাণ্ড চলেছে অবাধে। তাঁদের চোখে দেখতে হয়নি এইটুকুই সুবিধা।

১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাস থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত লাহোরে বা অমৃতসরে যিনি থেকেছেন তিনিই সাক্ষ্য দেবেন যে সান্ধ্য আইনের মেয়াদের ভেতরেই সবচেয়ে বড় বড় অগ্নিকাণ্ড ঘটেছিল। আর পুলিশ সেইসব অগ্নিকাণ্ডে হয় সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছে, নয় নিষ্ক্রিয়ভাবে দাঁড়িয়ে দেখেছে।

সম্মানভাজন নাগরিক বা দোকানদার যাঁরা আগুন নেবাতে বাইরে এসেছেন, পুলিশ তাঁদের গুলি করে মেরেছে। আর যারা আগুন দিয়ে বেড়িয়েছে তাদের ছায়াও মাড়ায়নি। ইন্সপেক্টর জেনারেল বেনেট সাহেব ছিলেন পুলিশ বাহিনীর অধিনায়ক।

'ট্রিবিউন' এক সম্পাদকীয়তে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আগুন নেবাতে গেলে নাগরিকদের যদি পুলিশ গুলি করে মারে, তাহলে উপায় কী?'

লাহোরে হিন্দু এবং শিখেরা ছিলেন সংখ্যালঘু, সেখানে তাঁরা যতটা না আক্রমণ করেছেন, তার চেয়ে অনেক বেশি আক্রমণ হয়েছে তাঁদের ওপর। অথচ সেখানে এই সংখ্যালঘুদের ধরে ধরে জেলে পোরা হয়েছে।

লাহোরের প্রত্যেকেই জানেন সাহালিম গেটের হিন্দু অঞ্চলে সবচেয়ে বড় অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। এই অগ্নিকাণ্ড তত্ত্বাবধান করেছিলেন লাহোরের জনৈক সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট নিজে। তাঁর নাম মিস্টার এম. জি. চীমা। একটি শক্তিশালী বাহিনীর সঙ্গে একদল মুসলমান প্রচুর পেট্রল নিয়ে সুপরিকল্পিতভাবে বাজারটিতে আগুন লাগিয়ে যায়, ফলে সমস্ত বাজারটি ভস্মীভূত হয়।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সবচেয়ে প্রধান কীর্তি সংঘটিত হয় এপ্রিল মাসে লাহোরের উপকণ্ঠে বাজগড় নামক একটি মুসলমান এলাকায়। এখানেই আক্রমণের সময় সর্বপ্রথম বোমা-বন্দুক-রিভলবার ব্যবহৃত হয়। এই আক্রমণে কয়েকজন মুসলমান নিহত হন। লাহোরে এই সময় বলাবলি হত এই অঞ্চলের হিন্দু পুলিশ কর্ম্মচারী আগেই জানতেন যে এ ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে।

অমৃতসরের ঘটনাও ঠিক একই রকমের। পুলিশ সক্রিয়ভাবে দাঙ্গাকারীদের সাহায্য করেছে এবং শাস্তি দিয়েছে নির্দোষ লোকদের।

এমনভাবে লাহোর এবং অমৃতসর জ্বলল যে, আর কোন শহর এমনভাবে কোনদিন জ্বলেনি। আশ্রয়প্রার্থীরা নিরন্তর গতিতে শহর দুটি ছাড়তে লাগলেন।

গ্রামাঞ্চলে

মধ্য পাঞ্জাবের জেলাসমূহের বিশেষত বিপাশা এবং শতদ্রু নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে শিখ কৃষকদের স্বদেশ প্রীতির ঐতিহ্য সুপ্রসিদ্ধ। সুতরাং বর্ত্তমানে আকালী নেতৃত্ব যখন মুসলমানদের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য শিখ কৃষকদের উস্কানি দিতে লাগলেন, তখন তাঁরা দেশপ্রেমিকের নির্ভুল যুক্তি তুলে বলেছিলেন, 'রাওয়ালপিণ্ডিতে শিখদের হত্যা করা যদি মুসলমানদের পক্ষে অন্যায় হয়ে থাকে, তবে এখানে মুসলমানদের মারা কীভাবে ন্যায় কাজ হবে?' তবু আপ্রাণ চেষ্টা চলতে লাগল যাতে এই কৃষকদের দাঙ্গার পথে টেনে নামানো যায়।

এপ্রিল মাসে দোয়াবের গ্রামাঞ্চল থেকে আমরা খবর পাচ্ছিলাম আকালি দলসমূহ গোপনে গোপনে শিখ কৃষকদের শস্য-ভাণ্ডারে আগুন জ্বালিয়ে প্রচার করেছে—এসব সেই সেই অঞ্চলের মুসলমানদের কীর্ত্তি। পুলিশও সক্রিয়ভাবে একই চক্রান্ত চালিয়েছে। মগার নিকট কোকারি গ্রামে একজন পুলিশ কনস্টেবল একটি গমের ভাণ্ডারে আগুন দেবার সময় হাতে নাতে ধরা পড়ে। মে মাসের শেষের দিকে এখানে ওখানে মুসলমানদের হত্যা করা হয়। সশস্ত্র আকালী দলসমূহ দ্রুতগামী জীপগাড়ী চড়ে গ্রামগুলি টহল দিয়ে বেড়াতে শুরু করল, তখন থেকেই মুসলমান গ্রাম ও শিখ গ্রামগুলি ভাগ ভাগ হয়ে গেল। স্ব-গ্রামের শিখ ভাইদের কাছ থেকে কোন বিপদের আশঙ্কা না করলেও মুসলমানরা গ্রাম ছাড়তে আরম্ভ করলেন। কারণ, বহিরাগত এইসব আকালী বাহিনীদের হাত থেকে রক্ষা পাবার ভরসা

কোথায় ? শিখ-গ্রাম ছেড়ে এসে মুসলমানরা এক একটা গ্রামে জড়ো হয়ে এক সঙ্গে থাকতে লাগলেন।

এই রকম ভাগাভাগি হবার পরেই পুলিশ এবং সশস্ত্র বাহিনীদের পক্ষে শিখ কৃষকদের দাঙ্গার পথে টেনে আনা সহজ হল। আমরা এরূপ অনেক রিপোর্ট পেয়েছি যে পুলিশ এবং অন্যান্য কর্মচারীরা শিখদের গ্রামে গিয়ে বলেছে পার্শ্ববর্তী মুসলমানদের গ্রামগুলি সাংঘাতিকভাবে সশস্ত্র হচ্ছে। তোমরা যদি আত্মরক্ষার জন্য সশস্ত্র না হও তাহলে চরম বোকামি হবে। প্রায় প্রতি গ্রামেই এইভাবে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলতে লাগল। তরবারি, বর্শা যোগাড় হতে লাগল। শিখ-প্রধান গ্রাম পাশের মুসলমানদের এবং মুসলমান-প্রধান গ্রাম পাশের শিখদের আক্রমণ করবে—এই আতঙ্কে সমস্ত গ্রামাঞ্চল প্রাণপণে অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হয়ে উঠতে লাগল।

তথাপি কৃষকসাধারণ খুব ব্যাপকভাবে দাঙ্গায় নেমে পড়েনি। শুধু যখন সশস্ত্রবাহিনীসমূহের ভয়ে মুসলমানরা প্রাণভয়ে গ্রাম ছেড়ে পালাতে লাগলেন, তখন লুটপাটের লালসায় মত্ত হয়ে কিছু কিছু গ্রামবাসী শিখ বেরিয়ে পড়েছিলেন। এরকম ঘটনা তো ঘটেছে শেষের দিকে, দুই-তিন মাস ধরে যখন চারদিকে চরম অরাজকতা চলছে এবং ধ্বংস ও হত্যার লালসায় ছেয়ে গেছে সারা দেশ, লুণ্ঠনকারীদের অবিরাম সক্রিয় উৎসাহ যুগিয়ে চলেছে সাম্রাজ্যবাদী পুলিশ ও মিলিটারী।

সীমান্তবাহিনী

এই আগুনে ইন্ধন যোগায় মাউন্টব্যাটেন রোয়েদাদের পাঞ্জাব বিভাগ মঞ্জুরি। 'অন্যান্য কারণও' বিবেচিত হবে, বিভাগের ব্যাপারে রোয়েদাদের এই উক্তি প্ররোচনা যোগাল।

সঙ্গে সঙ্গে উঠতে লাগল আকাশ ছোঁয়া দাবী এবং প্রতি-দাবী। আকালিরা পাঞ্জাব বিভাগের দাবী তুলেছিলেন। কিন্তু তাঁরা জানতেন যে এতে শিখরা বিভক্ত হয়ে যাবেন। তাই তাঁরা শিখদের আশ্বাস দিতে লাগলেন এই বলে যে মাউন্টব্যাটেন নাকি তাঁদের কথা দিয়েছেন, সম্পত্তি, ধর্মমন্দির প্রভৃতি বিবেচনা করে সীমান্ত সম্পর্কে সিদ্ধান্ত তাঁদের অনুকূলে যাবে। তাঁরা বললেন চন্দ্রভাগা নদীর সীমানা পর্য্যন্ত তাঁরা পেয়ে যাবেন ; আর তা যদি নাও হয় অন্তত ক্যানেল উপনিবেশ অঞ্চল এবং গুরু নানকের জন্মস্থান সুপ্রসিদ্ধ গুরুদ্বার নানকানা সাহেব তো নিশ্চয়ই পাবেন।

লীগ নেতারা দাবী ওঠালেন পাকিস্তানের সীমান্ত হবে যমুনা নদী পর্যন্ত।

এইভাবে দুটি পক্ষ স্ব-স্ব সম্প্রদায়ের মনে যত আশা জাগিয়ে তুললেন, ততই অপর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে রোষবহ্নি ফুঁসে উঠতে লাগল।

…এমনি অবস্থার মাঝে ঘোষণা করা হল গুরুদাসপুর, অমৃতসর, জলন্ধর,

ফিরোজপুর, হোসিয়ারপুর, লুধিয়ানা, লাহোর, মণ্টগোমারী, লায়ালপুর, শেখপুরা, শিয়ালকোট এবং গুজরানওয়ালা—এই ১২টি জেলার ভার নিতে সীমান্তবাহিনী পাঠান হচ্ছে।

১লা আগস্ট সীমান্তবাহিনীর চার্জ নেবার কথা। মুসলমানদের উপর ব্যাপক আক্রমণের দিনও হল এই ১লা আগস্ট। ৩০শে জুলাই রাত্রিতে শহীদী দলের সংগঠক জাঠেদার উধম সিং-এর নিজগ্রাম নাগোকের মুসলমান-দের উপর আক্রমণ হল এই ব্যাপক আক্রমণের সংকেত নিশানা।

এক অমৃতসর জেলাতেই শতশত সশস্ত্র লোক বিপাশা, তারণতারণ এবং মাজিয়া অঞ্চলে আক্রমণের প্রথম মহড়া শুরু করে। যেখানেই মুসলমান দেখতে পাওয়া গেছে সেখানেই গ্রামের পর গ্রামে আক্রমণ চালিয়ে যাওয়া হল। ৫ই আগস্টের ভেতরেই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল সারা অমৃতসর জেলা। পুলিশ এবং সরকারী আমলা খোলাখুলি দাঙ্গায় অংশ গ্রহণ করল।

…অথচ পাঞ্জাবে যদি সীমান্তবাহিনী আদৌ না পাঠান হত, প্রকৃতপক্ষে তাহলেই হয়তো কম লোক মরত। পাঞ্জাবের দাঙ্গায় অনেক কম ধ্বংসকার্য হত। পাঞ্জাবে ধ্বংসের স্রোত বইয়ে দিতে এই সীমান্তবাহিনীর একক অবদান সবার ওপরে।

এর নাকের ডগায় বড় বড় অগ্নিকাণ্ড ঘটে গেছে, অথচ আগুন দিচ্ছে এমন একটি লোককেও এরা গ্রেপ্তার করেনি। মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড, শহীদী দল কিংবা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের কোন একটি বাহিনীরও অস্ত্র এরা কেড়ে নেয়নি বা তাদের গ্রেপ্তার করেনি। এদের অস্ত্রশস্ত্র, বারুদ-বোমার ভাণ্ডারগুলি কোথায়, তা জনসাধারণেরও অজানা ছিল না; কিন্তু এরা সেসব জায়গার ধার দিয়েও যায়নি।

…বেলুচি রেজিমেণ্ট লাহোর রেল স্টেশনে পলায়নপর অ-মুসলমান আশ্রয়প্রার্থীদের হয় গুলি করে মেরেছে, না হয় মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড যখন এঁদের হত্যা করেছে, তখন তারা নিষ্ক্রিয়ভাবে দাঁড়িয়ে দেখেছে। ১৩ই ও ১৪ই আগস্টে ৩০০০ থেকে ৪০০০ জন আশ্রয়প্রার্থী এইভাবে নিহত হয়।

ঐ একই লাহোর স্টেশনে আবার অমৃতসর থেকে যে মুসলমান আশ্রয়-প্রার্থীরা এসেছিলেন, সীমান্ত সেনাবাহিনীর ডোগরা রেজিমেণ্ট তাঁদের গুলি করে মেরেছে। বেলুচি ও ডোগরা রেজিমেণ্ট দুটিই সীমান্তবাহিনীর অংশ—দুটিরই অফিসার বৃটিশ। দুটিই সুপ্রীম কম্যাণ্ডারের 'প্রত্যক্ষ হুকুমে' কাজ করছিল। সে কাজ হল অরক্ষিত আশ্রয়প্রার্থীদের নিতান্ত 'নিরপেক্ষ-ভাবে' গুলি করে মারা। অমৃতসর স্টেশনে আকালীরা মুসলমান আশ্রয়-প্রার্থীদের হত্যা করেছে, আর শিখ রেজিমেণ্টগুলি এই সমস্ত আকালী দস্যু-দেরই আশ্রয় দিয়ে এসেছে।

সেখপুরাতে সেখানকার বেলুচি রেজিমেণ্ট হিন্দু এবং শিখ সংখ্যালঘু-দের ওপর মেশিনগান চালিয়ে হত্যা করেছে। সংবাদপত্র থেকে জানা যায়, সীমান্ত সেনাবাহিনী হাজার হাজার লোককে এইভাবে হত্যা করেছে। পাঞ্জাবে

সীমান্ত সেনাবাহিনী যে ভূমিকা গ্রহণ করে তা এমনি নারকীয়, এমনি পৈশাচিক।

চরম নৃশংসতা

অবস্থা চরমে উঠল ১১ই আগস্ট। সেদিন অমৃতসরের মুসলমান পুলিশদের ওপর নির্দেশ এল তাদের ছুটি দেওয়া হয়েছে এক সপ্তাহের। অস্ত্রশস্ত্র জমা দিয়ে যেতে হবে। এক সপ্তাহ পর তাদের রিপোর্ট করতে হবে লাহোরে গিয়ে। এ নির্দেশ ছিল একান্ত আকস্মিক এবং সংশ্লিষ্ট কর্মচারীরা ছাড়া আর কেউ জানত না।...

...পূর্ব পাঞ্জাবের মুসলমান পুলিশদের এবং লাহোর ও পশ্চিম পাঞ্জাবের শিখ পুলিশদের নিরস্ত্র করে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এই সংবাদ সংখ্যালঘুদের মনে দারুণ আতঙ্ক সৃষ্টি করল। তাঁরা জানতেন, সাম্প্রদায়িক খুনোখুনিতে পুলিশ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছে। নিজেদের সম্প্রদায়ের পুলিশের কাছ থেকে আর কোন রকম সাহায্যের ভরসা নেই জেনে তাঁরা আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। আর যখন অমৃতসর থেকে মুসলমান এবং লাহোর থেকে হিন্দু ও শিখরা শহর ত্যাগ করে প্রাণভয়ে কাতারে কাতারে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন তখন বোমা ফেলা হল এই পলায়নপর জনতার ওপর। রাইফেল ও রিভলবারের গুলি বর্ষিত হল, কৃপাণ আর বর্শার আঘাতে প্রাণ হারালেন শতশত অসহায় মানুষ।

মদ খেয়ে খুনের নেশায় পাগল হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে লাগল এই সমস্ত দস্যুবাহিনী; হতভাগ্য জনতার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল তারা; আর তাদের সক্রিয় সাহায্য করল অমৃতসরের হিন্দু ও শিখ পুলিশ আর সীমান্তবাহিনীর ইউনিটগুলি। ঠিক একই ঘটনা ঘটে লাহোরে।

...অমৃতসবে শতশত মুসলমান মেয়েকে হরণ করা হয়েছে বা তাঁদের উপর পাশবিক অত্যাচার করা হয়েছে। একবার একদল মুসলমান মেয়েকে উলঙ্গ করে রাস্তায় হাঁটিয়ে নিয়ে বেড়ান হয়। প্রকাশ্যে পাইকারীভাবে মহিলারা ধর্ষিতা হয়েছেন। মনুষ্যত্ব, শালীনতা এবং নারীত্বের প্রতি মর্যাদাবোধও নিঃশেষে লুপ্ত হয়েছে।

এই নৃশংস বর্বরতা উস্কিয়ে তুলে সারা দেশে আগুন ছড়িয়ে দেবার এক গভীর পরিকল্পনা ছিল। পশ্চিম পাঞ্জাবের গুজরানওয়ালা থেকে আমরা রিপোর্ট পেয়েছি যে ৬ই আগস্ট থেকেই মুসলমান মওলবীরা শুক্রবারের জুম্মা নমাজে সমাগত মুসলমানদের প্রতিশোধ নেবার জন্য ক্ষেপিয়ে তুলতে শুরু করেছে। তারা বক্তৃতা দিচ্ছিল—অমৃতসরে মুসলমান মেয়েদের স্তন কেটে নেওয়া হয়েছে। বর্শা ফলকে মুসলমান শিশুর ছিন্ন মুণ্ড গেঁথে নিয়ে মিছিল বেরিয়েছে। পরের দিনই শুরু হয়ে গেল ভীষণ অগ্নিকাণ্ড ও লুটপাট। হিন্দু ও শিখেরা বাস্তু ত্যাগ করতে আরম্ভ করলেন। ট্রেন আক্রমণ করে হত্যা করা হল আশ্রয়প্রার্থীদের। ১৪ই আগস্টের ভেতরেই

কামোক, ওয়াজিরাবাদ, গাখার, আমিনাবাদ, আকালগড়, রামনগর প্রভৃতি জায়গাতেও আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ১৪ই তারিখ জম্মুগামী একটি ট্রেনে মুসলমানেরা আক্রমণ করে এবং ফলে স্ত্রীলোক ও শিশু নির্বিশেষে সমস্ত যাত্রী নিহত হয়।

অমৃতসরের রাস্তায় যা ঘটেছিল শিয়ালকোটের রাস্তায় তেমনি শিখ ও হিন্দু মেয়েদের উলঙ্গ করে হাঁটিয়ে বেড়ান হয়। প্রকাশ্যে পাইকারীভাবে পাশবিক অত্যাচার চলে। একই ব্যাপার ঘটে শেখপুরাতেও। নিজের হাতে কন্যাকে হত্যা করে চরম অমর্যাদার হাত থেকে মুক্তি দিতে হয়েছে বাপ-মাদের। পাঞ্জাবের উভয় অংশে এমনিভাবে নিহত হয়েছে সহস্র সহস্র মানুষ। রাস্তায়, মাঠে, ঘাটে আর প্ল্যাটফর্মের উপর শুধু পড়ে রইল শতশত ছিন্নভিন্ন বিকৃত শবের স্তূপ।

যেদিকেই পা বাড়িয়েছি আমাদের চোখে পড়েছে শুধু মৃতদেহ—মেয়ে, পুরুষ আর শিশু। ···এত মৃতদেহ ! কে কি করবে এ নিয়ে ! যেখানে যে ঢলে পড়েছে সেখানেই পড়ে রইল তার শব। শুধু কুকুর আর শকুনির পাল ঝাঁক বেঁধে নামল তার ওপর।

···অমৃতসর, লাহোর এবং শিয়ালকোট সম্পর্কে যে বীভৎস কাহিনীর বর্ণনা আমরা করেছি, অন্য জেলাগুলির ছবিও প্রায় অনুরূপ। পূর্ব পাঞ্জাবে অমৃতসর, জলন্ধর ও হোসিয়ারপুর এবং পশ্চিম পাঞ্জাবে লাহোর, গুজরান-ওয়ালা, শেখপুরা ও শিয়ালকোট ছিল নৃশংসতার রঙ্গভূমি।

প্রাণহানি হয়েছে দেড় লক্ষের ওপর এবং হাজার হাজার মেয়ের ওপর পাশবিক অত্যাচার হয়েছে। অপহৃত হয়েছে হাজার হাজার মেয়ে। কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হয়েছে। অমৃতসর এবং লাহোর যেমন জ্বলেছে এমন আর কোন শহর কোনদিন জ্বলেনি। লুণ্ঠন যা হয়েছে তা বর্ণনাতীত। সমস্ত অঞ্চল আজ পরিত্যক্ত। নিরাপত্তার জন্য প্রাণভয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে ছুটেছে লাখ লাখ মানুষ।

পশ্চিম পাঞ্জাবে ছিলেন ৩৬ লক্ষ হিন্দু ও শিখ, পূর্ব পাঞ্জাবে ৪৪ লক্ষ মুসলমান। প্রত্যেকেই স্থান ত্যাগ করার জন্য ব্যাকুল। এমন কি রাওয়াল-পিণ্ডি এবং আম্বালা থেকেও সংখ্যালঘুরা বেরিয়ে পড়েছেন। সমস্যা যে কত বিরাট তা সহজেই বোঝা যায়।

কমিউনিস্ট পার্টি এবং লাল ঝাণ্ডার কাজ

··পাঞ্জাবে তরুণ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন আজ ছিন্নভিন্ন। মুসলমান শ্রমিকেরা চলে গেছেন পশ্চিমে, অ-মুসলমান শ্রমিকেরা পূর্বে। কারখানা-গুলি হয় ভস্মীভূত, নয় বন্ধ। লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের কাজ নেই।

··প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল প্রগতিশীল দাঙ্গা-বিরোধী মানুষদের। ঘটনার মোড় ফেরাতে তাঁরা যে বিশেষ কিছুই করতে পারেননি তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই · ভাখনা হোল ৮২ বছরের প্রবীণ বিপ্লবী

কমিউনিস্ট নেতা সোহন সিং ভাখনার জন্মভূমি। এটা ছিল মুসলমানদের পক্ষে সম্পূর্ণ নিরাপদ জায়গা। এই অঞ্চলে লাল ঝাণ্ডার নেতৃত্বে শিখ কৃষকেরা মুসলমান কৃষকদের রক্ষা করে খাইয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

কিন্তু বাধা ছিল অত্যন্ত প্রবল। খাসা স্টেশনের নিকটে হোসিয়ার নগরে লাল ঝাণ্ডার কৃষকেরা প্রায় তিনশ' মুসলমানকে আশ্রয় দেন। দুইবার সশস্ত্র গুণ্ডা বাহিনী গ্রামটিকে আক্রমণ করেছে। দুইবারই তাদের হারিয়ে দেওয়া হয়েছে। পণ্ডিত নেহরু প্রথম সফর শেষ করে যখন চলে গেলেন, তারপর ১৮ই আগস্ট তারিখে সশস্ত্র আকালী দলের সঙ্গে শিখ মিলিটারী এসে হানা দিল গ্রামে। এক এক করে ৩০০ মুসলমানকে টেনে এনে খুন করে ফেলা হয়। মিলিটারির সামনে গ্রামের শিখ কৃষকেরা কি করতে পারতেন আর!

এই অবস্থার মুসলমানদের ওপর সামান্য দয়া-দাক্ষিণ্য দেখালেও আপনার মৃত্যু হতে পারত। তা সত্ত্বেও আশার কথা এই যে এর মধ্যেই কয়েকজন দেশপ্রেমিক কৃষক-মুসলমান ভাইদের সাহায্য করতে গিয়ে মৃত্যু বরণ করতে কুণ্ঠিত হননি।

অমৃতসর জেলার খারপারখেরি গ্রামে শিখ কৃষকেরা ৯০০ মুসলমানকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। যখন অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়াল যে মুসলমানদের আর নিরাপদে রাখা যায় না, তখন তাঁরা ওই নয়শত মুসলমানকে সঙ্গে করে নিয়ে-গেলেন অমৃতসর স্টেশনে ট্রেনে উঠিয়ে দিতে। স্টেনগান নিয়ে সশস্ত্র বাহিনী-গুলি তখন ঘুরে বেড়াচ্ছে চারদিকে, যেখানে পারছে মুসলমানদের গুলি করে মারছে। সে অবস্থায় শিখ-কৃষকরা উন্মুক্ত কৃপাণ হাতে ওই নয়শত মুসলমান-দের দুই পাশে মার্চ করতে করতে এগিয়ে গিয়েছিলেন। এই দৃশ্য দেখতে পাওয়া ভরসার কথা।

কিন্তু আমরা করতে পারলাম কতটুকু? মরুভূমিতে একফোঁটা জলের বেশী আমরাও দিতে পারিনি। অবস্থার চাবিকাঠি ছিল ঘৃণ্যতম প্রতিক্রিয়া-শীল শক্তিগুলির সম্পূর্ণ করায়ত্ত। তাদের সাহায্যে এসে দাঁড়াল পুলিশ ও মিলিটারী। মনুষ্যত্বের প্রাথমিক কর্ত্তব্যটুকু করতে গেলেও মৃত্যুর মুখোমুখি না দাঁড়িয়ে উপায় ছিল না। সশস্ত্র বাহিনীর হাতে আমাদের অনেক কমরেড নিহত হয়েছেন, বুলেটের ঘায়ে আহত হয়েছেন অনেকে।'

('রক্তক্ষয়ী পাঞ্জাব' থেকে উদ্ধৃত)

এ প্রসঙ্গে পাঞ্জাবের শীর্ষস্থানীয় সি. পি. আই নেতা সতপাল ডাঙ বলছেন, 'পাঞ্জাবের নারকীয় তাণ্ডবের পশ্চাৎভূমি রচিত হয়েছে অনেক অনেক আগে। শিখ-সম্প্রদায় মোগল আমল থেকেই নির্যাতিত। তার বিষাক্ত স্মৃতি পুরুষানুক্রমিক ধারায় প্রবহমান। সহজেই তারা সাম্প্রদায়িক চক্রান্তের শিকার হয়ে পড়ে। হিন্দু ও মুসলমান দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যেও সেদিন শুভবুদ্ধি ও চেতনার একান্ত অভাব দেখা গিয়েছে। কমিউনিস্টরাই একমাত্র উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। কমিউনিস্টরাই একমাত্র আপ্রাণ চেষ্টা করেছে সংখ্যা-লঘুদের বাঁচাতে—হিন্দুপ্রধান অঞ্চলে মুসলমানদের এবং মুসলমান সংখ্যা-

গুরু অঞ্চলে হিন্দু ও শিখদের। ফিরোজপুরের মতো কমিউনিস্ট প্রভাবাধীন অঞ্চলে হত্যাকাণ্ড খুব কমই ঘটেছে। কমিউনিস্টরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের আশ্রয় দিয়ে বাঁচিয়েছে এবং শেষে নিরাপদ স্থানে তাদের পৌঁছে দিয়েছে।'

'যখন অমৃতসর জ্বলছে'—উর্দু ভাষায় লেখা বইখানি ১৯৭৮ সালে পাকিস্তানে প্রকাশিত হয়। গোটা বইটা সাম্প্রদায়িক বিষে জর্জর। এহেন বইয়ের লেখককেও স্বীকার করতে হয়েছে যে কমিউনিস্টরা মুসলমানদের প্রাণরক্ষা করেছে। বাবা ঘনশ্যাম সিং-এর মতো একজন সুপরিচিত কমিউনিস্ট নেতার নামও বইখানিতে উল্লিখিত। তিনি নিজের বাড়িতে বহু মুসলমান পরিবারকে আশ্রয় দেন। স্বাধীনতার পর নেহরু অমৃতসরে গিয়ে তাঁকে বাহবা দিয়ে আসেন। কিন্তু গোটা পাঞ্জাবে সেদিন কমিউনিস্টদের প্রভাব আর কতটুকু!

দেশব্যাপী ভ্রাতৃঘাতী গৃহযুদ্ধের পটভূমিতে পার্টির চোখে মুসলিম লীগের প্রকৃত চেহারা ধরা পড়ে। কমিউনিস্ট পার্টির দৃষ্টিতে এতদিন পর্যন্ত মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক চরিত্রের দিকটা ছিল গৌণ। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য অপরিহার্য ছিল কংগ্রেস-লীগ-কমিউনিস্ট ঐক্য। কংগ্রেস ও লীগের স্থান দেশের রাজনীতিতে পার্টির মতে সমান গুরুত্বপূর্ণ। লীগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামে'র ভয়াবহ পরিণাম মুসলিম লীগ সম্পর্কে পার্টির মধ্যে দ্বিতীয় চিন্তার উন্মেষ ঘটায়।

বি. টি. রণদিভের মতে, 'এ প্রসঙ্গে রজনী পাম দত্তের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনিই প্রথম মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক চরিত্র সম্বন্ধে পার্টি নেতৃত্বকে সজাগ করেন। মুসলিম লীগকে মুসলমানদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে দেখানো এবং কংগ্রেস ও লীগকে একই আসনে বসানোর যুক্তিকে তিনি নিপুণভাবে খণ্ডন করেন।' (সি. পি. আই. ২য় পার্টি কংগ্রেসে সংস্কারবাদী বিচ্যুতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন, পৃ ১৭৫)

মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক জনবিরোধী চরিত্র সম্পর্কে রজনী পাম দত্তের অভিমত পার্টি নেতৃত্ব অবশেষে গ্রহণ করেন। এবং ১৯৪৬ সালের ১লা নভেম্বর কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে এই প্রথম মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িকতাবাদী ভূমিকা জনসমক্ষে খোলাখুলি নিন্দা করা হয়। এই বিবৃতিতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলা হয়—মুসলিম লীগ এ পর্যন্ত কোন প্রকৃত গণসংগ্রামে অংশগ্রহণ করেনি এবং লীগের সংগ্রাম কংগ্রেস ও হিন্দুদের বিরুদ্ধে। 'স্বাধীনতা'য় প্রকাশিত ইস্তাহারটির পূর্ণ বয়ান :

'শৃঙ্খলিত ভারতবাসীর মিলিত সংগ্রাম ভাঙ্গিয়া ফেলিতে দিও না
কমিউনিস্ট পার্টির আহ্বান

কলিকাতায় রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা হইতে দূরে থাকিবার জন্য শ্রমিকদের
প্রতি অভিনন্দন

[ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার]

লীগের 'সংগ্রাম' কংগ্রেস ও হিন্দুর বিরুদ্ধে

ভারতবর্ষে যতগুলি গণ-অভ্যুত্থান এই পর্যন্ত সংগঠিত হইয়াছে, তাহার একটিতেও লীগ নেতৃত্ব প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিয়া স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করে নাই। লীগ নেতৃত্ব ভারতের ১০ কোটি মুসলমানের প্রতিনিধিত্ব দাবী করিয়া থাকে, অথচ ১৯৪৩ সালে যখন ৩০ লক্ষ লোক যাহার অধিকাংশই মুসলমান চাষী, দুর্ভিক্ষে প্রাণ দিল, তখন তাঁহারা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ঘোষণার সাহস করেন নাই। মুসলমান চাষীদের রক্ষার জন্য সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ প্রভুদের বিরুদ্ধে তাঁহাদের বাক্যস্ফূর্তি করিবার স্পর্ধা হয় নাই।

কাশ্মীরের বীর অধিবাসীদের শতকরা ৯০ জনই নির্য্যাতিত ও অত্যাচারিত মুসলমান। অত্যাচারী মহারাজার বিরুদ্ধে লীগ নেতৃত্ব কখনো তাহাদিগকে সমর্থন জানায় নাই বা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দেয় নাই।

এই প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্ব ভারত সরকারের বিরুদ্ধে রেল শ্রমিকদের ঐক্য-বদ্ধ সংগ্রামের বিরোধিতা করিয়াছে। পাঞ্জাবের মুসলমান জমিদারদের হাত হইতে মুসলমান চাষীকে রক্ষা করিবার জন্য কোন কিছুই ইহারা করে নাই।

স্বতরাং এই 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামের' আহ্বান কাহাদের স্বার্থে এবং কি উদ্দেশ্যে? ১৬ই আগস্টের আহ্বান সাম্রাজ্যবাদী শাসনকে কায়েম রাখিবার আহ্বান, কংগ্রেসের খপ্পর হইতে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে উদ্ধারের আহ্বান; ইহা ক্ষমতা কাড়াকাড়ির রাজনীতি, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মুসলিম কায়েমী-স্বার্থের খেলা, বৃটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম নহে; ইহা কংগ্রেস ও হিন্দুর বিরুদ্ধে বৃটিশের সাহায্য প্রার্থনার আহ্বান। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের মনের মত আহ্বান।

মুসলিম লীগ নেতৃত্ব তাহার সমর্থকদের হিন্দুদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া ক্ষমতা আদায়ের জন্য সম্মিলিত সংগ্রামকে ইচ্ছাপূর্বক অস্বীকার করিয়া এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সংঘর্ষের আহ্বান জানাইয়া সাম্রাজ্যবাদের গৃহযুদ্ধের চক্রান্তকে সফল করিবার সহায়তাই করিয়াছে।' (স্বাধীনতা. ১. ৯. ৪৬)

একত্রিশ

১৯৪৬ সালটি ছিল দেশী ও বিদেশী শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থানের বৎসর। সরকারি হিসাবে প্রকাশ, এই এক বৎসরে মোট ১৬২৯টি ধর্মঘটে ১৯ লক্ষ ৬২ হাজার শ্রমিক জড়িত ছিল। তার ফলে উৎপাদনের যে ক্ষতি হয়েছে তার পরিমাণ মোট ১ কোটি ২৭ লক্ষ ১৮ হাজার শ্রমিকের একদিনের কাজের সমান।

১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্টের পর সারাদেশব্যাপী ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের ফলে শ্রেণী সংগ্রামের মূল স্রোত স্তিমিত হয়েছে—সন্দেহ নেই; কিন্তু একেবারে মিলিয়ে যায়নি—ক্ষীণতর হলেও শহরাঞ্চলে শ্রেণী সংগ্রাম প্রবহমান। সফল ট্রাম ধর্মঘটের কথা আগেই বলা হয়েছে। ১৯৪৭ সালের ১লা মে 'স্বাধীনতা'য় তুষার চট্টোপাধ্যায় লিখছেন, 'দাঙ্গার হানাহানির মধ্যেই কলিকাতার স্ট্যাণ্ডার্ড ফার্মাসী, ন্যাশনাল ট্যানারী, গোবিন্দ শিট মেটাল, ওরিয়েণ্ট ফ্যানের শ্রমিকরা দুইমাস ধর্মঘট চালাইয়াছেন।'

১৯৪৭ সালের সূচনাতেই ১০ই জানুয়ারি ঘটে ১৫ হাজার সরকারি কর্মচারীর সাধারণ ধর্মঘট। তুষার চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায়, 'সেইদিন হইতে আবার কলিকাতার চেহারা ফিরিয়া গেল। তারপরেই ঘটে খণ্ড খণ্ড ভাবে ২০-২৫ হাজার শ্রমিকের সাধারণ ধর্মঘট।'

৪৬-এর আগস্টের মাত্র পাঁচমাস পর ৪৭ এর ২১শে জানুয়ারি কলকাতার ছাত্ররা আবার রাস্তায় নামে। 'ভিয়েতনাম থেকে হাত ওঠাও' ধ্বনি দিয়ে দমদম বিমান বন্দরকে ফরাসি যুদ্ধ বিমানের অবতরণ ঘাঁটি করার বিরুদ্ধে ছাত্ররা প্রতিবাদ জানায়। গুলি চলে—হতাহত হয়। গুলিতে শহীদ হলেন কিশোর ধীরঞ্জন ও সুখেন্দুবিকাশ। আবার যেন ৪৬-এর ঝড়ো দিনগুলি ক্ষণিকের জন্য হলেও ফিরে আসে। সমস্ত সাম্প্রদায়িক বিভেদ ভুলে গিয়ে শ্রমিকরা আবার ধর্মঘটের পথে পা বাড়ায়। পোর্ট ও হাওড়ার ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার শ্রমিকরা ধর্মঘটের রাস্তায় নামে। কানপুরের এক লক্ষ সুতাকল শ্রমিক কাজ বন্ধ করে। কয়লাখনির শ্রমিকরাও ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেয়। কোয়াম্বাটুর, করাচী এবং অন্যান্য জায়গায় শ্রমিক-অসন্তোষ সংগ্রামের আকার নেয়। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের শ্রমমন্ত্রী বাবু জগজীবন রামের মতে, 'এর মূলে রয়েছে কমিউনিস্টরা'।

'সর্বত্র ধর্মঘট · সবাই চায় কম কাজ করে বেশি বেতন'—গান্ধীজীর ব্যক্তিগত সচিব প্যারেলালের কাছে বিড়লার খেদোক্তি।

এই প্রেক্ষাপটে সুমিত সরকারের অভিমত, '১৯৪৬-৪৭ সালের দিনগুলিতে হিন্দু-মুসলমান হানাহানি রোধ করার জন্যে গান্ধীজীর একক প্রয়াস—যতই মহৎ ও মর্মস্পর্শী হোক না কেন—এই দুর্যোগে তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর; তার চেয়ে শত বিভেদ সত্ত্বেও, যদি আবার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ঐক্যবদ্ধ জঙ্গী লড়াইয়ের ডাক দেওয়া হত—তাহলে ঘটনাস্রোত অন্যদিকে মোড় নিত। কিন্তু কারা দেবে এই ডাক! এমনকি শ্রমিক ধর্মঘটগুলির দিগন্তও সে অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়া আদায়ের চৌহদ্দিতে সীমাবদ্ধ। তাদের সামনে ছিল না কোন সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক লক্ষ্য। শ্রমিক নেতৃত্ব জাতীয় স্তরে প্রভাব বিস্তার করতে ব্যর্থ হয়েছে।' (মডার্ন ইন্ডিয়া, পৃ ৪০৮-৪০৯)

দাঙ্গার প্রতিকূল পরিবেশে শহরের লড়াই যখন ছিন্নভিন্ন—শ্রমিক আন্দোলনের স্রোতও যখন ক্ষীণতর—তখন বাংলার গ্রামাঞ্চল উত্তাল। তেভাগার

লড়াইয়ের ময়দানে লক্ষ লক্ষ কৃষক সামিল। শহরের সাম্প্রদায়িকতার বিষ বাংলার গ্রামাঞ্চলকে ততখানি কলুষিত করতে পারেনি। বিষিয়ে ওঠেনি সেখানকার হিন্দু-মুসলমান প্রতিবেশীর পারস্পরিক সম্পর্ক। এমন কি নোয়াখালির দাঙ্গাও নিছক সাম্প্রদায়িক ঘটনা নয়। অন্নদাশংকর রায়ের উপন্যাস, 'ক্রান্তদর্শী'র অন্যতম প্রধান চরিত্র মানস বলছে :

'আমি আগে ঠিক বুঝতে পারিনি, নোয়াখালির অতিরঞ্জিত বিবরণ শুনে ব্যালান্স হারিয়েছি। ক্রমে ক্রমে উপলব্ধি করেছি যে মানুষকে যদি মুসলমান না ভেবে চাষী বা ক্ষেতমজুর ভাবি তবে এর অর্থ অতি পরিষ্কার। এটা ধর্মের নাম করে শ্রেণী সংগ্রাম। জমিদার, মহাজন, জোতদার বা পুলিশ যদি প্রধানত হিন্দু না-হতো এটা হতো মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুসলমানের শ্রেণী সংগ্রাম।' (ক্রান্তদর্শী, চতুর্থ খণ্ড, পৃ ২৮৩)

অতএব তেভাগা আন্দোলনের পরিমিতি যাই হোক না কেন—এই আন্দোলনের ফলে বাংলার গ্রামাঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বড় আকারে ঘটতে পারেনি। এইটুকু শুধু সান্ত্বনা। কিন্তু কলকাতা-নোয়াখালি-বিহার-পাঞ্জাব! এক বিয়োগান্ত দৃশ্যের মুখোমুখি হয়ে গোটা পার্টি যেন এক অসহায়তার শিকার।

কুমুদ বিশ্বাস বলছেন, 'পরের বছর পার্টির কাজ হয়ে দাঁড়াল—'হিল আপ দি উন্ডস' (ক্ষত নিরাময় করা)।' নৃপেন ব্যানার্জি বলছেন, 'তারপর আর কিছু জমল না। এখন শুধু সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন। পার্টি হয়ে পড়ল 'ডিফেনসিভ' (রক্ষণাত্মক)। দাংগা না করে, পরস্পরকে না মেরে হিন্দু-মুসলমান রাজনৈতিক বন্দোবস্ত করে নাও। এই হয়ে দাঁড়াল পার্টির মূল বক্তব্য।'

সে সময়ে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক যা দাঁড়িয়েছিল তার এক বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা দিচ্ছেন ময়মনসিংহের এক মুসলমান চাষী :

'আমাদের গাঁয়ের অনেকেই আসামে গিয়ে চাষবাস করতে থাকে। তারা শেষ পর্যন্ত সেখানে থেকেই যায়। ময়মনসিংহের জমির চেয়েও সেখানকার মাটি অনেক উর্বরা। তাছাড়া জমিও সস্তা। আমি সেখানে বছরখানেক রয়েই গেলাম। তারপর ঘরে ফেরার তাগাদা দিয়ে বাড়ি থেকে চিঠি গেল। কিন্তু ফেরার পথেই যত ঝামেলা। কী সেই দিনগুলো। লোকে ইংরেজ শাসন খতম করে স্বাধীনতা চাইছে—পাকিস্তান চাইছে। তাছাড়া চলছে দেশ জুড়ে হিন্দু-মুসলমানে মারামারি। আমি আসাম থেকে দেশে ফেরার পথে ট্রেনের কামরায় এক মহিলার কাছাকাছি বসি। তিনি শুয়েছিলেন; আমাকে দেখামাত্র উঠে বসে চীৎকার করে বললেন, 'তুমি মুসলমান, তুমি এখানে বসতে পারবে না। এই ট্রেনে মুসলমানদের বসার জায়গা নেই। তোমার দেশ তো মক্কা—তুমি সেখানে চলে যাচ্ছ না কেন?' একজন শিক্ষিত

মহিলার মুখে এই উক্তি ! আমি তাহলে মানুষ নই ! তিনিই কেবল মানুষ ! যাত্রী যারা বসেছিল—তারা সবাই হিন্দু—তারা হেসে উঠল। কয়েকজন পুলিশও ছিল ট্রেনের কামরায়—তারাও হাসিতে যোগ দিল। তারপর সারাটা পথ মাথা হেঁট করে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম—এমন কি বসার জায়গা পেয়েও আমি আর বসতে সাহস করলাম না। কিন্তু যেই আমি বাংলার সীমানায় এসে পৌঁছলাম—তখন উল্টো দৃশ্য। তখন দেখি হিন্দুরাই দাঁড়িয়ে আর ভয়ে কাঁটা। আর মুসলমানরা রয়েছে বসে আর মোচে তা দিচ্ছে।' (এ কোয়ায়েট ভায়োলেন্স, পৃ ৪৮-৪৯)

এই পটভূমিতে ক্ষমতা হস্তান্তর ও দেশভাগ। ঘটনাপ্রবাহের এই অমোঘ পরিণতি প্রসঙ্গে নেহরুর স্বীকারোক্তি :

'সত্যি কথা এই যে আমরা ছিলাম ক্লান্ত মানুষ, বয়সও বেড়ে যাচ্ছিল। আবার জেলে যাওয়ার ভবিষ্যৎ আমাদের অল্প লোকই সহ্য করতে পারত —আর আমরা যেমন চেয়েছিলাম যদি (সেই) ঐক্যবদ্ধ ভারতের জন্য রুখে দাঁড়াতাম, স্পষ্টতই আমাদের জন্য অপেক্ষা করে ছিল কারাগার। পাঞ্জাবে আমরা আগুন জ্বলতে দেখলাম, সেখানকার প্রাত্যহিক হত্যাকাণ্ডের কথাও শুনলাম। ভারত ভাগের পরিকল্পনা এর থেকে বেরিয়ে আসার পথ হাজির করেছিল, আমরা সেটাই গ্রহণ করলাম। আমরা আশা করেছিলাম, এই বিভাগ হবে সাময়িক, পাকিস্তান আমাদের কাছে ফিরে আসতে বাধ্য। আমরা কেউই ভাবিনি সম্পর্ক কতটা তিক্ত করে তুলবে কাশ্মীরের হত্যাকাণ্ড ও সংকট।' (দি লাস্ট ডেজ অফ দি ব্রিটিশ রাজ, পৃ ২৮৫)

কলকাতা-নোয়াখালি-বিহার-পাঞ্জাবের মুখোমুখি হয়ে কংগ্রেস কর্মীদের মন সাম্প্রদায়িকতায় বিষিয়ে ওঠে। বিহারের হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাকে নেহরু কড়া ভাষায় নিন্দা করেন। কলকাতায় দাঙ্গা গোড়াতেই থামিয়ে দেবার জন্য সৈন্যবাহিনী না ডাকায় আজাদ বড়লাট ওয়াভেলকে দায়ী করেন। কিন্তু ভিন্ন সুর প্যাটেলের উক্তিতে। তিনি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদকে এক চিঠিতে বলেন যে বিহারের কংগ্রেস মন্ত্রীসভাকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্যে বেশি নিন্দাবাদ করলে মুসলিম লীগকে আস্কারা দেওয়া হবে।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং তার পাশাপাশি কেন্দ্রে কংগ্রেস-লীগ কোয়ালিশনের অচল অবস্থা—এই পটভূমিকায় ১৯৪৭ সালের গোড়ার দিকে নেহরু ও প্যাটেল সহ অনেকের মন দেশভাগের বিনিময়ে ক্ষমতা লাভের দিকে ঝুঁকে পড়ে। অন্য সময়ে হয়তো দেশভাগের চিন্তা তাঁদের স্বপ্নেও স্থান পেত না। ১৯৪৭ সালের এপ্রিলে কংগ্রেস সভাপতি আচার্য কৃপালনী মাউন্টব্যাটেনকে জানান, 'বিনা যুদ্ধে তারা বরং পাকিস্তান নিয়ে যাক—কিন্তু বাংলা ও পাঞ্জাবের সুষ্ঠু বিভাগ চাই'। (মডার্ন ইণ্ডিয়া, পৃ ৪৩৬-৪৩৭)

বাত্রিশ

সুমিত সরকার লিখছেন, 'বাংলা মুসলিম লীগের অনেকেই কিন্তু সুদূর পাঞ্জাবের তাঁবেদারি মেনে নিতে রাজি নন। যেমন সোহরাবর্দী ও আবুল হাশিম। তাঁরা হিন্দুস্থান-পাকিস্তান দুটোরই বাইরে অবিভক্ত বাংলা গঠনের পরিকল্পনা তৈরি করেন। শরৎ বসুর মতো কয়েকজন কংগ্রেস নেতাও প্রস্তাবটি বিবেচনা করে দেখতে রাজি হন।' (মডার্ন ইন্ডিয়া, পৃ ৪৪৯)

এ প্রসঙ্গে অন্নদাশংকর রায় বলেন, 'সে সময় সোহরাবর্দী বাংলার প্রাইম মিনিস্টার। সোহরাবর্দী 'কালচার্ড', এফিসিয়েন্ট, আনস্ক্রুপুলাস অ্যান্ড করাপ্ট' (মার্জিত, দক্ষ, নির্বিবেক ও দুর্নীতিগ্রস্ত)। নাজিমুদ্দিন, আমার ধারণায়, সৎ। বাংলা ভাগ হলে পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী হবে ঢাকা। সেখানে নাজিমুদ্দিনের প্রতিপত্তি বেশি—সোহরাবর্দী সেখানে পাত্তা পাবেন না। তাই তিনি স্লোগান দিলেন বৃহত্তর-বঙ্গের। সেই বঙ্গ—হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান দুই রাষ্ট্র থেকে আলাদা হয়ে থাকবে। এই ব্যাপারে গান্ধীজীরও কিছু মদত ছিল। তিনি শশাংক সান্যালকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—শরৎ এখন কী করছে? তার খবর নাও।'

বিষয়টির উপর আরও একটু আলোকপাত করেন গান্ধী-শিষ্য অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু। তিনি তাঁর রোজনামচায় লেখেন:

১০. ৫. ১৯৪৭ (শনিবার) সোদপুর

কয়েকজন মুসলিম লীগ সদস্য একটি নতুন পরিকল্পনার উদ্ভব ঘটিয়েছেন। এবং তার সঙ্গে যুক্ত শরৎ বসুর নাম। পরিকল্পনাটির মর্মকথা হচ্ছে ভারত পাকিস্তান ও সংযুক্ত সার্বভৌম বাংলা—এই তিনভাগে দেশকে ভাগ করা। শরৎবাবু এ প্রসঙ্গে গান্ধীজীর সঙ্গে আলাপ করেন এবং বিষয়টির নানাদিক পর্যালোচনা করার জন্যে সঙ্গে করে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্পাদক আবুল হাশিমকে সোদপুরে নিয়ে আসেন। আবুল হাশিম প্রায় দেড়ঘণ্টা ধরে গান্ধীজীর সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলাপ করেন। শরৎবাবু সারাক্ষণ চুপচাপ বসেছিলেন। হাশিম সাহেবের মূল কথা হচ্ছে হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক—শেষ পর্যন্ত সবাই বাঙালি। সকলেরই ভাষা এক—সংস্কৃতি এক। তারা কেন হাজার মাইল দূরের পাকিস্তানীদের শাসন মেনে নেবে?' (মাই ডেজ উইথ গান্ধী, পৃ ২২৭)

১১. ৫. ১৯৪৭ (রবিবার) সোদপুর

'এইচ. এস. সোহরাবর্দী আজ গান্ধীজীর সঙ্গে সোদপুরে দেখা করেন। তিনিই সংযুক্ত সার্বভৌম বাংলার মূল প্রবক্তা। তিনি গান্ধীজীর সামনে তার এক উজ্জ্বল ছবি আঁকেন।' (ঐ, পৃ ২৩৯)

১৩. ৫. ১৯৪৭ (মঙ্গলবার) সোদপুর।

'শ্যামাপ্রসাদবাবু এই বলে আলোচনা শুরু করেন—সোহরাবর্দীর প্রস্তাব আসলে বাংলার ইউরোপীয় বণিক-কুলের প্রস্তাব। বাংলাদেশ যদি ভাগ হয়—তাহলে পাটশিল্প মার খাবে। চটকলগুলো পড়বে পশ্চিম বাংলায়—আর কাঁচা পাট সব অন্য রাষ্ট্রে। এমনকি বড়লাট মাউণ্টব্যাটেনও তাঁকে প্রস্তাবটি ভালো করে দেখতে বলেছেন।

গান্ধীজী তার উত্তরে বলেন, 'অতএব এই প্রস্তাবের পিতৃত্ব নিয়েই আপনার যত আপত্তি! না, আমি চাই, আপনি এই প্রস্তাবের ভালোমন্দ খতিয়ে দেখে—তবে এর সমালোচনা করুন।'

…শ্যামাপ্রসাদবাবু জানতে চাইলেন, 'ধরুন, অধিকাংশ হিন্দু যদি ভারতের সঙ্গে এবং অধিকাংশ মুসলমান পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হতে চান—সেক্ষেত্রে কী হবে?'

গান্ধীজী বলেন, 'সেক্ষেত্রে বাংলা ভাগ হবে। কিন্তু সেই বিভাজন ঘটবে বাংলার জনগণের সম্মতি অনুসারে। বৃটিশ-সৃষ্ট বঙ্গবিভাগকে যে-কোন মূল্যে ঠেকাতে হবে।'

…পরিশেষে গান্ধীজী শ্যামাপ্রসাদবাবুকে বলেন, 'ব্যক্তি-সোহরাবর্দীর উপর আস্থা না থাকলেও—এই প্রস্তাবের ভালোমন্দ ভেবে দেখতে হবে। বাঙালী হিন্দু ও মুসলমান—তারা এক ও অভিন্ন। এটা একবার স্বীকার করে নিলেই—লীগের দ্বিজাতি তত্ত্বের উপর বড় আঘাত হানা হবে।' (ঐ, পৃ ২৩৩-৩৫)

সত্যি গান্ধীজী কত ঐকান্তিক ভাবেই না দ্বিজাতি তত্ত্বকে নস্যাৎ করতে চেয়েছেন। সংযুক্ত সার্বভৌম বাংলা—তাঁর একটি মরিয়া প্রচেষ্টা। তিনি চেয়েছিলেন এর মাধ্যমে ভারত বিভাগ ঠেকাতে।' (ঐ, পৃ ২৩৬)

দেখা যাচ্ছে যে যতই ক্ষমতা হস্তান্তর ও দেশবিভাগের মুহূর্ত ঘনিয়ে আসছে ততই লীগ ও কংগ্রেস নেতাদের এক প্রভাবশালী অংশ বাংলাদেশকে অখণ্ড ও ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন।

আবুল হাশিম লিখছেন:

'আমি শরৎবাবুর ১নং উডবার্ন পার্কের বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করি। আমার সঙ্গে ছিলেন মুন্সিগঞ্জের শামসুদ্দিন আহমদ ও আমার ছেলে বদরুদ্দিন মহম্মদ উমর। তিনি আমার সঙ্গে কথা বলার পর বিভক্ত ভারতে ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন বাংলার প্রস্তাব মেনে নেন। কিন্তু আলোচনার কথা আমার সঙ্গী শামসুদ্দিন কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা দৈনিক 'স্বাধীনতা'র রিপোর্টারের কাছে ফাঁস করে দেন। এবং তাঁরা বিকৃতভাবে বড় হরফে 'বৃহত্তর বঙ্গ'—আমার দাবি বলে ছাপান। 'বৃহত্তর বঙ্গ' গঠিত হলে মুসলমানরা সেখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত হতে বাধ্য। এ ধরনের বিকৃত সংবাদ পরিবেশন আমার রাজনৈতিক শত্রুদের হাতে আমার বিরুদ্ধে

এক জোরালো হাতিয়ার তুলে দিল। শামসুদ্দিন ছিলেন একজন প্রচ্ছন্ন কমিউনিস্ট। কমিউনিস্ট পার্টির চর হয়ে তিনি আমাদের দলে ঢুকেছিলেন। কমিউনিস্ট অথচ পরে বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করে বসেন।' (ইন রেট্রসপেক্‌ট্, পৃ ১৩৪-৩৫)

এ জায়গায় হাশিম সাহেব কমিউনিস্ট পার্টিকে ভুল বুঝলেন। কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকার কথায় আমরা পরে আসছি।

আবুল হাশিম বলছেন :

'এপ্রিল মাসের শেষাশেষি সোহরাবর্দীর ৪০ নং থিয়েটার রোডের বাসভবনে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতাদের এক যুক্ত বৈঠক বসে। সেখানে স্বাধীন বাংলার সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ধারণের জন্যে এক কমিটি গঠিত হয়। কমিটিতে লীগের পক্ষ থেকে থাকেন, যথাক্রমে, এইচ. এস. সোহরাবর্দী, খাজা নাজিমুদ্দিন, বগুড়ার মহম্মদ আলি, ডাঃ এ. এম. মালেক, ঢাকার ফজলুর রহমান ও আমি এবং কংগ্রেসের পক্ষ থেকে থাকেন সর্বশ্রী শরৎ চন্দ্র বসু, কিরণ শংকর রায়, নলিনীরঞ্জন সরকার ও সত্যরঞ্জন বক্সী। খাজা নাজিমুদ্দিন কমিটির প্রথম সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভাশেষে তিনি বলেন, যদি নির্ভেজাল যৌথ নির্বাচন পদ্ধতি গৃহীত হয়, তাহলে, আমি যে কোন সংবিধানকে মেনে নিতে রাজি আছি। ২৩শে এপ্রিল 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকার সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমার সুচিন্তিত অভিমত হচ্ছে, মুসলমান ও অ-মুসলমান সকলের স্বার্থেই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা চাই। এবং এটাও আমার সুনিশ্চিত ধারণা যে বঙ্গভঙ্গের ফলে বাঙ্গালী মাত্রেরই সর্বনাশ ঘটবে'।'

কংগ্রেস-লীগ যুক্ত প্রয়াস অনেকখানি ফলপ্রসূ হয়। গান্ধীজীকে একটা চিঠির মাধ্যমে শরৎ বসু তা অবহিত করেন। মূল বয়ানটিই দেওয়া যাক :

My dcar Mahatmajee,

Since you left Calcutta I have had several conferences which were attended by somc Muslim League leaders and Kiran and Satya Babu and important developments have taken place. Last tuesday evening (20th instant), there was a conference in my house which was attended by Suhrawardy, Fazlur Rahaman (Minister), Mohammad Ali (Minister), Abul Hashim (Secretary, Bengal Provincial Muslim League, now on leave), Abdul Malik (member, Bengal Legislative Assembly representing I abour), Kiran and Satya Babu. We arrived at a tentative agreement, copy of which is enclosed herewith for your consideration. For purposes of identification, it was signed by Abul

Hashim and myself in the presence of the others. It will, of course, have to be placed before the Congress and Muslim League organisations. From the trend of the discussions we had, it seems me that so far as the Congress and Muslim League organisations in Bengal are concerned, the tentative agreement will be ratified by them, possibly with some modifications here and there. I am most anxious to have your reactions and also your help, advice and guidance in giving final shape to the tentative agreement arrived at. I need not repeat what I told you at Sodepur. I still feel that if with your help, advice and guidance the two organisations can arrive at a final agreement on the lines of the tentative agreement, we shall solve Bengal's problems and at the same time Assam's. It may also have a very healthy reaction on the rest of India. If you want me to come to Delhi to discuss matters further with you, I need hardly say that I shall come as soon as I get your message. Things are moving rapidly and speaking for myself, I feel that further discussions with you are most necessary.

I trust your Bihar tour is pulling your health to a great strain. I am feeling somewhat better. With pronams,

Yours affectionately,
Sd/- Sarat Chandra Bose

শরৎচন্দ্র বসু ও আবুল হাশিমের স্বাক্ষরিত, খসড়া চুক্তির বয়ান :

1. Bengal will be a free State. The free State of Bengal will decide its relations with the rest of India.

2. The constitution of the free Bengal will provide for election to the Bengal Legislature on the basis of joint electorate and adult franchise, with reservation of seats proportionate to the population amongst Hindus and Muslims. The seats as between Hindus and Scheduled Castes Hindus will be distributed amongst them in proportion to their respective population or in such manner as may be agreed among them. The constituencies will be multiple constituencies and votes will be distributed and not cumulative. A candidate who gets the majority of the votes

of his own community cast during election and 25% of the other communities so cast will be declared elected. If no candidate satisfies these conditions, that candidate who gets the largest number of votes of his own community will be elected.

3. On the announcement by His Majesty's Government that the proposal of the free state of Bengal has been accepted and that Bengal will not be partitioned, the present Bengal Ministry will be dissolved and a new Interim Ministry brought into being consisting of an equal number of Muslims and Hindus (including Scheduled Castes Hindus) but excluding the Chief Minister. In this Ministry the Chief Minister will be a Muslim and the Home Minister a Hindu.

4. Pending the final emergence of a Legislature and a Ministry under the new constitution, the Hindus (including Scheduled Castes Hindus) and the Muslims will have an equal share in the services including Military and Police The services will be manned by Bengalis.

5. A constituent Assembly composed of 30 persons, 16 Muslims and 14 Hindus, will be elected by Muslims and non-Muslims members of the Legislature respectively, excluding the Europeans.

1, Woodburn Park, Sd/-Sarat Chandra Bose
Calcutta.
20th May, 1947 Sd/-Abul Hashim

কিন্তু স্বাধীন বঙ্গ আন্দোলন তেমন দানা বাঁধল না। তার মূল কারণ, হাশিম সাহেবের মতে, কংগ্রেস সভাপতি আচার্য কৃপালনী ও হিন্দু মহাসভা নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি—দুজনেই বাংলা ভাগের পক্ষে রায় দিয়েছেন। তিনি লিখছেন :

'শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বাংলার গভর্নর স্যার ফ্রেডরিক ব্যারোজ-এর সঙ্গে ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৭-এ দেখা করেন। স্পষ্টতই গভর্নর-এর অনুপ্রেরণায় ২৩ তারিখে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বঙ্গভঙ্গের দাবি জানিয়ে তিনি একটি বিবৃতি দেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি, আচার্য কৃপালনী, হিন্দু মহাসভার সভাপতি ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির দাবি সমর্থন করেন। তাঁরা বঙ্গভঙ্গের আন্দোলন শুরু করলেন। ইতিমধ্যেই ভারতের নেতৃবৃন্দের কাছে লর্ড মাউন্টব্যাটেন বৃটিশ সরকারকে ভারত-ভাগ ও ত্যাগের সংকল্প জানিয়ে দিয়েছিলেন। খুবই স্বাভাবিকভাবে কংগ্রেস এক নতুন

রাজনৈতিক পথ ধরল। ভারত-ভাগের বিরোধিতা তারা হাওয়ায় ছুঁড়ে ফেলে দিল।' (ইন রেট্রস্পেক্ট, পৃ ১৩৭)

হাশিম সাহেবের এই ধারণা অমূলক নয়। দেখা যাচ্ছে, কংগ্রেসের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতাবাদ শিকড় ছড়িয়েছে এবং হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে হিন্দু মহাসভার প্রভাব উপেক্ষণীয় নয়। এমন কি ২৩শে এপ্রিল, বুধবার হিন্দু মহাসভার ডাকে কলকাতায় হরতাল পর্যন্ত হয়ে গেল। এ প্রসঙ্গে 'স্বাধীনতা'য় (২৫. ৪. ৪৭) প্রকাশিত রিপোর্ট :

বুধবার কলিকাতার এক অংশ কর্তৃক পূর্ণ হরতাল পালন

'বুধবার হিন্দু মহাসভার আহ্বানে কলিকাতায় ব্যাপক হরতাল প্রতিপালিত হয়। কয়েকখানি ছাড়া বাস ও ট্যাক্সি সম্পূর্ণ বন্ধ—ট্রাম একদম বন্ধ। হিন্দু মহল্লায় মটর সাইকেল প্রভৃতি কংগ্রেস পতাকার পরিবর্তে হিন্দু মহাসভার পতাকা উড়াইয়া চলিয়াছিল। লালদীঘিতে হিন্দু কর্ম্মচারী প্রায় কেহই আসেন নাই।'

অতএব নিতান্ত অসময়ে স্বাধীন বাংলা গড়ার ডাক এসেছিল। সন্দেহ, অবিশ্বাস, হিংস্রতার জীবাণু বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। এই অসহনীয় পরিস্থিতিতে মানুষের স্থৈর্য ও বিচার-বুদ্ধি লোপ পেতে বাধ্য। তখন রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিও যেন কুয়াশায় ঢাকা পড়ে যায়। মানুষের মনের অবস্থাকে ব্যাখ্যা করে তুষার চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'এত রায়ট হচ্ছিল যে দেশভাগ নিয়ে লোকের দুঃখ করার অবকাশ নেই। সবাই বুঝতে পারছে যেন দেশভাগ ছাড়া উপায় নেই।'

তেত্রিশ

কী কঠিন সময়! ঘটনা স্রোত যেন নিয়তি-নির্ধারিত পরিণামের দিকে সবেগে ধেয়ে চলেছে। এই স্রোতের মোড় ফেরান কমিউনিস্ট পার্টি'র সাধ্যের বাইরে। তবুও ইতিহাসে লেখা থাকুক—কমিউনিস্ট পার্টি এই পরিণাম চায়নি। ভাবীকালের মানুষ জানুক—কমিউনিস্ট পার্টি দেশভাগ চায়নি। শেষ বারের মতো ভারতকে অবিভক্ত রাখার এক ক্ষীণ প্রয়াস দেখা গেল পার্টি'র পক্ষ থেকে।

'স্বাধীনতা'র পাতায় ১০ই মে প্রকাশিত হল রজনী পাম দত্তের বিবৃতি :

ভারত বিভাগের বৃটিশ পরিকল্পনা এখনও ব্যর্থ করা যায়

জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে কংগ্রেস লীগ কম্যুনিস্ট একমত হোন

লণ্ডন ৬ই মে :

'...ভবিষ্যৎ কোন পথে ? ভারত ব্যবচ্ছেদ কি বন্ধ করা সম্ভব ? এই শেষ সন্ধিক্ষণেও কি ভারতের ঐক্য রাখা সম্ভব ? একমাত্র পথ হইতেছে—যদি ভারতের হিন্দু-মুসলমান, কংগ্রেস-লীগ-কম্যুনিস্ট, তথা সকল দেশপ্রেমিক শক্তি যদি এই গণতান্ত্রিক চুক্তিতে একত্রিত হইতে পারে যে, ভারতের ভবিষ্যৎ ভারতীয় জনগণ ঠিক করবেন। প্রতিটি ভৌগোলিক, কৃষ্টিগত, জাতীয় জনসমষ্টির গণতান্ত্রিক আদর্শের ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রীয় কাঠামো গণতান্ত্রিক উপায়ে ঠিক করা হইবে—গণতান্ত্রিক উপায়ে, বিনা রক্তপাতে একমাত্র এই পথেই উহা সম্ভবপর। স্বেচ্ছামূলক ইউনিয়ন গঠনের ভিত্তিতে ভারতের নূতন সভ্যতার ঐক্য গড়িয়া উঠিবে।'

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকৃতির ভিত্তিতে ভারতীয় ইউনিয়ন গঠনই যে তখন একমাত্র যথার্থ স্লোগান তাতে কোন সন্দেহ নেই : কিন্তু যুক্তির কথায় কান দেবার মতো অবস্থা কারও নেই। কংগ্রেস-লীগ-কমিউনিস্ট ঐক্যের ধ্বনি সে সময়ে একান্ত অবাস্তব।

অবশ্য এই বিবৃতি প্রকাশিত হওয়ার একমাস আগে থেকেই পার্টি ভারত ভাগ ও বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছে। এই মুহূর্তের স্লোগানের আকারে পার্টির ভেতরে ও পার্টির বাইরের লোকের জন্যে ৯ই এপ্রিল 'স্বাধীনতা'র পাতায় পার্টির বক্তব্য দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশিত হয় :

ভারত বিভাগ এবং বঙ্গ ভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিব কেন ?

—'উহা 'কুপল্যাণ্ড' পরিকল্পিত সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত সফল করিয়া তোলে—ভারতে বৃটিশ ফৌজ, বৃটিশ মূলধন ও ভারতবাসীর গোলামী স্থায়ী করে।

—উহা বৃটিশের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত জাতীয় আন্দোলনকে ধ্বংস করিবে, জাতীয় আন্দোলনের ঐতিহ্যকে কলঙ্কিত করিবে।

—উহা কলকারখানার মালিক এবং জমিদার-জোতদারের বিরুদ্ধে শ্রমিক আন্দোলন ও কৃষক আন্দোলনকে টুকরা টুকরা করিবে, মালিক ও জমিদারের শোষণ বৃদ্ধি করিবে।

—উহা সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান না করিয়া সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে স্থায়ী করিবে—আরও ব্যাপক করিবে।

স্বাধীন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ বাংলার জন্য আওয়াজ তুলুন।'

অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টি শরৎ বসু-সোহরাবর্দী-হাশিম প্রযোজিত স্বাধীন বাংলা গঠনের লাইন মেনে নিয়েছে এবং সে আন্দোলনে সামিল হয়েছে। অবশ্য গোড়ার দিকে সোহরাবর্দীর সঙ্গে এ ব্যাপারে পার্টির কিছুটা ভুল

বোঝাবুঝি হয়। কারণ, সোহরাবর্দী বৃহত্তর বঙ্গের আওয়াজ তুলেছিলেন এবং পার্টি এই স্লোগানের বিরোধিতা করে।

৯ই এপ্রিলের 'স্বাধীনতা'য় প্রকাশিত হয় :

বঙ্গভঙ্গ সম্বন্ধে মিঃ সোহরাবর্দী

'...তিনি বৃহত্তর বঙ্গ চান, কারণ বঙ্গভঙ্গের ফলে হিন্দু, মুসলমান, অনুন্নত হিন্দু—সকলেরই ক্ষতি হইবে।'

পরের দিন ১০ই এপ্রিল 'স্বাধীনতা'র পাতায় স্ব্যর্থহীন ভাষায় পার্টির পক্ষ থেকে ঘোষিত হয় :

'বঙ্গভঙ্গ চাই না, সোহরাবর্দ্দী সাহেবের 'বৃহত্তর বঙ্গ'-ও চাই না।

আমাদের দাবী

১। স্বাধীন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে ঐক্যবদ্ধ বাংলা

২। বাংলাদেশ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দেবে কি না সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক বাঙ্গালীর ভোটে তার মীমাংসা চাই।'

২৭শে এপ্রিল প্রকাশিত হয়, পাকিস্তান ও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী কমিটির সমর্থনে ভবানী সেনের বিবৃতি :

'ধর্ম্মের ভিত্তিতে ভারত ব্যবচ্ছেদ ও বঙ্গভঙ্গ রোধ করিবার জন্য শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুকে সভাপতি ও শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দত্তকে সম্পাদক নির্ব্বাচিত করিয়া যে কমিটি গঠিত হইয়াছে উহাকে আমরা আমাদের পার্টির পক্ষ হইতে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। আমবা বিশ্বাস করি যে বাংলার জনগণের ভিতর ঐক্য স্থাপনের জন্য এই কমিটি যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে।...

...আজ হিন্দু-সংস্কৃতি বাঁচাইবার নামে বঙ্গভঙ্গের দাবী হিন্দুদের নিকট যেভাবে জনপ্রিয় করিয়া তোলা হইতেছে, তাহাতে ভারতের ঐক্য আসিবে না বরং তাহার ফলে মুসলমানদের মনে ধর্ম্মের ভিত্তিতে ভারত ব্যবচ্ছেদের দাবী আরও শক্ত হইবে এবং সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বাড়িয়াই চলিবে। ইহার ফলে ১৯৪৮ সালের জুন মাসে ভারত স্বাধীন হইতে পারিবে না, সাম্প্রদায়িক কলহের মধ্যস্থতা করিবার অজুহাতে বৃটিশ শাসন বাঁচাইয়া রাখা হইবে। একদিকে পাকিস্তান এবং অন্যদিকে বঙ্গভঙ্গ এই দুই দাবীর চাপে জাতীয়তাবাদ আজ বিপন্ন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ বিভক্ত করিয়া ভারতের উপর সাম্রাজ্যবাদী ক্ষমতা নূতনভাবে চালু করিবার যে বৃটিশ ষড়যন্ত্র চলিতেছে সেই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিতেই হইবে। ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে যদি এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করা না যায় তাহা হইলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ নূতন রোয়েদাদ জারী করিয়া ভারতে ইংরেজ শাসন কোন না কোন প্রকারে বাঁচাইয়া রাখিবে।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর এই কূটনৈতিক চাল ব্যর্থ করিবার জন্য আমাদের পার্টি বঙ্গভঙ্গ বিরোধী কমিটির সঙ্গে বন্ধুত্বমূলক সহযোগিতার নীতি অনুসরণ করিবে।

নিখিল বঙ্গ পাকিস্তান বিরোধী ও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী কমিটির সভ্য ও সমর্থকদের নিকট আমরা আবেদন করিতেছি যে আমাদের ভিতর বিভিন্ন বিষয়ে যত মতভেদই থাকুক না কেন যে-যে বিষয়ে আমরা একমত সে সমস্ত বিষয়ে সহিষ্ণুতার সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট গঠন করিয়া সম্মিলিত কার্য্যপদ্ধতি গ্রহণ করিতে পারি। জাতীয়তা-বিরোধী ভেদনীতি আজ দেশে এত প্রবল যে আমাদের সমবেত কর্মপ্রচেষ্টা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।' (স্বাধীনতা, ২৭. ৪. ৪৭)

ইতিমধ্যে সোহরাবর্দী তাঁর স্লোগানের হেরফের ঘটিয়েছেন। তিনি 'বৃহত্তর বঙ্গে'র দাবি ছেড়ে দিয়ে সার্বভৌম অবিভক্ত বাংলা রাষ্ট্র গঠনের দাবি তোলেন।

২৭শে এপ্রিল তিনি নয়াদিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, তিনি বিভক্ত ভারতে অবিভক্ত সার্বভৌম বাংলা রাষ্ট্র গঠনের পক্ষপাতী। 'তাঁহার মতে বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব হিন্দুদের পক্ষেও আত্মহত্যার সামিল। ঐক্যবদ্ধ সার্বভৌম বাংলা ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্পদশালী ও সমৃদ্ধিশালী দেশ হইতে পারে।

তিনি আরও বলেন যে এই আদর্শের জন্য তিনি বহুদূর অগ্রসর হইতে রাজী আছেন। 'আমরা সকলে মিলিয়া একত্রে বসিয়া এমন কোন শাসন-ব্যবস্থা স্থির করিতে পারি যাহার ফলে সকলেই সন্তুষ্ট হইবেন।'

কমিউনিস্ট পার্টি-শরৎচন্দ্র বসু-সোহরাবর্দীর মিলিত উদ্যোগে বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার অভিযান শুরু হয়। ক্রমশ বিভিন্ন মহলের মানুষ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। যেমন :

১. বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বাংলা ফরওয়ার্ড ব্লক

৫০০ কর্ম্মীর সভায় বঙ্গভঙ্গ ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাউড়িয়া প্রস্তাবের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করা হয়। (স্বাধীনতা, ১. ৬. ৪৭)

২. বঙ্গভঙ্গ রোধ করুন : ঐক্যবদ্ধ ভারতে
স্বাধীন বাংলা গড়ুন

বাংলার যুব সমাজের প্রতি ঢাকার ছাত্র নেতাদের আহ্বান :

'আমরা মনে করি যে বাংলা বিভাগের সাম্প্রতিক আন্দোলন সম্পর্কে যে কোনও সংবুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরই আপত্তি থাকা উচিত। প্রথমত, প্রস্তাবটি পরাজিত মনোভাবের পরিচায়ক। দ্বিতীয়ত, ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আদর্শের পরিপন্থী। প্রস্তাবিত বিভাগ কার্য্যে পরিণত হইলে দেড়কোটি জাতীয়তাবাদী হিন্দু-মুসলমান ভারতীয় ইউনিয়নের বাহিরে থাকিয়া

যাইবেন। আমাদের দৃঢ় মত এই যে, স্বাধীন ভারত সরকারের মধ্যে থাকার অধিকার হইতে এই হিন্দু-মুসলমানদের কেহই বঞ্চিত করিতে পারেন না।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে পূর্ব্বঙ্গের জনসাধারণের দান কেহই বিস্মৃত হইতে পারেন না। ক্ষুদ্র স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া আজ যাহারা পূর্ব্ব-বঙ্গের কথা ভাবিতেছেন না, তাঁহাদের বিরুদ্ধে বাংলার বিপ্লবী যুবসমাজকে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের জন্য আহ্বান জানাইতেছি।'

স্বাঃ সুধীর দত্ত, সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টুডেন্টস্ ইউনিয়ন।
ক্ষিতীন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা জেলা স্টুডেন্টস্ কংগ্রেস।
সুবোধ রক্ষিত, সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা জেলা স্টুডেন্টস্ ব্যুরো।
দীপ্তি চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদিকা, কামারুন্নেসা গার্লস কলেজ স্টুডেন্টস্ ইউনিয়ন।
লীলা সেন, সাধারণ সম্পাদিকা, ইডেন কলেজ ছাত্রী সংঘ।

(স্বাধীনতা, ১. ৬. ৪৭)

৩. ঐক্য, গণতন্ত্র ও সহযোগিতার পথেই বাঙালীর সমৃদ্ধি
লেখক : সামসুল হক (পূর্ব্বঙ্গের ভারপ্রাপ্ত প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সংগঠক)

'বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন আজ সকল আন্দোলনের উপর মাথাচাড়া দিয়া উঠিয়াছে। এমন কি পাকিস্তান গঠন না হইলেও বঙ্গভঙ্গ চাই—হিন্দু মহাসভার প্রধান নেতা শ্যামাপ্রসাদবাবুর আজ ইহাই দাবী। যে কংগ্রেস একদিন বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আইন অমান্য করিয়া বঙ্গভঙ্গ রহিত করিয়াছিল আজ সেই কংগ্রেস বঙ্গভঙ্গের দাবী সমর্থন করিতেছে।

অপরদিকে যে কয়জন মুসলিম নেতা বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর বৃহত্তম স্বার্থের জন্য শরৎবাবু ও কিরণশঙ্করবাবুর সহিত শলা-পরামর্শ করিয়া একটা সিদ্ধান্তে আসিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে একদল লীগ নেতা দেশদ্রোহীরূপে মুসলমান জনসাধারণের নিকট প্রচার করিতেছেন।'
(স্বাধীনতা, ১. ৬. ৪৭)

৪. ময়মনসিংহে দুই সহস্র লোকের দেশবিভাগ বিরোধী সভা

'২৪শে মে, গোপাল আচার্য্যের সভাপতিত্বে বিপিন পার্কে অনুষ্ঠিত সভায় খোকা রায় ভারত ও বঙ্গ বিভাগ বিরোধী একটি প্রস্তাব উত্থাপিত করেন। প্রস্তাবে বসু-সোহরাবর্দী আলোচনাকে অভিনন্দন জানাইয়া ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের স্বেচ্ছামূলক যোগদানের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ ভারতীয় ইউনিয়ন গড়িয়া তোলার সংগ্রামকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য আহ্বান জানান হয়।'

(স্বাধীনতা, ২. ৬. ৪৭)

৫. মেদিনীপুর থেকে :

আমরা বঙ্গভঙ্গ চাই না
—জননেতাদের ডাকে সাড়া দিন

'আমরা বঙ্গভঙ্গ চাই না, আমাদের দৃঢ়মত এই যে, বঙ্গভঙ্গের ফলে সাম্প্রদায়িক ভেদ-বিভেদ আরও বৃদ্ধি পাইবে, দাঙ্গা দৈনন্দিন ঘটনায় পর্য্যবসিত হইবে আর সেই সুযোগে অভিভাবকরূপে বিরাজ করিতে থাকিবে শ্বেতাঙ্গ শাসকগোষ্ঠী।

আমরা প্রত্যেকটি কংগ্রেস ভক্ত ও লীগ ভক্ত দেশপ্রেমিকের নিকট আবেদন জানাইতেছি, আর আত্মকলহ নয়, মিলিত সংগ্রামের পথে ঐক্যবদ্ধ বাংলা গড়িয়া তুলুন। ধর্ম্মের ভিত্তিতে নয়, ভাষা, সংস্কৃতি ও ভৌগোলিক পরিবেশের ভিত্তিতে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক লোকের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সেই অখণ্ড বাংলার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করিয়া লউন।

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের নামে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নামে, স্বাধীন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার নামে, বিপ্লবী বীর ভগৎ সিং, ক্ষুদিরাম আর সূর্য্য সেনের নামে আমাদের এই ডাক। আমাদের ডাকে সাড়া দিন।'

স্বাঃ সত্য ঘোষাল (সম্পাদক, চন্দ্রকোণা টাউন ক্লাব)
এস. আমির আলি (সম্পাদক, থানা কংগ্রেস কমিটি)
অমর দত্ত (সম্পাদক, চন্দ্রকোণা ছাত্র ফেডারেশন)
লক্ষ্মণচন্দ্র অধিকারী (সম্পাদক, চন্দ্রকোণা টাউন কংগ্রেস)
ডাঃ অনিলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (চিকিৎসক)
শ্রীমতী আশালতা দেবী (দলমাদল নারী সমিতি)
শীতল মণ্ডল (থানা কমিউনিস্ট পার্টি)
সতীশচন্দ্র রায় (সম্পাদক, থানা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, চন্দ্রকোণা, মেদিনীপুর)। (স্বাধীনতা, ৩. ৬. ৪৭)

৬. রংপুর থেকে :

'১লা জুন, জেলা কৃষক সম্মেলন উপলক্ষে গ্রামাঞ্চল হইতে আগত ৩ হাজার হিন্দু-মুসলমান কৃষকের এক মাইলব্যাপী বিরাট শোভাযাত্রা এবং 'ভাইয়ে ভাইয়ে লড়ব না', 'দাঙ্গা করে মরব না', 'বাংলা ভাগ করব না' সুদৃঢ় মিলিত আওয়াজে শহরবাসী যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িল। এই শোভাযাত্রা ও সম্মেলন উপলক্ষ্য করিয়া সমস্ত শহরবাসীর মধ্যে অভূতপূর্ব্ব আনন্দের সৃষ্টি হয়।...

...সম্মেলনের রাজনৈতিক প্রস্তাবে বাংলা ও ভারত বিভাগের সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিবার আহ্বান জানানো হইয়াছে। বসু-সোহরাবর্দ্দী আলোচনার সাফল্যের জন্য হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রচার ও আন্দোলনের সংকল্প ঘোষণা করা হইয়াছে।' (স্বাধীনতা, ৩. ৬. ৪৭)

৭. ময়মনসিংহ থেকে :

(ক) গত ৩১শে মে শেরপুর শহরে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বসু-সোহরাবর্দ্দী পরিকল্পনাকে সম্বর্দ্ধনা জানাইয়া এক জনসভা হয়। দশ-বারো মাইল দূর হইতে রক্ত-পতাকা হাতে হাজংরা মিছিল করিয়া আসেন।

(খ) 'গত ২৯শে মে—কিশোরগঞ্জে কমিউনিস্ট নেতা ওয়ালি নওয়াজের সভাপতিত্বে বঙ্গভঙ্গ ও পাকিস্তান বিরোধী এক জনসভা হয়। উপস্থিত দেড় হাজার লোকের মধ্যে বেশির ভাগই ছিলেন মুসলমান।' (স্বাধীনতা, ৬. ৬. ৪৭)

৮. 'খুলনা—১লা জুন পাইকগাছা থানার অন্তর্গত মদিনার আবাদে বঙ্গভঙ্গের চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রায় এক হাজার কৃষকের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।' (স্বাধীনতা, ৮. ৬. ৪৭)

৯. '১লা জুন, গৈলা (বরিশাল)—আগৈলঝাড়ায়, শ্রীযোগেশ চন্দ্র হালদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ১০ হাজার লোকের এক সভায় এই মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, বঙ্গভঙ্গ দ্বারা তপশীলী জাতি দ্বিধা বিভক্ত হইবে—উন্নতির পথ রুদ্ধ হইবে।' (ঐ)

১০. 'কসবা—পাকিস্তান ও বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে ফরওয়ার্ড ব্লক, আর-সি. পি. আই. বলশেভিক পার্টি ও রেডিক্যাল পার্টি'র মিলিত উদ্যোগে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।' (স্বাধীনতা, ৮. ৬. ৪৭)

১১. '৮ নং ওয়ার্ডে ৪ঠা জুন এস. এম. নয়িমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মুসলিম অধিবাসীদের এক সভায় বসু-সোহরাবর্দী পরিকল্পিত সার্বভৌম ঐক্যবদ্ধ বাংলাকে সমর্থন জানান হয়। সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন জাহিরুদ্দীন।' (স্বাধীনতা, ৮. ৬. ৪৭)

১২. 'চট্টগ্রাম জিলা মুসলিম লীগের সভাপতি শেখ রফিউদ্দিন এক বিবৃতিতে বলেন: বঙ্গভঙ্গে আমরা সম্মত হইতে পারি না। বসু-সোহরাবর্দী ফর্মুলাই বাংলার হিন্দু-মুসলমানের প্রকৃত দাবী মিটাইতে পারে। কিন্তু পারস্পরিক সন্দেহ এত তীব্র যে ভাল কথা কাহারও মনে ধরিতেছে না।' (স্বাধীনতা, ১০. ৬. ৪৭

চৌত্রিশ

বঙ্গভঙ্গ রদ করা গেল না। ১৯৪৭ সালের ২০শে জুন বাংলা আইন-সভার অধিবেশনে বাংলাদেশকে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব পাশ হয়। তার পনেরো মিনিট পর হিন্দু-প্রধান অঞ্চলের এম. এল. এ. ও মুসলমান-প্রধান এলাকার এম. এল. এ.-দের দুটি পৃথক সভা অনুষ্ঠিত হয়। হিন্দু-প্রধান অঞ্চলের ,এম. এল. এ.-রা বঙ্গ বিভাগের পক্ষে ও মুসমান-প্রধান অঞ্চলের এম. এল. এ.-রা দেশ-বিভাগের বিরুদ্ধে মত দেন। অতএব দেশ ভাগ। বাংলাদেশ দু-টুকরো হয়ে গেল।

হিন্দু মহাসভার নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতে, ২০শে জুন হিন্দুদের মুক্তির দিন। হিন্দু মহাসভার আর এক বড় নেতা এন. সি. চ্যাটার্জি আহ্বান জানালেন: আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করুন।

'স্বাধীনতা'র রিপোর্টার লিখছেন, '২০শে জুন, আইনসভার কংগ্রেস কি লীগ—উভয় দলের অধিকাংশ সদস্যের মুখেই একটা ব্যথার ছাপ দেখা যায়—বিশেষ করিয়া পূর্ববঙ্গের হিন্দু সভ্যদের ও পশ্চিম বঙ্গের মুসলমান সদস্যদের বেশ কিছুটা বিমর্ষ দেখা যায়।'

সেদিন অনেকেরই মনে এই প্রশ্ন বারে বারে হানা দিয়েছে : বঙ্গভঙ্গ কি রদ করা যেত না ?

হয়তো যেত। তার জন্যে আর একটা গণঅভ্যুত্থানের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কেন তা ঘটল না ? এই ক্ষুব্ধ জিজ্ঞাসা উচ্চারিত হয় সেদিন 'স্বাধীনতা'র সম্পাদকীয় নিবন্ধে :

' সারা কলিকাতা শহর আইনসভার দুয়ারে ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই কেন? গত ৪০ বছর ধরিয়া যাঁহারা স্বাধীন বাংলার স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, যাঁহারা হাসিতে হাসিতে ফাঁসীর মঞ্চে উঠিতেছিলেন, কালাপানি পার হইতেছিলেন, কলিকাতার রাজপথে বুলেটের সামনে বুক পাতিয়া দিতেছিলেন, কল-কারখানা ও স্কুল-কলেজ বন্ধ করিয়া লক্ষ লোকের জমায়েত করিতেছিলেন—তাঁহারা আজ কোথায়? তাঁহাদের সেই বিপ্লবী অভ্যুত্থানে আইনসভার প্রাসাদভবন কাঁপিয়া উঠে নাই কেন ?

-কারণ কংগ্রেস ও লীগ নেতারা বৃটিশ ঘোষণার এই 'অবদান' আপোষে লাভ করিয়াছেন দেশবাসীর মতামতের অপেক্ষায় না থাকিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিজেদের ভাষায় বলিতে গেলে, 'অনন্যোপায়' হইয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

অথচ, এই বৃটিশ ঘোষণা দেখিতে দেখিতে বাংলার চেহারা'কে কিভাবে বদলাইয়া দিয়াছে। কালও যাহারা প্রতিবেশী ছিল, আজ তাহারা বিদেশী, কালও যাহা নিজস্ব ছিল আজ তাহা পরস্ব, কালও যাহা গৌরবের ছিল, আজ তাহা ঈর্ষার বস্তু হইয়া উঠিল। 'পাকিস্তান' ও 'নব বঙ্গে'র এই পরিণতি লক্ষ্য করিয়াই আজ দেশবাসী নূতন করিয়া প্রশ্ন করিতেছে : সত্য সত্যই কি ইহা অবশ্যম্ভাবী ছিল ; বৃটিশ বড়লাটের রোয়েদাদকে মানিয়া লওয়া ছাড়া কি আর কোন পথ ছিল না ?

বঙ্গভঙ্গের মধ্যে আমাদের বিভাগ ও বিভেদের শেষ নয় ; নূতন দুর্ভাগ্যের সূচনা মাত্র। কাল আইনসভায় যাহা পাশ হইয়াছে, আজ তাহার ঢেউ প্রত্যেক গ্রাম ও শহরে আসিয়া লাগিবে। পরস্পর বিরোধী রাষ্ট্রে আমাদের মিলিত সংসার ও মিলিত আন্দোলন চূরমার হইবে ; আমাদের ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি বিপন্ন হইবে। নেতারা আর একবার 'অনন্যোপায়' হইয়া অবশ্যম্ভাবী বৃটিশ মধ্যস্থতা মানিয়া লইবেন। বৃটিশ ষড়যন্ত্র সাফল্য হইতে নূতন সাফল্যের দিকে অগ্রসর হইবে।' (স্বাধীনতা, ২১. ৬. ৪৭)

বাংলাদেশ ভাগ হয়ে গেল। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি। তবুও অনেক

সত্যি ঘটনাকে মানুষের মন মেনে নিতে চায় না। অনেকেরই মনে হয়েছিল সেদিন—এটা একটা অস্থায়ী ঘটনা, আবার ভাঙা দেশ জোড়া লাগবে: তাই সেদিন বেদনাবিদ্ধ মুসলিম লেখকগণ বাংলাকে আবার ঐক্যবদ্ধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

তাঁদের বিবৃতির পূর্ণ বয়ান:

'অর্থনীতিগত ও সংস্কৃতিগত অখণ্ড বাংলার রাজনৈতিক অঙ্গ ব্যবচ্ছেদের সিদ্ধান্তে আমরা গভীর বেদনা বোধ করছি। সাম্প্রদায়িক বিচ্ছেদ আজ যত দানবিক আকারেই দেখা দিক না কেন, সেটা সাময়িক; কারণ দেশের মাটিতে সর্ব্বসাধারণের সুখে, দুঃখে, চাষী ও মজুরের প্রাণ-ধারণের কঠিন সংগ্রামে, শিল্পী ও সাহিত্যিকের আত্মবিকাশের ক্ষেত্রে—কোথাও তার শিকড় নেই। হিন্দু ও মুসলিম বাঙালীর মধ্যে ধর্ম্মবিশ্বাসের, চিরপ্রথার এবং সমাজ ব্যবস্থার বিভেদ আছে তা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে তাদের মিলনের ক্ষেত্রও বহুদূর-প্রসারী এবং বহু শতাব্দীব্যাপী এবং সর্ব্বোপরি এই সত্যটি আজ উভয় সম্প্রদায়ের রক্তে লেখা অক্ষরে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে বিভেদের রাজনীতি জিঘাংসা ও আত্ম-হত্যার রাজনীতি এবং হিন্দু ও মুসলমানের সম্মিলিত স্বাধীন বাংলার রাজনীতি মহান সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের রাজনীতি, স্পন্দিত নবজীবনের রাজনীতি।

হিন্দু ও মুসলমান রাষ্ট্রনায়কদের বিভেদকামী ও বিপথগামী নেতৃত্বের ভয়াবহ পরিণাম চোখের সামনে স্পষ্ট দেখেও কি আমরা আমাদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের দ্বারা মাউণ্টব্যাটেনের রোয়েদাদকে ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিয়ে বাংলাকে পুনর্গঠিত ও পুনরুজ্জীবিত করতে আত্মদানে এগিয়ে আসব না?'

স্বাঃ আবু সয়ীদ আইয়ুব	সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ
শওকত ওসমান	আহসান হাবীব
আবুল হোসেন	ফজলুল হক
হবীব রহমান	অধ্যাপক নাজমুল করিম
সৈয়দ নুরুদ্দিন	খায়রুল কবির
মতিউল ইসলাম	এবনে গোলাম নবী
অধ্যাপক নুরুজ্জমান	বুলবুল চৌধুরী
অধ্যাপক মহম্মদ হাবিবুর রহমান	নাসির আলী
জয়নাব আখতার জলিল	গোলাম কুদ্দুস
অধ্যাপক মঈদুল ইসলাম	

এই বিবৃতি সেদিন খুব কম লোকেরই চোখে পড়েছিল। দেশ ভাগ হচ্ছে, অত্যন্ত দুঃখের কথা—কিন্তু ইংরেজ তো যাচ্ছে। ব্যর্থ ও বিমর্ষ

আবুল হাশিম ১৫ই আগস্ট বিকেলে সোদপুর আশ্রমে গেলেন গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে। দু'হাত বাড়িয়ে গান্ধীজী হাশিমকে অভ্যর্থনা জানালেন। গান্ধীজী হাসিমুখে বলে উঠলেন, 'হাশিম তুমি তো হেরে গেলে—তুমি তো বাংলা ভাগ রুখতে পারলে না। আমার ধারণা তুমি তা পারতে যদি তোমার দৃষ্টিশক্তি থাকত।'

১৯৪৭-এর বছরটি ফুরুবার আগেই হাশিমের চোখের আলো নিভে গেল। তিনি তখন পুরোপুরি অন্ধ।

পঁয়ত্রিশ

১৩—১৪—১৫ই আগস্ট

১৩ই আগস্টের রাত। শিবশঙ্কর মিত্র বলছেন, 'আমি মধ্যরাত্রি পর্যন্ত জেগে—একটা খবরের অপেক্ষায়। রায়ট নাকি থেমে গিয়েছে। রাত দুটোয় এক অদ্ভুত কোলাহল শুনে আমায় পথে বেরিয়ে আসতে হল। রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট ধরে দলে দলে মুসলমান আসছে। আমি তাদের চীৎকার শুনতে পাচ্ছি। সেই বুকের রক্ত হিম করে দেওয়া 'আল্লা হো আকবর' নয়—আর এক ধ্বনি। তারা বলছে, 'হিন্দু-মুসলিম এক হো—এক হো।' অভাবনীয় দৃশ্য। লোকে ঘর থেকে বেরিয়ে মুসলমানের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল—প্রগাঢ় আলিঙ্গনে। আমিও তাদের সঙ্গে চলতে লাগলাম। মানিকতলার মোড়ে গিয়ে দেখি শয়ে শয়ে মুসলমান আসছে। সেই স্রোতে আমি ভেসে গেলাম। চল কলাবাগানের দিকে। হ্যাঁ, তাই চল। সেখানকার বাসিন্দারা গোলাপ জল ছিটোচ্ছে সকলের গায়ে। তারা কলেজ স্ট্রীটের সব চা-এর দোকান-হোটেল খুলে দিয়েছে। এসো, খেয়ে যাও—পয়সা লাগবে না। আজ মিলনের রাত—কাল আজাদীর দিন। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ঘটনা—১৬ই আগস্টের চেয়েও অপ্রত্যাশিত। অথচ পার্টি কিছুই টের পায়নি। কাল বাদ পরশু স্বাধীনতা আসছে—এই ধারণাটুকু যথেষ্ট। এই ধারণা যে মানুষকে কতখানি উদ্বেলিত করতে পারে—কোন্ অতল থেকে কোন্ শিখরে যে মানুষ উঠে যেতে পারে! অথচ আজ দিনের বেলায়ও এখানে ওখানে ইতস্তত দাঙ্গা হয়েছে।'

শ্রীমতী লীলা রায় বলছেন, 'তখন হাওড়ায় থাকি। রাতে আমরা ঘুমোতে পারতাম না। কী চীৎকার! কী চীৎকার!! কী কান ফাটানো ধর্মীয় জিগির! আল্লা হো আকবর আর বন্দে মাতরম্। মনে হত যেন নরকের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে। ১৪ই আগস্ট রাত্রিতেও কান-ফাটা চীৎকার। কিন্তু তার ভাষা আলাদা—সেটা হিন্দু-মুসলমান মিলনের।'

চিন্মোহন সেহানবীশ বলছেন, '১৪ই আগস্ট শোনা গেল রায়ট নাকি

থেমে গেছে। সত্যি কিনা যাচাই করার জন্যে আমি আর সরোজ দত্ত পাগলের মতো পায়ে হেঁটে সারা কলকাতা ঘুরেছি। প্রথমে ভয় হয়েছিল, পরে ভয় উড়ে গিয়ে এল স্বস্তি—এক অদ্ভুত আনন্দ। এক হিন্দু বিধবাকেও রাস্তায় যেতে যেতে বলতে শুনছি—'পার্ক সার্কাস দেখে এলাম—যাই নাখোদা মসজিদ দেখে আসি।' তুই বিধবা মানুষ—তোর অত নাখোদা মসজিদ দেখার শখ কেনরে বাবা!

একদিকে গড়পারে বিষ্টু ঘোষের আখড়া—হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার দুর্গ। অপরদিকে রাজাবাজার—মুসলমান গুন্ডা অধ্যুষিত সাংঘাতিক জায়গা। গিয়ে দেখি দু'পক্ষই তোরণ বানাচ্ছে—হিন্দুস্তান - পাকিস্তান দুটি ডোমিনিয়নের জন্ম হচ্ছে। মাঝখানে খানিকটা জায়গা—নো ম্যান'স ল্যান্ড। দু'পক্ষই বোমা নিয়ে সতর্ক সশস্ত্র। একমনে তারা কাজ করে চলেছে। হঠাৎ সাহস করে রাজাবাজারের দিক থেকে এক মুসলমান ছেলে নো ম্যান'স ল্যান্ড-এ এসে চেঁচিয়ে বলল, 'আমাদের একটা হাতুড়ি দিতে পারেন? আমাদের একটা হাতুড়ি দরকার।' গড়পারের দিক থেকে একজন চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'এই নিন হাতুড়ি।' সে হাতুড়িটা রাজাবাজারের দিকে ছুঁড়ে দিল। মুহূর্তে উবে গেল সব ভয়-সন্দেহ-অবিশ্বাস। যে বোমা তারা একে অপরকে মারবার জন্যে বানিয়েছিল—সে সব ফাটিয়ে তারা দিনটাকে সেলিব্রেট করল।

যতই ঘুরছি দেখি—রাস্তায় রাস্তায় কোলাকুলি। স্টিরাপ পাম্প দিয়ে গোলাপ জল ছিটোচ্ছে লোকে পথচারীর গায়ে। সম্পূর্ণ অচেনা লোককে পথচারী সিগারেট বিলোচ্ছে। স্বাধীনতার জন্মলগ্নে হিন্দু-মুসলমান মিলে গেল। কলকাতা আনন্দে হেসে উঠল।'

সার্কুলার রোডের উপর দাঁড়িয়ে অমিয় মুখার্জিও অবাক হয়ে এ দৃশ্য দেখছেন। লরিতে চেপে হিন্দু-মুসলমান একসাথে কেমন হৈ-হৈ করে আনন্দ করতে করতে চলেছে। কী উচ্ছ্বাস তাদের! তিনি বলছেন, 'আমি একেবারে সেদিন নিঃসঙ্গ। শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছি। সেই আমি—যে দাঙ্গা ঠেকাবার জন্যে প্রাণপাত করেছে। আমাকে তো আজ টেনে নিল না এই আনন্দের স্রোতে!'

কুমুদ বিশ্বাসও দেখছেন এই অভিনব দৃশ্য। লরির উপর একটি হিন্দুস্থানী ছেলে নাচছে—আর কেবল বলছে—'হাম আজাদ হো গিয়া—হাম আজাদ হো গিয়া।'

ছাত্রিশ

কার আজাদী? কিসের আজাদী? সেদিন অন্তত এই প্রশ্ন কোন কমিউনিস্টের মনে জাগেনি। দাঙ্গা-বিধ্বস্ত দেশ। ভয়-সন্দেহ-অবিশ্বাস কলুষিত শ্বাসরোধকারী আবহাওয়া থেকে মুক্তিরই অপর নাম স্বাধীনতা।

পার্টি নেতৃত্ব ঘোষণা করেছিলেন কমিউনিস্টরাও ১৫ই আগস্ট-এর আনন্দ উৎসবে সামিল হবে। (পিপলস্ এজ, ৩. ৮. ৪৭)

কিন্তু এই ঘোষণার মধ্যে ফাঁক ছিল যথেষ্ট। সুনীল মুন্সী বলেন, 'স্বাধীনতা আসছে—ইংরেজ যাচ্ছে। এর বেশি কিছু নয়। কারা ক্ষমতায় বসছে—কমিউনিস্টদের অংশ কী তাতে? সেই স্বাধীনতায় শ্রমিকদেরই বা কী অংশ? এসব প্রশ্ন কেউ সেদিন তোলেনি।'

এসব সওয়াল সেদিনের জন্যে মুলতুবি রাখা হলেও—বেশিদিন রাখা গেল না। অচিরেই নেমে আসে স্বাধীনতার স্বরূপ নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির জীবনে এক যুক্তি-তর্ক-বিতর্ক কণ্টকিত অধ্যায়। যতই ক্ষমতাসীন সরকারের জনবিরোধী চেহারা বিকট থেকে বিকটতর—ততই তীক্ষ্ম থেকে তীক্ষ্মতর হয় সদ্য পাওয়া 'স্বাধীনতা' নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ। পার্টির মধ্যে বিতর্কের ঝড় ওঠে এবং 'স্বাধীনতা' লাভের পশ্চাৎপট সম্পর্কে কমিউনিস্টরা নতুন করে ভাবতে বাধ্য হয়। ক্যাবিনেট মিশনের মতলব—মাউন্টব্যাটেন রোয়েদাদের তাৎপর্য—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে কংগ্রেস-লীগ নেতৃত্বের বোঝাপড়া—ক্ষমতা হস্তান্তরের পটভূমি—সব কিছু নিয়ে এই নতুন ভাবনার সূত্রপাত। 'বিনা যুদ্ধে' বা 'শান্তিপূর্ণ' উপায়ে স্বাধীনতা লাভ'-এর নজির তো তেমন নেই। যুদ্ধোত্তর যুগের এই অভিনব ঘটনার বিশ্লেষণ-কার্যে সোভিয়েত ভারত-তত্ত্ববিদদের তৎপর ভূমিকা লক্ষণীয়।

স্বনামখ্যাত সোভিয়েত ভারত-তত্ত্ববিদ্ ই. এম. ঝুকভ ১৯৪৬-এর মে মাসে ভারত সফরে আসেন। জুলাই মাসে প্রকাশিত তাঁর এক রচনায়, মাউন্টব্যাটেন রোয়েদাদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ভারতের বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিভূ কংগ্রেস নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতার ওপরই তিনি একমাত্র গুরুত্ব আরোপ করেন। ১৯৪৯ সালের জুন মাসে লিখিত তাঁর এক রচনায় দেখা যায়, নেহরু এখন ব্রিটেন ও আমেরিকা—এই দুই মনিবের ভৃত্যে পরিণত। ১৯৫০ সালে আরেকটি লেখায় তিনি বলেন, ভারতবর্ষ ও বর্মা মেকি স্বাধীনতা লাভ করেছে।

দিয়াকভ লেখেন, মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা মেনে নিয়ে গান্ধী ও কংগ্রেস নেতৃত্ব চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। তিনি আরও বলেন, লোলুপতা ও শঠতাই হল ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর মূল বৈশিষ্ট্য। তারা মুনাফার জন্যে দেশের স্বাধীনতা বিকিয়ে দিতে পারে।

বালাবুশেভিচ-এর মতে, ভারত বিভাগ—ভারতীয় বুর্জোয়া ও জমিদার-শ্রেণীর সঙ্গে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমঝোতার পরিণাম।

সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে এই একপেশে বিচারপর্বের অবসান ঘটালেন কমরেড অজয় ঘোষ। কমরেড গঙ্গাধর অধিকারীর ভাষায়, ১৯৪৭ সালের ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়টির পুনর্মূল্যায়ন করেন কমরেড অজয় ঘোষ ১৯৫৫ সালে। অজয় ঘোষ বলেন, জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী আপস করে রাষ্ট্র-ক্ষমতা পেয়েছে—তাতে কোন

সন্দেহ নেই। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য ঔপনিবেশিক অবস্থা বজায় রাখা নয়, নবলব্ধ ক্ষমতার সাহায্যে তার বিরুদ্ধে লড়াই করা। তিনি আরও বলেন, অতীতে এটা অভাবনীয় ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে এটা সম্ভব। কারণ, সোভিয়েত ইউনিয়নের জয়লাভ ও ইউরোপের জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রপুঞ্জের উত্থানের ফলে—ধনতন্ত্রের সার্বিক সংকট এক নতুন স্তরে গিয়ে পেঁাছেছে এবং সম্পূর্ণ এক নতুন অবস্থার উদ্ভব ঘটেছে।

সম্প্রতি সমগ্র বিষয়টির উপর নতুন করে আলোকপাত করেছেন কমরেড অজিত রায়। ১৯৮২-৮৩ সালে প্রকাশিত তাঁর রচনা—'সোশিও-পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউণ্ড অফ ম্যাউণ্টব্যাটেন অ্যাওয়ার্ড'—এ বিষয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। অজয় ঘোষের বক্তব্য প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য : পার্টি নেতৃত্ব যখন ক্ষমতা হস্তান্তরের দ্বৈতরূপ—অর্থাৎ জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর একাধারে সমঝোতা ও অগ্রগতির ভূমিকা—লক্ষ্য করেন, তখনও তাঁরা এর প্রকৃত সারমর্ম—উভয়ের দ্বান্দ্বিক সমাহার (ডায়ালেকটিক্যাল ইন্টারপেনিট্রেশন) উপলব্ধি করতে পারেন না। তাঁর ভাষায়, 'এ ছিল যুগপৎ আপসের অগ্রগতি ও অগ্রগতির আপোস।' অগ্রগতি নিশ্চয়—কিন্তু সেটা আপসের মাধ্যমে সুসংগঠিত—আবার এর চেয়ে চরম সার্থক আপস আর সম্ভব নয়। তিনি বলছেনে, এই জটিল বিষয়টি সঠিক অনুধাবনের জন্য তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্পর্কে উপযুক্ত বিবেচনা চাই।

১. সমঝোতার প্রাক্কালে দেশের পরিস্থিতি
২. সে পরিস্থিতি সম্পর্কে বুর্জোয়া নেতৃত্বের মূল্যায়ন
৩. সমঝোতার বৈশিষ্ট্য

অজিত রায় লিখছেন : দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর গণঅভ্যুত্থানের উত্তাল তরঙ্গ ব্রিটিশ শাসক সম্প্রদায় ও জাতীয় কংগ্রেসের নেতাদের কাছাকাছি নিয়ে আসে। বিশেষ করে যখন কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরোধিতা সত্ত্বেও গণবিদ্রোহ চলতে থাকে এবং কমিউনিস্ট ও বামপন্থীরা এসব আন্দোলনের নেতা ও সংগঠক—তখন এটা ঘটতে বাধ্য। এ পর্যায়ে কংগ্রেস নেতৃত্বের মূল লক্ষ্য ছিল—জনগণ থেকে কমিউনিস্টদের বিচ্ছিন্ন করা, দুর্বল করা। সারা দেশ জুড়ে তারা কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষের জেহাদ শুরু করে এবং বহুক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের মারধর পর্যন্ত করে।

অপরদিকে মাউন্টব্যাটেনকে ভারতে দায়িত্বভার নিতে অনুরোধ করার সময় ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী এটলি বলেন, 'আমরা যদি সাবধানে পা না ফেলি—তাহলে ভারতকে শুধু যে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দেওয়া হবে—তা নয়, এক সর্বগ্রাসী বা টোট্যালিটারিয়ান চরিত্রের রাজনৈতিক শক্তির হাতে ভারতকে সঁপে দেওয়া হবে।' (মিশন উইথ মাউন্টব্যাটেন, পৃ ১৭)—টোট্যালিটারিয়ানধর্মী রাজনৈতিক শক্তি বলতে—এটলি কমিউনিস্ট ও বামপন্থী শক্তিকেই বোঝাচ্ছেন।

ভারতীয় জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের (আই. এন. টি. ইউ. সি.) প্রথম অধিবেশনে উদ্বোধনী ভাষণ প্রসঙ্গে সর্দার প্যাটেল বলেন : দেশকে অবর্ণনীয় দুর্দশার কবল থেকে যদি বাঁচাতে হয় ও শান্তিপূর্ণভাবে যদি ক্ষমতা হস্তান্তরের কাজ সম্পন্ন করতে হয়—তাহলে শ্রমিক আন্দোলনে বর্তমানে যে নৈরাজ্য চলছে তাকে অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। এখানেও প্যাটেল নৈরাজ্য বলতে শ্রমিক আন্দোলনের জঙ্গী মেজাজকে বোঝাচ্ছেন।

সুতরাং এটলি ও প্যাটেল—উভয়ের একই দুশ্চিন্তা। অভূতপূর্ব গণ-জাগরণ ও মেহনতী মানুষের ক্রমবর্ধমান জঙ্গী মেজাজ। উভয়েরই শত্রু এক ও অভিন্ন। বৈপ্লবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ মানুষ দুজনেরই রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে।

অ্যালেন ক্যাম্পবেল জনসন অত্যন্ত সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় ১৯৪৭-এর ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রকৃত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলছেন :

'The transfer of power was as unique response to a revolutionary situation. It is usual for revolutions to get out of control and defy the calculations of those lead them. Perhaps Lord Mountbatten's greatest achievement lay in producing a solution which had about it sufficient substance and support to survive the storm of the immediate revolutionary crisis.' (*Mission with Mountbatten*, p. 37)

অজিত রায়ের মতে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের হাতে ব্রিটিশ শাসকদের ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘটনাটিকে যেমন কোনমতেই একটি সত্যিকারের বিপ্লব বলা চলে না, আবার তেমনি এটা নিছক সমঝোতার পরিণতিও নয়। এটা এমনই এক প্রক্রিয়া যেখানে 'বিপ্লব' ও 'সমঝোতা'—দুটোই বর্তমান।

এটা এমন একটা 'বিপ্লব' যার লক্ষ্য প্রকৃত বিপ্লবকে বানচাল করা। আবার এই 'সমঝোতা'র পিছনেও রয়েছে এক প্রবল বাধ্যবাধকতার অস্তিত্ব।

ভারতের বুর্জোয়া নেতৃত্ব সর্বদা এক ধরনের আরোপিত সীমাবদ্ধ 'বিপ্লবে'র পক্ষপাতী, যার আশু লক্ষ্য নিজের সংকীর্ণ শ্রেণীস্বার্থ বিকাশের পথ উন্মুক্ত করা ও সাধারণ মানুষকে সামান্য কিছু পাইয়ে দিয়ে নিজের গণভিত্তি আরও প্রসারিত ও সংহত করা। বুর্জোয়া নেতৃত্ব কিন্তু সব সময় প্রকৃত বিপ্লবের পথ এড়িয়ে চলেছে। অতএব যখন গণ-অভ্যুত্থান প্রবল বৈপ্লবিক চেহারা নেয় ও যুদ্ধোত্তর যুগে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর এক বড় অংশ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং এসব কংগ্রেস নেতাদের নিষেধ অমান্য করেই চলতে থাকে—তখনই ব্রিটিশ শাসক ও কংগ্রেসের মধ্যে বোঝাপড়ার প্রক্রিয়া দ্রুততর হয়ে ওঠে।

অতএব, নীচুতলার আসন্ন বিপ্লবকে বানচাল করার জন্যে ওপরতলা থেকে চাপিয়ে দেওয়া 'সীমাবদ্ধ বিপ্লবে'র অপর নাম এই ক্ষমতা হস্তান্তর।

এই পটভূমিতে মনে হয়, সেদিনের রাজনৈতিক পালাবদলের সার্থক প্রতিবিম্ব সমর সেনের এই কবিতা দুটি :

জয়হিন্দ

বম্বেতে দিন রেখে গেল বারুদের গন্ধ,
রাস্তায় রক্তের ছিটে।
বন্দুকের খর শব্দ থামলে শহরে
বিপ্লবী নেতারা জমে বক্তৃতার মাঠে,
সর্দারের ধমকে পার্কের রেলিং কাঁপে,
হয়তো কৃতপাপের লজ্জা জাগে
মর্গে জমা দুশো সত্তরটা লাসে।
মাঝে মাঝে উদ্যত সঙিন, সাম্রাজ্যের উদ্ধত প্রতীক।

...জন্মদিনে

কাক ডাকে
রোদেপোড়া উদ্বিগ্ন মুখের কালো শব্দ
বাঙলায় বিহারে গড় মুক্তেশ্বরে
বিকলাঙ্গ লাশ কাঁধে লোক চলে গোরস্থানে
কিম্বা পোড়াবার ঘাটে।
মৃত্যু হয়তো মিতালি আনে :
ভবলীলা সাঙ্গ হলে সবাই সমান—
বিহারের হিন্দু আর নোয়াখালির মুসলমান
নোয়াখালির হিন্দু আর বিহারের মুসলমান।

যৌবনের প্রেম শেষ প্রবীণের কামে।

কবিতার সাংকেতিক ভাষায় নয়—ঋজু ও প্রাঞ্জল গদ্যে বিবৃত করেছেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর এবং অনেকের আত্মিক সংকট—সেদিনের নিরুপায় অসহায়তাবোধের কথা। তিনি লিখছেন :

'কিন্তু প্রচন্ড ভূমিকম্পের পর যেমন মাঝে মাঝে নদীর গতি পর্যন্ত পালটে যায়, তেমনি যে-খাতে আমাদের জনতার চিন্তা ও কর্ম চলছিল, যার প্রোজ্জ্বল প্রকাশ দেখেছিলাম '৪৫-এর নভেম্বর থেকে '৪৬-এর জুলাই পর্যন্ত, সেই খাতে আর প্রবাহ যেন বইল না। হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনার চোটে আমাদের ইতিহাস বিশ্রী একটা মোড় নিয়ে বসল। ক্রমশ সহজ হয়ে এল ভাবা যে এই ধিক্কৃত দেশে একত্র মেহনতী মানুষ ভাষা-ধর্ম-নির্বিশেষে স্বাধীনতা অর্জন করবে আর তার সাম্যবাদী পরিণতির দিকে অগ্রসর হবে চিন্তা করা দিবাস্বপ্ন, বরঞ্চ 'সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ' স্মরণ করে মেনে নেওয়া যেতে পারে দ্বিখণ্ডিত দেশের বিকৃত স্বাধীনতা।'
(তরী হতে তীর, পৃ ৪১০-১১)

তৃতীয় পর্ব

রক্তে আনো লাল

রাত্রির গভীর বৃন্ত থেকে ছিঁড়ে আনো ফুটন্ত সকাল।

সুকান্ত ভট্টাচার্য/বিবৃতি

এক

দেশজোড়া সাম্প্রদায়িক হানাহানির পরিপ্রেক্ষিতে কমিউনিস্ট পার্টি নতুন সরকারকে জানাল অকুণ্ঠ সমর্থন। জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় বেশ গুরুত্ব সহকারে ছাপা হল—'নেহরু গভর্নমেণ্টকে অকুণ্ঠভাবে সমর্থনের জন্য পি. সি. জোশীর আবেদন'। সমর্থনের প্রধান কারণ ঃ

'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এক গভীর সংকটের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে সমগ্র দেশে আগুন জ্বলিতেছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এই দাঙ্গার জন্য মুখ্যতঃ দায়ী। পাকিস্তান ও ভারতীয় ইউনিয়নের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার যে উন্মত্ত অভিযান আরম্ভ হইয়াছে, দেশীয় রাজ্যগুলিই তাহার সম্মুখ ঘাঁটিরূপে কাজ করিতেছে। দেশীয় রাজারাই দাঙ্গার প্রধান প্ররোচক ও প্রধান অস্ত্রাগারে পরিণত হইয়াছে। এই দেশীয় নৃপতি ও বৃটিশ অফিসারদের যোগ-সাজসে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ, আর্য সমাজী প্রভৃতি দল শরণার্থীদের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করিয়া যুক্ত প্রদেশ, বোম্বাই ও কলিকাতায় দাঙ্গা বাধাইতে চায় এবং এইভাবে গভর্নমেণ্টকে কুক্ষিগত করিতে চায়।

দাংগার এইসব মূল শক্তি ও প্ররোচকদের বিরুদ্ধে ব্যাপক জাতীয় ফ্রণ্ট গঠন করাই আজিকার কর্তব্য। যাহারাই আজ দাঙ্গা প্রতিরোধ করিতে চায়, পাকিস্তান ও ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যে সহযোগিতা চায়, আজ তাহারাই প্রগতিশীল। মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত নেহরু, শ্রীযুক্ত পন্থ প্রভৃতি নেতা হইতে সুরু করিয়া কম্যুনিস্ট পর্যন্ত প্রত্যেকেই এই যুক্তফ্রণ্টে সংঘবদ্ধ হইতে হইবে।

পরিশেষে শ্রীযুক্ত যোশী বলেন যে, আমাদের জাতীয় গভর্নমেণ্টের নেতা পণ্ডিত নেহরুর পিছনে সংঘবদ্ধ হইবার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি আজ সমগ্র দেশবাসীকে অকুণ্ঠ আহ্বান জানাইতেছে। জাতির শত্রুরা আজ পণ্ডিত নেহরু তথা তাঁহার গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে যে আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে দেশের সমস্ত মিলিত শক্তির দ্বারা তাহাকে রুখিতেই হইবে।' (যুগান্তর, ৮. ১০. ৪৮)

নেহরু সরকারের প্রতি এই নিঃশর্ত সমর্থন ও দাংগা-বিরোধী মানুষ মাত্রেই প্রগতিশীল—এ ধরনের উক্তি সাধারণ অবস্থায় পার্টির সবাই মেনে নিত কিনা সন্দেহ। কিন্তু সারা দেশ জ্বলছে! বিশেষ করে পাঞ্জাবে বয়ে চলেছে রক্তস্রোত। এর মুখোমুখি গোটা পার্টি যেন হতচকিত। পরবর্তীকালে বি. টি. রণদিভে বলেন, এই অস্বাভাবিক ও অভূতপূর্ব পরিস্থিতির চাপে পার্টি নেতৃত্বের বামপন্থী অংশও জোশীর লাইনকে সমর্থন জানাতে বাধ্য হন। (ওভারস্ট্রিট ও উইন্ড মিলার, কমিউনিজম ইন ইন্ডিয়া, পৃ ২৬২-৬৩)

১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্টের পর কিন্তু পার্টির নীতিগত অবস্থানের ঠিক উল্টো খাতে বয়ে চলেছে প্রকৃত ঘটনাপ্রবাহ। দিল্লীতে নেহরু সরকার ও কলকাতায় প্রফুল্ল ঘোষের সরকার অধিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী মানুষের জীবন জীবিকা ও অধিকারের উপর ক্রমবর্ধমান হামলা। সবশেষে ব্যক্তি-স্বাধীনতা হরণের তোড়জোড়। চলতে থাকে 'স্বাধীন' সরকারের জনবিরোধী চেহারার ধারাবাহিক উন্মোচন।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট অর্থাৎ স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রথম দিনেই শ্রীদুর্গা কটন মিলের চারজন নেতৃস্থানীয় ইউনিয়ন কর্মীকে ছাঁটাই করা হয়। তার প্রতিবাদে চলতে থাকে মনোরঞ্জন হাজরার নেতৃত্বে দীর্ঘস্থায়ী লড়াই। অবশেষে ত্যাগ-বীরত্ব-মৃত্যুর সড়ক ধরে শ্রীদুর্গার শ্রমিক লড়াই জয়যুক্ত হয়। অ্যালবামে ধরে রাখার মতো কয়েকটি অসামান্য দৃশ্য এই লড়াইয়ের সংগে সম্পৃক্ত। যেন ৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চের জের এখনও অব্যাহত।

মনোরঞ্জন হাজরা লিখছেন :

'এদিকে তখন ক্লাইপার রোড আর জি. টি. রোডের জংশনে হাজার হাজার মানুষের ভিড়। পুলিশের রি-ইনফোর্সমেন্ট দেখে ডি. এস. পি.-র হৃত সাহস ফিরে এল। ড্রাইভারকে গাড়ী স্টার্ট দিতে হুকুম দিলেন। গাড়ীর সামনের চাকা ধাক্কা মারল ভিখারীকে। ভিখারী এতক্ষণ সংযত ছিল—কিন্তু যেই ধাক্কা লাগল—সোজা ডি. এস. পি.-র নাকে বসিয়ে দিল তার শক্ত হাতের একখানা প্রচণ্ড ঘুষি। সংগে সংগে তখন এসে পড়ল সশস্ত্র বাহিনীর গাড়ী। দু'দুটো ট্রাক—দুটো ট্রাকে আটচল্লিশখানা রাইফেল।

ইউনিয়নের যত জঙ্গী-শ্রমিক ছিল সবাইকে ডাকা হল—এগিয়ে এল ভিখারী, হেমন্ত, কালীপদ, নিরঞ্জন, চন্দ্রনাথ ফকির, বাউরীবন্ধু, বটকেষ্ট, আলেখ সাউ, চেহেতু, ধনেশ্বর, লিংগরাজ, গয়াধর—বাঙালী, বিহারী, ওড়িয়া, মাদ্রাজী সবাই। দশ ফুট উঁচু ব্যারিকেড রচিত হল—চেয়ার, বেঞ্চ, টেবিল, তক্তাপোষ, পাশের বাটার দোকান থেকে বড় বড় কেরোসিন কাঠের প্যাকিং বাক্স—থাকে থাকে সাজানো হয়ে গেল।'

মনোরঞ্জন ব্যারিকেডের উপর দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন : 'সশস্ত্র পুলিশের ভায়েরা। আপনাদের কাছে আমাদের আবেদন—আপনারা অনুগ্রহ করে শুনুন আমাদের কথা, যেদিন জাহাজী ফৌজেরা আরব সাগরের বুকে দাঁড়িয়ে বিদ্রোহ করেছিল সেদিন আমার পার্টি, যেদিন বিহারে পুলিশ ভাইয়েরা স্ট্রাইক করেছিলেন সেদিনও আমার পার্টি—সেই জাহাজী, ফৌজ আর আপনাদের মদত দিতে এগিয়ে গিয়েছিল। ভাই, বন্ধু আজ যখন আমাদের রুটির লড়াই, আমাদের আদর্শের লড়াই, তখন সেদিনের মত আমরাও চাই আপনাদের মদত, আপনাদের সমর্থন।

'ভাইসব আপনারাও আমাদের মত গরীব ঘরের ছেলে। হয়তো আপনা-

দেরই বাপ-দাদা-কাকা-জ্যাঠা ক্ষেত-খামারে নয়তো কলে-কারখানায় আমাদের মতই মেহনত করেন—কাজেই আপনারা আমাদের সমগোত্রীয়, আমাদের মেহনতী মানুষের ভাই। তাই আপনাদের কাছে আমাদের অনুরোধ আপনারা আমাদের দিকে রাইফেল তাক করবেন না। আমাদের গুলি করবেন না।'

এস. ডি. পি. ও. চরম আদেশ দিয়ে বসলেন—'ফায়ার'।

হঠাৎ জয়রাম সিং সশস্ত্র বাহিনীর ট্রাক থেকে লাফিয়ে পড়ল নীচে। এস. ডি. পি. ও.-র কাছে গিয়ে খটাস্ করে সেলাম দিলে। তারপর বুক পকেট থেকে নোটবুকখানা বের করে ধরে বললে, 'পহেলা লিখ্ দিজিয়ে সাব ফায়ারিংকা অর্ডার—নেইতো পিছে হম ফাঁস যায়গা।'

ক্রোধে ও অপমানে আরক্ত এস. ডি. পি. ও. কোনদিকে না তাকিয়ে নিজের জীপের দিকে চলে গেলেন। জনতা উল্লাসে ফেটে পড়ল।' (ক্লাইপার রোডের ঝড়)

আর এক দৃশ্য। শ্রমিকরা হয় গ্রেপ্তার নয় ফেরার। পিকেট লাইনে তাদের জায়গা নিয়েছে ঘরের মেয়েরা। মনোরঞ্জন দেখছেন এক বিরল দৃশ্য যা কোন কারখানার গেটে আগে কেউ দেখেনি।

'ঐতো বাঁদিক থেকে অমূল্যের মা, হরিপদর দিদি, মনোরঞ্জনের দিদিমণি, ঐতো সতীশ আর সুবোধের বৌ, তারপর দাঁড়িয়ে নিরঞ্জনের পিসী। নিরঞ্জনের পিসীর পর দেবুর বৌ, কমলের বৌ, নন্দের বৌ, সুফলের বৌ। এরপর আরও মেয়ে এসেছে বিভা, কুসুম, রেবা।' (ক্লাইপার রোডের ঝড়)

ঠিক একই ভূমিকায় নেমেছেন দেড়শ' দিনের ধর্মঘটী বাসন্তী কটন মিলের উপোসী শ্রমিক ঘরের মেয়েরা। শ্রমমন্ত্রীর কাছে লেখা এক খোলা চিঠিতে বাসন্তী শ্রমিকের মা ও বৌ-এরা ঘোষণা করেন :

মায়ের অভিশাপ, স্ত্রীর ক্রোধ আপনার যাত্রাপথে
বিঘ্ন সৃষ্টি করিবে

'...আপনি একজন পুরানো শ্রমিক নেতা। শ্রমিকদের দুঃখ-দারিদ্র্যের সঙ্গে নিশ্চয়ই আপনার পরিচয় আছে। আজ শ্রম-মন্ত্রী হিসাবে আপনার হাতে শাসন-ক্ষমতা আসিয়াছে। কিন্তু তবু কেন আপনার এই শাসন ক্ষমতা সেই গরীবদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হইতেছে? শ্রমিকদের দাবী যে ন্যায্য একথা আপনিও স্বীকার করিয়াছেন। তবু কেন শ্রমিকদের এই ন্যায্য দাবী আদায়ে আপনি তাঁহাদের সাহায্য করিতেছেন না?'

স্বাঃ নন্দরাণী দাস, কৃষ্ণদাসী দেবী, মনোমোহিনী দেবী, তরুলতা দেবী, কালীতারা ভট্টাচার্য্য, প্রতিভাময়ী দাস, অন্নপূর্ণা চৌধুরী, বাসন্তী বসু, ফেলাবালা দাসী, ভেদীবালা দাসী, মরণী সিকদার, চপলা, সিধুবালা, নুরজাহান বিবি, লক্ষ্মী, শোভা দাসী, তীর্থবালা, বীণা, মঙ্গলা, অন্নদা দাসী,

এয়া রাম্মা, সরলাবালা দাসী, পার্ব্বতী, গোলাপী দাসী ও ধনিপতিয়া। (স্বাধীনতা, ৬. ১১. ৪৭)

১০ই নভেম্বর থেকে শুরু ব্রুকবন্ড শ্রমিকদের ধর্মঘট। দশজন নেতাকে ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে এই ধর্মঘট।

নব পর্যায়ের শ্রমিক-মালিক বিরোধে 'স্বাধীন' সরকার কোন্ পক্ষে? এর উত্তরের জন্যে বেশিদিন অপেক্ষা করতে হল না। ১৯৪৭ সালের ১০ই নভেম্বর এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়: 'কারখানার শ্রমিক ও অফিসের কর্ম্মচারীদের মধ্যে সম্প্রতি 'সত্যাগ্রহ' ও 'অবস্থান ধর্ম্মঘট' করিবার যে আগ্রহ দেখা যাইতেছে তাহার সম্বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।' (স্বাধীনতা, ১২. ১১. ৪৭)

এরকম উৎকট মালিক-ঘেঁষা শ্রম-নীতি এমনকি কংগ্রেসী শ্রমিক নেতাদেরও বরদাস্ত হচ্ছিল না। ১১ই নভেম্বর শ্রদ্ধানন্দ পার্কের এক জনসভায় কংগ্রেসের শ্রমিক-নেত্রী ডাঃ মৈত্রেয়ী বসু এক বক্তৃতায় বলেন, 'শ্রমনীতি মন্ত্রিসভাকে কলঙ্কিত করিবে—বাসন্তী এবং শ্রীদুর্গার ধর্ম্মঘটের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে পাঁচ মাস যাবৎ ধর্ম্মঘট চলিতে দেওয়া ও শ্রমিকদের উপর গুলি চালান কংগ্রেস মন্ত্রিসভার নামই কলঙ্কিত করিবে।' (স্বাধীনতা, ১২. ১১. ৪৭)

নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ২৭তম প্রতিষ্ঠা দিবসে মনুমেন্ট-ময়দানে অনুষ্ঠিত পঞ্চাশ হাজারের এক শ্রমিক সমাবেশ থেকে সরকারি শ্রম-নীতির পরিবর্তন দাবি করা হয়।

জমিদারবাবুদের কাহিনীও তাই। 'স্বাধীন' সরকারের আমলে তাদেরও পোয়াবারো। 'স্বাধীনতা'র নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, অগ্রদ্বীপের জমিদারবাবুর গরু নির্বিবাদে প্রজাদের ফসল খেয়ে বেড়াচ্ছিল। প্রজারা সাহস করে একদিন এসে পেয়ারের গরুকে খোঁয়াড়ে জমা করে দেয়। বাস্, অমনি জমিদারের কাছারিবাড়ি থেকে সমন এল প্রজাদের নামে। কয়েকজন প্রজা সেখানে যায় আর মার খেয়ে ফিরে আসে। জমিদারের গরু প্রজাদের ধান খেয়ে সাবাড় করলেও প্রজাদের গরু মাঠের ঘাসও খেতে পায় না। (স্বাধীনতা, ৭. ১০. ৪৭)

'স্বাধীনতা'র সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, জোতদারের গোলায় ধান তোলার জন্যে কাকদ্বীপ ও মথুরাপুর থানায় সশস্ত্র পুলিশ ও বেতার ঘাঁটি প্রস্তুত। প্রতিবাদে কৃষকরা ষাট হাজার বিঘা জমিতে ধানকাটা বন্ধ করেছেন। (২৪. ১২. ৪৭)

তবুও ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ বীরভূম পল্লী নির্বাচন কেন্দ্রের উপনির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির পুরো সমর্থন লাভ করেন এবং নির্বাচনে জয়ী হন। ডাঃ ঘোষ পেলেন ২২,৪৮০টি ভোট এবং হিন্দু মহাসভা প্রার্থী শিবশংকর মুখার্জি পান ১০,৯৪২টি ভোট।

সরকারের ক্রমবর্ধমান জনবিরোধী কার্যকলাপ সত্ত্বেও কেন এই সমর্থন ? তার উত্তর দিচ্ছেন ভবানী সেন :

'বর্তমানে জাতীয় গভর্নমেণ্টের দক্ষিণে রহিয়াছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী, আমলাতন্ত্র, জমিদার, ধনী মালিক, দেশীয় রাজন্যবর্গ এবং তাহার বামে রহিয়াছে শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত। জাতীয় গভর্ণমেণ্টের উপর দক্ষিণের টান ব্যর্থ করিয়া আমরা বামের টানকে জয়যুক্ত করিতে চাই। কংগ্রেসের সঙ্গে দক্ষিণের যে কোন সংগ্রামে বামের শক্তি কংগ্রেসকেই সমর্থন করিবে। শ্রমিক এবং কৃষকের স্বার্থ হইল প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ অভিযান।

বীরভূমে ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের নির্ব্বাচনে হিন্দু মহাসভা দক্ষিণের পক্ষ লইয়া কংগ্রেসের বিরোধিতা করিতেছিল। সেইজন্য কমিউনিস্ট পার্টি সেখানে সর্ব্বান্তঃকরণে ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষকে সমর্থন করিয়াছিল। নির্ব্বাচনী অভিযানে কমিউনিস্ট পার্টি বীরভূমে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য, জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ এবং চোরাবাজারের উচ্ছেদকেই প্রধান দাবিতে পরিণত করিয়াছিল। মহাসভার অভিযান ছিল ঠিক এই সমস্তের বিরুদ্ধে। বীরভূমে মহাসভা যদি জয়ী হইত তাহা হইলে দাঙ্গার শক্তিই প্রবল হইত। এরূপ ক্ষেত্রে কোন কোন বামপন্থী দলের নিরপেক্ষতা কার্য্যতঃ হিন্দু-মহাসভাকেই সুবিধা করিয়া দিয়াছে।

অবশ্য জাতীয় গভর্নমেণ্টের ভিতরও দক্ষিণের শক্তি প্রবল, তাহার স্থান শূন্য করিয়া বামের শক্তির দ্বারা উহা পূর্ণ করিতে হইবে। সে কাজ সফল করিবার প্রধান উপায় প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক ঐক্যবদ্ধ অভিযান। বীরভূমের নির্ব্বাচনে ডাঃ ঘোষের সাফল্যের জন্য আন্দোলন করিয়া আমরা সেই অভিযানই চালাইয়াছি। তাহা যাঁহারা চালান নাই তাঁহাদের কেহ জ্ঞাতসারে কেহ অজ্ঞাতসারে প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণের শক্তিলাভে সাহায্য করিয়াছেন।' (পার্টি সংগঠক, ১২. ১২. ৪৭)

দুই

যতক্ষণ কলকাতায় কিছু না ঘটে ততক্ষণ দেশের লোক জানতে পারে না বা জানলেও সেসব ঘটনাকেও বিশেষ আমল দেয় না। সুতরাং শিল্পাঞ্চলের বা গ্রামাঞ্চলের ঘটনাগুলির প্রভাব নিতান্তই আঞ্চলিকতার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ। তখনও দেশবাসীর চোখে নতুন সরকারের অপাপবিদ্ধ চরিত্র অম্লান। নয়া সরকার—জাতীয় সরকার—শিশু সরকার—এসব অভিধায় ভূষিত ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের মন্ত্রিসভা। এই সরকার কি মজুত উদ্ধার করছে না। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ কি ময়দা কলে হানা দিয়ে বস্তা বস্তা তেঁতুল বীচি উদ্ধার

করেননি ! জনা কয়েক মারোয়াড়ি ব্যবসাদারকে কি গ্রেপ্তার করা হয়নি ! এই খদ্দরধারী মন্ত্রীরা কি আজীবন দেশের জন্যে নিজের সুখ বিসর্জন দেননি !

কিন্তু পর পর কয়েকটি ঘটনার অভিঘাতে মানুষ চমকে উঠল। এবং এবার ঘটনাস্থল কলকাতার রাজপথ :

২২শে নভেম্বর, 'যুগান্তরের' সংবাদ শিরোনামা :

কলিকাতায় রামেশ্বর দিবসে ছাত্রদের উপর পুলিশ হামলা
কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ ও মৃদু লাঠি চালনা

প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, ছাত্র ও কৃষক—উভয়েই সেদিন পুলিশী হামলার শিকার। কারণ, সেদিন 'রামেশ্বর দিবস' উপলক্ষে ছাত্র মিছিল ও তে-ভাগার দাবিতে কৃষক মিছিল—দুটোই বিধানসভার দিকে যাচ্ছিল।

২১শে নভেম্বর 'স্বাধীনতা'য় এই বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশিত হয় :

স্বাধীন বাংলার আইনসভাকে অভিনন্দন জানাইতে
জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ ও তে-ভাগা আইন পাশের দাবীতে
বিরাট কৃষক সমাবেশ

স্থান — ওয়েলিংটন স্কোয়ার সময় — বেলা ১২টা

কৃষ্ণবিনোদ রায়
মনসুর হাবিব

একই দিনে একই সময়ে ছাত্ররাও এসে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে 'রামেশ্বর স্মৃতি' সভায় মিলিত হয়। ঐ সভায় রামেশ্বরের একটি মূর্তি নির্মাণের দাবি প্রস্তাবাকারে গৃহীত হয় এবং এই প্রস্তাব সরকারের কাছে পেশ করার জন্যে ছাত্র-শোভাযাত্রা আইনসভার দিকে অগ্রসর হয়। যুদ্ধোত্তর কলকাতার প্রথম শহিদ রামেশ্বরের স্মৃতি নতুন বাংলার ছাত্রসমাজের কাছে এক পবিত্র উত্তরাধিকার। তারই অনুরণন অসীম রায়ের কবিতায় :

২১শে নভেম্বর

হাজার শ্রাবণ জল ঢেলে যাক ঘাসের চাপড়া ঘিরে
পথের ধুলোয়, সে দাগ তবুও মুছবে না মুছবে না,
যে যৌবনের শিক্ষা হয়েছে রক্তের স্বাক্ষরে
ঘুম পাড়ানিয়া গান গেয়ে তাকে ভুলাতেও পারবে না
নতুন শপথ এসেছে আবার ; অস্ফুট কলস্বরে
হাতের মুঠিতে এখনো যখন আগামীর আনাগোনা
মিলেছি আবার, হয়েছি জমাট একুশে নভেম্বরে।

(স্বাধীনতা, ২৩. ১১. ৪৭)

২১শে নভেম্বরের ছাত্র-কৃষক মিছিলকে মোকাবিলা করল 'স্বাধীন' বাংলার সরকার ঠিক ব্রিটিশ আমলের কায়দায়।

পরের দিন অর্থাৎ ২২শে নভেম্বর 'স্বাধীনতা'র পাতায় এভাবে সংবাদটি পরিবেশিত হল :

১৫ হাজার কৃষক ও ছাত্রদের শোভাযাত্রা আটক করিয়া পুলিশের কাঁদুনে বোমা নিক্ষেপ

এসেম্বলীর সামনে জমিদারী উচ্ছেদ ও তে-ভাগা আইনের দাবী তোলায় বাধা

মন্ত্রীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত না হওয়ায় শোভাযাত্রীদের মধ্যে বিক্ষোভ

'শুক্রবার (২১ ১১. ৪৭) আজ পশ্চিম বাংলা এসেম্বলীর প্রথম অধিবেশনকে অভিনন্দন জানাইবার জন্য প্রায় ১৫ হাজার কৃষকের এক বিরাট শোভাযাত্রা এসেম্বলী গৃহ অভিমুখে অগ্রসর হইবার সময় পুলিশ তাহার পথ রোধ করে। কিছুক্ষণ পরে 'রামেশ্বর দিবস' উপলক্ষে এক ছাত্র শোভাযাত্রা কৃষক মিছিলটির পাশ দিয়া অগ্রসর হইবার সময় পুলিশ অতর্কিতভাবে উভয় শোভাযাত্রার উপর বহুবার কাঁদুনে বোমার সাহায্যে আক্রমণ চালায়।...

...দুই বৎসর আগে এই ২১শে নভেম্বর ছাত্রসমাজ আজাদ হিন্দ দিবসে যে ঐতিহ্যের সৃষ্টি করিয়াছিল আজ বাংলার ছাত্র ও কৃষক তাহারই পুনরাবৃত্তি করিতেছে।

সেদিনের পুনরাবৃত্তি শুধু কৃষক ও ছাত্ররাই করে নাই ; পুলিশও সেই দিনের ভূমিকা পুনরভিনয় করিল তাহাদের অতর্কিত আক্রমণে। যখন জনতা শান্তভাবে পথের উপর দাঁড়াইয়া মন্ত্রীদের উপস্থিতি দাবী করিতে লাগিল, তখন আরও সশস্ত্র পুলিশ আমদানী করা হইল, ফিরিঙ্গি সার্জেণ্টদের হাতে আরও কাঁদুনে বোমা বাঁধিয়া দেওয়া হইল। ততক্ষণে কয়েক সহস্র কেরাণী ও নগরবাসী চারিদিকে জমিয়া গিয়াছেন, দাবী তুলিয়াছেন 'পুলিশ জুলুম চলিবে না', 'অত্যাচারের বিচার চাই।'

সবই ঠিক। দিনটা ২১শে নভেম্বর বটে কিন্তু বছরটা ১৯৪৫ নয় ১৯৪৭। ১৯৪৫-এর ২১শে নভেম্বরে ক্রুদ্ধ ধিক্কারধ্বনি গর্জনের রূপ নিয়েছিল ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে। আজ শুধু পুলিশের আচরণের বিরুদ্ধে ধিক্কার। সরকারকে আসামী বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে না। তাই ঐদিনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন সভা থেকে দাবি জানান হয় :

ছাত্র মিছিলের উপর আক্রমণের জন্যে পুলিশ অফিসারদের শাস্তি চাই—সমস্ত ঘটনা খতিয়ে দেখার জন্যে বে-সরকারি তদন্ত কমিটি গঠন করা হোক।

২১শে নভেম্বরের 'অশুভ ইঙ্গিতবাহী' ঘটনাটির জন্যে 'স্বাধীনতা'র সম্পাদকীয় নিবন্ধে (২৩. ১১. ৪৭) পুলিশকেই পুরোপুরি দায়ী করা হয় এবং মন্ত্রীদের অনুরোধ করা হয়, তাঁরা যেন পুলিশের লাগাম টেনে ধরেন।

২১শে নভেম্বরের ঘটনার জের মিলিয়ে যাবার আগেই পার্টি ও দেশের মানুষের জন্যে অপেক্ষমান আর এক বিপন্ন বিস্ময়। আইনসভায় সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ ক্ষমতা আইনের বিল আনা হল। সরকারের মৌল চরিত্র এই বিলের ছত্রে ছত্রে উদ্‌ঘাটিত। এবার আর কারও পক্ষে পুলিশের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে সরকারকে অব্যাহতি দেওয়া সম্ভব নয়। এই বিল প্রসঙ্গে ২৯শে নভেম্বর 'স্বাধীনতা'র পাতায় লেখা হল :

বিশেষ ক্ষমতা আইনের ধারায় ধারায়
গণতন্ত্রের অপমৃত্যু

দলীয় ও আমলাতান্ত্রিক ক্ষমতার লোভে ন্যায্য
প্রতিবাদেরও কণ্ঠরোধ

দেশব্যাপী প্রতিবাদে জাতীয় সর্ব্বনাশ রোধ করুন

[বিশেষ অধিকার আইনের মর্মবস্তু : বিনা বিচারে জেল, সংবাদপত্রের সেন্সর, গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে ন্যায্য ধর্মঘটও নিষিদ্ধ, রাজনীতিক ধর্মঘটে পাঁচ বছর সাজা, সরকারী কর্মচারীদের অভিযোগ চাপা দেওয়া, প্রমাণ ও বিচারবিহীন নিরঙ্কুশ দমননীতি।]

'পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ ক্ষমতা বিল' মারফত পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে বিশেষ ক্ষমতা গ্রহণ করতে যাচ্ছেন তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয় :

'ভবিষ্যতে যে কোন রকম ব্যাপক 'বিশৃঙ্খলা' দমন করার জন্য এই আইন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা ব্যাপক অরাজকতা উপস্থিত হইলে তার ব্যবস্থার জন্য গভর্নমেণ্ট সাধারণ আইন ছাড়াও এই অতিরিক্ত ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া অনেকের ধারণা। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। আইনের সঙ্গে অধিকাংশ সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বা ব্যাপক বিশৃঙ্খলার কোন সম্বন্ধ নাই। যে কোন সাধারণ অবস্থায় আমলাতন্ত্র এই আইন প্রয়োগ করিয়া বিনা বিচারে ও বিনা প্রমাণে শ্রমিক, কৃষক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্ম্মীদের গ্রেপ্তার করিয়া মালিক, জমিদার ও চোরাকারবারীদের তুষ্ট করিতে পারিবে। আর মন্ত্রিমণ্ডলী তথা দলীয় গভর্নমেণ্ট যাহাতে তাঁহাদের আইনসঙ্গত বিরোধী পক্ষের ন্যায়সঙ্গত বিরোধিতারও কণ্ঠরোধ করিতে পারেন এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে বর্ত্তমানে অনুমোদিত শ্রমিক আন্দোলনকেও ধ্বংস করাই হইল এই বিলের আসল উদ্দেশ্য।'

বিশেষ অধিকার বিলের অগণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যালোচনা করে দেখানো হয় :

'স্পেশ্যাল পাওয়ার্স' বিল কি ?

১। প্রাদেশিক সরকার, তাঁহাদের যে কোন অফিসার এমন কি দারোগা-সাহেব পর্য্যন্ত নিজেদের খুশি মতো যে কোন লোককে বিনা বিচারে ও বিনা প্রমাণে জেলে বন্দী এবং গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেন। ইহার বিরুদ্ধে আদালতে বিচার চলিবে না।

২। ট্রাম, বাস, রেল, বিজলী, কর্পোরেশন, গ্যাস, কয়লা, পেট্রোল. সিভিল সাপ্লাই প্রভৃতিতে ধর্ম্মঘট করিলেই এবং সরকারী কর্ম্মচারী, পুলিস ও ফায়ার-ব্রিগেডে 'অসন্তোষ' সৃষ্টি করিলে এবং যে কোন রাজনৈতিক কারণে ধর্ম্মঘট করিলে ৫ বছর জেল।

৩। এ সম্বন্ধে কোন লেখা, ছবি, দলিল ইত্যাদি প্রকাশ, মুদ্রণ ও বিলির জন্য ৫ বছর জেল। সংবাদপত্রে প্রকাশিত 'আপত্তিকর' সংবাদের জন্য রিপোর্টারের নাম জানাইতে বাধ্য করা হইবে, অন্যথায় ৩ বছর জেল। যে কোন সময়ে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা যাইবে।

৪। বিশেষ হুকুমে রাস্তায় লাউড স্পীকার হইতে চোঙ্গা পর্য্যন্ত শব্দ-যন্ত্রের ব্যবহার বন্ধ করা চলিবে।' (স্বাধীনতা, ৩. ১২. ৪৭)

পুলিশ রাজ কায়েম করাই যে বিলটির আসল লক্ষ্য—এ বিষয়ে কমিউনিস্ট পার্টি পুরোপুরি নিঃসন্দেহ। পার্টির পক্ষ থেকে, ব্যক্তি স্বাধীনতা সংঘের সম্পাদক নিরঞ্জন সেনগুপ্ত সমস্ত দেশপ্রেমিক মানুষের কাছে এই বিল প্রত্যাহারের দাবি জানাতে আহ্বান জানান। 'স্বাধীনতা' লাভের পর এই প্রথম সমস্ত বামপন্থী ও প্রগতিপন্থীদের সম্মিলিত আন্দোলন ঘটায় এই স্পেশ্যাল পাওয়ার্স বিলটি। কলকাতায় ও কলকাতার বাইরে বিভিন্ন সভা ও জনসমাবেশ থেকে প্রস্তাবিত বিলটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। এই প্রতিবাদে শিল্পাঞ্চলের সমাবেশে শ্রমিকদের অংশগ্রহণ বিশেষ লক্ষণীয়।

২৯শে নভেম্বর—কলকাতা, বাঁশবেড়িয়া, জগদ্দল ও দমদমে অনুষ্ঠিত শ্রমিক সমাবেশে বিলটি প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়।

৩০শে নভেম্বর—জগদ্দল গোলঘর ময়দানে দেড় হাজার শ্রমিকের জমায়েত থেকে বিলটির নিন্দা করা হয়।

প্রখ্যাত সাংবাদিক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভা থেকে প্রতিবাদ জানানো হয়। উত্তর কলকাতার ফরওয়ার্ড ব্লক কর্মীরাও একটি প্রতিবাদ সভা করেন।

১লা ডিসেম্বর—রামনগিনা সিং-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ কলকাতায় ট্রাম শ্রমিক সভা থেকে বিলটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান হয়।

মেদিনীপুর শহরের কংগ্রেস ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সম্মিলিত প্রতিবাদ-শোভাযাত্রা থেকে দাবি ওঠে: কংগ্রেসের ঐতিহ্যবিরোধী দমন-মূলক বিল প্রত্যাহার করুন। এই দাবিতে মেদিনীপুর জেলার নানা জায়গায় ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়।

২রা ডিসেম্বর—কামারহাটিতে রমজান আলির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত চার হাজার শ্রমিকের সভা থেকে প্রতিবাদ জানানো হয়।

বেলঘরিয়ার মোহিনী মিল (২নং), টেক্সম্যাকো, পটারি ও কাস্টিংস ইউ-নিয়নের পক্ষ থেকে বিলটি প্রত্যাহারের জন্য প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ ঘোষের কাছে তারবার্তা পাঠান হয়।

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে আন্দোলন জোর কদমে চলতে থাকে। কলকাতার প্রায় প্রতিটি পার্কে জনসভা হয়। শরৎচন্দ্র বসু কয়েক মাস আগে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান পার্টি প্রতিষ্ঠা করেছেন। কমিউনিস্ট পার্টির পরই এই আন্দোলনে শরৎবাবু প্রতিষ্ঠিত এস. আর. পি.-র স্থান। শরৎবাবুর সভায় বেশ লোক হতে থাকে। ৬ই ডিসেম্বর, শ্রদ্ধানন্দ পার্কে শরৎবাবুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় দশ হাজার লোক জমায়েত হয়। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন জ্যোতি বসু, সত্যরঞ্জন বক্সী ও সত্য গুপ্ত। ৭ই ডিসেম্বর হাজরা পার্কে পনেরো হাজার মানুষের জমায়েতে শরং বসু বক্তৃতা করেন। তাছাড়া শ্যাম পার্ক, হৃষীকেশ পার্ক ও বিডন স্কোয়ারের সভাতেও প্রচুর জনসমাগম হয়।

হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে প্রতিবাদ জানান দুশ জন অগ্নিযুগের বীর বিপ্লবী।

লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবী মহলও প্রতিবাদে মুখর। তারাশঙ্কর বন্দ্যো-পাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, ধীরেন্দ্রনাথ সেন, গোপাল হালদার, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিজন ভট্টাচার্য, অরুণ মিত্র, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, রথীন মৈত্র, জ্যোতির্ময় রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়, নবেন্দু ঘোষ, ননী ভৌমিক, সুশীল জানা প্রমুখ খ্যাতনামা সাহিত্যিক, শিল্পী ও সাংবাদিকগণ এই বিল প্রত্যাহারের দাবি জানান। (স্বাধীনতা ৪. ১২. ৪৭)

তারপরই ঘটল স্বাধীন বাংলার সরকার-কৃত প্রথম হত্যাকাণ্ড এবং এই মহানগরীর বুকে।

১১ই ডিসেম্বর প্রকাশিত 'স্বাধীনতা'র সংবাদ-শিরোনামা :

কলিকাতায় ছাত্র ও জনতার উপর নির্বিচার গুলিবর্ষণ

এ্যাম্বুলেন্সের উপর পুলিশের আক্রমণে
স্বেচ্ছাসেবকের মৃত্যু

এসেম্বলীর সম্মুখে তিন ঘণ্টা ব্যাপী কাঁদুনে গ্যাস ও লাঠি চালনা

সংবাদসূত্রে প্রকাশ, ১০ই ডিসেম্বর পুলিশের গুলিতে আর. ডবল্যু. এ. সি.-র কর্মী শিশির মণ্ডল নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ব্যারিস্টার এস. সি. দত্ত ও আরও চার জন। তা ছাড়া আশে-পাশের অফিসগুলিতেও

পুলিশ হানা দিয়ে নির্বিচারে প্রহার করে। তার ফলে, এ. জি. বেঙ্গলের ৫০ জন কর্মী আহত হয়েছেন এবং সেখান থেকে ১০২ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

এ প্রসঙ্গে অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী সরোজ চক্রবর্তী মশায় বলেছেন :

'১০ই ডিসেম্বরেই প্রথম পুলিশের গুলি চলে এবং তার ফলে আর. ডবলু. এ. সি.-র স্বেচ্ছাসেবক শিশির মণ্ডলের মৃত্যু আমার চোখের সামনেই ঘটে। স্পেশ্যাল পাওয়ার্স বিলের প্রতিবাদে অনুষ্ঠিত এক জঙ্গী মিছিলের মোকাবিলায় এক পুলিশ বাহিনী বন্দোবস্ত করা হয়। টিয়ার গ্যাস ও লাঠি-চার্জ শুরু হলে ছাত্ররা টাউন হল ও এ. জি. বেঙ্গল অফিসে ঢুকে পড়ে। সমস্ত এলাকা টিয়ার গ্যাসের ধোঁয়ায় অন্ধকার। আমরা যারা আইনসভার উত্তর দিকের বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলুম—টিয়ার গ্যাসের দৌলতে আমরা সবাই তখন অঝোরে কাঁদছি। পুলিশ কমিশনার এস. এন. চ্যাটার্জি স্বয়ং পুলিশী কর্মকাণ্ডের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। আর হোম সেক্রেটারি রণজিৎ গুপ্ত মশায় আমাদেরি পাশে দাঁড়িয়ে গোটা ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত পুলিশই জয়ী। তারা শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ করে এবং ২৩ জন আহত সহ একশ জনকে গ্রেপ্তার করে। সমগ্র ঘটনাটা মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর সহকর্মীদের ভীষণভাবে বিচলিত করে।' (উইথ বি. সি. রায় ইঃ, পৃ ৬৮)

এই বিয়োগান্ত ঘটনায় সার্বিক ক্রোধ ও ধিক্কার ধ্বনিত হওয়ার কথা। কার্যত দেখা গেল তা ঘটল না। জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি প্রকৃতপক্ষে ছাত্রদের নিন্দা করল এবং সরকারের হয়ে সাফাই গাইল। 'যুগান্তর' (১২. ১২. ৪৭) সম্পাদকীয় নিবন্ধে এই আন্দোলনকে 'ভ্রান্ত পথ' বলে অভিহিত করে।

কালাকানুন দমননীতির বিরুদ্ধে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ১৩ই ডিসেম্বর সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান জানায়। শিশির মণ্ডলের মৃত্যুর ফলে জনমত এখন সরকারবিরোধী। মানুষের মেজাজ খানিকটা আন্দাজ করে ও ঘটনা প্রবাহকে স্তিমিত করার জন্যে সরকার 'স্পেশ্যাল পাওয়াস' বিলের আলোচনা ১৯৪৮-এর ৫ই জানুয়ারি পর্যন্ত স্থগিত রাখেন। এই স্থগিতকরণকে জনগণের জয় বলে শরৎ বসু ১২ই ডিসেম্বর বিকেলে শ্রদ্ধানন্দ পার্কের জনসভায় মন্তব্য করেন। বিল প্রত্যাহারের জন্যে মন্ত্রিসভাকে সময় দানের উদ্দেশ্যে বি. পি. টি. ইউ. সি. ১৩ই ডিসেম্বর সাধারণ ধর্মঘটের ডাক প্রত্যাহার করে নেয়।

তিন

'বিশেষ অধিকার বিল' প্রত্যাহার করা হল না। অতএব সাধারণ ধর্মঘটের দিন পেছিয়ে ৫ই জানুয়ারি নির্দিষ্ট করা হল। সে উপলক্ষ্যে চলল অবিরাম প্রচার। অপর দিকে কংগ্রেস দল এবং সরকারও চুপচাপ বসে নেই। জাতীয়তাবাদী কাগজগুলি 'বিশেষ অধিকার' আইনের যৌক্তিকতায় মুখর। চোরাকারবারি ও দাঙ্গাবাজদের শায়েস্তা করার জন্যে এই আইন পাশ হওয়া একান্ত জরুরি। অতএব 'বিশেষ অধিকার'-বিরোধী দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলন জটিল অবস্থার সম্মুখীন। মানুষের একাংশ ইতিমধ্যে কিছুটা বিভ্রান্ত। কংগ্রেস শুধু পাল্টা সভাসমিতি করেই ক্ষান্ত নয়—তারা আবার নতুন করে কমিউনিস্টবিরোধী জিগির শুরু করেছে। তার সঙ্গে মারধরেও তাদের অরুচি নেই—যদিও এই বিলের বিরোধিতা করেছেন কংগ্রেসের একাংশ : বর্ধমানের কংগ্রেস নেতা যাদব পাঁজা, মেদিনীপুরের কুমার জানা ও চারু মহান্তি। কিন্তু প্রস্তাবিত বিল আইনসভায় উত্থাপিত হবার আগেই চলছে নানা জায়গায় গুণ্ডামি ও লাঠিবাজি। এমনকি প্রতিবাদী কংগ্রেস-কর্মীদেরও রেহাই নেই।

গুণ্ডাদের আক্রমণে মেদিনীপুর টাউন কংগ্রেসের যুগ্ম সম্পাদক পান্নালাল ব্যানার্জি ও ফরওয়ার্ড ব্লকের সত্যরঞ্জন বেরা আহত হন। ছাত্র ফেডারেশনের কর্মী বরকত হোসেন মারের চোটে অজ্ঞান। (স্বাধীনতা, ১৯. ১২. ৪৭)

কলকাতার বুকে কমিউনিস্ট পার্টির এক মিছিল, ২০শে ডিসেম্বর, ওয়েলিংটন স্কোয়ার থেকে দেশবন্ধু পার্ক পর্যন্ত পথ পরিক্রমা করে। তাতে হাজার হাজার মানুষ অংশ গ্রহণ করেন। কালাকানুনের বিরুদ্ধে আরেকটি শ্রমিক মিছিল মনুমেণ্ট-ময়দান থেকে বেরিয়ে নানা রাস্তা ঘুরে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে গিয়ে শেষ হয়।

এতদিন পর্যন্ত কলকাতার বুকে সভা-শোভাযাত্রার উপর বড় রকমের কোন হামলা হয়নি। হরতালের দু'দিন আগে অর্থাৎ ১৯৪৮ সালের ৩রা জানুয়ারি কমিউনিস্ট পার্টির এক বড় মিছিল কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট ধরে যখন দেশবন্ধু পার্কের দিকে যাচ্ছিল—ফড়িয়াপুকুর স্ট্রীটের মোড়ে এসে মিছিলটি আক্রান্ত হয়। 'বঙ্গীয় কলালয়' নামে এক নাচ-গানের স্কুলের ছাদ থেকে 'ভারত জাতীয় বাহিনী'-র গুণ্ডারা সোডার বোতল আর ইঁট ছুঁড়ে মিছিলটি ছত্রভঙ্গ করে। তারপর তারা শুরু করে বিচ্ছিন্ন শোভাযাত্রীদের উপর বেপরোয়া মারধর। কমিউনিস্ট ঠ্যাঙাবার উদ্দেশ্যে, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় সদ্যোজাত ভারত জাতীয় বাহিনী-র সৃষ্টি।

অতএব ৫ই জানুয়ারির হরতাল শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ায় ঘটতে দেওয়া হচ্ছে না।

হরতাল সম্পর্কে ৬ই জানুয়ারি 'যুগান্তরে' প্রকাশিত সংবাদ :

কলিকাতায় সাধারণ ধর্ম্মঘটের আহ্বান ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত

শহরের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ অব্যাহত

ধর্ম্মঘটের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত

'একমাত্র হাওড়া এলাকার দুই একটি মিল ভিন্ন বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ইউনিয়নগুলিও গতকাল ধর্ম্মঘটে যোগ দেয় নাই। খিদিরপুরের ডক এলাকায় ধর্ম্মঘট হয় নাই।

পশ্চিমবঙ্গ নিরাপত্তা বিলের প্রতিবাদে এই সাধারণ ধর্ম্মঘটকে কংগ্রেস এবং সোস্যালিস্ট দল বিরোধিতা করেন। একমাত্র কম্যুনিস্ট পার্টি ও শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর সোস্যালিস্ট রিপাব্লিকান দল এবং অপর কয়েকটি বামপন্থী দল এই ধর্ম্মঘটকে সমর্থন করেন। কিন্তু ধর্ম্মঘট ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হওয়ায় পুনরায় আর একবার কলিকাতাবাসী প্রমাণ করিলেন যে তাঁহারা কংগ্রেসপন্থী।

এতদিন কোনরকম শ্রমিক বিক্ষোভের সর্ব্বাগ্রে কম্যুনিস্টরা ট্রাম ধর্ম্মঘট করাইয়া সহরের স্বাভাবিক আবহাওয়া নষ্ট করিতেন। কিন্তু সোমবার তাহাদের শত চেষ্টা সত্ত্বেও ট্রামগাড়িগুলি চলাচল করিয়াছে।'

৫ই জানুয়ারির হরতাল পুরোপুরি সফল হয়নি এবং ঐ দিনটিকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস-কমিউনিস্ট সম্পর্ক চরম তিক্ততায় বিষিয়ে ওঠে। জগৎ বোস বলছেন, '১৯৪৮ সালের ৫ই জানুয়ারি শুরু হয় সারা কলকাতা জুড়ে কংগ্রেস-কম্যুনিস্ট রায়ট। পটারির শ্রমিক বস্তিতে আগুন দেওয়া হয়—ইউনিয়ন অফিস পোড়ানো হয়। পুলিশ ও গুণ্ডার অত্যাচার সেদিন চূড়ান্ত পর্যায়ে ওঠে। আমার ট্যাংরার বাসা আক্রান্ত হয়। ঐদিন পূর্ব কলকাতার শ্রমিকরাই শুধু ধর্মঘট করে। কাদাপাড়া অঞ্চলে আমরা মার খাই। যুগল ঘোষ, ভোলা চ্যাটার্জি ও পুনিত গোয়ালা কাদাপাড়া জুট মিলে আমাদের কমরেডদের উপর হামলাবাজির নেতৃত্ব দেয়। তার বদলা হিসাবে পটারি অঞ্চলে আমরা কংগ্রেসীদের মার দিই। পামার বাজার এলাকায় নর্থ জুট মিলের কাছে একজন পটারি শ্রমিককে কংগ্রেসী শ্রমিকরা মারে। খবর পেয়ে গরান কাঠ হাতে করে আড়াই হাজার শ্রমিক বেরিয়ে এসে আলি মহম্মদ আর দীন আলির নেতৃত্বে টহল দিতে থাকে। সেদিনই ঐ অঞ্চলের সব মধ্যবিত্ত পরিবার পাড়া ছেড়ে পালায়। একজন গান্ধীটুপি মাথায় দিয়ে যাচ্ছিল। তাকে শ্রমিকরা টুপি খুলে যেতে বাধ্য করে।'

এরকম জোরালো উপলক্ষ্য—তবুও কেন হরতাল ব্যর্থ? তার উত্তরে রণেন সেন বলেন, 'প্রফুল্ল ঘোষ সবে বসেছে এবং কংগ্রেস তার পূর্ণ গরিমায়। তখনও তারা এমন কিছু করেনি যাতে লোকে বিক্ষোভে ফেটে পড়তে পারে। কাজেই আমরা ধর্মঘটের ডাক দিয়ে হঠকারী কাজ করে বসি।'

সোমনাথ লাহিড়ী বলছেন, 'সিকিউরিটি অ্যাক্ট-এর বিরুদ্ধে হরতালের ডাকে মাত্র পঞ্চাশ হাজার শ্রমিক সাড়া দিল। এমন কি ট্রামেও হরতাল হল না। উল্টে ট্রামে পাল্টা ইউনিয়ন তৈরি হয়ে গেল। তখনও শ্রমিক প্রস্তুত নয়। তখন এক্সপ্ল্যানেটরি ক্যাম্পেন (ব্যাখ্যা করার জন্য 'প্রচার)-এর দরকার ছিল। আমি আর রণেন সেন এই হরতালকে 'অপোজ' (বিরোধিতা) করেছিলুম। আমি পি. সি. মিটিং-এ (রাজ্য কমিটির সভায়) ঠিক এই তিনটি শব্দ বলেছিলুম : এক্সপ্লেন—এক্সপ্লেন—এক্সপ্লেন (ব্যাখ্যা করো—ব্যাখ্যা করো—ব্যাখ্যা করো)।'

১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্টের পর শ্রমিকের পরিবর্তিত মনোভাব মণিকুন্তলা সেনেরও দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি লিখছেন।

'ধর্মঘটে আর তেমন তেজ নেই। সেই ২৯শে জুলাই-এর সাফল্যের পর এই পার্থক্যটা চোখে পড়ার মতন। ট্রাম-বাস শ্রমিকদের মধ্যে ছিল কমিউনিস্টদের প্রাধান্য। তারা রাস্তায় নামলেই কলকাতায় হরতাল সর্বদা সফল হয়ে যেত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাদের মধ্যেও অন্যত্র কোন প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট হলে তার সমর্থনে হরতালে যোগ দিতে দ্বিধা দেখা যেতে লাগল। ২৯শে জুলাই-এর ধর্মঘটে যে শ্রমিকরা ইউনিফর্ম পরে স্বেচ্ছায় রাস্তায় হাঁটল, তাদের মধ্য থেকেই এখন দাবি উঠল—সকালবেলা তারা ডিউটিতে যোগ দেবে, নাম সই করবে, ব্যাগ নেবে এবং ট্রামগাড়ি রাস্তায় বের করবে। তারপর জনতা যদি গাড়ি আটকায় তবে 'জান খতরা' অজুহাতে গাড়ি তারা ডিপোতে তুলে দেবে।' (সেদিনের কথা, পৃ ১৮৭)

৫ই জানুয়ারি. কমিউনিস্টদের চোখে নতুন করে ধরা পড়ল কংগ্রেসের স্থূল শ্রেণী-চরিত্র। ৫ই জানুয়ারির পর থেকে স্বপ্নভঙ্গের পালা। কংগ্রেস-কমিউনিস্ট মিতালি যে কত অসম্ভব—প্রকৃত স্বাধীন ভারত গড়ার জন্যে গান্ধীজী থেকে কমিউনিস্ট পর্যন্ত সকলের মিলিত যুক্তফ্রন্টের তত্ত্ব যে কত অলীক এবং প্রগলভতার নামান্তর—আক্রান্ত ও রক্তাক্ত কমিউনিস্টরা সেদিন এই সারসত্যটুকু অনেক রূঢ় অভিজ্ঞতার বিনিময়ে উপলব্ধি করেন।

চার

১৯৪৮ সাল। 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' প্রকাশের শতবর্ষ পূর্তির বৎসর। অতএব একজন কমিউনিস্টের কাছে বছরটির আলাদা তাৎপর্য। আজ সমস্ত রাস্তা গিয়ে মিলেছে কমিউনিজমের আঙিনায়—মলোটভের এই ঐতিহাসিক উক্তিতে যেন বিশ্বের তাবৎ কমিউনিস্টের সযত্নলালিত আকাঙ্ক্ষা নিহিত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির দিকে তাকালে মনে হয় ১৯৪৮ সাল বিপ্লবের বার্তাবাহী বছর। বছরটি যেন এদেশের কমিউনিস্টদের জন্যেও অজ্ঞাতপূর্ব

অভিজ্ঞতায় ঠাসা। কলকাতার কমরেডরা ৫ই জানুয়ারি তার কিঞ্চিৎ আভাস পেয়েছে। কিন্তু ১৯৪৭ সালের শেষ দিন বোম্বাই শহরে যা ঘটে গিয়েছে, তার তাৎপর্যও কিছু কম নয়।

সেই ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ 'যুগান্তরে'র পাতা থেকে তুলে দেওয়া হচ্ছে।

বোম্বাইতে ছাত্র-শোভাযাত্রীদের উপর গুলিবর্ষণ

ছাত্রগণ কর্তৃক বলপূর্বক সম্মেলন মণ্ডপ অধিকার

—

মণ্ডপের ভিতর পুলিশের লাঠি চালনা

একজন ছাত্রীসহ ছয়জন ছাত্র প্রতিনিধি আহত

ও

কাঁদুনে গ্যাসের ফলে তিনশত ছাত্রছাত্রী অসুস্থ

'বোম্বাই, ৩১শে ডিসেম্বর, অদ্য অপরাহ্নে প্রায় ৪ ঘটিকার সময় তিন সহস্রাধিক ছাত্রের একটি মিছিল কামগড় ময়দানে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের সম্মেলন মণ্ডপের দিকে অগ্রসর হইলে পুলিশ ছয় রাউণ্ড গুলীবর্ষণ করে। পুলিশ এই মণ্ডপটি ঘেরাও করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু 'সম্মেলন মণ্ডপ চল' ধ্বনি সহকারে অগ্রসরমান ছাত্রদের মিছিলটি মণ্ডপে ঢুকিয়া পড়ে এবং পুলিশের উপর চেয়ার ছুঁড়িয়া মারে। ফলে একজন পুলিশ কনস্টেবল আহত হয়।

মণ্ডপের ভিতর ছাত্ররা তাহাদের সভা আরম্ভ করে। বোম্বাই ছাত্র ফেডারেশনের সম্পাদিকা সুশীলা মনিবেন 'সরকারের দমন-নীতির' নিন্দা করিয়া এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং উহা গৃহীত হইল বলিয়া ঘোষণা করা হয়। ইহার পরও ছাত্রগণ মণ্ডপের ভিতর বসিয়া থাকে। তখন পুলিশ কাঁদুনে গ্যাস চালায়। ফলে প্রায় তিনশত ছাত্রছাত্রী অসুস্থ হইয়া পড়ে। এতদ্ব্যতীত একজন ছাত্রীসহ ছয়জন ছাত্র প্রতিনিধি গুলিতে আহত হয় এবং অপর কুড়িজন লাঠি চার্জের ফলে সামান্য আহত হয়।

বোম্বাই পুলিশ নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনকারীদের উপর বহুবার লাঠিচার্জ করে এবং শতশত কাঁদুনে বোমা নিক্ষেপ করে। রিভলবার হইতেও তাহারা ছয় রাউণ্ড গুলীবর্ষণ করে।' (যুগান্তর, ১. ১. ৪৮)

এই সংঘর্ষ আসলে কমিউনিস্ট পার্টির জীবনে পটপরিবর্তনের সূচক। রাজনৈতিক লাইন ও পার্টি নেতৃত্বে পরিবর্তনের ইঙ্গিতবাহী এই ঘটনা। বাংলার ছাত্র প্রতিনিধিরা বোম্বাই সম্মেলনে গিয়ে তার আভাস পেয়েছিলেন। সে কথায় পরে আসছি।

ইতিমধ্যে পার্টির পরিবর্তিত রাজনৈতিক লাইন, কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাব আকারে পার্টি কর্মীদের কাছে পেঁাছে গিয়েছে। প্রস্তাবটির মূল বিষয়বস্তু :

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বর্ত্তমান নীতি ও কাজ সম্পর্কে

ভূমিকা

কমরেড,

বোম্বাই শহরে সম্প্রতি ১৯৪৭ সালের ৭ই হইতে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির এক বৈঠক হয়। সেখানে পার্টির রাজনৈতিক কাজের মূল ধারা নির্দ্দেশ করিবা একটা বিবৃতি অনুমোদিত হইয়াছে।

ছাপা প্রস্তাব এবং বর্ত্তমান লেখা দুই-এ মিলিয়া এ-কথা পরিষ্কার বোঝা যাইবে যে, দেশের রাজনৈতিক অবস্থাটা কেন্দ্রীয় কমিটি আবার ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখিয়াছে, তাহা আন্তর্জাতিক অবস্থার সঙ্গে মিলাইয়া দেখা হইয়াছে। আগে আমাদের বুঝিবার যে ভুল ছিল কেন্দ্রীয় কমিটি সেই ভুল ভাঙ্গিয়া দিল নির্ম্মমভাবে।...

১৯৪৭-এর জুন মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবে মাউণ্টব্যাটেন রোয়েদাদ ও জাতীয় সরকার সম্বন্ধে যে ভুল ধারণা ছিল তাহা ত্যাগ করা হইল। ইতি-মধ্যে আসল গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্ভাবনা ও আয়োজন সম্বন্ধে সজাগ ভাবটা আমাদের মনে ম্লান হইতে হইতে মুছিয়া গিয়াছিল। এই লেখায় তাহাকে আবার প্রতিষ্ঠা করা হইতেছে। বামপন্থীদের একজোট করিবার প্রয়োজনের উপর এখানে জোর দেওয়া হইয়াছে, চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখানো হইতেছে যে বামপন্থীদের মিলন কত দরকারী, তাহার সার্থকতা ও শক্তি কতখানি।

এদেশে বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্ব সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে যে ভুল ধারণা দেখা গিয়াছিল, সেই সুবিধাবাদী কল্পনাকে এই লেখা তীব্রভাবে আঘাত করিতেছে। বড়লোকদের স্বার্থের খাতিরে গান্ধীজী, পণ্ডিত নেহরু ও সর্দার প্যাটেলের কি ভূমিকা আমরা ঠিকমত যাচাই করতে পারি নাই। এই নেতাদের মধ্যে একটা বড় তফাৎ আমরা ভুল করিয়া টানিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম; সেই চেষ্টার পিছনে ছিল জাতীয় নেতা বিশেষের আঁচল ধরিয়া থাকিবার সুবিধাবাদী নীতির সাফাই গাহিবার ইচ্ছা।...

জাতীয় পুনর্গঠন সম্বন্ধে ভুল ধারণা, আজিকার দিনে কেবলমাত্র সামান্য সংস্কারের উপর ভুল আস্থা রাখা, দাঙ্গা প্রতিরোধ অথবা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ব্যাপারে গান্ধীজী বা পণ্ডিত নেহরুর উপর অন্ধ বিশ্বাস, জাতীয় সরকার সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ও সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে তাহার সহযোগ না দেখা—এই সব কিছুর উপর যে তীব্র আক্রমণ করা হইল তাহা সম্পূর্ণ সঙ্গত। কারণ পার্টির নেতাদের মধ্যেই ভুল ও বিচ্যুতি দেখা গিয়াছিল, তাহারই ফলে সমগ্র পার্টি রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ভুল বুঝিয়াছিল।...

যে সব ভুলের এখানে সমালোচনা হইয়াছে তাহাতে বোঝা যায়, পার্টির মধ্যে যে সংস্কারবাদী অবিপ্লবী মনোভাব শিকড় গাড়িয়া আছে—রাজনৈতিক

ঘটনার মার্কসপন্থী বিচারে তাহা বাধা দেয়। এই সংস্কারবাদী বিচ্যুতি অনেক কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেই দেখা গিয়াছে। আমেরিকাতে ব্রাউডার ভুল করিলেন। বিলাতে পার্টির নেতারা ভুল করিলেন, অস্ট্রেলিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশ্যে তাহার সমালোচনা করিয়াছে। ফরাসী পার্টির নেতা তোরেজ আত্মসমালোচনা করিয়াছেন। এইসব হইতে বোঝা যায় যে বহু কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেই দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদী ঝোঁক দেখা দিয়াছিল।

জনযুদ্ধের যুগ পার হইয়া আসিবার সময় নানা দেশের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে এই একই ধরনের কিছু কিছু ঝোঁক দেখা দিয়াছিল, একথা আজ সুস্পষ্ট। সংস্কারপন্থীদের ও মালিকগোষ্ঠীর লেজুড় হইয়া চলার নীতির পক্ষেই এই ঝোঁক সমর্থন যোগাইয়া আসিয়াছে।

আমরা আজ যে আত্মসমালোচনা করিতে বসিয়াছি তাহাকেও দেশ-বিদেশের এই অভিজ্ঞতার আলোতে দেখিতে হইবে; ইহাকে হাল্কাভাবে নেওয়া উচিত নয়। —পলিট ব্যুরো

পুনশ্চ—এই খসড়া কেন্দ্রীয় কমিটির সকলে একমত হইয়া গ্রহণ করেন নাই। কমরেড পি. সি. জোশী, কমরেড পি. সুন্দরায়া ও কমরেড ইকবাল সিং বিপক্ষে ভোট দেন। কমরেড এস. জি. সরদেশাই প্রথমে নিরপেক্ষ ছিলেন। পলিট ব্যুরোর কাছে তিনি পরে বিরুদ্ধ মত দাখিল করেন বটে, কিন্তু তিনি আবার সে মন্তব্য প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছেন এবং খসড়ার পক্ষে পূর্ণ সমর্থন জানাইয়াছেন। (২১. ১. ১৯৪৮)

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমান নীতি ও কাজ সম্পর্কে বক্তব্য

[কেন্দ্রীয় কমিটির ৭ই হইতে ১৬ই ডিসেম্বর (১৯৪৭) বৈঠকে গৃহীত]

১৫ই আগস্টের পর সারা ভারতীয় ইউনিয়ন জুড়িয়া বিশাল পরিবর্তন আসিয়াছে। জাতীয় কংগ্রেসের নেতাদের লইয়া কেন্দ্রীয় সরকার গড়িবার ফলে দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর ভিতর পারস্পরিক সম্বন্ধে পরিবর্তন দেখা দিয়াছে, নানা প্রতিষ্ঠান ও শ্রেণীর ভূমিকাও আর ঠিক আগের মতন নাই।

—ভারতের জনগণ মুক্তি কিংবা স্বাধীনতা পাইয়া গিয়াছে, কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠার মধ্যে তাহার কোন চিহ্নই নাই। এমন কি গণতন্ত্র অথবা জনসাধারণের মুক্তির দিকে যে এই সরকার অগ্রসর হইবে তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই।

বরং উল্টো তরফে বলা চলে যে নূতন সরকার বিপরীত রাস্তাই ধরিয়াছে, তাহার গতি হইল সাধারণ লোকের স্বার্থ ও মুক্তির পরিপন্থী, ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সমাবেশের সঙ্গে হাত মিলাইবার দিকেই তাহার ঝোঁক।' (পৃ ৪-৯)

জাতীয় সরকার ও জনগণ

গণতন্ত্র ও মুক্তির দিকে আমাদের জাতীয় সরকার অগ্রসর হইতেছে না, সেই আদর্শ দমনের দিকেই সরকারের ঝোঁক।

আমাদের রাষ্ট্রগঠন পরিষদ তাই যে শাসনতন্ত্র খাড়া করিতেছে তাহার রূপ হইবে এই যে উপর তলার লোকেরাই অত্যাচারে জর্জরিত কোটি কোটি সাধারণ লোককে শাসন করিতে থাকিবে। সেই শাসনের লক্ষ্য হইবে ইংরাজ ও ভারতীয় ধনিকের মিলিত স্বার্থের খাতিরে জনগণের শোষণ।

ইতিমধ্যে আমাদের সরকার ভারতীয় ধনকুবেরদের পরিকল্পনা কাজে খাটাইতে লাগিয়া গিয়াছে। জাতীয়করণের প্রস্তাব রুখিতে হইবে, শ্রমিকদের দাবাইয়া রাখা প্রয়োজন, আরও বেশী ঘণ্টা খাটাইয়া উৎপাদন বাড়াইবার রব উঠিয়াছে। মজুরি বাড়িলে জিনিসের দাম বাড়িবে, এই বিপদের ধুয়া তুলিয়া মজুরি চাপিয়া রাখা হইবে; শ্রমিকেরা যেটুকু দাবী আদায় করিয়াছিল তাহা পর্য্যন্ত কার্য্যকরী হইতে দেওয়া চলিবে না (রেলের চুক্তিব ব্যাপারে ইহাই ঘটিতেছে)।

এককথায় পরিকল্পনা হইল এই যে, অর্থনৈতিক সংকটের সমস্ত ভারটুকু শ্রমিকের কাঁধে চাপাইয়া মালিকের মুনাফাটা অব্যাহত রাখিতে হইবে।···

·· সরকার যে নীতি অনুসরণ করিতেছে তাহার পরিচয় দিতে গেলে এই কথাই বলিতে হয় যে সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়ার তোষণ করা হইতেছে; সঙ্গে সঙ্গে সামন্ততন্ত্র বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিপ্লবী লড়াইকে পিছন হইতে আঘাত করার কসুর দেখা যায় না।

গণতান্ত্রিক দাবী ও ব্যক্তি স্বাধীনতার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দ্দেশে প্রাদেশিক সরকারগুলি কালা কানুন পাশ করিতেছে—তাহার নাম দেওয়া হইতেছে জনরক্ষা আইন। সেই আইনের অবাধ প্রয়োগ চলিয়াছে বর্দ্ধিষ্ণু শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের উপর আর ছাত্রদের বিরুদ্ধে। শতশত লোক আজ বিনা বিচারে আটক অথবা অন্তরীণ।

প্রাদেশিক মন্ত্রীদের জমি-সংক্রান্ত আইন পাশের জল্পনা পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের নেতারা রাশ টানিয়া আটকাইয়া রাখিয়াছেন। পরিকল্পিত আইনগুলি আবার জমিদারী প্রথা তুলিয়া দিবার ব্যাপারে পুরা লাভটুকু হইতে চাষীদের ঠকাইয়া বঞ্চিত করার চেষ্টা মাত্র। কিষাণ আন্দোলন ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টা এখানে চোখে পড়ে, চাষী বিপ্লবের বাড়ন্ত শক্তিকে ছত্রভঙ্গ করাই ইহার লক্ষ্য।

মন্ত্রীসভায় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে গ্রহণ করাতে দেখা গেল যে সরকার সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে আপোষ করিয়া লইয়াছে। (পৃঃ ৯ - ১২)

সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহযোগিতা

আমাদের সরকার একদিকে জাতীয়করণের পথে দেশের মূল শিল্পের প্রসার করিতে রাজী নয়, অন্যদিকে ভারতীয় বড় ব্যবসায়ীদের স্বার্থের

খাতিরে রপ্তানি বাড়াইবার প্রচেষ্টায় উৎসাহের অভাব নাই; সাধারণ লোককেই অবশ্য তাহার ঠেলা সামলাইতে হইবে। ঈঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার সংকল্পের অংশ হিসেবে ইহাকে দেখিতে হইবে, কারণ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে হাত না মিলাইলে রপ্তানির জন্য এ ধরনের বাজার জোটানো সম্ভব নয়।

ইংরাজ ও আমেরিকান ধনিকদের উপর আর্থিক নির্ভরতার এই দুই দিক আছে, ভারতীয় পণ্যের জন্য বিদেশী বাজার জুটাইতে এবং তাহাদের কাছে যন্ত্রপাতি কিনিবার জন্য হাত পাতিতে হইবে। তাই প্রয়োজন হইয়াছে দাসের মত প্রভুর মুখ চাহিয়া থাকা এবং নির্লজ্জের মতন আত্মসমর্পণ। এদেশী বড় ব্যবসায়ীরা সরকারের সাহায্যে, ঈঙ্গ-মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে ভারতের ভবিষ্যৎ বিকাইয়া দিতে বসিয়াছে।

ইহার স্বাভাবিক ফল দাঁড়াইবে এই যে, শুধু অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব নয়, পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক প্রভুত্বও বিদেশীর হাতে গিয়া পড়িবে। (পৃ ১২ - ১৪)

পণ্ডিত নেহরুর বৈদেশিক নীতি

জাতীয় সরকার যে শ্রেণী-স্বার্থের প্রতিনিধি, সরকারের বৈদেশিক নীতি চলিতেছে তাহারই নির্দেশে। গোড়া হইতে পণ্ডিত নেহরু একটা 'তৃতীয় পক্ষ' গড়িবার নীতি গ্রহণ করিয়াছেন, সেই নীতির মধ্যে আসলে প্রকাশ পাইতেছে বড় ব্যবসায়ীদের স্বার্থটুকু। সে নীতি ভারতবর্ষকে গণতান্ত্রিক শিবির হইতে দূরে রাখিয়াছে, সাম্রাজ্যবাদী শিবিরে ভিড়িবার পথ পরিষ্কার করিতেছে। ···

···পণ্ডিত নেহরু বলেন অর্থনৈতিক নীতির উপর বৈদেশিক নীতি নির্ভর করে। কথাটা প্রমাণ হইয়াও গিয়াছে। বৈদেশিক সম্বন্ধের ব্যাপারেও তাই ভারতবর্ষ ঈঙ্গ-মার্কিন দলের সঙ্গে একজোটে দাঁড়াইবার জন্য প্রস্তুত হইতে দেরী করে নাই। ভারতীয় রাষ্ট্রদূতেরা ইতিমধ্যেই সোভিয়েট বিরোধী মিথ্যা প্রচারের বুলি আওড়াইতে শুরু করিয়াছেন।

···তাই কথাটা আজ পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে যে আমাদের এই 'জাতীয়' সরকার সম্বন্ধে আর ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করা চলিতে পারে না। জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সম্পূর্ণ করিয়া তোলা—ইহাই হইল সাধারণ লোকের এই মুহূর্তের প্রয়োজন। সে প্রয়োজন মিটাইতে জনগণের সংকল্প সফল করিবার কাজে এই সরকার সহায় হইবে না। সাধারণ লোক ও জাতীয় সরকারের মিলিত ফ্রন্টের আর অবকাশ নাই। ভারতের শ্রমিক ও জনসাধারণকে এখন সরকারী নীতির পরাজয়ের জন্য লড়িতে হইবে। জাতীয় সরকারের আজ আমূল পরিবর্তন সম্ভব করিয়া তুলিতে হইবে।

'নেহরু সরকারের প্রতি পূর্ণ সমর্থন' অথবা 'জনগণ ও জাতীয় সরকারের মিলিত ফ্রন্ট' ইত্যাদি আওয়াজ তোলা ভুল এবং সুবিধাবাদের চিহ্ন ছাড়া

কিছু নয়। এই ধরনের আওয়াজের অর্থ হইলে শ্রমিক ও জনসাধারণকে মালিক মহলের লেজুড় হইয়া চলার পথে টানিয়া নামানো, মালিকদের গণতন্ত্র বিরোধী নীতি সফল করিবার কাজে সহায় হওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। (পৃ: ১৪ - ১৬)

বুর্জোয়াদের নূতন ভূমিকা

জাতীয় নেতারা আজ সরকারের কর্ণধার, জনগণের লড়াই-এর জোরে জাতীয় সরকারের হাতে ক্ষমতা আসিয়াছে। সেই সরকার এমন নীতি অনুসরণ করিতেছে যে যাহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ছাড়া উপায় নাই।

···এত বৎসর ধরিয়া আমাদের গণসংগ্রামের নেতৃত্ব করিয়াছেন যে নেতারা, যাঁহারা আজ দেশের সরকার গঠন করিয়াছেন, তাঁহারা আসলে এদেশী শিল্প-ব্যবসায়ী মালিক মহলের শ্রেণী স্বার্থের প্রতিনিধিস্থানীয়।

গান্ধীজী, পণ্ডিত নেহরু এবং সর্দার প্যাটেল—প্রত্যেকেই ভারতের ধনিক-শ্রেণীর স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৫ই আগস্টের পর জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা হইল, কিন্তু তাহার আসল অর্থ দাঁড়ায় এই যে সাধারণ লোকের লড়াই-এর সম্পর্কে ভারতীয় ধনিকদের মনোভাবটা অনেকখানি বদলাইয়া গেল। রাষ্ট্র ক্ষমতা হস্তান্তর বলিয়া যাহার প্রচার হয় আসলে সে ব্যবস্থার মধ্যে ছিল ক্ষমতা ভাগাভাগির বন্দোবস্ত মাত্র।

···যুদ্ধোত্তর বিপ্লবী জোয়ার সাম্রাজ্যবাদীদের কৌশল বদলাইতে বাধ্য করিল, গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে যাহাতে আরও বেশী হিংস্রভাবে আঘাত করা যায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইল।

জনগণকে ঠকাইবার উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদ তখন রাজী হয় যে দেশের নেতাদের হাতে সরকারী শাসনযন্ত্র আনুষ্ঠানিকভাবে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। দেশের নেতারা অবশ্য মালিকদেরই নেতা। পুরানো ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা বজায় রাখার জন্য তাঁহাদের উপর নির্ভর করার ব্যবস্থা হইল।···

·· ভারতীয় মালিকেরা কিন্তু যে রাষ্ট্রশক্তি দখল করিল তাহা আসলে সাম্রাজ্যবাদী মুখাপেক্ষী আশ্রিত রাজ্য ছাড়া অন্য কিছু নয়।

এজন্য বলা যায় যে আমাদের নূতন রাষ্ট্রে দেশী মালিকেরা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ করিয়া লইতেছে। পরোক্ষভাবে সাম্রাজ্যবাদই এখন পর্যন্ত কর্তৃত্ব করিতেছে।

আমাদের জাতীয় সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির পিছনে রহস্য হইল এই। আমাদের মালিকশ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী খেলা শেষ হইয়া গিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদের কাছ হইতে সুবিধা আদায় করিবার জন্য গণসংগ্রামের আর তাহাদের প্রয়োজন নাই।···

·· মালিকদের সরকার ও সরকারী নীতি, কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতৃত্ব—এইসবের বিরুদ্ধে এখন হইতে সাক্ষাৎ অভিযানের ভিতর দিয়াই আমাদের গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে আগাইয়া চলিতে হইবে। (পৃ: ১৬ - ১৯)

দাঙ্গা অভিযানের ভিতরকার খেলা

'প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ততান্ত্রিক মহল ও সাম্রাজ্যবাদের চরেরা দাঙ্গার অভিযান চালাইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সরকারের মুণ্ডপাত করিয়াছে। অনেক লোক তাই ভুল করিয়া ভাবে যে সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়াশীল মহলের আক্রমণের লক্ষ্য এই সরকার বুঝি একটা বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান, আর সাধারণ লোকের এখন কাজ হইল বিনা শর্তে সরকারের পিছনে আসিয়া দাঁড়ানো। অবস্থাটাকে এইভাবে বুঝিতে গেলে আসলে সম্পূর্ণ ভুল হইবে।…

…সংগঠিতভাবে আগে হইতে ফন্দি আঁটিয়া এই অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে প্রতিবিপ্লবের প্রত্যেকটি শক্তিজোট—তাহার মধ্যে আছে সামন্ততান্ত্রিক রাজা-রাজড়া, সাম্রাজ্যবাদী মহল, জমির মালিকেরা ও সাম্প্রদায়িক প্রচারকেরা। আসল লক্ষ্য ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক বিপ্লবকেই রক্তের স্রোতে ডুবাইয়া মারা, বিপ্লবকে হতাশার আবর্তে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেওয়া। যাহারা মজুরের ধর্ম্মঘট, দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের সশস্ত্র লড়াই ও বিদ্রোহের ভিতর দিয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে আগাইয়া চলিতেছিল, দেশের সেই জনসাধারণই হইল আক্রমণের আসল লক্ষ্য। ‥

সন্দেহ নাই যে, প্রতিবিপ্লবের সুপরিকল্পিত এই গভীর ষড়যন্ত্র জনসাধারণ ও রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে হতাশা, সন্দেহ ও এলোমেলো মনোভাব সঞ্চারের চেষ্টা প্রায় সফল করিতে সক্ষম হয়। লোকে আসল লক্ষ্য ভুলিয়া বসে, আতঙ্কে সরকারের সমর্থনে আসিয়া জড়ো হওয়ার একটা ঝোঁক চোখে পড়িতে থাকে।… (পৃ ২০ - ২১)

আপোসকামী ও সাম্রাজ্যবাদীদের মুখোশ খুলিয়া দাও

সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে আপোস করার নীতি ইতিমধ্যেই দাঙ্গা বাধাইয়াছে, আরও দাঙ্গা বাধাইবে। আপোসে সর্বদাই প্রতিবিপ্লব জোর পায়, ভারতবর্ষের বেলায়ও তাহার অন্যথা হয় নাই। গান্ধীজী, পণ্ডিত নেহরু, সর্দার প্যাটেল, ইঁহাদের প্রত্যেকেই আপোস-নীতির কলঙ্কে কলঙ্কিত। দাঙ্গা অভিযানের জন্য রাজনৈতিক দায়িত্ব ইঁহাদের সকলেরই আছে।…

‥ সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণের বিরুদ্ধে সফল হইতে হইলে নেতাদের আপোষকামী নীতিটারই মুখোশ খুলিয়া দিতে হইবে, সেই নীতি ও দাঙ্গার মধ্যে যোগটুকু দেখাইতে হইবে, নাহলে প্রতিক্রিয়ার আক্রমণ বাড়িতে থাকিবে।

…সর্দার প্যাটেলের সাম্প্রদায়িক নীতির আসল রূপটা খুলিয়া না ধরিলে দাঙ্গা বন্ধ করার কথা বলা বৃথা। মন্ত্রীসভায় সর্দারজী থাকিয়া গেলে শুধু পণ্ডিত জহরলালের বাক্যচ্ছটায় সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়া হার মানিবে এই প্রত্যাশাও সমানই অসঙ্গত।

দাঙ্গা রুখিবার রব তুলিয়া সরকারের সমর্থনে বিনাশর্তে একজোট হইয়া দাঁড়াইবার সংকল্পটা তাই সুবিধাবাদী নীতি ছাড়া আর কিছু নয়।

একথার অর্থ এই নয় যে, দাঙ্গা থামানোর বা শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণী সরকারকে সাহায্য করিবে না। কিন্তু পার্টি মনে রাখিবে যে ইহাতে দাঙ্গার মূল কারণ উৎপাটিত হইবে না। পার্টিকে একথাও বুঝিতে হইবে যে সরকারী দাঙ্গা দমনের ব্যবস্থা সাধারণতঃ সংখ্যালঘুদের দাবাইয়া রাখার নামান্তর মাত্র।

পার্টি দাঙ্গাকে বিপ্লব-বিরোধী অভিযান হিসাবেই দেখিবে। কিন্তু আমরা কখনও এই মোহের প্রশ্রয় দিব না যে, জাতীয় সরকার তাহার বর্তমান নীতি লইয়া দাঙ্গা রুখিতে পারিবে। বরং পার্টি এই কথা বোঝে যে, দাঙ্গাবাজদের হারাইতে হইলে সরকারের আপোসপন্থা ও সাম্প্রদায়িক নীতিটাকেও খোলাখুলি আঘাত করিতে হইবে। (পৃঃ ২২ - ২৪)

সর্দার প্যাটেল, পণ্ডিত নেহরু এবং গান্ধীজী

সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন সম্বন্ধে মনোভাব বিচার করিতে গেলে একদিকে পণ্ডিত নেহরু ও গান্ধীজী, অপরদিকে সর্দার প্যাটেল, এই তফাতটুকু খানিকদূর পর্যন্ত বাস্তব সত্য এবং ইহার একটা গুরুত্বও আছে। আমাদের দুইজন বড় নেতার দাঙ্গা-বিরোধী কথাবার্তার মূল্য সামান্য নয়। ইহারাও যদি সর্দারজীর মতন দাঙ্গার সমর্থনে দাঁড়াইতেন তাহা হইলে অবস্থাটা নিশ্চয়ই আরও সংকটজনক হইয়া উঠিত।

কিন্তু ইঁহাদের নিজ শ্রেণী স্বার্থের দৃষ্টিভঙ্গী ও নীতি সত্ত্বেও যদি আমরা মনে করি যে গান্ধীজী ও পণ্ডিত নেহরু দাঙ্গাকে বাস্তবিক রুখিতে পারিবেন, সেই বিশ্বাসে আমরা যদি তাঁহাদের উদ্দেশ্যে প্রশংসা বর্ষণ করিতে থাকি, তাহা হইলে জনগণকে প্রতারিত করার খেলায় আমরা যোগ দিব।

গান্ধীজী ও পণ্ডিত নেহরু যে নীতি অনুসরণ করিতেছেন সে-পথে সাম্প্রদায়িকতা ও দাঙ্গাকে কখনই পরাস্ত করা যাইবে না।

শুধু দাঙ্গার ব্যাপারে নয়, এমন কি গণতান্ত্রিক কর্মপদ্ধতির ক্ষেত্রে পর্যন্ত আমাদের পার্টি নেতাদের মধ্যে পণ্ডিত নেহরু সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত আশা আছে।

প্যাটেল নীতির বিরুদ্ধে যোদ্ধা হিসাবে পণ্ডিতজীকে দেখা হয়, প্রচার করা হয় যেন তিনি গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির নেতার মতন।...

...পণ্ডিত নেহরু সম্বন্ধে এই ধারণা মার্কসবাদ-বিরোধী। জনসাধারণকে বুর্জোয়া নেতাদের লেজুড় করিয়া রাখার কাজেই ইহাতে সাহায্য করা হয়। এই কথাটা পরিষ্কারভাবে বুঝিতে হইবে যে, পণ্ডিত নেহরু ও গান্ধীজী ঠিক সর্দার প্যাটেলের মতই ধনিক স্বার্থের প্রতিনিধি। ইঁহারা সকলেই মালিকদের শ্রেণীগত নীতি ও বিশেষ স্বার্থের রক্ষক। এই মালিকেরাই আবার এখন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে হাত মিলাইতেছে।

বিভিন্ন বুর্জোয়া নেতাদের মধ্যে যেটুকু পার্থক্য আছে, শ্রমিকশ্রেণী অবশ্য নিঃসন্দেহেই তাহার যোগ্য মূল্য দিবে। নেতাদের মধ্যে কে বেশী প্রগতিশীল আর কে-ই বা বেশী প্রতিক্রিয়াশীল, এই তফাৎটুকু মনে রাখিয়া প্রতিক্রিয়ার বাহনদের বিরুদ্ধে লড়াই জোরদার করা সম্ভব। কিন্তু সে তফাৎ বাস্তব হওয়া চাই, কল্পনার আশ্রয় লওয়া চলিবে না। ··

···পণ্ডিত নেহরুর সম্বন্ধে ভুল আশার উপর নির্ভর করিয়া সংগ্রামের সমস্ত কায়দা স্থির করা শ্রমিকশ্রেণীর বিরোধী কাজের সামিল। (পৃ: ২৪-২৭)

গান্ধীজী ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

গান্ধীজীর সম্বন্ধেও সেই একই ধরনের বিচার করিতে হইবে। গান্ধীজী কন্ট্রোল তুলিয়া দিবার আদর্শকে বরণ করিয়াছেন, শত শত লোকের অনাহারে মৃত্যু সম্বন্ধে তিনি হৃদয়হীন মন্তব্য করিয়াছেন। তিনি ধনিক মহলের শ্রেণী-সচেতন প্রতিনিধি, এই খাঁটি কথাটুকুই ইহার কারণ।

এখানে মনে রাখা দরকার যে আপোসকামী সংস্কারপন্থী বুর্জোয়া নেতাদের গান্ধীজীই বরাবর পথ দেখাইয়া আসিয়াছেন। যুদ্ধোত্তর যুগে বিপ্লবী জোয়ারের বিপক্ষে তিনিই প্রথম তীব্রভাবে আপত্তি জানান। সাম্রাজ্য-বাদের সঙ্গে তাড়াতাড়ি আপোস করিয়া ফেলিতে অন্য নেতাদের তিনিই উৎসাহিত করিয়াছিলেন। ধনিক নেতারা জনগণের বিশ্বাস ভাঙিয়াছেন, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে হাত মিলাইবার নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এই বিশ্বাসভঙ্গের ব্যাপারে প্রধান নেতৃত্ব ও উৎসাহ যোগাইয়াছিলেন স্বয়ং গান্ধীজী এবং তিনি এখনও তা যোগাইতেছেন। (পৃ: ২৭-২৮)

জাতীয় নেতারা ও জনগণ

আমাদের সরকার আজ যাঁহাদের হাতে তাঁহারা এখনও এদেশী জন-সাধারণের নেতৃস্থানীয়, এই সত্য কথাটার উপর জোর দেওয়া আজ একেবারেই অত্যুক্তি নয়। লোকে এখনও আগেকার সাম্রাজ্যবাদী সরকার হইতে একেবারে আলাদা করিয়া এই সরকারকে জাতীয় সরকার হিসাবে দেখিয়া থাকেন।···

লোকের এই মনোভাবের প্রতি নজর না রাখিয়া জাতীয় সরকারের উপর আক্রমণ করিলে সরকারের স্বরূপ প্রকাশ করার উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হওয়া সম্ভব।

·· গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিবার জন্য সাধারণ লোককে লড়াই-এ টানিয়া আনা সম্ভব করিতে হইলে, তাহাদের বুর্জোয়া নেতাদের কবল হইতে ছাড়াইয়া আনা শ্রমিকশ্রেণীর কর্তব্য। জাতীয় ঐক্যের আদর্শকে নূতনভাবে বুঝিতে শিখিয়া তাহারই উপর আমাদের নূতন আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

জনগণের ঐক্যের নূতন ফ্রণ্ট গঠন

জাতীয় ঐক্য সম্বন্ধে, আমাদের আগেকার ধারণা ছিল কংগ্রেস-লীগ-কমিউনিস্টের মিলন। সেই ঐক্যের প্রধান অবলম্বন আসলে কংগ্রেসই। কমিউনিস্ট পার্টিকে এখন আগেকার ধারণাটা ছাড়িতে হইবে। এই ধারণা সত্য ছিল সেই পর্য্যায়ে যখন কংগ্রেস ও কংগ্রেস নেতারা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জনগণের শিবিরের মধ্যেই সমবেত ছিলেন।

আজ কংগ্রেস নেতারা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে হাত মিলাইয়াছে। আজ গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার দিকে অগ্রগতির লড়াই জিতিতে হইলে শুধু যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা করিতে হইবে তাহা নয়, ভারতীয় ধনিকদের—বুর্জোয়াদের বিরোধিতাও করিতে হইবে।

নূতন অবস্থার পরিবেশে কংগ্রেস আর নূতন গণতান্ত্রিক ফ্রণ্টের প্রধান কেন্দ্র হইতে পারে না।...

...জনগণের ঐক্যের নূতন ফ্রণ্ট, গণতান্ত্রিক ফ্রণ্টের আহ্বান তাই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে দিতে হইবে।

এখন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও তাহার শ্রমিক ও কিষাণ ঘাঁটিগুলি, শ্রমিক - কিষাণ - ছাত্রদের গণসংগঠনগুলি, বামপন্থী সকল দল ও তাহাদের অনুগামী জনগণ হইবে এই ফ্রণ্টের কেন্দ্রস্থল।

বর্তমান অবস্থায় বামপন্থী দলগুলির ঐক্যই হইবে উপরিউক্ত সংগঠন-গুলির নূতন মিলিত ফ্রণ্ট গঠনের শক্তিশালী হাতিয়ার। এই ঐক্যই কংগ্রেস ও লীগভক্ত জনসাধারণের, দেশীয় রাজ্যের প্রজা ও অন্যান্য অংশের ভুল ধারণা কাটাইতে থাকিবে, তাহাদের সক্রিয় করিয়া তুলিবে। এইভাবেই গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে হইবে।... (পৃ ২৯ - ৩৩)

বামপন্থীদের ভূমিকা

কংগ্রেসের মধ্যে যত বামপন্থী আছেন তাঁহাদের প্রতি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির আবেদন এই যে হাল ছাড়িয়া না দিয়া তাঁহারা যেন লড়াই চালাইয়া যান, কংগ্রেসকে উপরওয়ালার আজ্ঞাবাহী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার সকল চেষ্টাকে ব্যর্থ করেন। না হলে কংগ্রেস বুর্জোয়া নেতাদের আপোসকামী নীতির অনুগত যন্ত্র হইয়া পড়িবে। তাঁহারা যেন জনগণের ঐক্যের লড়াইটাও চালাইয়া যান, নেতাদের শত আপত্তি সত্ত্বেও কংগ্রেসকে গণতান্ত্রিক ফ্রণ্টের সঙ্গে যুক্ত করিবার জন্য চাপ দেন।

·· ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে তাই সোস্যালিস্ট পার্টি, ফরোয়াড ব্লক ও অন্যান্য বামপন্থী দলের সঙ্গে এখনই সৌহার্দ্যের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে এবং মিলিত কার্য্যক্রমের ভিত্তিতে বামপন্থী ঐক্য গড়িয়া তুলিবার প্রস্তাব আনিতে হইবে। ··

· গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ন্যূনতম কার্যক্রম ব্যতীত, বামপন্থী ঐক্য ও গণতান্ত্রিক ফ্রণ্টের পক্ষে অন্যকিছু কর্মসূচী রাখা চলে না। (পৃ ৩৬ - ৩৭)

সংস্কার ও বিপ্লব

আজ যুদ্ধোত্তর বিপ্লবী সংকট উপনিবেশের পুরানো ব্যবস্থাকে উলটাইয়া দিতেছে। সংকট এই একই স্তরে চিরকাল থাকিয়া যাইতে পারে না। যথা-সম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে আমরা যদি গণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করিয়া না তুলিতে পারি তাহা হইলে সাম্রাজ্যবাদী ও ধনিকশ্রেণী বিপ্লবকেই ব্যর্থ করিয়া দিবে এবং জনসাধারণকে দমন করিয়া ও ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাকে গায়ের জোরে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়া সংকট সমাধানের চেষ্টা করিবে।

এই অবস্থার সামনে কেবল দুইটি মাত্র পথ আছে—হয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব নয়ত মিলিত শোষণের চাপে দাসত্ব ও দুঃখের ভার বৃদ্ধি।

গণতান্ত্রিক বিপ্লবের আওয়াজ শুধু প্রচারমূলক নহে, অদূর ভবিষ্যতেই এ বিপ্লব সম্পন্ন ও সার্থক হওয়া সম্ভব। ··

·· জনসাধারণকে এই অপ্রিয় সত্য কথাটা আমাদের বলিতে হইবে যে জমিদার ও শোষক-শ্রেণীকে পরাস্ত করিতে না পারিলে যাহা কিছু আগে পাওয়া গিয়াছে সবই নষ্ট হইয়া যাইবে। ·

· আসলে ছোটখাট সংস্কার মূল বিপ্লবী সংগ্রামের পরোক্ষ ফল মাত্র। এই খাঁটি সত্যটা কখনও ভুলিয়া যাওয়া উচিত নয়।

বিপ্লবকে শক্তিশালী করার কাজেই সামান্য সংস্কারের সদ্ব্যবহার করা উচিত। পরোক্ষ ফলের মোহে মূল লক্ষ্যকে সুদূর ভবিষ্যতে ঠেলিয়া দিলে চলিবে না। (পৃ ৩৭ - ৪০)

জনগণের লড়াই পরিচালনা কর

জাতীয় নেতাদের নীতি সম্বন্ধে সাধারণ লোকের ভুল ভাঙ্গাটা তাড়াতাড়ি ছড়াইয়া পড়িতেছে। তাঁহাদের নীতি জনগণের কোন সমস্যাই সমাধান করিবে না। ··

···আমাদের দেশে আজ গণতান্ত্রিক বিপ্লব ঘনাইয়া আসিতেছে। ·

···এই অবস্থায় বিপ্লবের ভাগ্য নির্ভর করিতেছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণীর নির্ভুল নীতি গ্রহণের উপর। সেই নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে একদিকে মনে রাখিতে হইবে বিপ্লবের শক্তির প্রচণ্ড প্রতাপের কথা, অন্যদিকে ভুলিলে চলিবে না যে আমাদের অবস্থার মধ্যে দুর্বলতা আছে, বুর্জোয়া শ্রেণীর উপর জনসাধারণের অন্ধ বিশ্বাস এখনও ঘোচে নাই। গণতান্ত্রিক ফ্রণ্টের ভিতর দিয়া সেই শক্তিকে একত্র টানিয়া সংহত করা, 'জাতীয় সরকারের' মুখোশ খুলিয়া অন্ধভক্তি ভাঙ্গিয়া দেওয়া, গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কার্যক্রমকে আশ্রয় করিয়া লড়াইকে সামনের দিকে লইয়া যাইতে

পারা—শ্রমিক শ্রেণীর পার্টির বিশেষ কর্তব্য আজ এইখানে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নিজের মধ্যেই যদি বুর্জোয়া নেতাদের সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা থাকিয়া যায় তাহা হইলে বিপ্লব ব্যর্থ হইয়া যাইবে। পার্টি যদি জাতীয় নেতাদের তীব্র সমালোচনা সাহসের সঙ্গে করিতে পারে, তাহা হইলে হাজার হাজার লোকের মোহমুক্তি অনেক বেশী তাড়াতাড়ি সম্ভব হইয়া উঠিবে। তাহা হইলে গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট বাড়িতে বাড়িতে এমন শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিবে যে যার দ্বারা মালিকদের বর্তমান নীতিকে ব্যর্থ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। নূতন গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের উপযোগী অবস্থা তখন আসিবে ; সে সরকার আসলে হইবে গণতান্ত্রিক বিপ্লবেরই হাতিয়ার। (পৃ ৫১ - ৫৪)

প্রতিবাদসূচক মন্তব্য

পি. সুন্দরায়া :

কেন্দ্রীয় কমিটির বিবৃতির বিরুদ্ধে আমি ভোট দিয়াছিলাম, কেননা

১। ইহা এমনভাবে লেখা হইয়াছে যে সংশোধন করার পরেও যদি পার্টির সাধারণ সভ্যদের কাছে লেখাটি পাঠানো হয় তাহা হইলে পার্টির কাজের মূল ধারা সম্বন্ধে সংকীর্ণ ধারণা প্রশ্রয় পাইবে। লেখাটি পার্টিকে ঠিক পথে লইয়া যাইবে না। সংস্কারবাদী পথ হইতে উদ্ধার করিতে গিয়া পার্টিকে অন্ধ গোঁড়ামির গলিতে ঠেলিয়া দেওয়া হইবে।

২। একদিকে পণ্ডিত নেহরু, অন্যদিকে গান্ধীজী ও সর্দার প্যাটেল, ইহাদের মধ্যে মূলগত কোনও প্রভেদ নাই একথা আমি মানিতে পারি না। প্রভেদটা যদি আমরা না দেখিতে পাই, প্রভেদের পিছনে শ্রেণীগত কোনও তফাতের যদি সন্ধান না রাখি (আমার মতে ভারতবর্ষে মধ্যবিত্ত জনগণের আশা-ভরসা ও দোলায়মান মনের প্রতীক হইলেন পণ্ডিত নেহরু) তাহা হইলে আমার মনে হয় অত্যন্ত ভুল বোঝা হইবে। প্রতিদিনের কাজে তখন একপেশে ভাব বাড়িয়া যাইবে।

৩। প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকার বদল কর, এখনই এমন আওয়াজ তোলাতে আমার মত নাই। বর্তমান সরকার আমাদের সমস্যার পূর্ণ সমাধান করিতে পারে এই সম্বন্ধে ভুল বিশ্বাস না রাখাটা ঠিক ; সরকারের মূলগত পুনর্গঠনের জন্য কাজ করিয়া যাইতে হইবে তাহাতেও সন্দেহ নাই। তবুও এখনকার মত এই ডাকই দেওয়া উচিত যে বর্তমানের প্রতিক্রিয়াশীল নীতিকে ব্যর্থ কর, গণতান্ত্রিক কার্য্যক্রম অনুসরণের দাবী জানাও, সে কার্য্য-ক্রমে যাহাদের আপত্তি তাহারা যেন মন্ত্রীসভায় না থাকে। এই ডাকের পিছনে ক্রমেই বেশী জনসমাবেশ গড়িয়া তুলিতে তুলিতে আমরা দাবী করিতে পারিব যে সর্দার প্যাটেলকে পদত্যাগ করিতে হইবে এবং মন্ত্রীসভাকে বদলাইতে হইবে।

৪। গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের এখনই আওয়াজ তুলিলে কংগ্রেস নেতাদের একটা সুযোগ দেওয়া হইবে। তাঁহারা বামপন্থীদের এবং আমাদের, কংগ্রেস

ভক্তদের কাছ হইতে সরাইয়া ফেলিতে পারিবেন। আমার মনে হয় আপাতত আমাদের কংগ্রেস, কমিউনিস্ট ও বামপন্থী মিলিত অভিযানের উপর জোর দেওয়া উচিত—লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক কর্মসূচীর জন্য, দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া নেতৃত্ব ও নীতির বিরুদ্ধে লড়াই।

আমার বিশ্বাস কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশের মূলে একটা ভুল বিচার আছে। জনসাধারণের উপর কংগ্রেস নেতাদের তুলনায় আমাদের ও অন্যান্য বামপন্থীদের উপস্থিত প্রভাবটাকে বাড়াইয়া দেখা হইয়াছে।

এই সব কয়টা বিষয়েই আমাকে আরও অনেক ভাবিতে হইবে। তবুও ইতিমধ্যে আমি একথা বলিতে চাই যে লেখাটা এখন যে আকারে রহিয়াছে তাহাতে সমস্ত পার্টির সংকীর্ণ গোঁড়ামির দিকে ঝুঁকিয়া পড়াটা অনিবার্য্য হইবে। দক্ষিণপন্থী নেতাদের হাতে যদি লেখাটা পড়ে তাহা হইলে ইহার সুযোগ লইয়া আমাদের বিরুদ্ধে নিন্দা ও অপবাদের ঝড় বহিয়া যাইবে, গণতান্ত্রিক কংগ্রেস ভক্তদের কাছ হইতে আমাদের তফাৎ করিয়া ফেলা হইবে। (পৃ ৫৬ - ৫৭)

পি. সি. জোশীর বিবৃতি

আমি প্রস্তাবের পক্ষে এবং রিপোর্টের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিলাম এই জন্য যে আমার কিছু কিছু সন্দেহ ছিল এবং আনুষ্ঠানিকভাবে আমি কিছুই স্বীকার করিয়া লইতে চাহি নাই। কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশন শেষ হওয়ার সময় হইতে আমি নিজে গভীরভাবে চিন্তা করিতে থাকি; কেন্দ্রীয় কমিটির কমরেডদের সহিত আমার আলোচনায় আমার ভুল বোঝার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। প্রায় সপ্তাহখানেক পূর্বে পার্টির নূতন নীতির সমস্ত মৌলিক সিদ্ধান্তগুলি আমি নির্বিবাদে গ্রহণ করিয়াছি। অতীতের গুরুতর সংস্কারপন্থী ভুলের জন্য আমি বর্তমানে আত্মচিন্তা এবং আত্মসমালোচনায় ব্যাপৃত আছি এবং পার্টির কাজে নিজেকে আরো যোগ্য করিতে সক্ষম হইবার জন্য আমি পার্টি নীতির কায়দা-কৌশলের সমস্যাগুলি বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি। নিজেকে আবারও পার্টি-সভ্যপদের যোগ্য করিয়া তোলার জন্য আমাকে যে কঠোর সংগ্রাম করিতে হইতেছে আশা করি সকল কমরেডই তা বুঝিতে পারিবেন। কমিউনিস্ট পার্টির সংগ্রাম-সাথীদের সঙ্গে স্বাধীনতা গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্য যে কেহ আন্তরিকভাবে সংগ্রাম করিতে ইচ্ছুক, আমাদের মহান জনগণের সেই সুসন্তান মাত্রই পার্টি সভ্যপদের সর্বোচ্চ সম্মান লাভের জন্য উৎসুক হইবে। জনগণের শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে, দাসত্ব-পীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এবং বিশ্বজোড়া সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক শক্তির সহযোগে, কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে মজুর, কৃষক ও জনগণের সংগ্রাম ইতিহাসের জয়যাত্রার পথে যে অপূর্ব সংগ্রামশক্তি গড়িয়া তুলিয়াছে, সকলেই সেই পার্টির গৌরবময় সভ্যপদলাভের আশা ও উৎসাহ পোষণ করিবে।

কমরেডদের নিকট আমার যে মন্তব্য দিবার কথা ছিল তাহা দিতে বিলম্ব হইল কারণ আমাকে এ সম্বন্ধে গভীর চিন্তা করিতে হইয়াছে ; তাহা ছাড়া শ্রান্তির চাপে আমার শরীরও ভাল ছিল না।

১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৪৮ পি. সি. জোশী

(পৃ. ৫৮)

পাঁচ

এক গভীর আত্মানুসন্ধানের পরিণতি এই নতুন রাজনৈতিক লাইন। বিগত ১৯৪৭ সালের জুন মাসে গৃহীত মাউন্টব্যাটেন রোয়েদাদ ও জাতীয় সরকার সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাব বাতিল হল।

এটুকুই যথেষ্ট নয়। পার্টি যেন ছিল এতদিন পথভ্রান্ত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট। পার্টির মধ্যে সংস্কারবাদী ও অবিপ্লবী প্রবণতা শিকড় ছড়িয়েছিল অনেক গভীরে। এবার তাকে সবলে উৎপাটন করার পালা। 'নেহরু সরকারের প্রতি পূর্ণ সমর্থন' অথবা 'জনগণ ও জাতীয় সরকারের মিলিত ফ্রন্ট' গড়ার স্লোগান সংস্কারবাদেরই উৎকট অভিব্যক্তি। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টে গঠিত সরকার আদৌ জাতীয় সরকার নয়—এটা সাম্রাজ্যবাদের মুখাপেক্ষী, আশ্রিত সরকার।

অতএব কমিউনিস্ট পার্টি আহ্বান জানাচ্ছে, জাতীয় সরকার সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা বর্জন করো—জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ করো।

কমরেড পি. সুন্দরায়া এই রাজনৈতিক দলিলের মূল বক্তব্যের সঙ্গে একমত হতে পারেননি। তাঁর ধারণা, 'সংস্কারবাদী পথ হইতে উদ্ধার করিতে গিয়া' এই রাজনৈতিক লাইন 'পার্টিকে অন্ধ সংকীর্ণ গোঁড়ামির গলিতে ঠেলিয়া দিবে।' সুন্দরায়ার ভবিষ্যদ্বাণী পরবর্তীকালে অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রমাণিত হয়। এই দলিলে যেটা বীজের আকারে নিহিত—পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক থিসিস ও আরও পরে পলিট ব্যুরো-রচিত রণনীতি ও কৌশলগত দলিলে সেটা মহীরুহের আকার নেয়। কিন্তু সে সব আরও পরের ঘটনা।

নৃপেন ব্যানার্জি বলছেন, 'গিরনি কামগড় ইউনিয়নের ছাদে এ. আই. এস. এফ. ক্যাডারদের সভায় বি. টি. রণদিভে বক্তৃতা করলেন। অধিকারী ও জোশী সেখানে বসে। জোশীর লাইনের বিরুদ্ধে বি. টি. আর. পুরোদমে আক্রমণ ঘোষণা করলেন। 'হোয়াট ফাদার! হোয়াট নেশন!' (কী পিতা! কী জাতি!)। আমরা খুশি—আমরাও তাই চাইছিলাম। কী সেই সময়! একদিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশে দেশে সশস্ত্র সংগ্রাম চলছে—চীন, মালয়, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া সর্বত্র। বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন নতুন

লাইন নিয়েছে—ঝানভ্ লাইন। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতৃত্বের জঙ্গী লাইন। তার পাশাপাশি ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘটনা—যার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত দেশভাগ ও বন্যার মতো বাস্তুহারাদের এদেশে আসা। এদেশের ঘটনাবলীর নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে পার্টির কোন উদ্যোগ ছিল না। ফলে এক ধরনের হতাশায় পেয়ে বসেছিল সবাইকে। সুতরাং নতুন লাইন পার্টি র‍্যাঙ্কের কাছে একটা 'রিলিফ' (স্বস্তি)। বুঝতে পারলাম—পার্টি কংগ্রেসের আগে জোশীর পরাজয় একদম পাকা। তারপর গোটা পার্টি কংগ্রেসটাই, আমরা যারা এ. আই. এস. এফ. সম্মেলন উপলক্ষ্যে বোম্বে গিয়েছিলুম—তাদের কাছে একটা রুটিন মাফিক ঘটনা।'

কিন্তু পার্টির লাইন যে বদলাচ্ছে, জানতেন না অনেকে। যেমন জানতেন না উত্তর কলকাতা পার্টি ব্রাঞ্চের বিশিষ্ট কমরেড, বীরেশ্বর ভট্টাচার্য। তিনি বলছেন, 'দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের পনেরো দিন আগেও আমাদের ধারণা ছিল, জোশীর নেতৃত্বেই পার্টি চলছে। জোশীর লাইনই পার্টির লাইন।'

আগে থেকে জানুক বা না-জানুক, পার্টি র‍্যাঙ্ক চাইছিল—পরিবর্তন আসুক। বীরেন রায়ের মতে, কলকাতার পার্টি র‍্যাঙ্ক নতুন লাইনকে ব্যাপকভাবে অভ্যর্থনা জানায়। তিনি বলেন, 'জোশী যে একেবারে কাঠগড়ায় এটা আগে বুঝিনি। যদিও লাইনের পরিবর্তন হচ্ছে—এটা বুঝতে পেরেছিলাম।'

কুমুদ বিশ্বাস বলছেন, 'দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের রাজনৈতিক লাইনের কোন অবজেক্টিভ (বিষয়গত) ভিত্তি ছিল বলে তো মনে হয় না। অর্থাৎ সশস্ত্র সংগ্রামের এটা সময় নয়। এমন কি তার প্রস্তুতিরও সময় নয়। শুধু তেলেঙ্গানা আর কাকদ্বীপ। তবুও আমরা এই লাইন মেনে নিলুম : কারণ কংগ্রেসের প্রশংসা করে করে 'ফেড-আপ' (হদ্দ) হয়ে গিয়েছিলাম—তরুণদের পার্টি বলে আমরা একটা শর্টকাট চাইছিলাম।'

কমরেড শাহেদুল্লাহ্-র মতে, 'দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের রাজনৈতিক লাইন—আসলে অতীতের লেজুড় বৃত্তির 'সিকেনিং' (জঘন্য) মনোভাব থেকে 'রিকয়েল' করার (উল্টো ধাক্কার) ফল। যখন কংগ্রেস - লীগ প্রায় আসর হারাতে বসেছে, আমরাই তখন চেঁচিয়ে চলেছি—কংগ্রেস - লীগ এক হও।'

অতএব দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের প্রাক্কালে অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনের সময় জোশীর আনুষ্ঠানিক নেতৃত্ব বজায় থাকলেও, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক উদ্যোগ তখন জোশীর হাতছাড়া। সুনীল মুন্সী বলছেন, 'আমাদের এ. আই. এস. এফ. সেন্টার-এ অজয় ঘোষ তখন রোজ আসতেন। তিনিই অরুণ বোসকে জোশীর প্রভাব থেকে সরিয়ে নিয়ে যান। জোশীর লেখা—গান্ধীকে 'জাতির পিতা' বলে ডাকা—এসব নিয়ে অজয় শ্লেষাত্মক মন্তব্য করতেন। আমার ধারণায়, অরুণবাবুর পরিবর্তনটা বড় তাড়াহুড়ো করে হল। জোশী নানা জায়গা থেকে বাছাই

করা কমরেড এনে পি. এইচ. কিউ. (পার্টি হেড কোয়ার্টার) তৈরি করে-ছিলেন। আমার মনে হল, পি. এইচ. কিউ-এর ওপর জোশীর নিয়ন্ত্রণ ক্রমশ শিথিল হয়ে আসছে। তাঁর হাত থেকে পি. এইচ. কিউ. বেরিয়ে যাচ্ছে।'

সুনীল মুন্সী বলছেন, 'সমস্ত রাজনৈতিক আক্রমণ কেন একজনেরই বিরুদ্ধে পরিচালিত হচ্ছে—আমার মনে এই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে কখনও কখনও। কেন একজন লোকের উপর সব দোষ চাপানো হচ্ছে? কেন একজনকেই শুধু বলির পাঁঠা খাড়া করা হচ্ছে? জোশীও নিজের কায়দায় আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করছিলেন। জোশী একটা দলিলের খসড়া তৈরি করেন। যাতে রয়েছে, স্বাধীনতা অর্জিত হলেও একটা স্তর অতিক্রান্ত হয়েছে মাত্র। আমাদের লড়াই একটা স্তর থেকে আরেকটা স্তরে উন্নীত হয়েছে মাত্র। আমি পি. এইচ. কিউ.-তে খেতে গিয়েছি। জোশী তখন আমায় পাকড়াও করে আমাকে ওর লেখা পড়িয়ে শোনালেন। উদ্দেশ্য—আমার প্রতিক্রিয়া দেখা। এটা ওঁর একটা কায়দা ছিল। কোন একজন কমরেডকে পড়িয়ে শুনিয়ে তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা।

আমি সেদিন জোশীর বিচ্ছিন্নতার বেদনা অনুভব করতে পারছিলাম।'

ছয়

জগৎ বোস বলছেন, 'দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের ঠিক আগেই শ্রমিকাঞ্চলে বিশেষ করে কেশোরামে ও পূর্ব কলকাতায় কংগ্রেসী গুণ্ডাদের হামলা শুরু হয়। তার মধ্যে সবচেয়ে নারকীয় ডিক্সন লেনের ঘটনাটি।'

কলকাতায় ২১শে থেকে ২৬শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ পার্টি কংগ্রেসের পাশা-পাশি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া যুব সম্মেলন চলছিল। ডিক্সন লেনের একটা বাড়িতে সোভিয়েত ও অন্যান্য বৈদেশিক যুব-প্রতিনিধিদের সম্বর্ধনার আয়োজন হয়েছিল। যুব-প্রতিনিধিদের লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হয়। সৌভাগ্যবশত তাঁরা কেউ হতাহত হননি—কিন্তু ঘটনাস্থলে মারা যান অন্য কয়েকজন।

'যুগান্তরে' পরিবেশিত সংবাদ:

'যুব সম্মেলনে প্রতিনিধিবর্গের সম্বর্ধনা কালে হাঙ্গামা

উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের উপর গুলী বর্ষণ;

একজন নিহত ও পাচজন আহত

শুক্রবার রাত্রে মধ্য কলিকাতায় ডিক্সন লেনের এক বাড়ীতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া যুব-সম্মেলনের প্রতিনিধিবর্গকে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ কর্তৃক সম্বর্দ্ধনা জানাইবার সময় একদল লোক ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া সম্মিলিত

ব্যক্তিবর্গের উপর রিভলবারের গুলীবর্ষণ করে। গুলীবর্ষণের ফলে সুশীল মুখার্জী নামক ছাব্বিশ বৎসর বয়স্ক এক যুবক মারা গিয়াছেন ও আরও পাঁচজন আহত হইয়াছেন।

আহত: (১) ভবমাধব ঘোষ (২৯), (২) নিরঞ্জন সেন (৩১), (৩) সন্তোষ দত্ত (৩৪), (৪) জ্ঞান মজুমদার (৩৬), (৫) ফণীভূষণ দত্ত (২৮)।' (যুগান্তর, ২৮. ২. ৪৮)

ভবমাধব ঘোষ পরে মারা যান। ভবমাধবের ভাই নির্মল ঘোষ বলছেন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া যুব সম্মেলন থেকে সদলবলে বেরিয়ে যাবার পরের দিনই ঘটে এই হামলা।

প্রসঙ্গত, ডিক্সন লেনে গুলি চালনার সূত্রে অরবিন্দ বোস, রঞ্জিত বোস সহ ১১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পঁয়ত্রিশটি জায়গায় তল্লাসি চালিয়ে কয়েকটি পিস্তল, বিস্ফোরক অ্যাসিড, টোটা প্রভৃতি পাওয়া যায়। পুলিশের মতে এটা একটা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। (যুগান্তর, ১. ৩. ৪৮)

নির্মল ঘোষ বলছেন, 'পরের দিনই দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেস। শহীদদের নিয়ে মিছিল এল। রণদিভে, অধিকারী ও কাকাবাবু গেলেন গেটে মালা নিয়ে। জালাতুসিয়ে ও কারমেল রিকম্যান প্রমুখ আন্তর্জাতিক যুব প্রতিনিধিরা চললেন শহীদদের সঙ্গে শ্মশান পর্যন্ত। তাঁরা আমায় সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন।'

চিন্মোহন সেহানবীশ বলছেন, 'ডেকার্স লেনের অফিসে বসে ভলান্টিয়ার আর ডেলিগেটদের ব্যাজ আর অন্যান্য জিনিসপত্র গোছাচ্ছি—এমন সময় ঝড়ের বেগে এসে হেমাঙ্গ বিশ্বাস বলল, ডিক্সন লেনে গুলি চলেছে—সুশীল মুখার্জি আর ভবমাধব ঘোষ মারা গেছে। তখন আমাদের ভাবনা হয়ে দাঁড়াল—পার্টি কংগ্রেসকে রক্ষা করা। তখন পার্টিতে সেরকম লোকজন যথেষ্ট ছিল—যারা এই কাজটা বেশ যোগ্যতার সঙ্গে করতে পারে। ২৪ ঘণ্টা এক নাগাড়ে পাহারার মধ্য দিয়ে পার্টি কংগ্রেস শেষ হল।'

২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮। দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেস শুরু। নির্বাচিত মোট ৯১৯ জন প্রতিনিধির মধ্যে ৬৩২ জন পার্টি কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন। তেলেঙ্গানা থেকে নির্বাচিত ৭৫ জন প্রতিনিধির মধ্যে মাত্র চার-পাঁচ জন উপস্থিত হতে পেরেছিলেন। দক্ষিণ ভারতের প্রতিনিধিদের বেশ কয়েকজন আত্মগোপন করে কলকাতায় আসেন।

সমবেত ৬৩২ জন প্রতিনিধি এসেছেন সরাসরি লড়াইয়ের ময়দান থেকে এবং গোটা দেশ আজ লড়াইয়ের ময়দান। প্রথম পার্টি কংগ্রেসের পর পাঁচ বৎসর অতিক্রান্ত। ইতিমধ্যে দেশের উপর দিয়ে যেন ঝড় বয়ে গিয়েছে। পার্টি গড়ে উঠেছে এই ঝোড়ো সময়ে। তাই প্রতিনিধিরা সবাই এক-একজন পোড়-খাওয়া কমরেড। তাঁরা নিয়ে এসেছেন বোম্বাই, কানপুর, মাদ্রাজ,

কোয়েম্বাটুর, গোল্ডেন রক ও কলকাতার বিশাল ও ঐতিহাসিক ধর্মঘটের অভিজ্ঞতা সঙ্গে করে।

তাঁরা সঙ্গে এনেছেন বিহার, যুক্তপ্রদেশ, তামিলনাড ও অন্ধ্রের জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষকদের জঙ্গী লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সে সব মানুষ যাঁরা মহারাষ্ট্রের ওয়ালি অঞ্চলের ভূমি দাসত্ব ও সামন্ততন্ত্র-বিরোধী লড়াইয়ের নেতৃত্ব করেছেন। রাজপুতানা, মধ্য ভারত ও দক্ষিণ ভারত জুড়ে দেশীয় রাজাদের স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে লড়াই চলেছে—তাঁরা সরাসরি সেই লড়াইয়ের ময়দান থেকে এসেছেন। তাঁদের পুরোভাগে রয়েছেন তেলেঙ্গানার কৃষক নেতারা, যাঁরা নিজামশাহীর বিরুদ্ধে ওয়ারাঙ্গল ও নালগোণ্ডায় ঐতিহাসিক লড়াইয়ের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। প্রতিনিধি দলে রয়েছেন ছাত্র ও মহিলা ফ্রন্টের শ্রেষ্ঠ কর্মী ও সংগঠকবৃন্দ।

পার্টি কংগ্রেসে মূলত তিনটি দলিলের উপর আলোচনা চলে—রাজনৈতিক থিসিস, পাকিস্তান সংক্রান্ত রিপোর্ট ও সংস্কারবাদী বিচ্যুতি সম্পর্কীয় রিপোর্ট।

রাজনৈতিক থিসিস

বি. টি. রণদিভে পার্টি কংগ্রেসে থিসিসের খসড়া পেশ করেন। তাঁর বক্তব্যের মূল বিষয়বস্তু :

১. প্রথমত মনে রাখা দরকার আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও আমাদের জাতীয় পরিস্থিতির মধ্যে কোন চীনের প্রাচীর নেই।

২. যুদ্ধের পর সমাজতন্ত্রী দুনিয়া ও ধনতন্ত্রী দুনিয়ার মধ্যে শক্তির ভারসাম্য পরিবর্তিত। শক্তির পাল্লা আজ সমাজতন্ত্রী শিবিরের পক্ষে ঝুঁকে পড়েছে। এই নতুন শক্তি-সাম্যের পটভূমিতে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার সংকট চরম আকার নেয়। ফলে, উপনিবেশগুলিতে ও সাম্রাজ্যবাদের পদানত দেশগুলিতে জাতীয় ও সামাজিক আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে।

দুই শিবির

৩. এই পরিস্থিতিতে প্রতিটি দেশের বুর্জোয়া শ্রেণী খোলাখুলিভাবে প্রতিক্রিয়া ও সাম্রাজ্যবাদের শিবিরে ভিড়ে পড়েছে এবং প্রকাশ্যে নিজের দেশের জাতীয় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের আদর্শের প্রতি বেইমানি করেছে। তার ফলে প্রতিটি দেশের সর্বহারা শ্রেণীকে জাতীয় স্বাধীনতা ও জনগণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের ধারক ও বাহক হতে হবে।

৪. জনগণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বি. টি. আর. কতকগুলি বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

জনগণতন্ত্রের জন্য লড়াইয়ের অর্থ—লক্ষ কোটি মানুষের—বিপুল সংখ্যক শ্রমিক, কৃষক মেহনতী বুদ্ধিজীবীর—প্রতিক্রিয়া ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে

গণতান্ত্রিক সংগ্রাম। এই লড়াই শুধু বুর্জোয়া গণতন্ত্রের স্তরে সীমাবদ্ধ নয়। এই লড়াই সমাজতন্ত্রের জন্য লড়াইয়েরও অঙ্গীভূত।

যে সব দেশে সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী বুর্জোয়া শ্রেণী কোণঠাসা—সে সব দেশে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্য লড়াই একটিমাত্র বৈপ্লবিক সংগ্রামের আওতায় একাকার।

সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বাধীন শ্রমিক, কৃষক ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মৈত্রীর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নতুন রাষ্ট্রশক্তি—এই জনগণতন্ত্র। সামন্ত-শাহী ও পুঁজির ক্ষমতাকে চূর্ণ করার পথ ধরে জনগণতন্ত্র এগিয়ে চলবে এবং তার ফলে শুধু যে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে তা নয়—সমাজতন্ত্র নির্মাণের ক্ষেত্রও প্রস্তুত হবে।

সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াই আসলে জনগণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াই।

৫. বিশ্ব পরিস্থিতি আগে আমরা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারিনি; তাই মাউন্টব্যাটেন রোয়েদাদ সম্পর্কীয় কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবে নেহরু ও প্যাটেলের আপসকামী ভূমিকার কথা জোরালোভাবে তুলে ধরা হয়নি।

আপসকামিতার ভিত্তি

৬. যুদ্ধের বৎসরগুলিতে ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণী প্রচুর ধনদৌলত কামিয়েছে; তার ফলে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপসের এবং বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার প্রবণতাও তার বেড়েছে।

দেশের মানুষকে নির্মমভাবে শোষণ করে—মুনাফাবাজি ও কালো-বাজারির মাধ্যমে যেমন একদিকে বুর্জোয়াদের হাতে প্রচুর সম্পদ জড়ো হয়েছে—অন্যদিকে তেমন সাধারণ মানুষের বেড়েছে দারিদ্র্য, অনশন ও দুর্দশা। বাংলার মন্বন্তর তার জ্বলন্ত উদাহরণ।

তার পরিণাম যুদ্ধোত্তর যুগের বিশাল বৈপ্লবিক গণ-অভ্যুত্থান।

বি. টি. আর. বলছেন, 'বুর্জোয়া শ্রেণী এই গণ-অভ্যুত্থানের তাৎপর্য উপলব্ধি করে; নিজের অবস্থা যে বিপন্ন তাও বুঝতে পারে। এই পরাক্রান্ত অভ্যুত্থানের ভয়ে বুর্জোয়া শ্রেণী আপস-পন্থার দিকে ঝুঁকে পড়ে।

আমরা আগে অর্থনৈতিক সংকটের অতিকায়ত্ব বুঝতে পারিনি; এবং এটাও বুঝতে পারিনি যে এহেন পরিস্থিতিতেই জঙ্গী জনতা সমাজব্যবস্থার ওলটপালট ঘটায়।'

৭. জাতীয় সরকার সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্বতন প্রস্তাবকে নস্যাৎ করে দিয়ে তিনি বলেন, 'আমরা এই থিসিসে জাতীয় সরকারকে—জাতীয় আত্মসমর্পণ, সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী ও তার সাথে আপসকামীদের সরকার বলে চিহ্নিত করেছি। অতীতে আমরা ভ্রান্ত ধারণাবশত এই সরকারকে জাতীয় অগ্রগতির সরকার বলে অভিহিত করেছিলুম।'

মূল স্লোগান: প্রধান কাজ

৮. জনগণের বৃহত্তম অংশকে আমাদের পক্ষে নিয়ে আসার জন্য অবিরত আন্দোলন করাই হল আমাদের প্রথম কাজ। তাহলে আমরা সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী বর্তমান সরকারকে হঠিয়ে তার জায়গায় শ্রমিক, কৃষক ও পেটি বুর্জোয়া শ্রেণীর সম্মিলিত সরকারকে বসাতে পারব।

ক্ষমতা দখলই হল আজকের মূল কথা। তার জন্য চাই জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্ট এবং শ্রমিক, কৃষক, শোষিত মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মৈত্রীবন্ধ রূপই সেই ফ্রন্ট।

৯. বর্তমান পর্যায়ে পুরানো দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আংশিক লড়াইগুলিকে শুধু দাবি-দাওয়া আদায়ের সংকীর্ণ পরিসরে সীমাবদ্ধ রাখা চলবে না।

আজ ভারতের বুকে সাম্রাজ্যবাদী সামন্তশাহী বুর্জোয়া ব্যবস্থা ধ্বসে পড়েছে। সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী বুর্জোয়া শ্রেণী জোড়াতালি দিয়ে ও মেরামত করে তার পতন রুখতে পারবে না।

১০. বক্তৃতার উপসংহার টেনে তিনি বলেন, 'অনেক ভুল-ভ্রান্তি সত্ত্বেও আমাদের সাফল্য কম নয়। অবশ্য ভুল-ভ্রান্তি না ঘটলে আমাদের শক্তি আজ দশগুণ বেড়ে যেত। আমাদের পার্টির নেতৃত্বে জনগণ সর্বত্র গৌরবের সঙ্গে লড়ছে। নিজাম ও তার পার্শ্বচররা আজ তেলেঙ্গানার নাম শুনলেই আতঙ্কে শিউরে ওঠে। কারণ, তেলেঙ্গানার অর্থ হল কমিউনিস্ট এবং কমিউনিস্টদের অপর নাম তেলেঙ্গানা।'

বি. টি. আর. বক্তৃতা প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি প্রতিনিধিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

ক. আমরা এই দলিলে জাতীয় সরকারকে জাতির আত্মসমর্পণের প্রতীক—সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী ও জাতীয় সমঝোতার সরকার বলে চিহ্নিত করেছি। অতএব এই সরকারের বিরোধিতা করাই হবে শ্রমিকশ্রেণী ও তার পার্টির মূল নীতি। অনেক কমরেডের মতে এই সরকার কেরেনস্কি সরকার। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, আমাদের দেশে রুশ দেশের মতন একটি শক্তিশালী বলশেভিক পার্টি এখনও পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি।

খ. একথা মনে রাখা দরকার যে যাঁরা সরকার চালাচ্ছেন—দেশবাসীর এক বিরাট অংশের শ্রদ্ধা ও আনুগত্য তাঁদের প্রতি রয়েছে। একথা যদি আমরা ভুলে যাই, তাহলে নিজেদের মার্কসবাদী বলে পরিচয় দেওয়াটা অর্থহীন।

আগে যখন আমরা বলেছি, এই সরকারকে হঠাতে হবে—লোকে বলত, ঠিক আছে, চালিয়ে যাও। কারণ, তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকার রাজত্ব করছিল এবং সকলেই তার বিরুদ্ধে লড়ছিল। কিন্তু আজ, সরকারকে উল্টে দিতে হবে—বলার সঙ্গে সঙ্গে সবাই ছুটে আসবে না। কারণ, জাতীয় সরকার সম্বন্ধে লোকের যথেষ্ট মোহ রয়েছে। তাই সরকারের আপসকামী

ও সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী চেহারাটি আমাদের অনবরত জনসাধারণের কাছে তুলে ধরতে হবে।

গ. কয়েকজন কমরেডের মতে আমরা ক্ষমতা দখলের প্রশ্নটি তুলে ধরছি না। নিশ্চয় আমরা ক্ষমতা দখলের কথা বলছি। কিন্তু তার আগে চাই—অভ্যুত্থানের বিভিন্ন তরঙ্গের পুরোভাগে থেকে তাকে বেগবান করা ও এক পরাক্রান্ত স্রোতে মিলিয়ে দেওয়া।

পার্টি কংগ্রেসের ডাক

একদিকে কাশ্মীর, আর একদিকে তেলেঙ্গানা। বি. টি. আর.-এর জিজ্ঞাসা—তোমরা কোন্ পথে যাবে? বি. টি. আর.-এর জবাব—আমি বলি তেলেঙ্গানাই আমাদের পথ।

কমল চ্যাটার্জি (চন্দননগর) বলছেন, 'আমি, কালী সেন আর শিশির গাঙ্গুলী কংগ্রেসে ডেলিগেট ছিলুম। সুন্দরায়ার নেতৃত্বে তেলেঙ্গানা থেকে ছ'জন ডেলিগেট এসেছিলেন এবং তাঁদের ধরার জন্য চারদিকে আই. বি.-রা সতর্ক—কিন্তু তাঁরা ধরা পড়েননি। তাঁরা যখনই বলতে উঠেছেন—তখনই হাততালির পর হাততালি। এরকম 'ওভেশন' (সংবর্ধনা) থানটুনও পেয়েছিলেন। কারণ, বার্মাতেও মুক্ত এলাকা তৈরি হয়েছে—সশস্ত্র লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে।'

পার্টি কংগ্রেসের প্রকাশ্য সভায় ময়দানে ঘোষণা করা হল—তেলেঙ্গানার পথ আমাদের পথ।

দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় কমিটি

১. বি. টি. রণদিভে (সাধারণ সম্পাদক) ২. ভবানী সেন ৩. সোমনাথ লাহিড়ী ৪. গঙ্গাধর অধিকারী ৫. অজয় ঘোষ ৬. এন. কে. কৃষ্ণাণ ৭. সি. রাজেশ্বর রাও ৮. এম. চন্দ্রশেখর রাও ৯. এস. এস. ইউসুফ (সবাই পলিট-ব্যুরোর সদস্য) ১০. রণেন সেন ১১. এস. এ. ডাঙ্গে ১২. এস. ভি. ঘাটে ১৩. ডি. এস. বৈদ্য ১৪. পি. সুন্দরায়া ১৫. ই. এম. এস. নাম্বুদ্রিপাদ ১৬. অরুণ বোস ১৭. এস. জি. সরদেশাই ১৮. বিশ্বনাথ মুখার্জি ১৯. পি. কৃষ্ণ পিল্লাই ২০. কে. সি. জর্জ ২১. এম. বাসবপুন্নায়া ২২. ডি. বেঙ্কটেশ্বর রাও ২৩. এল. কে. ওক ২৪. এস. ভি. পারুলেকার ২৫. এম. কল্যাণসুন্দরম্ ২৬. বি. শ্রীনিবাস রাও ২৭. মুজফ্ফর আহ্মদ ২৮. বীরেশ মিশ্র ২৯. মহম্মদ ইসমাইল ৩০. সুনীল মুখার্জি ৩১. রবি নারায়ণ রেড্ডি।

কন্ট্রোল কমিশন

এস. এস. মিরাজকর, রাধারমণ মিত্র, কে. পি. আর. গোপালন

ভ্রাতৃত্বমূলক প্রতিনিধি

অস্ট্রেলিয়া, বার্মা, সিংহল ও যুগোশ্লাভিয়া

যে সব দেশের কমিউনিস্ট পার্টি অভিনন্দন-বার্তা পাঠিয়েছেন

অস্ট্রিয়া, বুলগেরিয়া, কানাডা, কারাকাস, সাইপ্রাস, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স, গ্রেট ব্রিটেন, হল্যান্ড, হাঙ্গেরী, ইন্দোনেশিয়া, ইতালি, লেবানন, মালয়, নিউজিল্যান্ড, উত্তর আয়ারল্যান্ড, নরওয়ে, প্যালেস্টাইন, পোল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, সুইজারল্যান্ড, সিরিয়া ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র।

সাত

১৯৪৮-এর ২৮শে ফেব্রুয়ারি থেকে ৬ই মার্চ—দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের সাত-দিন ব্যাপী অধিবেশন সমাপ্ত হওয়ার ঠিক কুড়ি দিন পর পশ্চিম বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হয়।

এ প্রসঙ্গে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় (২৭. ৩. ৪৮) প্রকাশিত সংবাদ-শিরোনামা :

কমিউনিস্ট পার্টি, উহার শাখা ও স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠান
বে-আইনী ঘোষিত

বিভিন্ন স্থানে পার্টির কার্য্যালয় তালা বন্ধ : প্রায় ৬০ জন গ্রেপ্তার

'যুগান্তরে' (২৭. ৩. ৪৮) প্রকাশিত সংবাদ-শিরোনামা ও বিস্তৃত সংবাদ :

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক কম্যুনিস্ট পার্টি বে-আইনী
বলিয়া ঘোষিত

কলিকাতা ও উপকণ্ঠে ব্যাপক তল্লাসী ও ধরপাকড়

পার্টির বিভিন্ন অফিস ও ঘাঁটি পুলিশ কর্তৃক তালাবন্ধ

বহু কাগজপত্র হস্তগত : শ্রীজ্যোতি বসু ও মুজফ্ফর আমেদ প্রমুখ
পঞ্চাশ জন গ্রেপ্তার

'পশ্চিমবঙ্গ সরকার সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৬ ধারানুসারে কম্যুনিস্ট পার্টি ও উহার সহিত সংশ্লিষ্ট স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠানসমূহকে বে-আইনী ঘোষণা করিয়াছেন। কলিকাতা, ২৪ পরগণা, হাওড়া ও হুগলী

জেলার পঞ্চাশটি অফিসে হানা দিয়া বাংলার গোয়েন্দা বিভাগ ও কলিকাতা স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের পুলিশ তল্লাসী চালায়। উপরিউক্ত স্থানগুলিতে প্রাপ্ত কাগজপত্র পুলিশ কর্তৃক হস্তগত করা হইয়াছে এবং অফিসগুলি সীল করা হইয়াছে। কলিকাতার বিভিন্ন প্রায় একশত স্থানে পুলিশ তল্লাসী চালাইয়াছে এবং বহু কাগজপত্র হস্তগত করিয়াছে।

পুলিশ কম্যুনিস্ট পার্টির দৈনিক পত্রিকা 'স্বাধীনতা' অফিসে হানা দিয়া উহার কার্য্যকরী সম্পাদক শ্রীসন্তোষ কুমার চ্যাটার্জ্জীকে হাজতে লইয়া যায় এবং অফিসে তালা লাগাইয়া সীল করিয়া দেয়। ধৃতদের মধ্যে মুজাফ্ফর আহমেদ, জ্যোতি বসু এম. এল. এ, অম্বিকা চক্রবর্ত্তী, আব্দুর রেজাক খাঁন, গোপাল হালদার, সতীশ পাকড়াশী, মণিকুন্তলা সেন, গীতা মুখার্জ্জী, বিশ্বনাথ মুখার্জ্জী, অরুণ বসু, শিশির গাঙ্গুলী, মনোরঞ্জন হাজরা ও পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী অন্যতম। ৮ই ডেকার্স লেনে প্রাদেশিক সদর কার্য্যালয় এবং লোয়ার সার্কুলার রোডের কলিকাতা জেলা অফিস এবং আরও কয়েক স্থানে খানাতল্লাসী হইয়াছে। শ্রীরামপুর, উত্তরপাড়া, তেলেনীপাড়া ও মাহেশেও খানাতল্লাসী হইয়াছে এবং সাতজন গ্রেপ্তার হইয়াছে।' (যুগান্তর, ২৭. ৩. ৪৮)

কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী করায় বিশেষ কোন প্রতিবাদী ঘটনার সংবাদ নেই। ট্রাম শ্রমিকদের একাংশ শুধু বিক্ষোভ প্রকাশ করেন। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় (২৭. ৩. ৪৮) প্রকাশিত সংবাদ :

'গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক কম্যুনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে এইদিন যাঁহারা গ্রেপ্তার হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ধীরেন মজুমদার অন্যতম। তাঁহার গ্রেপ্তারের পর কালীঘাট সেক্সনের একদল ট্রামকর্ম্মী সন্ধ্যার দিকে কাজ স্থগিত রাখিতে চাহেন। অপরদল ট্রামকর্ম্মী ইহার বিরোধিতা করেন। ইহাতে উভয় দল কর্ম্মীর মধ্যে বচসা আরম্ভ হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত কালীঘাট ট্রাম ডিপোর সম্মুখে একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। ঐ গণ্ডগোলে দুই একজন ট্রাম কর্ম্মী সামান্য আহত হন। ফলে কালীঘাট, বালীগঞ্জ ও টালীগঞ্জ সেক্সনে ঐ রাত্রের মত ট্রাম চলাচল স্থগিত থাকে।'

কলকাতার বুকে কোন বিক্ষোভ বা প্রতিবাদী ঘটনা নেই, তবুও সতর্ক পুলিশ কমিশনার কলকাতা ও শহরতলীতে সভা শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করে ১৪৪ ধারা জারী করেন। (যুগান্তর, ২৮. ৩. ৪৮)

কলকাতার বাইরে বাঁকুড়া শহরেই একমাত্র প্রতিবাদ শোভাযাত্রা বার হয়। খবরে প্রকাশ, 'কমিউনিস্ট কর্ম্মীগণের গ্রেপ্তারের সংবাদে বেলা প্রায় ১০টায় কয়েকটি শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের কয়েক শত শ্রমিক এই গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে মিছিল করিয়া শহরের বিভিন্ন পথ পরিভ্রমণ করে।' (আনন্দবাজার, ২৯. ৩. ৪৮)

'যুগান্তরে'র সংবাদসূত্রে জানা যায় যে বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে মোট ১৭৯ জন কমিউনিস্ট গ্রেপ্তার হয়েছেন। তার মধ্যে কলকাতায় ৫৩ জন। (যুগান্তর, ৩০. ৩. ৪৮)

'যুগান্তর' ও 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত গ্রেপ্তারের জেলা ভিত্তিক এক অসম্পূর্ণ তালিকা :

দার্জিলিং : রতনলাল ব্রাহ্মণ এম. এল. এ., জেলা পার্টি সম্পাদক, গণেশচন্দ্র সুব্বা ও অপর সাত জন। পার্টি অফিস ও দার্জিলিং চা-বাগান মজদুর ইউনিয়ন অফিস তল্লাসি করা হয়।

জলপাইগুড়ি : তিন জন মহিলা সহ মোট ৩২ জন গ্রেপ্তার। তাছাড়া ৪০টি বাড়ি তল্লাসি করা হয়। পার্টি অফিস ও দার্জিলিং চা-বাগান মজদুর ইউনিয়ন অফিস শীলমোহর করে তালাবন্ধ করা হয়।

বাঁকুড়া : উদয়ভানু ঘোষ, নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধাংশু মুখোপাধ্যায়. দুর্গাপদ হাজরা, অজিত সিংহ, নয়নরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, লোকনাথ মণ্ডল, জগদীশচন্দ্র পালিত ও স্কুল শিক্ষক ননীগোপাল রায় গ্রেপ্তার হয়েছেন।

সোনামুখীর পুলিশ জেলা কমিউনিস্ট নেতা প্রমথনাথ ঘোষের বাড়ি তল্লাসি করে। প্রমথবাবু বাড়ি না থাকায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা যায়নি।

তমলুক : অনন্ত মাজী গ্রেপ্তার।

বহরমপুর ও জিয়াগঞ্জ : জেলা পার্টি সম্পাদক, অনন্তকুমার ভট্টাচার্য, শিক্ষক নেতা সন্তোষকুমার ভট্টাচার্য, কৃষক নেতা সনৎকুমার রাহা, রেল শ্রমিক নেতা গৌরীচরণ ভট্টাচার্য, ছাত্র নেতা বেণী বরাট, কমিউনিস্ট কর্মী হেমাঙ্গ বরাট ও সমর অধিকারী গ্রেপ্তার হন।

বর্ধমান : হরেকৃষ্ণ কোনার, প্রভাত কুণ্ডু, শিবপ্রসাদ দত্ত ও বিপদবরণ রায় গ্রেপ্তার।

২৭শে মার্চ (শনিবার) রাত্রি পর্যন্ত সংবাদসূত্রে জানা যায়, জেলা-ভিত্তিক ধৃত ব্যক্তির সংখ্যা, যথাক্রমে, হুগলী—১৮; হাওড়া—১৪; ২৪ পরগণা—৪; মালদহ—৪; জলপাইগুড়ি—৩৪; বর্ধমান—৮; মেদিনীপুর—৭; বাঁকুড়া—৫; বীরভূম—৩ ও মুর্শিদাবাদ—৫।

এক চাঞ্চল্যকর বিবৃতির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কিরণশঙ্কর রায় কমিউনিস্ট পার্টিকে অবৈধ ঘোষিত করার কারণ ব্যক্ত করেন :

'...সম্প্রতি কলিকাতায় কম্যুনিস্ট পার্টির যে কংগ্রেস হইয়া গেল তাহাতে পার্টি সিন্ধান্ত করে যে দেশে কংগ্রেস গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে অবিরাম সর্বাত্মক সংগ্রাম চালান হইবে। ইহার একটি গুরুত্বপূর্ণ সিন্ধান্ত হইতেছে জনসাধারণকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করা এবং একটি গণবাহিনী গঠন করা। গভর্ণমেন্টের সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, পার্টি অর্থ ও বে-আইনী অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিতেছে এবং পার্টির স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠান রেডগার্ড দলকে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারে ট্রেনিং দেওয়া হইতেছে। পার্টি যে বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করিয়া উক্ত সিন্ধান্ত কার্যে পরিণত করিতে প্রবৃত্ত

হইবে এবং তদ্দ্বারা জগগণের নিরাপত্তা ও কল্যাণে ভীষণ বিঘ্ন সৃষ্টি করিবে তাহাতে আমাদের কোন সন্দেহ নাই।

পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ এই চ্যালেঞ্জ ও আপদকে আর উপেক্ষা করিতে পারে না। ...আমরা জানি যে, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী এই দলের বিরুদ্ধে জনসাধারণের অধিকাংশই আমাদের পশ্চাতে আছেন। গুণ্ডাদের হিংসাত্মক কার্য্যকলাপের ভয়ে এতকাল তাঁহারা তাঁহাদের মনোভাব প্রকাশ করিতে পারিতেছিলেন না...গভর্ণমেণ্ট একটি নগণ্য ক্ষুদ্র দলকে বিরাট জনসাধারণের আতঙ্কস্থল হইতে দিবেন না।

...সর্ব্বজনস্বীকৃত গণতান্ত্রিক নীতি ও আদর্শকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া কোন ক্ষুদ্র দল যদি হিংসার সাহায্যে ক্ষমতা হস্তগত করিতে চায়, তাহা হইলে গভর্ণমেণ্ট কোনক্রমেই তাহা ঘটিতে দিবেন না।' (যুগান্তর, ২৮. ৩. ৪৮)

৩০শে মার্চ আইনসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কিরণশঙ্কর রায় কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী করার কারণ আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। বিবৃতিটির পূর্ণ বয়ান:

গভর্ণমেণ্ট কম্যুনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন পরিষদ সে সম্বন্ধে আমার নিকট এক বিবৃতি আশা করিতে পারেন। ২৭শে মার্চ আমি সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দিয়াছি আপনারা দেখিয়া থাকিবেন। আপনারা একথা উপলব্ধি করিবেন যে কমিউনিস্ট পার্টির ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে তদন্ত চলিতেছে এবং গত কয়দিনে যে সব তল্লাসী হইয়াছে তাহার পূর্ণ বিবরণ আমি এখনও পাই নাই। দ্বিতীয়তঃ জনস্বার্থের খাতিরে বর্ত্তমানে সকল তথ্য প্রকাশ করা সঙ্গত হইবে না। তথাপি যতটা সম্ভব ততটা আমি প্রকাশ করিব।

গত কয়েক মাসের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচী ও ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে সম্ভবত পরিষদের অনেক সদস্যই ওয়াকিবহাল নহেন। সদস্যগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে মহাত্মা গান্ধীর হত্যার পর কম্যুনিস্ট পার্টি জাতির কতিপয় নেতার বিরুদ্ধে জনসাধারণকে প্ররোচিত করিতে প্রবল প্রচার কার্য্য চালায়। সেই প্রচার কার্য্য বন্ধের জন্য গভর্ণমেণ্টকে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়; কম্যুনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'স্বাধীনতা'র উপর পূর্ব্বাহ্নে সংবাদাদি সরকারী সূত্রে অনুমোদিত করাইয়া লইবার আদেশ জারী হয়। সম্প্রতি খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়প্রার্থীর পুনর্বসতি, বেকারী প্রভৃতি আশু সমাধান-সাপেক্ষ সমস্যাগুলির উপর গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া আছে। কম্যুনিস্ট পার্টি সরকারের এই তন্ময়তার সুযোগ গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল একটা অরাজক অবস্থার সৃষ্টি করা এবং শেষাশেষি ঐ সুযোগে হিংসাত্মক পন্থায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করা। গ্রামাঞ্চলে ঐ পার্টি খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারে কি রকম বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছে গভর্ণমেণ্ট

তাহার অসংখ্য সংবাদ পাইয়াছেন। এই পার্টি যে সব অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিয়াছে সেইসব অঞ্চলে তাহারা গ্রামবাসীদিগকে আইন ও শৃংখলা অমান্যের জন্য উস্কানি দিয়াছে। হুগলী জেলার কমলপুর গ্রামের সাম্প্রতিক ঘটনা পরিষদের স্মরণ থাকিতে পারে। কম্যুনিস্ট পার্টির প্রভাবে গ্রামবাসীগণ বেশ কিছুকাল যাবৎ কর্তৃপক্ষ স্থানীয়দের সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করিয়া আসিয়াছে।

একটি ক্ষেত্রে তাহারা এক পুলিশদলের উপর চড়াও হয়; ঐ পুলিশদল ফৌজদারী মামলা সম্পর্কে কয়েকজন পলাতককে গ্রেপ্তার করিতে গিয়াছিল। পরিশেষে পুলিশদল আত্মরক্ষার প্রয়োজনে গুলী চালাইতে বাধ্য হইয়াছিল।

শ্রমিক মহলেও এই পার্টির ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে অনেক সদস্যই বিশেষভাবে ওয়াকিবহাল আছেন। যে সময় জাতির নেতৃবৃন্দ উৎপাদন বৃদ্ধির জরুরী সমস্যায় নিমগ্ন তখন এই পার্টি শ্রমিক বিরোধ জাগাইয়া তুলিতে থাকে। ...কমিউনিস্ট পার্টির সংশ্লিষ্ট স্থানীয় শ্রমিক নেতাদের আচরণে ইহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে যে তাহারা যতটা না অভিযোগ প্রতিকার বা সমাধানের জন্য ব্যস্ত তাহার চাইতে শিল্পক্ষেত্রে একটা বিশৃংখলা ও স্থগিতাবস্থা সৃষ্টি করার জন্য বেশী ব্যগ্র। এইভাবে এমন প্রকৃত অভিযোগ আছে যে শ্রমিক মহলেরও একাংশ বিভ্রান্ত এবং বে-আইনী ও হিংসাত্মক পথে পরিচালিত হইয়াছে; সাধারণ অবস্থায় তাহারা এইরূপ পন্থাবলম্বনের কথা মনেও স্থান দিত না। গভর্ণমেণ্টের পক্ষে যতোটা সম্ভব বাধা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি কলিকাতায় উক্ত পার্টির ক্রিয়াকলাপ এইভাবে প্রকাশ পাইতে ছিল। তাহারা প্রতিদিন লাউড স্পীকার সহ শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে করিতে সরকারী দপ্তরখানার সম্মুখে জমায়েত হইত এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেখানে অবস্থান করিয়া কাহারও পক্ষে কাজ করা অথবা দপ্তরখানায় যাওয়া-আসা অসম্ভব করিয়া তুলিত।

ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির কলিকাতায় সম্প্রতি যে সম্মেলন হইয়া গিয়াছে তাহার সিদ্ধান্ত কার্য্যতঃ সকল ক্ষেত্রে দেশের কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম পরিচালনার সিদ্ধান্ত। উহার একটি প্রস্তাব তো অশুভ ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ। ইহাতে জনসাধারণকে অস্ত্র সরবরাহ ও গণবাহিনী গঠনের কথা বলা হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট ইতিমধ্যেই খবর পাইতেছিলেন যে এই পার্টির সদস্যগণ অর্থ ও বে-আইনী অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিতেছে এবং রেডগার্ড নামক পার্টির স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠানকে অস্ত্র ব্যবহারের শিক্ষা দিতেছে। গভর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে পার্টি অবিলম্বে সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করিয়া জন-নিরাপত্তা ও কল্যাণ বিপন্ন করিতে চাহিয়াছিল।

পরিষদ সদস্যগণ সম্ভবত জ্ঞাত আছেন যে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি সম্প্রতি তাহাদের হেড অফিস বোম্বাই হইতে কলিকাতায় আনার সিদ্ধান্ত করিয়াছে; অর্থাৎ বাংলাকে তাহারা তাহাদের ক্রিয়াকাণ্ডের প্রথম ক্ষেত্ররূপে

বাছিয়া লইয়াছিল। দলটি বে-আইনী করিবার পূর্বেই উহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের আশঙ্কায় দলের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য নেতা অন্তরালে থাকিয়া আন্দোলন চালাইবার জন্য আত্মগোপন করেন।

আপনারা বুঝিতে পারিবেন যে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টিকে বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টকে উৎসাদন ও তাহাদের ক্ষমতা হরণের লক্ষ্যে পরিকল্পনা ফাঁদিতে ও দলকে সুসংহত করিবার অবসর দিলে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে মূর্খতা ও বিপজ্জনক হইত। এই কারণেই গভর্ণমেণ্ট স্থির করেন যে ব্যবস্থা অবলম্বনের সময় হইয়াছে। আমি পরিষদকে এই ভরসা দিতে পারি যে গভর্ণমেণ্টের কাহারও অভিমত ও মতবাদ প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা হরণের বিন্দুমাত্র অভিপ্রায় নাই, ন্যায়সঙ্গত ট্রেড ইউনিয়ন ক্রিয়াকলাপ নিবারণেরও বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নাই। একথা বলা বাহুল্য যে বিরোধী দল নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যেও গভর্ণমেণ্ট এই ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। কথা উঠিয়াছে যে, আই. এন. টি. ইউ. সি-র পরিপুষ্টির সহায়তার জন্যই কম্যুনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী করা হইয়াছে। ইহা একেবারে অসত্য। গভর্ণমেণ্ট বি. পি. টি. ইউ. সি-র বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। বি. পি. টি. ইউ. সি-র সভাপতি যখন অভিযোগ করেন যে ট্রেড ইউনিয়ন অফিসের সামনে পুলিশ প্রহরী থাকায় কর্মীরা সেখানে যাইতে পারিতেছে না, আমরা তৎক্ষণাৎ সেখানকার প্রহরী সরাইয়া লই।

গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে আমি জানাইতে চাই যে অত্যন্ত দুঃখ ও অনিচ্ছার সঙ্গে আমরা এই ব্যবস্থা লইয়াছি। কোন জনপ্রিয় ও গণতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্টের পক্ষে এই সব অসাধারণ ক্ষমতার প্রয়োগ রীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে একটা আসন্ন বিপদ নিবারণের জন্যই, এই বিপদ অত্যন্ত দ্রুত প্রসারলাভ করিয়া শান্তি ও শৃঙ্খলার বিঘ্নস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছিল। জনগণের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব ও কর্তব্য গভর্ণমেণ্টের। সেই গভর্ণমেণ্ট যদি উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন না করিতে পারেন, তবে তাহাদের কর্ত্তব্যচ্যুতি হয় এবং তাহাদের শাসনভার ত্যাগ করা উচিত।

এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য গভর্ণমেণ্ট দুঃখিত। এই সম্পর্কে সমগ্র প্রদেশে এই পর্য্যন্ত ১৯৫ জনকে আটক রাখা হইয়াছে। আমি পরিষদকে ভরসা দিতে পারি যে আমরা যেদিন বুঝিব যে কম্যুনিস্ট পার্টি নিয়মানুগ পদ্ধতিতে কাজ করিতে প্রস্তুত সে দিনই আমরা অকুণ্ঠচিত্তে এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিব ও ধৃত ব্যক্তিদের মুক্তি দিব। কম্যুনিস্ট পার্টির যদি শাসন-ভার গ্রহণের ইচ্ছা থাকে তবে সাধারণ নির্ব্বাচনের অধিকাংশ ভোটদাতার সমর্থন লাভের গণতান্ত্রিক পথ তাহাদের জন্য উন্মুক্ত আছে। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত ঐসব পথ পরিহার করিয়া তাহারা হিংসাত্মক প্রণালীর পথ অনুসরণ করিতেছে ততদিন প্রদেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় কঠোরতম ব্যবস্থা অব-লম্বন না করিলে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে কর্ত্তব্যচ্যুতি হইবে।' (আনন্দবাজার, ৩১. ৩. ৪৮)

কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী করার কারণ হিসেবে গোপনে আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ, রেডগার্ডদের সামরিক প্রশিক্ষণ দান ও অরাজকতার সুযোগে রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল প্রভৃতির সাফাই, জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র জগতে সোৎসাহ সমর্থন লাভ করে। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদকীয় স্তম্ভে দুটি লেখা প্রকাশিত হয়। পত্রিকা-সম্পাদকের ক্ষুব্ধ অনুযোগ: কমিউনিস্ট পার্টিকে আরও আগে বে-আইনী করা হয়নি কেন?

সময়োচিত ব্যবস্থা

'পশ্চিমবঙ্গে কম্যুনিস্ট পার্টি বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। এই সংবাদে দেশের জনসাধারণ বিস্মিত না হইলেও জিজ্ঞাসা করিবে, ইহা আরও পূর্ব্বে করা হয় নাই কেন? আমরাও লক্ষ্য করিয়াছি গভর্ণমেণ্ট এযাবৎ কম্যুনিস্ট পার্টির সম্বন্ধে অতিরিক্ত উদাসীনতার নীতি গ্রহণ করিয়া আসিতেছিলেন। দেশের জনসাধারণের জীবনকে শতভাবে বিড়ম্বিত ও উপদ্রুত করিবার জন্য যে কোন হীন ও কুটিল পন্থা অবলম্বন করিতে উক্ত পার্টি তিলমাত্র সঙ্কোচ অনুভব করে নাই। ১৯৪১ সাল হইতে দেশের জাতীয় শক্তি সংহতি ও শান্তিকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিবার জন্য কম্যুনিস্ট পার্টি সর্ব্বপ্রকার উদ্যম করিয়া আসিতেছে। জনসাধারণ ইতিপূর্ব্বে ইহাদিগের আচরণে বহুবার ধৈর্য্য হারাইবার উপক্রম করিয়াও নিজেকে সংযত করিয়াছে। কিন্তু দেশ স্বাধীন হইবার পর হইতে কম্যুনিস্ট পার্টির কার্যকলাপ দিন দিন এমন গর্হিত হইয়া উঠিতেছিল যে তাহা জনসাধারণের পক্ষে নিঃশব্দে সহ্য করা খুবই কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। যাহাই হউক জনসাধারণের এই মনোভাবের প্রতি মর্য্যাদা দিয়া পশ্চিমবঙ্গের গভর্ণমেণ্ট যে শেষপর্য্যন্ত কর্ত্তব্যবোধের প্রমাণ দিতে পারিয়াছেন তাহাই সুখের বিষয়। একটি রাজনৈতিক দল, যাহার প্রত্যেকটি কর্মপন্থা সমাজবিরোধী, অরাজকতা ও অশান্তি সৃষ্টি যাহার প্রধান রাজনৈতিক লক্ষ্য তাহাকে বে-আইনী ঘোষণা করিয়া গভর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণ সঙ্গত কাজই করিয়াছেন।' (আনন্দবাজার, ২৯. ৩. ৪৮)

পরবর্তী সম্পাদকীয়তে 'আনন্দবাজার'-এর কমিউনিস্ট-বিরোধী সাংবাদিকতা দেশের সীমানা অতিক্রান্ত। শুধু এদেশের নয়, সমগ্র বিশ্বের কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রতি বিষোদ্গার করেছেন পত্রিকা-সম্পাদক।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বিবৃতি

'. কম্যুনিস্ট দলের নীতি পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এক প্রকার। সম্প্রতি ব্রহ্মদেশেও কম্যুনিস্ট দল বে-আইনী ঘোষিত হইয়াছে। ওখানকার প্রধান মন্ত্রী মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে কম্যুনিস্টগণ দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। পূর্ব্ব ইউরোপের যুদ্ধোত্তর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এবং উত্তরসাধকের সাহায্যে তাহারা একটার পর একটা দেশে গণতন্ত্র ধ্বংস করিয়া চলিয়াছে। চেকোস্লোভাকিয়া তাহাদের আপাতত শেষ বলি। একেবারে

শেষ বলি একথা জোর করিয়া কে বলিবে ? বাংলাদেশের কম্যুনিস্ট পার্টির প্রসঙ্গ তুলিয়া যে পূর্ব্ব ইউরোপ পর্য্যন্ত যাইতে হইল তাহার কারণ কম্যুনিস্ট-গণ নিজদিগকে খণ্ডভাবে দেখে না, সমগ্রভাবেই দেখিয়া থাকে আর তাহাদের কর্ম্মনীতি ও লক্ষ্য যে সর্ব্বত্রই অভিন্ন তাহা আগেই বলিয়াছি। এই রকম ক্ষেত্রে একদেশে তাহারা যে অপকীর্ত্তি করিয়াছে তাহা হইতেই অপর এক দেশ ইচ্ছা করিলে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু কোন বিশেষ কারণে পূর্ব্ব ইউরোপের দেশগুলির পক্ষে সেই শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই। পশ্চিমবঙ্গের গভর্ণমেন্ট কম্যুনিস্ট পার্টির সামনে খোলা মাঠ ছাড়িয়া দেন নাই। তাহারা সময়োচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া দৃঢ়তার পরিচয় দিয়া খুবই ভাল কাজ করিয়াছেন। আরও আগে করিলে আরও ভাল করিতেন।…

…ইহারা নিজদিগকে ফ্যাসিবিরোধী বলিয়া ঘোষণা করিলেও কম্যুনিস্টগণের ও ফ্যাসিস্তগণের পন্থায় কোন প্রভেদ নাই।' (আনন্দবাজার, ৩১. ৩. ৪৮)

দেখা যাচ্ছে সাম্যবাদের বিরুদ্ধে এই অভিযানে 'যুগান্তর'-সম্পাদকও আপত্তির কারণ খুঁজে পাচ্ছেন না। তাঁর মতে, কমিউনিস্ট পার্টি নিজের দোষেই অবৈধ ঘোষিত হয়েছে।

সাম্যবাদের বিরুদ্ধে অভিযান

' কেহ কেহ গভর্ণমেন্টের এই আকস্মিক কার্য্যে বিস্ময় বোধ করিলেও আমরা উহাকে নিতান্ত স্বাভাবিক পরিণতি বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি। কেন না বর্ত্তমানে সারা ভারতবর্ষে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে এবং কংগ্রেসী গভর্ণমেন্ট-সমূহ বহু অনতিক্রমণীয় সমস্যার মধ্যে পড়িয়া যেভাবে চালিত হইতেছেন তাহাতে কম্যুনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা না করিয়া তাঁহাদের উপায় ছিল না। কম্যুনিস্ট পার্টির বর্ত্তমান কার্য্যকলাপ, আদর্শ ও লক্ষ্য বর্ত্তমানে অনুসৃত কংগ্রেসী গভর্ণমেন্টের নীতি ও পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপরীত এবং কংগ্রেসের বিবেচনায় এমনকি সমাজতান্ত্রিক দলের মতেও দেশের পক্ষে অনিষ্টকর। সুতরাং কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে সংঘর্ষ এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা একান্ত অনিবার্য্য ছিল।…

…এই বুদ্ধিহীনতার বিরুদ্ধে আমরা প্রথম সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলাম বিগত ৫ই জানুয়ারীর সর্ব্বাত্মক ধর্ম্মঘট আহ্বানের বিরোধিতার দ্বারা এবং তখনই আমরা সমগ্র অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছিলাম যে চরমবাদী বামপন্থীগণ নিজেদেরই অনিষ্টসাধন করিলেন। আমাদের সেই সাবধানবাণী আজ সত্যে পরিণত হইয়াছে। জনগণের সমর্থন হারাইয়া কোন পার্টি চলিতে পারে না। সুতরাং সাম্যবাদের বিরুদ্ধে এই অভিযান ও দমননীতির জন্য তাহারা নিজেরাই দায়ী এবং ইতিহাসের বিচারে ইহা অনিবার্য।' (সম্পাদকীয় নিবন্ধ, যুগান্তর, ৩০. ৩. ৪৮)

সুবাসসিঞ্চন রায় বলছেন, 'যে পুলিশ অফিসারের উপর বিধান রায় 'অপারেশন' চালাবার ভার দিয়েছিলেন—তিনি ছিলেন সুশোভন সরকারের ছাত্র। রাত দশটায় এসে জানিয়ে গেলেন—রেইড হবে। সুশোভনবাবু নানা জায়গায় খবর পাঠিয়ে সতর্ক করে দিলেন। রুই-কাতলা কেউ ধরা পড়ল না। বিধান রায়ের ব্লিৎসক্রিগ ব্যর্থ হল। এক সপ্তাহের মধ্যে পার্টির গোপন সংগঠন গড়ে উঠল। নেতারা ধরা না পড়লে সংগঠন গড়ে তোলা সহজ।'

অন্যান্য সূত্র থেকেও পার্টির নেতারা খবর পেয়েছিলেন। অমিয় মুখার্জি বলছেন, 'দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের পরই পার্টি যে বে-আইনী হবে—এটা পার্টি জানত এবং তার জন্যে তৈরি ছিল। পার্টি কার্ড সব নষ্ট করে ফেলা হয়। পার্টির বেশির ভাগ নেতা যে ধরা পড়েনি—তার কারণ সরকারের পুলিশ বিভাগ তখনও 'এফিসিয়েন্ট' (দক্ষ) হয়ে ওঠেনি। তারা তখনও ব্রিটিশ আমলের খাতাপত্র দেখে চলত। যেমন, আমার খোঁজে কমল বোসের বাড়িতে পুলিশের লোক তিনবার এসেছে। সতীশ পাকড়াশীর খোঁজে কানাই পাকড়াশীর বাড়িতে তারা বার পাঁচেক এসেছে।'

চিন্মোহন সেহানবীশ বলছেন, 'সেদিন দোল পূর্ণিমা। সেদিন বাড়ি ছিলুম না। অনেকে বেঁচে যান অদ্ভুতভাবে। বিশ্বনাথের বাড়ি সার্চ করে বিশ্বনাথ আর গীতাকে ধরল—কিন্তু গৌতমকে নয়। এদিকে গৌতমের বাড়িতে তাকে খুঁজতে পুলিশ এসেছে। প্রেসের মেশিনম্যানদের সাথে মিশে গিয়ে প্রমোদ দাশগুপ্ত ডেকার্স লেন থেকে বেরিয়ে এলেন। পার্টি বে-আইনী হবার কথা হেম নস্কর ফাঁস করেছিলেন। আভাসে-ইঙ্গিতে বলেছিলেন জ্যোতি বোসকে—একটু সাবধানে থাকবেন। এই সূত্র ধরে ভূপেশও বেঁচে গেল। সে বাড়ি বদল করে।'

সোমনাথ লাহিড়ী বলছেন, 'পার্টির ওপর হামলা আসতে পারে—এই খবর আমাদের মধ্যে কেউ কেউ পেয়েছিল। এখন হামলাটা কী জাতীয়—এই নিয়ে মতপার্থক্য। মুজফ্ফর আহ্মেদের ধারণা : এটা খানিকটা রুটিন মাফিক—সিরিয়স কিছু নয়। রাত দশটায় পার্টি অফিসে খবর এসেছিল। রাত এগারোটা নাগাদ অফিস থেকে বেরিয়ে দেখি এখানে ওখানে পুলিশ পোস্টিং হচ্ছে। নিশ্চিন্ত হলাম—সত্যি সত্যি পুলিশ রেইড হবে। অতএব সরে পড়লাম।'

তুষার চট্টোপাধ্যায় বলছেন, 'ভবানীবাবু একদিন ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, কাগজপত্র সরাতে হবে। ভবানীবাবু সরে গেলেন, আমাকেও বললেন অন্যত্র রাত কাটাতে। সেদিন অবশ্যি কিছু হয়নি। তখন গোকুল বড়াল লেনে আমাদের কমিউন। পার্টি যেদিন বে-আইনী হল—বাড়ি থেকে সেদিন ভোররাতে ধরা পড়ে গেলাম।'

নির্মল ঘোষ বলছেন, 'দোলের দিন ডেকার্স লেনের গলিতে ঢুকতে গিয়ে দেখি—রাস্তাটা পুলিশে ভর্তি। গলির মুখে কনক কাঞ্জিলাল দাঁড়িয়ে—তার মুখ থেকে শুনি পার্টি বে-আইনী হয়ে গিয়েছে।'

পার্টি বে-আইনী হবে—এই খবর কলকাতা জেলা পার্টির সম্পাদক কুমুদ বিশ্বাস পেয়ে যান। তিনি বলছেন, 'গোপাল আচার্যকে নিয়ে আমি সরে যাই। অন্যদেরও সাবধান করে দিই।' সবাই কিন্তু খবর পাননি—যেমন দিলীপ ভাদুড়ী। তাঁর কথায় আমরা পরে আসছি।

সৌরি ঘটক বলছেন, 'পার্টি বে-আইনী হতে পারে যে কোনদিন। পার্টি-কার্ড সামলে রাখা হচ্ছে। ভোর রাত্রিতে পুলিশ এল। শান্তিব্রত পেছনের গণিকা বস্তির চালার উপর লাফ মারল। দাশু চৌধুরী আরও ভোরে বেরিয়ে গেছেন। কাটোয়া পার্টির সাইনবোর্ডটা নতুন করে লেখানো হচ্ছে—তাই পার্টি অফিসের কোন নিশানা নেই। পুলিশের দারোগাকে বললাম—এটা পার্টি অফিস নয়। তাই সার্চ করতে দেব না। দারোগা খুবই তম্বি করল—কিন্তু শেষ পর্যন্ত চলে গেল। আমি অগ্রদ্বীপে গিয়ে সুবোধ চৌধুরীকে খবর দিলাম। সুবোধ চৌধুরী, দাশু চৌধুরী আর শান্তিব্রত গ্রেপ্তার এড়িয়ে গেল।'

সবক্ষেত্রে কিন্তু কমরেডরা সতর্কতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেননি। সৌরেন বোস বলছেন, '১৯৪৮-এর পার্টি কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে থাকার জন্য আমরা চাঁদা তুলে কলকাতায় গিয়েছিলুম। কিন্তু পার্টি বে-আইনী হবার সাথে সাথে জলপাইগুড়ির পুরো পার্টি এক বর্ধিত ডি. সি. (জেলা কমিটি)-র সভা থেকে ধরা পড়ে।'

অজিত রায়ের মতে, নেহরু নয়—বিধান রায়ের উদ্যোগেই পার্টিকে বে-আইনী করা হয়। বরঞ্চ নেহরু এ বিষয়ে দ্বিধান্বিত ছিলেন। তাঁর ধারণা, এতে বিদেশে ভারত সরকারের সুনামহানি ঘটবে। প্রসঙ্গত, ১লা এপ্রিল, ১৯৪৮-এ মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে নেহরুর লেখা এক চিঠিতে এই উক্তির সমর্থন পাওয়া যাবে। চিঠিটার প্রয়োজনীয় অংশ:

"· The West Bengal Government, as you know, has banned the Communist Party. This was done without reference to us. Normally this procedure is undesirable because any such action leads to repercussions and is therefore to be considered in its larger context. The Government of India later suggested to provincial governments that any member of the Communist Party suspected of organising trouble, more specially in the security services, might be arrested and detained. There was no intention of banning the Communist Party or indeed large-scale arrests. I hope your government would bear this in mind and only detain such persons against whom you have some proof that they are indulging in dangerous activities.' (J. Nehru, *Letters to Chief Ministers*, Vol. I, 1947-49, p. 99)

অজিত রায় বলছেন, 'পার্টি বে-আইনী হবার ঘটনাটি পার্টি নেতৃত্বের কাছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। তার জন্যে তাঁরা আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। কোন সতর্কতার কথা তাঁরা চিন্তা করেননি। পার্টি বে-আইনী হতে পারে, এ চিন্তা ভবানী সেন আমলই দেননি। ২৬শে মার্চ—অথচ বেশ কয়েক ঘণ্টা আগেই (রঞ্জিত গুপ্ত ও হেম নস্করের মাধ্যমে) দুটো 'সোর্স' (সূত্র) থেকে খবর এসেছিল। ভবানীবাবু একদম 'রি-অ্যাক্ট' করেননি। তাঁর ধারণা, পার্টি বে-আইনী করার প্রকৃষ্ট সময় তো ছিল পার্টি কংগ্রেস চলাকালীন। কিছু করলে তো সরকার তখনই করত। পার্টি কংগ্রেস তো নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হয়েছে। তবুও গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রাদেশিক কমিটির সভা বসে। বেলা আড়াইটে থেকে রাত আটটা পর্যন্ত প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা আলোচনা চলে। শেষ পর্যন্ত ঠিক হয় যে নেতারা নিজেদের ডেরায় না থেকে সে রাতটা অন্যত্র ঘুমোবেন। সভা ভাঙার পর নৃপেন চক্রবর্তী চুপিচুপি এই সিদ্ধান্তের কথা আমায় বলেন। অথচ খবরটা বিশ্বাস করে যদি নেতারা 'রিঅ্যাক্ট' করতেন, তাহলে যাঁরা ধরা পড়েছিলেন—তাঁদের বারো আনাকে বাঁচানো যেত। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে হাওড়া, হুগলী, চব্বিশ পরগনা এবং এমন কি মেদিনীপুরের পার্টিকেও সাবধান করা যেত।'

অজিত রায় বলছেন, 'অতএব পার্টি যখন সত্যি সত্যি বে-আইনী ঘোষিত হল তখন এক দিশেহারা অবস্থা এবং সেটা স্বাভাবিক। নেতাদের কাছে তখন ধরা না পড়াটাই আসল লক্ষ্য এবং আশ্রয়স্থল যোগাড় করাটাই জরুরি সমস্যা। কাজেই সরকারের এই হামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সংগঠিত করবে কে? প্রতিবাদের কোন প্রশ্নই ওঠে না। আগে থেকে তৈরি থাকলে এবং ঠিকমতো সংগঠিত করলে হয়তো বেশ কিছু বুদ্ধিজীবী সরকারি হামলার নিন্দা করে বিবৃতি দিতেন এবং সেটা নানা কাগজে প্রকাশ করা যেত। পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হবার পরের দিন ২৭শে মার্চ—প্রথম ও একমাত্র বিবৃতি ছাপাবার ব্যবস্থা করি আমরা কয়েকজন। মেট্রো-র পাশের সরু গলিতে এক চায়ের দোকানে আমি, রমণী সরকার ও নীরদ চক্রবর্তী—ইন্দ্রজিৎ গুপ্তকে সঙ্গে নিয়ে বসি। পার্টিকে বে-আইনী করার প্রতিবাদ জানিয়ে সোমনাথ লাহিড়ীর নামে একটা বিবৃতি ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত রচনা করেন। সেটা সন্তোষ ভট্টাচার্য নিয়ে যায় ইংরেজি সান্ধ্য দৈনিক 'জয় হিন্দ' কাগজের অফিসে। তাঁরা সেটা ২৭শে মার্চ সন্ধ্যায় ছাপেন। এটাই হল একমাত্র প্রতিবাদ।'

খুব স্বাভাবিক কারণেই পার্টির লোকজন বেশ কিছুটা সন্ত্রস্ত। কেউ জানে না—কে ধরা পড়েছে বা পড়েনি, পুলিশ কাকে ধরবে বা ধরবে না। এই অবস্থা প্রায় একমাস ধরে চলে। পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হবার প্রায় একমাস পরেও নৃপেন চক্রবর্তীর একটা নিরাপদ আস্তানা জোগাড় হয়নি। তিনি বেশ কিছুটা ঝুঁকি নিয়েই তাঁর দাদা কেষ্ট চক্রবর্তীর বাড়িতে ছিলেন। তিনি অজিত রায়কে ডেকে পাঠিয়ে এ বিষয়ে কিছু করতে বলেন।

অজিত রায় বলছেন, 'পার্টির এই সংকটকালে বেশ কিছু পার্টিসভ্য ও

দরদী পার্টিকে আশ্রয়স্থল যোগাড় করে দিয়ে—প্রেসের বন্দোবস্ত করে দিয়ে—পার্টির ক্যুরিয়ার হয়ে—নানাভাবে পার্টিকে 'সার্ভ' করার জন্যে এগিয়ে এসেছিলেন। যেমন স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউটের (আই. এস. আই.) অম্বিকা ঘোষ, হরকুমার চতুর্বেদী, সত্য গুপ্ত ও শীতাংশু ভট্টাচার্য পার্টিকে কয়েকশো টাকা দেন। সে যুগে এটা বেশ বড় অঙ্কের টাকা এবং তাঁদের দেওয়া টাকা নিয়েই বে-আইনী পার্টির নতুন পর্যায়ের কাজকর্ম শুরু হয়। এভাবে এগিয়ে আসেন সুধীর বোস। তিনি বে-আইনী যুগে আগাগোড়া সোমনাথ লাহিড়ীর টেকম্যান ছিলেন।'

ধরপাকড়ের প্রথম কয়েকদিন নেতারা যখন সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় অবস্থায় রয়েছেন, তখন কয়েকজন কমরেড উদ্যোগী হয়ে আত্মগোপনকারী কমরেডদের লুকিয়ে রাখেন। পার্টির সংস্কৃতি ফ্রন্টের অন্যতম সংগঠক নির্মল ঘোষ এরকম একজন উদ্যোগী কমরেড। তিনি সুনীল চ্যাটার্জিকে আদিত্য মজুমদারের বাবার ডিসপেনসারিতে তিন দিন লুকিয়ে রাখেন।

চিন্মোহন সেহানবীশ বলেন, 'সেদিন রাত্রে (২৬শে মার্চ) কিছু কমরেড 'মার্ভেল অফ এফিসিয়েন্সি' (দক্ষতার পরাকাষ্ঠা) দেখিয়েছিল।'

নয়

অন্যান্য দিনের মতো সেদিনও খুব ভোরে বেরিয়েছেন কলকাতা জেলা পার্টির লিট্-ইনচার্জ দিলীপ ভাদুড়ী। সকালবেলা তাঁর প্রথম কাজ হল 'স্বাধীনতা' বিলির তদারক করা। প্রায় পঞ্চাশ জন হকার সাইকেলে করে বাড়ি বাড়ি 'স্বাধীনতা' বিলি করে রোজ সকালে। সকাল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ দিলীপ ভাদুড়ী বৌবাজার-সেন্ট্রাল এভিনিউ-র মোড়ে এসে দেখেন—২৪৯ নং বৌবাজার স্ট্রীটের বাড়িটা পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ। ঐ বাড়ির বিভিন্ন তলায় বি. পি. টি. ইউ. সি, কৃষক সভা ও অন্যান্য সংগঠনের দপ্তর। 'ব্যাপার কী?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন সামনের ফুটের বিড়ির দোকানদারকে। বিড়ির দোকানদার পার্টির সমর্থক। দোকানদার জানান—বলতে পারব না—তবে ভোর হবার আগেই পুলিশ এসেছে। শুনেছি আরও বহু জায়গায় পুলিশ হানা দিয়েছে।

তিনি আর দেরি না করে ট্রামে চেপে সোজা জেলা অফিসের দিকে রওনা দিলেন। ১২১নং সার্কুলার রোডের জেলা-অফিস বাড়িটিতে তখন পুলিশ গিজগিজ করছে। তিনি রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তাঁকে দেখতে পেয়ে তাঁর সহকারীরা ছুটে এল। দুই ভাই গৌর দাস ও গোপাল দাস, ভবানী রায়চৌধুরী এবং উৎকলবাসী রতন পান্ডা—এঁরা সব জেলা অফিসেই থাকেন। তাঁদের কাছ থেকে শুনলেন পুলিশ ভোর হবার আগেই

হানা দিয়েছে। জেলা নেতারা কেউ নেই তবে জেলা পার্টির ফান্ড ইনচার্জ একটু আগে ঢুকেছেন। পুলিশ বাড়িটা সীল করে দেবে এবং সবাইকে বলছে যার যার ব্যক্তিগত জিনিসপত্র নিয়ে চলে যেতে। দিলীপ ভাদুড়ী তখনও কিছু জানেন না—তবুও ঠিক করলেন তিনি ঐ বাড়িতে ঢুকবেন না। তাঁর প্রধান ভাবনা—পার্টির পত্র-পত্রিকা ও বইপত্র বিক্রি বাবদ প্রচুর টাকা-কড়ি যে অফিসের বিভিন্ন আলমারি ও ড্রয়ারে রয়েছে। তাছাড়া লিপটন, ট্রাম ও বিভিন্ন ইউনিয়নের টাকাও তাঁদের কাছে জমা রাখা ছিল। সেগুলোর কী হবে? অতএব টাকা পয়সা বার করে আনাই হবে আপাতত প্রধান কাজ। তিনি সামনের ক্যাম্বেল হাসপাতালের চত্বরে বাবলা গাছের ছায়ায় বসে রইলেন। আর তাঁর সহকারী কমরেডরা আলমারি-ড্রয়ার সব তোলপাড় করে দফায় দফায় তাঁর কাছে টাকা এনে দিতে লাগল। রতন পাণ্ডা, ভবানী রায়চৌধুরী, গৌর দাস, গোপাল দাস ও অন্যান্যরা কয়েক দফায় তাঁর কাছে প্রায় হাজার পাঁচেক টাকা পেঁছে দিল। ইতিমধ্যে আর এক জেলা-নেতা বিনয় বাগচী মেটেবুরুজ থেকে এসে উপস্থিত। মেটেবুরুজ সাকোয়াত বিল্ডিং-এ কেশোরাম শ্রমিক ইউনিয়নের অফিস। পুলিশ ভোর রাত্রিতে সেখানে হানা দিয়েছে। গেঞ্জি গায়ে লুঙ্গি পরা অবস্থায় কোন রকমে পালাতে পেরেছেন বিনয় বাগচী। দিলীপ তক্ষুনি তাঁকে সরে যেতে বললেন। কারণ, বিনয় বাগচীকে পুলিশ চেনে। পার্টি অফিস সীল করে বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ পুলিশ চলে গেল। কিন্তু সঙ্গে করে নিয়ে গেল নীতীশ শেঠকে এবং পুলিশ তাঁকে হাঁটিয়েই নিয়ে যাচ্ছে। পিছু পিছু চলেছে গৌর দাস ও গোপাল দাস। তারা নীতীশ শেঠকে বলল, 'একটু আস্তে হাঁটুন নীতীশদা।' পুলিশ চলেছে আগে আগে। একটা গলির কাছে আসতেই তারা বলল, 'এবার ছুট দিন নীতীশদা।' পুলিশ টের পাবার আগেই গলি দিয়ে ছুট দিলেন নীতীশ শেঠ এবং গ্রেপ্তার এড়িয়ে গেলেন তিনি।

ইতিমধ্যে দুখানা চিরকুট পেলেন দিলীপ ভাদুড়ী। একখানা প্রমোদ দাশগুপ্তের কাছ থেকে—তাঁকে সেদিনই বেলা তিনটের একটা বাড়িতে দেখা করতে বলেছেন। আর একখানা পাঠিয়েছেন কুমুদ বিশ্বাস। তিনি লিখেছেন —রাত আটটায় গুরুসদয় দত্ত রোডের একটা নির্দিষ্ট জায়গায় অপেক্ষা করতে। তাঁকে সেখান থেকে 'পিক আপ' করা হবে। দেখা তিনি নিশ্চয় করবেন, কিন্তু আপাতত তাঁর সমস্যা সঙ্গীদের নিয়ে। পার্টি অফিস থেকে উৎখাত হয়ে যে দশ-বারো জন কমরেড অনাথের মতো তাঁর সঙ্গে রয়েছেন—তিনি তাদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিলেন। বললেন, পরে দেখা হবে। তারপর তিনি একটা পোঁটলা বেঁধে সমস্ত টাকা জেলা অফিসের কাছাকাছি বাসিন্দা পার্টি-সমর্থক ডাক্তার নীরদ মুখার্জির কাছে রেখে এলেন। সেদিনই তিনি বেলা তিনটের প্রমোদ দাশগুপ্তের সঙ্গে দেখা করে সারা দিনের অভিজ্ঞতার কথা জানালেন। বললেন ডাঃ মুখার্জির কাছে টাকা-পয়সা রয়েছে। প্রমোদ দাশগুপ্ত সব খবর নিলেন। কোথায় কোথায় সার্চ হয়েছে এবং কারা

কীভাবে রয়েছে বা ধরা পড়েছে—সব রিপোর্ট তিনি মন দিয়ে শুনলেন। তারপর দিলীপ ভাদুড়ীকে কুমুদ বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করে নতুন কাজের দায়িত্ব বুঝে নিতে বললেন।

সেদিন রাত আটটায় কিন্তু নির্দিষ্ট সময় ও নির্ধারিত জায়গায় গিয়েও কুমুদ বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর দেখা হল না। দেখা হল পরের দিন একই জায়গায় এবং একই সময়ে। কুমুদ বিশ্বাস ও গোপাল আচার্য মোটরে করে এসে তাঁকে আরেক বাড়িতে নিয়ে গেলেন। সেখানে কুমুদ বিশ্বাস একটা ছোটখাট বক্তৃতা দিলেন—বে-আইনী অবস্থায় কী কী করতে হয় এবং কী কী করতে নেই। এবং আরও জানালেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গোপন সংগঠন তৈরি করতে হবে। তার জন্যে চাই কয়েকটা বাড়ি বা ফ্ল্যাট। তাছাড়া বহু যোগাযোগ কেন্দ্র চাই। বিশ্বাসী ও বুদ্ধিমান লোক চাই—যারা ক্যুরিয়ারের কাজ করবে। চাই ছাপাখানা—কম্পোজিটার-মেশিনম্যান-টাইপিস্ট। এক্ষুনি চাই একটা তিন-চার কামরাওয়ালা ফ্ল্যাট, যেটা হবে জেলা পার্টির গোপন কেন্দ্র। এবং এসব যোগাড় করার দায়িত্ব নিতে হবে দিলীপ ভাদুড়ীকে। অর্থাৎ এককথায় তিনি হবেন কলকাতা জেলার টেক্ ইনচার্জ।

কেন দিলীপ ভাদুড়ী? তার কারণ, কলকাতায় পার্টি-প্রকাশিত যাবতীয় পত্র-পত্রিকা বিলি বন্দোবস্তের দায়িত্ব ও তদারকি এতদিন তিনিই করে এসেছেন। কলকাতায় চার হাজার কপি 'স্বাধীনতা' ও আড়াই হাজার কপি 'পিপ্‌ল্‌স্ এজ' নিয়মিত বিক্রি হয়। যাঁরা কেনেন নিঃসন্দেহে তাঁরা পার্টির সভ্য ও সমর্থক। তাদের পরিচয় ও বাড়ির ঠিকানা একমাত্র দিলীপ ও তাঁর সহকর্মীদের জানার কথা। পার্টির এই সংকটে পার্টি সভ্য ও দরদীদের সহায়তা চাই এবং এটা দিলীপের পক্ষেই সংগঠিত করা সম্ভব।

সমীর ছদ্মনামে পরের দিন থেকেই তিনি কাজে নেমে পড়েন। অবশ্যি মুসলমান মহল্লায় ইব্রাহিম নামেই তিনি পরিচিত হবেন। তাঁর প্রধান ভরসা কাগজের হকার ও বিড়ি শ্রমিক। দিলীপ ভাদুড়ীর মতে, সেদিন সবচেয়ে সাহসী ভূমিকা পালন করেছে বিড়ি-শ্রমিক কমরেডরা। তারপরেই ট্রাম। প্রকৃতপক্ষে বিড়ি-শ্রমিক ও ট্রাম-শ্রমিকরা সেদিন পার্টির জন্যে সব কিছু করতে প্রস্তুত ছিল। কলকাতার বহু অঞ্চলে বিড়ির দোকানগুলি ছিল পার্টির যোগাযোগ-কেন্দ্র। তাছাড়াও তিনি আশাতীত সাড়া পেয়েছেন সর্বস্তরের পার্টি-সভ্য ও দরদীদের কাছ থেকে।

সামান্য চেষ্টাতেই চাঁদনির কাছে হসপিটাল রোডে কলকাতা পার্টির গোপন কেন্দ্রের উপযুক্ত ফ্ল্যাট পাওয়া গেল। তাঁকে এই ফ্ল্যাট বাড়ির সন্ধান দেন মহাবীর সিং। পার্টিসভ্য মহাবীর সিং ঐ বাড়ির দরওয়ান। এভাবে ধর্মতলা—পার্ক স্ট্রীট—জ্যাকেরিয়া স্ট্রীটে পার্টির বহু গোপন আস্তানা তৈরি হয়ে গেল। তিনি নিজে থাকতেন নিউ মার্কেটের কর্মচারী লক্ষ্মণ ঘোষের ঘরে—ইব্রাহিম ছদ্মনামে। চাঁদনিতে রহিমের টুপির দোকানটি ছিল অন্যতম যোগাযোগ কেন্দ্র। স্ট্রান্ড রোডে এক সওদাগরি অফিসের ঘরটি প্রয়োজন

হলে উড়িষ্যাবাসী দিবাকরের দৌলতে পার্টির কাজে ব্যবহার করা যেত। তেমনি ব্যবহার করা যেত ওরিয়েন্ট সিনেমার ওপরের ঘরটি। ডাঃ ওমর জামাল, আবদাল্লা ইস্পাহানী (ইরানী) ও অধ্যাপক কামরুদ্দিন সেদিন পার্টিকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। তেমনি তাঁর মনে পড়ে খিদিরপুর বস্তির এক বিধবার কথা—যিনি পার্টির গোপনীয় কাগজপত্র এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পৌঁছে দিতেন। খিদিরপুরের হিন্দীভাষী পারশু-ও কি কম ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেছিল!

টালার কাছাকাছি এক বাড়িতে হিন্দী ও উর্দু ভাষায় ইশ্‌তাহার ইত্যাদি ছাপা হত। সেখানেও থাকতেন বিজ্ঞান ব্যানার্জি। তিনি ঝড়ের বেগে টাইপ করতে পারতেন। বাংলা ভাষায় ছাপা হত ল্যান্সডাউনের কাছে রায় স্ট্রীটের এক বাড়িতে। সদ্য বিবাহিত অমিয় গুহ ছিলেন তার দায়িত্বে আর গোপাল ছিলেন কম্পোজিটার। পার্টির প্রয়োজনে তাঁরা রাত দেড়টায়ও কাজে লেগে যেতেন।

দু'মাসের মধ্যে কলকাতার বুকে বে-আইনী পার্টির গোপন সংগঠনের পরিকাঠামো তৈরি হয়ে গেল। দিলীপ ভাদুড়ীর নেতৃত্বে গঠিত কলকাতা পার্টির টেক্-সংগঠনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন ভোলা বাগচী, ভবানী রায়চৌধুরী, সারদা মিত্র, প্রসূন ব্যানার্জি, সুশীল রায়, নির্মল রায়, বিমল মুখার্জি, অরুণ রায়, সুভাষ মল্লিক, গৌর গোস্বামী, খোকন সেন, হরেন দাশগুপ্ত, বিশ্বনাথ মিত্র প্রমুখ কমরেড।

গোপন সংগঠন গড়ার কায়দাকানুন সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান কোন বই পড়ে নয়। এসব তিনি শিখেছেন প্রমোদ দাশগুপ্ত, কুমুদ বিশ্বাস, বিনয় বাগচী ও বিশেষ করে সরোজ মুখার্জির কাছ থেকে।

সে সময়কার গোপন সংগঠনের কর্মী শিবানন্দ চট্টোপাধ্যায় বলছেন, 'ন'শো জন কমরেড আত্মগোপন করেছেন। তাঁদের গ্রেপ্তারি থেকে বাঁচানো, আশ্রয়স্থল যোগাড় করা ও নির্ধারিত কাজের উপযোগী ব্যবস্থা করা—এসব করতে হত টেক্-সংগঠনকে। অথচ টেক্-এর কর্মীরা কেউ আত্মগোপন করেনি। তারা নিজেদের বাড়িতে থেকে টেক্-এর কাজকর্ম করত। টেক্-সংগঠনের বিষয়ে সরোজ মুখার্জির প্রতিভা ও দক্ষতার কোন সীমা ছিল না। অত্যন্ত সহজ উপায়ে একজন মানুষ ছদ্মবেশে চলাফেরা করতে পারে। একজনের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে সাধারণত তার পোশাক ও চলার ভঙ্গিতে। ধুতি পরলে একজনের হাঁটার ধরন হবে একরকম—আবার সে যদি প্যান্ট পরে তাহলে হাঁটার ভঙ্গি পাল্টে যাবে। এসব সরোজ মুখার্জি ভালো জানতেন। পার্টির মধ্যে পুলিশের লোক ঢুকে থাকলে—সে সহজেই ধরা পড়ে যেত। অতিরিক্ত কৌতূহল দেখানো বা কাজের শেষে তৎক্ষণাৎ চলে না গিয়ে অন্যরা কে কোন্ দিকে যাচ্ছে—এসব নজর করার অভ্যাস থেকে বোঝা যেত—মানুষটি গোলমেলে এবং তাকে আলাদা করে রাখা হত।'

সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখছেন, 'পার্টি যখন বে-আইনী, তখন রাস্তায়

হাঁটতে হাঁটতে ছুতোয়-নাতায় পেছনে তাকানোটা আমাদের অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছিল।' (দেশ, ২৩শে আগস্ট, ১৯৮৬, পৃ ১৬)

গোপন সংগঠনের প্রয়োজনে প্রকাশ্য আন্দোলন ও সংগঠন থেকে পার্টি কয়েকজন নেতৃস্থানীয় কমরেডকে টেনে আনে। যেমন সংস্কৃতি ফ্রন্টের নির্মল ঘোষ ও চিন্মোহন সেহানবীশ এবং ছাত্র ফ্রন্টের গৌরীশংকর ব্যানার্জি। সংশ্লিষ্ট কমরেডরা প্রকাশ্যেই চলাফেরা করতেন—কিন্তু সভা-সমিতি, মিছিল বা সংগঠনের দপ্তরে যাওয়া তাঁদের বারণ ছিল। আবার কয়েকজন কমরেডকে পুরোপুরি আত্মগোপন করেই পার্টির গোপন সংগঠনের কাজ করতে হত। যেমন সুবাসসিঞ্চন রায়। তাঁকে প্রাদেশিক কমিটির গোপন কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। সোমনাথ লাহিড়ী, মহম্মদ ইসমাইল, সরোজ মুখার্জি প্রমুখ নেতাদের সঙ্গে তিনি আত্মগোপনরত অবস্থায় থেকে কাজ করতেন। উমা সেহানবীশ যুক্ত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির গোপন কেন্দ্রের সঙ্গে। তিনি সর্বভারতীয় নেতাদের সঙ্গে একই জায়গায় আত্মগোপন করেছিলেন।

চিন্মোহন সেহানবীশের মতে, তাঁকে টেক্-এর কাজে সরিয়ে আনার ফলে সংস্কৃতি ফ্রন্টের ক্ষতি হয়েছে। তিনি বলছেন, 'পার্টি থেকে আমায় বলেছিল—আপনি প্রকাশ্য আন্দোলন ও সংগঠনের বাইরে থাকবেন। আমি ৪৬ নং ধর্মতলা স্ট্রীটে যেতে পারছি না। আমার মত সুধী প্রধানকেও সরিয়ে নিয়েছে। বিনয় রায় যাবে মস্কো। ৪৬ নং ধর্মতলার ঘরে বিজন ভট্টাচার্যেরা আসে আর চলে যায়। আমাকে সরিয়ে নেবার ফলে কালচারাল মুভমেন্টে ধ্বস নামল। ১৯৪৯ সালের ১১ই এপ্রিল আমি ধরা পড়ে গেলাম।'

গৌরীশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন আত্মগোপনকারী ছাত্রনেতা গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের ক্যুরিয়ার। তিনি বলছেন, 'পার্টি বে-আইনী হবার তৃতীয় দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে দেবু বোসের সঙ্গে যোগাযোগ করি। আমায় জানানো হল, প্রকাশ্য সংগঠন ও আন্দোলনের সঙ্গে সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে। ১৯৪০-৪১ সালে আমার টেক্-এ কাজ সম্পর্কে কিছু অভিজ্ঞতা ছিল। তখন আমি ক্যুরিয়ার ছিলাম। আবার আমি সে কাজেই লেগে গেলাম।'

প্রকাশ্য জীবন থেকে গোপন জীবনে স্থানান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়াটি মোটেই সরল নয়। সুবাসসিঞ্চন রায় বলছেন, 'আমি প্রথমে বাগবাজারে আধা-প্রকাশ্যভাবে কিছুদিন থাকি। পরে আমায় 'কোয়ারান্টাইন' করে একজন ট্রাম-শ্রমিকের বাড়িতে রাখা হয়! সবশেষে আমায় পার্টি-ডেন-এ আনা হয়। ডেন বা গোপন আস্তানায় আনার সময় প্রথম দিন একটা মোটরে করে একই এলাকায় অনর্থক শুধু আমায় ঘোরানো হল। পার্টির ডেনের জন্যে সচরাচর মুসলমান অথবা খ্রীস্টান মহল্লাকে বেছে নেওয়া হত। ডেন কভার হিসাবে হয়তো একজন স্কুল মাস্টার বা একজন জাহাজী থাকতেন—এমন একজন জাহাজী যিনি আবার বেশির ভাগ সময় সমুদ্রের উপর জাহাজে থাকেন।'

কেন্দ্রীয় কমিটির গোপন কেন্দ্রের কাজের সঙ্গে যুক্ত হন উমা সেহানবীশ। তিনি বলছেন, 'চিনুদা (চিন্মোহন সেহানবীশ) ধরা পড়ার পর ছোড়দাকে সঙ্গে নিয়ে তাঁকে কাপড়-জামা পেঁছে দিতে গোয়েন্দা অফিসে গেলাম। আমি বাইরে গাড়িতে বসে রইলাম। আমি এসেছি শুনে আমাদের একজন পরিচিত পুলিশ অফিসার ছোড়দাকে বলল—ওকে চলে যেতে বলো। বাড়ি ছাড়লাম—আজ এখানে, কাল ওখানে রাত্রিবাস করতে লাগলাম। সে সময় আমার এক বান্ধবীর বাড়িতে তাঁর অবিবাহিতা আত্মীয়া সেজে কয়েকদিন থাকি। আমায় অবিবাহিতা ভেবে কয়েকজন প্রৌঢ়া ঘটকালি শুরু করে দিল। সুধী প্রধান জেলে চিনুকে বলে—আপনি এখানে বসে আছেন—আর ওদিকে যে আপনার বৌ-এর বিয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে। এই সময় দাদা, নিখিল চক্রবর্তীর একটা চিঠি পেলাম। তিনি আমায় দুটোর একটা বেছে নিতে বললেন। 'ম্যাস ওয়ক', যেটার মধ্যে আমি রয়েছি, যেখানে আমায় লোকে চিনবে জানবে, যেখানে আমি ধাপে ধাপে উঁচুতে উঠব। আর একটা হচ্ছে ইউ. জি. সেন্টার (গোপন কেন্দ্র)-এ কাজ করা, যে কাজের কোন 'গ্ল্যামার' নেই, প্রতিষ্ঠা নেই, লোকচক্ষুর অন্তরালে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত-বাস। এই অজ্ঞাতবাস হয়তো দশ বছর ধরেও চলতে পারে। আত্মগোপন করে অন্তত দশ বছর থাকতে হবে—এটাই ছিল তখন আমাদের ধারণা। আমি বললাম, পার্টি যদি আমায় তাই করতে বলে—আমি করব। 'কোড' ঠিক করা হল এবং ক্যুরিয়ার এসে এক আত্মীয়ের বাসায় আমার সঙ্গে দেখা করল।

আমায় রিক্সায় চাপিয়ে নানা অলিগলি ঘুরিয়ে নিয়ে গেল। তারপর রিক্সা ছেড়ে দিয়ে পায়ে হেঁটে অবশেষে এসে পেঁছিলাম খ্রীস্টান পাড়ার এক বাড়িতে। খ্রীস্টধর্মের বহু নিদর্শন বাড়িময় ছড়ানো। এটা একটা ডেন। কিন্তু আশে-পাশের লোকজন বাড়িটাকে কমিউনিস্টদের আস্তানা বলে সন্দেহ করা শুরু করেছে। সেখান থেকে এবার নিয়ে যাওয়া হল আমার গন্তব্য-স্থলে—পার্ক লেনের এক বাড়িতে। পার্টির গোপন হেড কোয়ার্টার। বাড়িটার দোতলা ও তিনতলায় পার্টির সর্বোচ্চ নেতারা থাকতেন। পাড়াটা ভাল নয়। যতসব সন্দেহজনক কাজকর্মে রত লোকজনের বাস এই পাড়াটায়। যাদের জন্যে পুলিশ মাঝে মাঝে হানা দেয়, এসব মানুষ-অধ্যুষিত পাড়ায় বে-আইনী কমিউনিস্ট পার্টির সর্বোচ্চ নেতারা বাস করবেন—এটা পুলিশের ধারণারও বাইরে।

বি. টি. আর. আমায় ডেকে বললেন—তুমি যেখানে এসেছ সেটাই বিপ্লবের স্নায়ুকেন্দ্র। এখানে তোমায় থাকতে হবে, কত বচ্ছর—কেউ জানে না।'

ধীরে ধীরে বে-আইনী পার্টির প্রচারপত্র ও পুস্তিকা প্রকাশন ব্যবস্থা গড়ে উঠল। একটা জায়গায় সাইনবোর্ড লাগিয়ে প্রকাশ্যে প্রেস করা হল। প্রেসটা হয়তো কলকাতার কোন এক থানার লাগোয়া জায়গায়। সেখানে কুলুঙ্গিতে

গণেশ মূর্তিও বসানো রয়েছে। অর্থাৎ কোন উপকরণই বাদ নেই। প্রেসের মালিক সেজে বসে আছেন পরবর্তীকালের 'চতুষ্কোণ'-সম্পাদক অরুণ রায়। সেখানে শুধু কম্পোজ করা হত। সেখান থেকে কম্পোজ-করা ম্যাটার সাইকেলে করে পার্টির মেশিনম্যান অন্য এক পার্টি-দরদীর প্রেসে রাত্রিবেলায় ছাপাত। প্রেসের বেলায় ছ' মাসের জন্যে কোন লাইসেন্স লাগত না। প্রমোদ দাশগুপ্ত ছিলেন বে-আইনী প্রেসের দায়িত্বে। ছাপা শুরু হওয়ার সময় মেশিনের শব্দ বন্ধ করা যায় কী করে। প্রমোদ দাশগুপ্ত এক অভিনব কাজ করে বসলেন। ওপর তলায় বসেছে বে-আইনী প্রেস। চালু মেশিনের আওয়াজ চাপা দেবার জন্যে নীচের তলায় তিনি এক গেঞ্জির কল খুলে দিলেন।

সুবাসসিঞ্চন রায় বলছেন, 'বাগবাজার খালের ধারে এক পোড়ো বাড়িতে বসানো হয় পার্টির সাইক্লোস্টাইল মেশিন। তারপর ছাপা ও সাইক্লোস্টাইল-করা প্রচারপত্র যে আস্তানায় নিয়ে জড়ো করা হত—তার সাংকেতিক নাম ছিল 'যমবাড়ি'। কারণ তার আশেপাশের ঘরগুলিতে চলত নানা অসামাজিক কাজকর্ম। তাই ঘন ঘন পুলিশ 'রেড' হত। ধরে নেওয়া হত, যে কোন সময় আস্তানাটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। যমবাড়ি থেকেই কাগজপত্র সব নানা জেলা ও এলাকায় ছড়িয়ে দেওয়া হত। এই কাজের দায়িত্বে ছিলেন সুরেন দত্ত।'

এভাবে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পার্টির গোপন সংগঠন গড়ে ওঠে। বে-আইনী যুগের শেষ দিন পর্যন্ত তা অটুট ছিল।

দশ

জহরলাল নেহরু যদিও পশ্চিমবাংলার কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী করার দায়িত্ব পুরোপুরি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপর ন্যস্ত করেন, তাহলেও দেখা যাচ্ছে তার কয়েকদিন পরে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই কাজকে কেন্দ্রীয় আইনসভায় দাঁড়িয়ে জোরালো ভাষায় সমর্থন করছেন। ধর্মঘট, উৎপাদন ব্যাহত করা ও সারা দেশব্যাপী অরাজকতা সৃষ্টির জন্যে তিনি কমিউনিস্টদের দায়ী করেন।

১৯৪৮-এর এপ্রিল মাসের গোড়াতেই মহীশূর, ইন্দোর, ভূপাল ও চন্দননগরে কমিউনিস্ট পার্টি অবৈধ ঘোষিত হয়। এবং ভারত জুড়ে চলতে থাকে পার্টি অফিসগুলিতে পুলিশী হানা। বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাটনা, এলাহাবাদ ও নাগপুর প্রভৃতি বড় বড় শহরে পার্টি অফিস, ট্রেড ইউনিয়ন ও গণ-সংগঠনের দপ্তরগুলিতে খানাতল্লাসি ও ব্যাপকহারে ধরপাকড় চলতে

থাকে। এস. এ. ডাঙ্গে, এস. এস. মিরাজকর, সোহন সিং জোশ, আর. ডি. ভরদ্বাজ ও দিনকর মেহতা প্রমুখ প্রথম সারির নেতাদের প্রথম চোটেই বিনা বিচারে বন্দী করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ, কেরল ও অন্ধ্র কমিটির যাবতীয় মুখপত্র নিষিদ্ধ হয়।

বি. টি. রণদিভে লিখছেন, 'আনুষ্ঠানিকভাবে না হলেও, কার্যত সারা দেশে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ।' (নেহরু গভর্মেন্ট ডিক্লেয়ার্স ওয়ার ইং. পৃ: ১)

পরবর্তীকালে মাদ্রাজ, হায়দ্রাবাদ ও ত্রিবাঙ্কুর কোচিনের কমিউনিস্ট পার্টি—নেহরু তথা কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতিক্রমেই আনুষ্ঠানিকভাবে অবৈধ ঘোষিত হয়। নেহরু লিখেছেন :

'The Government of Madras have recently, with our approval, banned the Communist Party of India in their province (on 26 September 1949, along with 19 labour unions). There has been a general approval of this step. (*Letters to Chief Ministers*, Vol. 1, p. 476)

সারা দেশ জুড়ে, কংগ্রেস সরকারের কমিউনিস্ট-বিরোধী জেহাদের প্রতিবাদ জানাবার জন্যে—বি. টি. আর. দেশের সমস্ত বামপন্থী, প্রগতিশীল ও সৎ মানুষদের আহ্বান জানান। কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে শুধু এই আক্রমণ নয়, সাধারণ মানুষের সংগঠন গড়ার অধিকার—তার স্বাধিকার ও বৈষম্যমূলক সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করার অধিকারকে কেড়ে নেওয়ার জন্যে এই আক্রমণ।

বি. টি. আর. লিখছেন, পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কিরণশঙ্কর রায় কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী করার সাফাই গেয়েছেন এই বলে যে—কমিউনিস্টরা নাকি অস্ত্রসম্ভার মজুত করছিল। অথচ এই জঘন্য কুৎসার সপক্ষে একটা প্রমাণও এই মিথ্যাবাদী ভদ্রলোকটি উপস্থিত করতে পারেননি। তাহলে ভাবুন, যাদের প্রতিভূ এই মন্ত্রী এরকম নির্জলা মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারে—সেই দল ও শ্রেণী কোন্ অধঃপতনের অতলে গিয়ে পৌঁছাতে পারে।

...আমাদের পার্টির বিরুদ্ধে আক্রমণ আসলে সমস্ত ধরনের গণতান্ত্রিক অভিমতকে পদদলিত করে ভারতের বুকে নগ্ন ফ্যাসিবাদ কায়েম করার পথে প্রথম পদক্ষেপ মাত্র।

পৃথিবীর সর্বত্র একই ঘটনা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা হচ্ছে—যখনই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারকে পদদলিত করতে চায়, তখনই তারা কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে প্রথম আক্রমণ শুরু করে।

এই আক্রমণ আসলে সমস্ত সৎ মানুষের প্রতি হুঁশিয়ারি। তাই দেশের বুকে ফ্যাসিবাদ কায়েম করার জন্যে কায়েমী স্বার্থবাদীদের কুটিল ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করার জন্যে সমস্ত সৎ ও গণতন্ত্রীদের একযোগে রুখে দাঁড়াতে হবে।

পার্টি সদস্যদের উদ্দেশে তিনি বলেন : আজ প্রতিটি সদস্যকে আমাদের পার্টির মর্যাদা রক্ষার উপযোগী হয়ে উঠতে হবে। যে মহান্ আন্তর্জাতিক আন্দোলনের আমরা শরিক তার উপযুক্ততার পরীক্ষা দিতে হবে। ভারতের বুকে আজ গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে সংগ্রাম শুরু হয়েছে—সে লড়াইয়ে শত্রুর প্রথম আঘাত আমাদের পার্টি বুক পেতে নিয়েছে। এটা আমাদের শ্লাঘার বিষয়। আজ পিছু হটার কোন রাস্তা নেই। ধনকুবেরদের খুশি করার জন্যে আমরা আমাদের রাজনীতিকে কাটছাঁট করতে পারি না। আমাদের পাল্টা আঘাত হানতে হবে।

··সরকার আমাদের জেলে পোরার আগেই—অত্যন্ত দ্রুত সাধারণ মানুষকে পার্টির মধ্যে নিয়ে আসতে হবে এবং আমাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ পদ ও দায়িত্বে অবিচল থেকে কাজ করে যেতে হবে। মেহনতী মানুষ জানুক, কমিউনিস্ট পার্টি জনগণের পার্টি—লক্ষ লক্ষ লড়াকু মানুষের পার্টি। (নেহরু গভমেণ্ট ডিক্লেয়ার্স ওয়ার ইঃ)

এগারো

পশ্চিম বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে পুলিশ অভিযান পুরোপুরি সফল হয় নি। বেশ কয়েকজন কর্মী ও নেতা যে গা-ঢাকা দিয়েছেন—সেটা সরকারও স্বীকার করেন।

১৯৪৮ সালের ১৯শে আগস্ট 'কলিকাতা গেজেটে' আত্মগোপনকারী নেতাদের এক তালিকা প্রকাশিত হয়। এবং তাঁদের আদালতে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আত্মসমর্পণের জন্যে নির্দেশ জারি করা হয়। তালিকাটি এই :

১. অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য, ২. নরেন্দ্রনাথ সেন, ৩. কংসারিপ্রসাদ হালদার, ৪. নিত্যানন্দ চৌধুরী, ৫. নীরদকান্ত চৌধুরী, ৬. সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায়, ৭. মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জি (বাঁকুড়া), ৮. প্রেমাংশু দাশ-গুপ্ত বা কিসান দাশগুপ্ত, ৯. রবীন্দ্রনাথ মিত্র (মেদিনীপুর) ১০. ভবানী মুখার্জি (চন্দননগর) ১১. কুমুদ বিশ্বাস ১২. নরেন্দ্রনাথ গুহ (বরিশাল) ১৩. গৌতম চ্যাটার্জি ১৪. নিরঞ্জন সেনগুপ্ত ১৫. ভবানী সেন ১৬. রণেন সেন ১৭. বীরেন রায় ১৮. ধীরেন মজুমদার ১৯. সরোজ মুখার্জি ২০. সোমনাথ লাহিড়ী ২১. প্রমোদ দাশগুপ্ত ২২. গোপাল আচার্য।

পুলিশী সন্ত্রাস ও গণতন্ত্ররোধকারী আবহাওয়ার মধ্যেও যতটুকু আইন-সম্মত উপায়ে প্রচার ও আন্দোলনের সুযোগ রয়েছে—পার্টি তার সদ্ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিল। পার্টি দৈনিক 'স্বাধীনতা' নিষিদ্ধ। সুতরাং তার জায়গায় আইনসঙ্গত সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা হয়।

অজিত রায় বলছেন, 'কিছুটা ঘর গুছিয়ে নেবার পর পার্টির প্রকাশ্য কাগজ 'সাপ্তাহিক সংবাদ' বার হল। সম্পাদক হলেন দুর্গাপদ তরফদার। মাস তিনেক চলার পর, প্রেসের কাছে সরকার তিন হাজার টাকা জামানত চেয়ে বসে। অতএব কাগজ বন্ধ হয়ে যায়। তারপর নানা জনের নামে কয়েকটি দৈনিক পত্রিকার 'ডিক্ল্যারেশন' নেওয়া হয়। 'খবর', 'নূতন খবর', 'বার্তা', 'নূতন সংবাদ' ইত্যাদি। 'নূতন সংবাদ' কেদারনাথ ভট্টাচার্যের সম্পাদনায়, নিউজ প্রেস থেকে মুদ্রিত ও ৩৪, গোপী বসু লেন থেকে প্রকাশিত হত। 'নূতন সংবাদ'-এর একটি শারদীয়া সংখ্যাও প্রকাশিত হয়—সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও বিনয় ঘোষের সম্পাদনায়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জনপ্রিয় 'অগ্নিকোণ' কবিতাটি 'নূতন সংবাদ'-এর শারদীয়া সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

এসব পত্র-পত্রিকা চালু রাখার মাধ্যমে একটা পার্টি স্টাফ গড়ে ওঠে। সম্পাদনায় অরুণ দাশগুপ্ত ও অজিত রায় এবং ম্যানেজার হিসাবে শচীন সেন মূল উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাছাড়া এই স্টাফে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন রমেন ব্যানার্জি, সুনীল সেনগুপ্ত, অধীর চক্রবর্তী ও সুধাংশু দাশগুপ্ত।

গোটা ১৯৪৮ সাল ও ১৯৪৯ সালের ৯ই মার্চ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ গণ-তান্ত্রিক অধিকারকে কাজে লাগিয়ে আন্দোলন ও সমাবেশের পথ ধরে কমিউনিস্ট পার্টি এগুতে থাকে। ১৯৪৯ সালের ৯ই মার্চ সারা ভারত রেল ধর্মঘট এবং ১৩ই মার্চ পোর্ট, ডক, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারি কর্মচারী ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়। পার্টির ধারণা, ভারত জুড়ে শ্রমিক আন্দোলনের সমস্ত স্রোত একত্র হয়ে ১৩ই মার্চ এক অভূতপূর্ব অবস্থার সৃষ্টি করবে—প্রায় অভ্যুত্থানের মতো।'

অজিত রায় বলছেন, 'এহেন অবস্থায় কিন্তু সম্পূর্ণ উল্টো কাজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পার্টি নেতৃত্ব ঠিক করেন যে সমস্ত প্রকাশ্য পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া হবে। এই উপলক্ষ্যে পরিমল চ্যাটার্জির এঁড়েদার বাড়িতে একটা জেনারেল বডি-র সভা হয়। আমি সেখানে এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করি। দু-একজন ছাড়া উপস্থিত সবাই আমাকে সমর্থন করেন। পার্টি নেতৃত্বের বিরোধিতার শাস্তি স্বরূপ ১৯৪৯ সালের ১৩ই মার্চ আমাকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়।'

অবশ্যি সে সব আরও পরের কথা। মাত্র এক মাসের স্তব্ধতা ভেঙে আবার আওয়াজ উঠল: কমিউনিস্ট পার্টি জিন্দা হ্যায়—ভুলো মৎ ভুলো মৎ। লাল ঝাণ্ডা ক্যারে পুকার—ইনকাব জিন্দাবাদ।

উমা সেহানবীশ বলেছেন, 'পার্টি বে-আইনী হবার পর প্রথম স্তব্ধতা ভাঙল বড়া কমলাপুরের মেয়েরা। তারা মিছিল করে রাইটার্স বিল্ডিং-এ আসে। তাদেব আমরা হাওড়া স্টেশন থেকে 'রিসিভ' করে নিয়ে আসি। লাল পতাকা নিয়ে মেয়েদের মিছিল দেখার জন্যে, গোটা ডালহৌসি পাড়া ভেঙে পড়েছিল। তাদের সুরেলা গলায় 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ'-ধ্বনি সকলকে আবেশ মুগ্ধ করে রাখে। বিধান রায় সেদিন বেরিয়ে এসেছিলেন। তিনি পুলিশের জীপে চড়ে মেয়েদের 'অ্যাড্রেস' করেছিলেন। মনে আছে, মণিদি (মণিকুন্তলা সেন) কেমন তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে সেই মাইক কেড়ে নিয়ে বক্তৃতা করেছিলেন। সেদিন মণিদির সেই দৃপ্ত ভঙ্গি এখনও আমার চোখের সামনে ভাসে।'

হ্যাঁ, কমিউনিস্ট পার্টি বেঁচে আছে। লাল ঝাণ্ডা ডাক দিচ্ছে—বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক। এক বৃষ্টির দিনে, কলকাতা যখন জলে থৈ থৈ করছে—রাজাবাজার থেকে বেরুল লালঝাণ্ডা হাতে বিড়ি শ্রমিকদের এক মিছিল। বিস্মিত পথচারীদের চোখের সামনে তারা ফের তুলে ধরল—লাল পতাকা, জানিয়ে দিল কমিউনিস্ট পার্টি মরেনি।

না, কমিউনিস্ট পার্টি মরেনি। ধরপাকড় ও দমননীতি উপেক্ষা করেই কমিউনিস্টরা কাজ করে চলেছে গণ-সংগঠনগুলির মাধ্যমে। ডেকার্স লেনের প্রাদেশিক দপ্তর—সার্কুলার রোডের কলকাতা জেলা কমিটির দপ্তরের দরজা বন্ধ। কিন্তু ২৪৯ বৌবাজার স্ট্রীটের বি. পি. টি. ইউ. সি.-র দপ্তর তো খোলা। বৌবাজারের ছাত্র ফেডারেশনের দপ্তর ও ৪৬ নং ধর্মতলার গণনাট্য সংঘ এবং প্রগতি লেখক সংঘের দপ্তর তো খোলা। যাদের নামে ওয়ারেন্ট নেই—এমন সব কর্মীরা সে সব জায়গায় নিয়মিত জড়ো হতে থাকে। যাঁরা গ্রেপ্তার হয়েছেন বা আত্মগোপন করেছেন—তাঁদের জায়গায় অন্যরা এগিয়ে এল এবং প্রকাশ্য সংগঠন ও আন্দোলন অব্যাহত রাখার দায়িত্ব বুঝে নিল। ছাত্র ফ্রন্টে আত্মগোপনকারী অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য, গীতা মুখার্জি ও গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের জায়গা পূরণ করলেন সুখেন্দু মজুমদার, নৃপেন ব্যানার্জি, সরোজ হাজরা, সুকুমার গুপ্ত ও কমল চ্যাটার্জি।

শ্রমিক নেতাদের মধ্যে অনেকেই ধরা পড়েছেন অথবা আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু আইনসঙ্গত ট্রেড ইউনিয়ন-কাজকর্ম অব্যাহত রইল। এমন কি গ্রেপ্তারের ঝুঁকি নিয়েও কমিউনিস্ট শ্রমিক নেতারা ট্রাইব্যুনালের শুনানিতে উপস্থিত হতে কসুর করেননি। অজয় দাশগুপ্ত বলছেন, '১৯৪৭ সালে চটকলে প্রথম ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রাইব্যুনাল বসল। আমি ও ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত ট্রাইব্যুনালে 'রিপ্রেজেন্ট' (প্রতিনিধিত্ব) করতাম। তাছাড়া ছিলেন সুধীর প্রামাণিক ও শিশির রায়। পার্টি যেদিন বে-আইনী হল—সেদিনও 'হিয়ারিং' শেষ হয়নি। শেষ হিয়ারিং-এর দিন পড়ল ৫ই মে। আই. জে. এম. এ.-র চেয়ারম্যান তখন এম. পি. বিড়লা। পার্টি আমায় পাঠাল যেহেতু ইন্দ্রজিৎ যেতে পারছে না। তার কয়েকদিন আগে রাইটার্স থেকে বেরুতে গিয়ে

গ্রেপ্তার হলেন মোমিন সাহেব। আই. এন. টি. ইউ. সি.-র ল-ইয়ার সন্তোষ বোসকে বললাম—বেরিয়ে গেলে হয়তো গ্রেপ্তার হয়ে যাব। জজ বললেন—কোর্টের মধ্যে আমি 'ইমিউনিটি' দিতে পারি—বাইরে নয়। মন্ত্রীদের লিফ্‌ট্ দিয়ে নেমে আই. সি. এস. সত্যেন মোদকের গাড়িতে চড়ে বসলাম। তিনি হরিশ মুখার্জি রোডে আমায় ছেড়ে দিলেন।'

ইতিমধ্যে কয়েকটি শর্তে জ্যোতি বসুর জামিন মঞ্জুর হয়েছে। তাঁকে সপ্তাহে দু'বার থানায় নিজের গতিবিধির খবর দিতে হবে। জ্যোতি বসুকে দেখা গেল আইনসভার বিতর্কে যোগ দিতে। এরকম এক প্রশ্নোত্তরের সুযোগে তিনি শিক্ষামন্ত্রী হরেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী মশায়কে বিব্রত করেন। দৃশ্যটি এই :

পশ্চিমবঙ্গ আইনসভা

আমি কিছুই জানি না

জ্যোতি বসু—রেলওয়ের একজন কুলি কত টাকা মাগ্‌গী ভাতা পায়, শিক্ষা মন্ত্রী জানেন কি ?

শিক্ষা মন্ত্রী—আমি জানি না।

জ্যোতি বসু—একজন শিক্ষকের মাসিক পারিবারিক খরচ কত লাগে ?

শিক্ষা মন্ত্রী—আমার জানা নাই।

(নূতন সংবাদ, ৭. ৯. ৪৮)

আইনসঙ্গত পথে রাজনৈতিক প্রচার আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে পার্টি নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিল। মালদহের উপনির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কিরণশংকর রায়। তাঁর বিরুদ্ধে পার্টি দাঁড় করাল কৃষক সভার প্রার্থী শরৎচন্দ্র বর্মনকে।

বারো

দেখতে দেখতে স্বাধীনতার একটি বছর ফুরিয়ে গেল। আবার ফিরে এল ১৫ই আগস্টের দিনটি। এবার দেখা গেল না কোথাও সেই বাঁধ ভাঙা উচ্ছ্বাস। মাত্র এক বৎসরেই যেন স্বাধীনতার রঙ চটে গিয়েছে। প্রকাশিত হল পাঁচুগোপাল ভাদুড়ীর লেখা, 'স্বাধীনতার এক বৎসর'। তার প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা—হুগলি জেলার কোন একটি গ্রামে পুকুর থেকে শালুক তোলা নিয়ে দু'দলের মধ্যে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটেছে। 'স্বাধীন' দেশে আজ শালুকও এক মহার্ঘ বস্তু।

বাজার দর চড়ছে। সাধারণ মানুষ তার নাগাল পাচ্ছে না।

বাজার দর

প্রতি সের রুই	—	৪	টাকা ৮ আনা
,, ইলিশ	—	৫	,,
,, পোনা	—	৪	,,
,, কুচো চিংড়ি	—	৩	,,
,, পটল	—	১	,,
,, আলু	—	১—১	,, ২ ,,
,, ঢেঁড়স	—		৮ ,,
,, বেগুন	—		১০ ,,

স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ও বিস্মিত। কুচো চিংড়িও তিন টাকা?

সাংবাদিক—আজ্ঞে হ্যাঁ।

বিধান রায়—এত দরের জিনিস না খেলেই হয়। আমি তো ঢেঁড়স করলা খাই। তাও সামান্য পরিমাণে।

সাংবাদিক— আজ্ঞে করলাও যে এক টাকার নীচে নয়।

বিধান রায়—অল্প অল্প খাওয়াই ভাল।

(নূতন সংবাদ, ২১. ৮. ৪৮)

তার পাশাপাশি চলেছে ছাঁটাই। চারদিকে যেন ছাঁটাইয়ের হিড়িক পড়েছে।

১. বজবজে বার্মা সেলের ৯ জন কর্মী ছাঁটাই।

২. বেঙ্গল জুট মিল—১৩ জন ছাঁটাই।

৩. কে. সি. মল্লিক অ্যান্ড সন্স কারখানায়—২ জন ছাঁটাই।

৪. কাশীপুর সিভিল সাপ্লাই ডিপোতে রণজিৎ লাহিড়ী, সুখেন্দু আচার্য, সীতাইয়া-কে কোন কারণ না দেখিয়ে বরখাস্ত করা হয়েছে। বেহালা ডিপোতেও ছাঁটাই হয়েছে।

৫. জুট বেলিং-এর ৩০ হাজার ফুরন শ্রমিক বেকার।

৬. বজবজ চটকলে লক-আউট।

৭ হাওড়ায় ডালমিয়ার এলেনবেরিতে শ্রমিকদের কাছ থেকে 'দাসখৎ' আদায়ের চেষ্টা হয়। বিনা অনুমতিতে একদিনও কামাই করলে চাকরি চলে গিয়েছে বলে ধরা হবে।

সংবাদদাতা জানাচ্ছেন: 'সকাল ৮টা বাজিতে না বাজিতে এই সই করাইবার চেষ্টা হয়; কিন্তু ১০/১৫ জন ভীত হইয়া সই করিতে না করিতে সমস্ত শ্রমিক আসিয়া পড়ে এবং বেগতিক দেখিয়া কর্তৃপক্ষ সই সংগ্রহ বন্ধ রাখেন।'

৮. কোন্নগর লক্ষ্মীনারায়ণ জুট মিলে নাইট শিফ্‌টের ১২০০ জন শ্রমিক ছাঁটাই।

৯. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—১৭ জন কর্মী ছাঁটাই।

১০. 'দৈনিক ইত্তেহাদ'-এর সম্পাদক গোলাম মোস্তাফা ছাঁটাই।

১১. শিয়ালদহ ও সোনারপুরের ৩৮০ জন গ্যাংম্যান ছাঁটাই।

১২. সিভিল সাপ্লাই এসোসিয়েশনের সম্পাদক জনাব আবদুল আজিজকে কোন কারণ না দেখিয়ে বরখাস্ত করা হয়।

১৩. প্রেসিডেন্সি জেলে বিনা বিচারে বন্দী ট্রাম শ্রমিক নেতা কেতনারায়ণ মিশির ছাঁটাই।

১৪. কাজ নেই অজুহাতে এলেনবেরি কারখানার ১৫০০ জন শ্রমিক ছাঁটাইয়ের মুখোমুখী।

১৫. ম্যান্স ফিল্ড অ্যান্ড সন্স—৩ জন শ্রমিক ছাঁটাই।

(নূতন সংবাদ, ২০ ও ২৬. ৮ ৪৮)

ক্ষুধা-দারিদ্র্য-ছাঁটাই-বেকারি-লাঞ্ছিত ও নিরাপত্তা আইনের ফাঁসে কণ্ঠ-রুদ্ধ দেশের বুকে নেমে এল আরেকটি স্বাধীনতা দিবস। সেদিন সরকার দেশবাসীকে শোনালেন মনোরম দেশাত্মবোধক সঙ্গীত। ২৭১ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ থেকে শ্রীঅমিতাভ মৈত্র এক চিঠিতে এ প্রসঙ্গে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন :

চিঠিপত্র

বামপন্থী শিল্পী

১৫ই আগস্টের বিশেষ অনুষ্ঠান

'স্বাধীনতার' নামে দেশ বিক্রয়ের লজ্জাকে ঢাকা দেবার জন্য কর্তৃপক্ষ সেদিন দেশবাসীকে কিছু মনোরম সঙ্গীতাদি শোনাতে চেয়েছিলেন। ভেবেছিলাম সমস্ত শিল্পীরা না হলেও অন্তত প্রগতিশীল শিল্পীরা এই অনুষ্ঠান বর্জন করবেন। কিন্তু দেখে অবাক হলাম যে 'বামপন্থী' এবং 'প্রগতিশীল' বলে পরিচিত একজন সাহিত্যিক ও কয়েকজন শিল্পী এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করলেন। (নূতন সংবাদ, ২৬. ৮. ৪৮)

প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর কিন্তু একেবারে নীরব নয়। ১২ই আগস্ট নির্বাচনী সভা করতে কিরণশংকর রায় যান মালদহ শহরে। দেখা গেল সমস্ত শহর জুড়ে 'কিরণশংকর ফিরিয়া যাও' পোস্টার পড়েছে। পুলিশকে পোস্টার ছেঁড়ার কাজে তৎপর হতে হয়। বস্তি ও মধ্যবিত্ত পরিবারের পাঁচশো মহিলা কাপড়ের দাবি জানিয়ে কিরণশংকর রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। এসব দেখে তিনি জনসভার কর্মসূচি বাতিল করেন।

বীরভূমের শ্রীনিধিপুর গ্রামে এক বৃদ্ধা কৃষক রমণীর সভানেতৃত্বে ১৫ই আগস্ট এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই 'স্বাধীনতা' ভুয়া বলে এক প্রস্তাব ঐ সভা থেকে পাশ হয়। (নূতন সংবাদ, ২০. ৮. ৪৮)

কোথাও কোথাও ঐদিন কালো পতাকা তোলা হয়। এই অপরাধে সিউড়ির এক সরকারি কর্মচারীকে বরখাস্ত করা হয়। (ঐ)

'স্বাধীনতা'র এক বৎসরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে 'ওয়ন ইয়র অফ ফ্রিডম' শীর্ষক একটি কুড়ি পৃষ্ঠার পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। তাতে বলা হয়ঃ

'একজন সাধারণ মানুষের এই এক বৎসরের অভিজ্ঞতা হল—ক্ষুধা, বঞ্চনা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের এক দীর্ঘ মিছিল। এই এক বছরেই তার 'স্বাধীনতা' সম্পর্কে মোহমুক্তির যথেষ্ট অবকাশ ঘটেছে।

'স্বাধীনতা' প্রাপ্তির প্রথম কয়েক মাসের মধ্যেই ঘটেছে দেশ জুড়ে রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। স্বয়ং মহাত্মা গান্ধীই হয়েছেন আততায়ীর হাতে নৃশংসভাবে নিহত। এই হত্যার ষড়যন্ত্রের সঙ্গে এমন সব লোক জড়িত—যারা হত্যাকাণ্ডের কয়েকদিন আগেও দেশভক্ত বলে কীর্তিত হয়েছে।···

···সামগ্রিকভাবে দেখা যাচ্ছে যে এই এক বৎসর ধরে দেশের সরল বিশ্বাসপ্রবণ মানুষেরা বারে বারে প্রতারিত হয়েছে এবং দেশজোড়া বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলার সুযোগে প্রতিক্রিয়া তার ঘর গুছিয়েছে।· আজ নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ফ্যাসিবাদী দানব মাথা চাড়া দিয়েছে। কিন্তু তার উদ্যত মস্তককে চূর্ণ করার জন্যে জনগণও ঐক্যবদ্ধভাবে চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্যে ময়দানে অবতীর্ণ।'

তেরো

১৯৪৮-এর আগস্টের শেষাশেষি গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরে পাবার লড়াই ও শ্রমিকের রুটি-রুজির লড়াই—দুইই জোর কদমে শুরু হয়।

২৮শে আগস্ট দিনটিকে 'নিরাপত্তা আইন ও অর্ডিনান্স বিরোধী দিবস' রূপে পালন করার জন্যে ২০০টি শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয়। তাঁরা সমস্ত বামপন্থী রাজনৈতিক দলকে সহযোগিতা করার জন্যে অনুরোধ জানান। ঐদিন প্রবল বৃষ্টিপাত উপেক্ষা করেও মনুমেণ্ট-ময়দানে মৃণালকান্তি বসুর সভাপতিত্বে দশ হাজার লোকের এক জমায়েত হয়। সে সভায় আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রমোদ সেনগুপ্ত ও দেবনাথ দাস, ফরওয়ার্ডব্লকের পক্ষ থেকে সত্যপ্রিয় ব্যানার্জি, ট্রাম শ্রমিক নেতা কালী ব্যানার্জি, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির অনিলা দেবী, পোর্ট ট্রাস্ট শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা সীতারাম, ছাত্র ফেডারেশনের অলকা মজুমদার, বি. এল. পি. আই.-এর হারাধন চ্যাটার্জি, সোশ্যালিস্ট ইউনিটি সেণ্টারের শিবদাস ঘোষ, বড়া কমলাপুরের নির্যাতিত কৃষকদের পক্ষ থেকে গোপাল দাস, 'অমৃত

বাজার পত্রিকা'র ধর্মঘটী সাংবাদিক সরোজ দত্ত, 'যুগান্তর' প্রেস কর্মচারী সমিতির সুরেশচন্দ্র মৈত্র প্রমুখ বক্তাগণ ব্যক্তি-স্বাধীনতার উপর আঘাতের প্রতিবাদ জানিয়ে বক্তৃতা করেন। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ১১টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। (নূতন সংবাদ, ২৯. ৮. ১৯৪৮)

সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে শিক্ষক-ছাত্র-শ্রমিক কর্মচারী মহলে আন্দোলনের এক নতুন তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। ১লা সেপ্টেম্বর কলকাতা ও শহরতলির লক্ষাধিক ছাত্র ও শিক্ষক ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেন। সংবাদসূত্রে জানা যায়, ১৫০টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শতকরা নব্বইজন শিক্ষক এই ধর্ম-ঘটে সামিল হয়েছিলেন।

২রা সেপ্টেম্বর 'অমৃতবাজার'-'যুগান্তর'-এর ধর্মঘটী কর্মচারীদের উপর পুলিশ লাঠি চালায়। পিকেট লাইন থেকে পুলিশ কংগ্রেসী এম. এল. এ. বীণা ভৌমিকসহ ২২ জনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃত ধর্মঘটীদের জামিনে মুক্তি দিয়ে আবার নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়।

২রা সেপ্টম্বর থেকে শুরু কলকাতার পোর্টের ধর্মঘটী ওয়াচ অ্যান্ড ওয়ার্ডের সিপাহীদের উপর পুলিশী হামলা। গুলি ও কাঁদুনে গ্যাস বর্ষিত হয়। ১৮ জন আহত ও তাদের মধ্যে ৬ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। পরের দিন লেবার কমিশনারের সামনেই মাখন চ্যাটার্জিকে গ্রেপ্তার করা হয়।

আন্দোলনের ব্যাপকতা দেখে আবার শুরু হয় নতুন করে ধরপাকড়। 'রেশনে চাউলের দর বৃদ্ধি পেতে পারে'—এই সংবাদ পরিবেশনের জন্যে প্রখ্যাত সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারকে গ্রেপ্তার করা হয়। কলকাতায় ব্যাপক ধরপাকড় ও খানাতল্লাসি চলে। যেসব জায়গায় খানাতল্লাসি হয় তাদের অন্যতম হল ইউনাইটেড আর্ট প্রেস। ধৃতদের মধ্যে ছিলেন দেবনাথ দাস ও নিখিল দাস।

৯ই সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয় দমননীতির বিরুদ্ধে শ্রমিক ও ছাত্রের ঐক্যের মহড়া। ঐদিন পোর্টের ১৩ হাজার শ্রমিক ও কলকাতার ৫০ হাজার ছাত্র ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ভবনের সামনে আট হাজার ছাত্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। বিকেলে ময়দানের জনসভার প্রধান বক্তা পোর্ট শ্রমিক নেতা বজলু মিঞা সভা সেরে ফেরার পথে গ্রেপ্তার হন। তাছাড়া পুলিশ ঐদিন আরও ১৯ জনকে গ্রেপ্তার করে।

সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের শ্রমিকদের মধ্যে বিক্ষোভ ফেটে পড়ে। ছোটো বড়ো প্রতিটি কারখানায় শুরু হয় স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট ও মিছিল। শ্রমিকরা নতুন সংগ্রামী নেতৃত্বের জন্যে উন্মুখ। (নূতন সংবাদ, ১৩. ৯. ৪৮)

কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদকমণ্ডলী আন্দোলনের সাম্প্রতিক অবস্থা পর্যালোচনা করেন। তাঁদের দৃষ্টিতে শ্রমিক আন্দোলনের কতকগুলি নতুন বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে :

"১৯৪৭ এর ১৫ই আগস্টের পর বাংলার ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে নিম্নলিখিত অবস্থা লক্ষ্য করা যায়।

১। 'পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়াছি, নিজের দেশকে গড়িয়া তুলিতে হইবে'—এই মনোভাব শ্রমিক ও চাকুরীজীবী মধ্যবিত্তের মনে প্রবল হইয়া উঠে। 'নেতাদের পিছনে দাঁড়াইতে হইবে' মনেভোবের বশবর্তী হইয়া বিশেষভাবে মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবীর দল নিজ নিজ ট্রেড ইউনিয়ন সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া পড়েন। দাবী সংক্রান্ত ব্যাপার ধামা চাপা পড়ে।

২। এই সময়ই জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস শ্রমিক ও মধ্যবিত্তের মধ্যে প্রবেশ করিবার বিশেষ চেষ্টা করে এবং কিয়দংশে সফলও হয়। বিভিন্ন ইউনিয়নে বিভেদ সৃষ্টি হয়। বহুস্থলে নতুন ইউনিয়ন জাতীয় টি. ইউ. সি.-র নেতৃত্বে গঠিত হয়। বহু মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবীদের ইউনিয়ন এ. আই. টি. ইউ. সি. হইতে বাহির হইয়া আসে (যথা কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী ইউনিয়ন) বা তাহার সংশ্রব ত্যাগ করে (যথা ফেডারেশন অফ মার্কেন্টাইল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন)।

৩। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপুট অ্যাক্ট চালু হওয়ার ফলে এবং কংগ্রেস সম্পর্কে যথেষ্ট মোহ থাকায় শ্রমিক ও কর্মচারীগণ 'আদালতের' মারফৎ ন্যায্য দাবী আদায়ে কথঞ্চিৎ বিশ্বাসভাজন হন। ১৯৪৭ সালের শেষদিকে বাংলায় কোন উল্লেখযোগ্য স্ট্রাইক হয় নাই বলিলেই চলে। ২-১টি হরতাল যাহা হইয়াছে বেশীর ভাগই শ্রমিকদের দলাদলির ফলে নষ্ট হইয়া যায়। এই সময় প্রধান প্রধান শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে ছোটখাট কারখানায়ও ট্রাইবুনাল বসে।

৪। যতই দিন যাইতে লাগিল ততই কংগ্রেসী রাজের স্বরূপ জনসাধারণের চক্ষে পরিস্ফুট হইতে থাকে এবং ততই সরকারী দমননীতি ও ও আই. এন. টি. ইউ. সি ও সোশ্যালিস্ট পার্টির ভেদ সৃষ্টির প্রয়াস তীব্র আকার ধারণ করে। কংগ্রেসী রাজত্বে শ্রমিক সাধারণের দুঃখ-দারিদ্র্যও প্রবল আকার ধারণ করিতে থাকে, ফলে সরকারী বিচার, আদালত সালিশী বা প্রতিশ্রুতিতে শ্রমিক ও কর্মচারী দল আস্থা হারাইতে থাকে।...

কলিকাতার মধ্যবিত্ত কর্মচারী মহলেও ট্রাইবুনাল বিরোধী অভিযান শুরু হইল। হতাশার ধাক্কা কাটাইয়া আবার চাকুরীজীবী দল কোমর বাঁধিল। সওদাগরী অফিস, বীমা ও ব্যাঙ্ক কর্মচারী সমিতির এক কনফেডারেশন গঠিত হইল—একযোগে ট্রাইবুনাল লড়িবার জন্য, দরকার হইলে সংগ্রাম করিবার জন্য। ২৯শে জুলাই আবার কলকাতার আকাশ বাতাস মুখর করিয়া তুলিল।

এই সময়ের প্রধান বিশেষত্ব :

(ক) কংগ্রেসী, কমিউনিস্ট, সোশ্যালিস্টপন্থী শ্রমিক কর্মচারীর মিলন। কমিউনিস্ট বিরোধিতার আরও হ্রাস।

(খ) কংগ্রেস ও আই. এন. টি. ইউ. সি.-র বিভেদকামী ভূমিকা সম্পর্কে শ্রমিক ও কর্মচারীদের চৈতন্য।

(গ) আই. এন. টি. ইউ. সি ও সোশ্যালিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন অনেক ইউনিয়নে স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট। আসরে স্থান রাখিবার জন্য উক্ত সংগঠন-গুলির নেতাদের গরম বুলি, স্ট্রাইকের ধমকি এমনকি স্ট্রাইক আহ্বান।

এই সময় আসে সেণ্ট্রাল ব্যাংক কর্মচারীদের ধর্মঘট। এই হরতালের প্রধান বিশেষত্ব :

(ক) প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ও জাতীয় টি. ইউ. সি.-র সভাপতি হরতালের বিপক্ষতা করা সত্ত্বেও সাধারণ হরতাল অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। সরকারী ভ্রূকুটি উপেক্ষা করিয়া, প্রচণ্ড নিপীড়ন হইবে জানিয়াও, সরকারী চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিয়া ১৮০০০ কর্মচারীর মধ্যে কমপক্ষে ১৭,৫০০ হরতাল পালন করেন। পিকেটিং একেবারেই করিতে হয় নাই বলিলেই চলে।

(খ) সেণ্ট্রাল ব্যাংক কর্মচারীগণ এমন দাবী উপস্থিত করেন যাহাতে সমস্ত কর্মচারী এবং নিম্নপদস্থ শ্রমিকগণ সাড়া দেন, একসূত্রে গ্রথিত হন।

(গ) বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদের লোক থাকা সত্ত্বেও বিভেদ সৃষ্টি হইতে পারে নাই। মোটামুটিভাবে কংগ্রেস সরকারের শ্রমনীতির বিরুদ্ধে কংগ্রেসপন্থী হইতে কমিউনিস্ট পর্যন্ত সমস্ত কর্মচারী কাঁধে কাঁধ লাগাইয়া কাজ করিয়াছেন। অত্যন্ত পরিচিত কমিউনিস্ট কর্মীর সহিত কিছুদিন পূর্বেকার কমিউনিস্ট বিরোধী কর্মচারী সহযোগিতা করিয়াছেন। অধিকাংশ লোক অ-কমিউনিস্ট হওয়া সত্ত্বেও ধর্মঘটে কমিউনিস্ট নেতৃত্ব স্বাভাবিক ভাবেই তাঁহারা মানিয়া লইয়াছেন।

(ঘ) সেণ্ট্রাল ব্যাংকের হরতালীদের পিছনে সমস্ত কলিকাতার মধ্যবিত্ত কর্মচারীদের অকুণ্ঠ ও সক্রিয় সমর্থন দেখা যায়। ১৪ই আগস্টের সভা এবং সাধারণ ধর্মঘটের পর যে সভা হয় তাহা হইতে প্রমাণিত হয়, সর্বশ্রেণীর মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবী মনেপ্রাণে বুঝিতে পারেন ঐ ধর্মঘটের জয়-পরাজয়ের উপর আগামী সংগ্রামের জয় পরাজয় নির্ভর করিতেছে।'

সাম্প্রতিক শ্রমিক আন্দোলনের পর্যালোচনার শেষে সম্পাদকমণ্ডলীর চূড়ান্ত অভিমত :

'অর্থনীতিক সংকটের চাপে পুঁজিপতি ও সরকার উভয়েই আজ শ্রমিকদের মজুরী কমাইবার জন্য মরীয়া হইয়া চেষ্টা শুরু করিয়াছে।...

...শ্রমিক জীবনের ক্রমাবনতির বিরুদ্ধে আজ জাতীয় টি. ইউ. সি-র কর্মীরা পর্যন্ত ধর্মঘট করিতেছে অথবা মুখে ধর্মঘটের কথা বলিতেছে।...

তাই সরকার ও পুঁজিপতিরা ইহার বিরুদ্ধে বর্বর ফ্যাসিস্ট আক্রমণ শুরু করিয়াছে। ধর্মঘট কার্যতঃ বে-আইনী করা হইয়াছে। জঙ্গী

ইউনিয়নগুলির আইনগত কার্যকলাপ পরিচালনা প্রায় অসম্ভব করিয়া তোলা হইয়াছে। ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের হাজারে হাজারে গ্রেপ্তার ও তাহাদের বিরুদ্ধে দমনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে ; সক্রিয় কর্মীদের বিনা বিচারে আটক রাখা হইয়াছে। পুলিশ, জাতীয় টি. ইউ.-র গুণ্ডা এবং মালিকের সশস্ত্র দালাল একত্রে মিলিয়া শ্রমিকদের খুন জখম করিতেছে, তাহাদের গৃহ লুণ্ঠন ও ভস্মীভূত করিতেছে।

…সরকার ও মালিক এবং শ্রমিকদের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ দ্রুত বাড়িয়াই চলিয়াছে। মালিকের আক্রমণের বিরুদ্ধে কিংবা নূতন দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্য শ্রমিকদের অসংখ্য ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হইতেছে। স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন সংগঠিত অথবা অর্ধ-সংগঠিত আন্দোলন ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে।

সমস্ত মিলিয়া শ্রমিক শ্রেণী আজ ব্যাপক গণজাগরণ ও বিরাট সাধারণ ধর্মঘটের পথে চলিয়াছে ; ইহার ফলে দেশের রাজনীতির মোড় ঘুরিতে বাধ্য।

.. জাতীয় সংস্কারপন্থী নীতি সম্পর্কে যদিও শ্রমিকরা দ্রুত মোহমুক্ত হইতেছে, জীবন ধারণের অবস্থার ক্রমাবনতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ স্পৃহা যদিও প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতেছে, তবু এখনও শ্রমিক শ্রেণীর ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থান আমরা দেখিতে পাইতেছি না।…

পরিবর্তিত অবস্থায় আজ আর পুরাতন পন্থায় ভাবিলে চলিবে না যে ধর্মঘট দীর্ঘস্থায়ী হইবে ও মোটামুটি শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধের পথে চলিবে এবং আংশিক দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত সযত্নে ইহার প্রস্তুতি ও সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হইবে। যেখানে এইরূপ সম্ভাবনা আছে, সেখানে নিশ্চয়ই ইহা করিতে হইবে ; কিন্তু বর্তমানে এইরূপ সম্ভাবনা নাই বলিলেও চলে। চণ্ডনীতির রাজত্বে আমাদের কৌশল হইল দ্রুত আঘাত করিবার কৌশল। যখনই আমরা দেখিব শ্রমিকদের উপর আঘাত আসিতেছে এবং ইহার বিরুদ্ধে তাহাদের বিক্ষোভ জমিয়া উঠিতেছে, তখনই তাহাদের উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে, সংগ্রামের সময় সাধারণ শ্রমিকদের গ্রহণযোগ্য সকল প্রকার লড়াই-এর পন্থা গ্রহণ করিতে হইবে—শত্রুর উপর চরম আঘাত হানিতে হইবে। যখনই দেখা যাইবে শ্রমিকদের মনোবল পড়িয়া যাইতেছে তখনই শ্রমিকদের শক্তি যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পিছু হটিতে হইবে অথবা সংগ্রামের অন্য কায়দা গ্রহণ করিতে হইবে। ইতিমধ্যে সমস্ত সময় সরকার এবং উহার দালালদের মুখোস খুলিয়া দিয়া তীব্র প্রচার কার্য চালাইতে হইবে।

পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ শক্তিই একমাত্র জনগণের গণতান্ত্রিক চেতনাকে জাগ্রত করিয়া প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথে পরিচালিত করিতে পারে। আপাত দৃষ্টিতে আমরা যে স্তব্ধভাব দেখিতেছি আমাদের কাজের দ্বারা আমরা উহাকে ঝড়ের পূর্ব মুহূর্তের স্তব্ধতায় পরিবর্তিত করিতে পারি।' (ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে প্রস্তাব : প্রাদেশিক কমিটির সেক্রেটারিয়েটে গৃহীত, ১৫ই আগস্ট ১৯৪৮। কমিউনিস্ট বুলেটিন, সংখ্যা ৬)

চোদ্দ

পার্টি কংগ্রেসের মঞ্চে দাঁড়িয়ে বার্মার কমিউনিস্ট নেতা থাকিন থানটুন আহ্বান জানিয়েছিলেন: আসুন, ১৯৪৮ সালকে মুক্তির বছরে পরিণত করি। গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মানুষ যেন এই আহ্বানের প্রতীক্ষায় ছিল। সাম্রাজ্যবাদ ও তার দেশী তাঁবেদারদের বিরুদ্ধে মুক্তিকামী জনগণের সংগ্রাম এশিয়ার মানচিত্রের চেহারা বদলে দিল।

এক উন্মত্ত ঝড়ে তোলপাড় গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বহ্নিমান রূপ অত্যন্ত সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়—তাঁর 'অগ্নিকোণ' কবিতাটিতে। স্তিমিত প্রাণের প্রতিটি রক্ত কণিকা দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে—যখন নিশির ডাকের মতো শোনা যায়:

> দিন এসে গেছে ভাই রে
> রক্তের দামে রক্তের ধার
> শুধবার।
> দিন এসে গেছে ভাই রে
> বিদেশী রাজের প্রাণ-ভোমরাকে
> নখে নখে টিপে মারবার।
> দিন এসে গেছে
> লাঙলের ফালে আগাছা উপড়ে
> ফেলবার।
> দিন আসে ভাই
> কাস্তের মুখে নতুন ফসল
> তুলবার।

সারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জুড়ে সাম্রাজ্যবাদের নাভিশ্বাস উঠেছে। ব্রিটিশ, মার্কিন, ফরাসি, ডাচ সাম্রাজ্যবাদ মুক্তিসেনাদের আঘাতে আঘাতে জর্জর। মালয়, বার্মা, ফিলিপাইনের জঙ্গল থেকে গেরিলা যোদ্ধারা একটার পর একটা আঘাত হেনে চলেছে। এবং সর্বোপরি চীন। চীনের মুক্তি ফৌজ দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে। ২২শে এপ্রিল ১৯৪৮, বিপ্লবতীর্থ ইয়েনান মুক্ত এবং ১৯৪৮-এর নভেম্বরের মধ্যে গোটা উত্তর-পূর্ব চীন মুক্ত। ১৯৪৯ সালের ৩১শে জানুয়ারি বিনা রক্তপাতে প্রাচীন শহর পিকিং মুক্ত এবং ২১শে এপ্রিল কমরেড মাও সে তুং ও সর্বাধিনায়ক চু-তে কুয়োমিনটাং তাঁবেদারদের বিরুদ্ধে শেষ আঘাত হানার নির্দেশ দেন। তারপর চীনের মুক্তি ফৌজ ইয়াংসি অতিক্রম করে সাংহাই ও নানকিং অভিমুখে অভিযান শুরু করে। ১৯৪৯ সালের ২৩শে এপ্রিল নানকিং-এর রাষ্ট্রপতি ভবনের মাথায় লাল পতাকা উড়তে থাকে। ১৯৪৯ সালের মধ্যে গোটা চীন ভূখণ্ড

থেকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও তার তাঁবেদার চিয়াং চক্র বিতাড়িত। জন্ম হল মহাচীনের বুকে জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এক রুদ্ধশ্বাস নাটকের অভিনয় যেন এইমাত্র শেষ হল।

লিউ শাও চি এ-প্রসঙ্গে বলছেন,

'সাম্রাজ্যবাদ ও তার পোষা কুত্তা কুওমিনটাং প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে চীনের মুক্তিসংগ্রাম আজ জয়যুক্ত। বিশ্বের এক-চতুর্থাংশ মানুষ আজ মুক্ত। ভিয়েতনামের শতকরা ৯০ ভাগ জমি জাতীয় মুক্তি সংগ্রামীদের দখলে; বার্মা ও ইন্দোনেশিয়ার মাটিতে জাতীয় মুক্তির লড়াই ছড়িয়ে পড়েছে; সাম্রাজ্যবাদ ও তার তাঁবেদারদের বিরুদ্ধে মালয় ও ফিলিপাইনের গেরিলা যোদ্ধারা অনমনীয়ভাবে একটানা লড়ে যাচ্ছে; ভারতের বুকেও মুক্তির জন্যে সশস্ত্র লড়াই শুরু হয়েছে।' (এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার দেশগুলির ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি সম্মেলনে লিউ শাও চি-র উদ্বোধনী বক্তৃতা। ১৬ই নভেম্বর, ১৯৪৯।)

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমগ্র দৃশ্যপট বদলে দিল চীন বিপ্লবের বিজয়-বার্তা। এবং এদেশের কবি-শিল্পী মহলও একাত্মবোধে উদ্বেলিত। এ-প্রসঙ্গে ধনঞ্জয় দাস লিখছেন,

'সৃজনশীল কবি মনে অগ্নিগর্ভ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রাণ-স্পন্দন কীভাবে অনুরণিত হচ্ছিল তার সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ সম্ভবত সুভাষ মুখোপাধ্যায় রচিত 'অগ্নিকোণ' কবিতাটি।

…রামেন্দ্র দেশমুখ্য-র কবিচেতনায় উদ্ভাসিত হল:

'প্রবাল, আগ্নেয় দ্বীপে লাল তারা ওঠে
পূব-দেশী দক্ষিণের তারা
গতি-ঝলকিত স্রোত এশিয়ার চোখের সম্মুখে
এখন যে অনন্ত ইসারা।'

('তারকা', পরিচয়, কার্তিক, ১৩৫৫)

বিমলচন্দ্র ঘোষ 'মাও সে তুঙ' শীর্ষক কবিতায় সরাসরি নিবেদন করলেন:

'নিরাপত্তার ফাঁসে লটকানো কণ্ঠস্বর
কবি-শ্রমিকের শুনতে কি পাবে কমরেড?
মাঞ্চুরিয়ার আকাশে আকাশে
মুক্ত প্রাণের রাঙা নিঃশ্বাসে
মিলবে কি ভুখা ভারতের শ্বাসধ্বনি-তরঙ্গে কমরেড?'

(পরিচয়, অগ্রহায়ণ ১৩৫৫)

১৩৫৫ সালের পৌষ-সংখ্যায় পরিচয়-এ প্রকাশিত হল, মৃগাঙ্ক রায়-এর 'চীন : নভেম্বর ৪৮' শীর্ষক কবিতা। মাঘ, ১৩৫৫ সালের 'পরিচয়ে' রামেন্দ্র দেশমুখ্য আবার লিখলেন,

> 'চীন থেকে আমি আসি রোজ
> বর্মার পর্বত থেকে আজকাল আমি দিই হানা,
> লেখা ও চিন্তার দেনা শোধ করি পূর্বপুরুষের
> আমার যে অবাক ঠিকানা।'

(বেকার কবি)

ঐ একই সংখ্যায় প্রকাশিত হল অনিল কাঞ্জিলাল-এর কবিতা 'রোগ-শয্যায়'। অসুস্থ কবির অনুভূতিতে ধরা পড়ল :

> 'আমার এ রোগশয্যা এশিয়ার বিক্ষুব্ধ প্রান্তর
> এক শত্রু মৃত্যু তার নানা ছদ্মবেশে
> চীনে ব্রহ্মে মালয়ে জাভায়
> বুক চিরে রক্ত খায়
> যক্ষ্মার মুখোস পরে
> রক্ত খায় ফুসফুস আমার প্রিয়ার।'

১৩৫৫ সালের ফাল্গুন সংখ্যা 'পরিচয়'-এ অনূদিত হল স্বয়ং মাও সে তুঙ-এর 'বরফ' কবিতা। তৎকালীন তরুণ কবি নির্মাল্য বসু ও জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়-এর 'খবর পেলাম' ও 'সংক্রামক' নামক কবিতা দুটিও প্রকাশিত হল উক্ত সংখ্যায়, আর সেই কবিতা দুটিতেও ধ্বনিত হল সংগ্রামী চীনের প্রতি কবি হৃদয়ের উত্তপ্ত আবেগ। ১৩৫৫ সালের চৈত্র সংখ্যা 'পরিচয়'-এ চীনের উদ্দেশে নিবেদিত কোন কবিতা প্রকাশিত না হলেও ঐ সংখ্যাতে সমালোচিত হল মুক্ত চীনকে অভিনন্দন জানিয়ে রচিত বাঙালী কবিদের প্রথম কাব্য-সংকলন 'মহাচীন' নামক পুস্তিকাটি।' (মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক, খণ্ড ২, পৃ ১১-১২)

'মহাচীন'-এর সমালোচক রবীন্দ্র মজুমদারের ভাষায় :

'আজকের এশিয়া জোড়া মুক্তি আন্দোলনের নেতৃত্ব করছে চীন। বার্মা, মালয়, ভিয়েতনাম, ভারতবর্ষ প্রত্যেক দেশের সংগ্রামী মানুষ আজ অত্যাচার আর শৃঙ্খল ছেঁড়ার দুর্জয় অভিযানে প্রেরণা পাচ্ছে চীনের মুক্তি-সেনাবাহিনীর দৃপ্ত অগ্রগতি থেকে। এই প্রেরণাতে দেশবিদেশের কবি সাহিত্যিকরাও উদ্বুদ্ধ। বুঝতে বাকি নেই চীনের জনতার সংগ্রাম মোটেই বিচ্ছিন্ন নয়—ইয়েনান নানকিং রণাঙ্গনের সীমারেখা আজ বিস্তৃত হয়ে গেছে পেগুর টিনের

খনি, সিঙাপুরের রবারের জঙ্গল ছাড়িয়ে তেলেঙ্গানা কাকদ্বীপ বুধাখালির খেত-খামার পর্যন্ত। অমিত শক্তির অধিকারী চীনের জনতার প্রতি তাই সর্বদেশের সংগ্রামী মানুষের আন্তরিক অভিনন্দন উৎসারিত হচ্ছে, জনশক্তির অনিবার্য বিজয়ের প্রতি বিশ্বাস দৃঢ়তর হচ্ছে চীনের দৃষ্টান্তে।

এই ক্ষুদ্র সংকলনটি চীনের মুক্তি সংগ্রামের প্রতি অভিনন্দন জানাবার একটি ছোট প্রচেষ্টায় বিমলচন্দ্র ঘোষ, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠাবান কবির রচনার সঙ্গে সংকলিত হয়েছে কয়েকজন নতুন কবির রচনা। আমাদের দেশের জঙ্গীমানুষ যে আজ লাল চীনের মুক্তিমন্ত্রে মনে-প্রাণে দীক্ষিত, তারই ঘোষণা আছে এই সংকলনের প্রত্যেকটি কবিতায়।' (ঐ)

ঘরের পাশেই এত বড় ওলটপালট স্বভাবতই দেশের বিভিন্ন মহলে আশা-নিরাশা ও শঙ্কা-প্রত্যাশাতুর প্রশ্ন না জাগিয়ে পারে না। এদেশের শাসক-শ্রেণীও চীন বিপ্লবের মধ্যে অশনি-সংকেত দেখতে পাচ্ছে। নেহরু-র নিয়তিও কি চিয়াং-এর অনুসারী! কংগ্রেস শাসকদলের পরিণামও কি কুওমিনটাং-এর মতো?

প্রশ্নটা আরও খুঁচিয়ে তুললেন মার্কিন মিশনারি ডাঃ স্টানলি জোনস্। গোটা চীন চষে বেড়াবার পর তিনি প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরুকে ১৫ই মে, ১৯৪৯ তারিখে লেখা একখানা চিঠিতে একই প্রশ্ন করেন। তিনি লেখেন:

'বুদ্ধিজীবী মানুষদের মনে যে সব প্রশ্ন নিরন্তর খোঁচা দিচ্ছে, সেগুলি হল—যেসব কারণে কুওমিনটাং দলের ভরাডুবি ঘটেছে—একই কারণে কংগ্রেস দলেরও কি তাই পরিণাম! কমিউনিস্টরা কি ভারতেও ক্ষমতায় চলে এসে বিপ্লবকে সমাপ্ত করবে! ক্ষমতার স্বাদ পাবার পর কি তারা বিপ্লবের গতিবেগ মন্থর করবে? ...আজ প্রতি দিন প্রতি ঘণ্টা অত্যন্ত মূল্যবান। আজ নিম্ন-পদস্থ সরকারী কর্মচারীদের মধ্যেও দুর্নীতি যেভাবে বাসা বেঁধেছে—তার দিকে কি কংগ্রেস দল উপেক্ষার চোখে তাকাবে এবং দেখেও না দেখার ভাণ করবে! অথবা চীনের কমিউনিস্টদের মতো তারা নির্মমভাবে দুর্নীতির তৃণমূল পর্যন্ত উচ্ছেদ করবে? শুধু মুনাফার তাগিদেই কি চলবে দেশের শিল্প-বাণিজ্য? কংগ্রেস যদি এই প্রশ্নগুলির যথার্থ উত্তর খুঁজে বার করতে পারে এবং সেই মতো জোরালো পদক্ষেপ নিতে পারে—তাহলেই কেবল দেশ কমিউনিস্টদের হাত থেকে বাঁচতে পারে।'

নেহরু এই চিঠিখানার কপি সমস্ত মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দেন। (সরোজ চক্রবর্তী, 'উইথ বি. সি. রায়', পৃ ৯৩-৯৪)

পনেরো

"ভারতবর্ষ রুশিয়ার পথ অনুসরণ করবে না চীনের পথ অনুসরণ করবে ? সংস্কারবাদী সংশয়াকুলেরা আজ আবার এই প্রশ্ন তুলেছেন।"—পলিট ব্যুরোর পক্ষ থেকে অন্ধ্র পার্টি-নেতৃত্বের প্রতিবেদন সম্পর্কে মন্তব্য (মার্কসবাদী, ৩য় সংকলন, পৃ ৬৩)

ভারতের বিপ্লবের বর্তমান স্তর ও তার আনুষঙ্গিক রণনীতি-রণকৌশল সংক্রান্ত এক প্রতিবেদন—১৯৪৮ সালের শেষাশেষি অন্ধ্র প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদকমণ্ডলী রচনা করেন। তার মূল বক্তব্য :

১. সাম্রাজ্যবাদী দেশের সমাজবিপ্লব এবং ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশের বিপ্লবকে একাকার করে ফেলা উচিত নয়। প্রসঙ্গত, জারতন্ত্রী রাশিয়া ছিল একটি স্বাধীন, সামন্ততান্ত্রিক ও সামরিক রাষ্ট্র এবং অপরপক্ষে আজকের ভারতবর্ষ আদৌ স্বাধীন নয় এবং একটি আধা-ঔপনিবেশিক দেশ মাত্র।

২. ভারতের বিপ্লবের বর্তমান স্তর হুবহু এক না হলেও মূলত ১৯২৭ সালের চীন বিপ্লবের স্তরের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত—অর্থাৎ যখন কমিউনিস্ট পার্টি ও শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে বুর্জোয়ার আক্রমণ শুরু হয়েছে। অতএব রুশ বিপ্লবের অক্টোবর পর্যায়ের রণনীতির হুবহু অনুকরণ এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভুল, বিভ্রান্তিকর ও বিপথগামিতার সামিল।

৩. আমাদের বিপ্লবের বেলায় মাঝারি বুর্জোয়াদের ভূমিকা হবে নিরপেক্ষ এবং এমনকি তারা বিপ্লবে অংশও নিতে পারে।

৪. রুশ বিপ্লবের অক্টোবর পর্যায়ের কথা মনে রেখে কেউ কেউ মাঝারি কৃষককুলকে নিরপেক্ষ রাখার কথা বলেন ; আসলে তাদের বিপ্লবে সামিল করতে হবে। মাঝারি কৃষককে গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে সামিল করা ও তাদের সঙ্গে শক্তিশালী ঐক্য গড়ে তোলা আমাদের একান্ত কর্তব্য।

৫. কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে নেহরু সরকারের এই আক্রমণ আসলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ-অনুসৃত আক্রমণেরই এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। অতএব এমন একটা স্তরে আমরা পৌঁছেছি যখন প্রতিটি আংশিক লড়াই সশস্ত্র রূপ নিতে বাধ্য। বুর্জোয়াদের আক্রমণ—সশস্ত্র প্রতিরোধ ছাড়া অন্য কোনভাবে প্রতিহত করা যাবে না। সশস্ত্র সংগ্রাম বিপ্লবের বর্তমান স্তরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত।

৬. আমাদের বিপ্লবের পথ ও লড়াইয়ের পদ্ধতি চীন বিপ্লব-অনুসারী এবং মুক্তাঞ্চল সৃষ্টিই হবে আমাদের প্রধান করণীয়।

অন্ধ্র দলিলের মূল সিদ্ধান্তকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে, পলিটব্যুরো পুরোপুরি নস্যাৎ করে দেন এবং এই উপলক্ষ্যে তাঁরা তিনটি দলিল রচনা করেন—'রণনীতি ও রণকৌশল', 'জনগণতন্ত্র প্রসঙ্গে', ও 'ভারতে কৃষি সমস্যা প্রসঙ্গে'।

অর্থাৎ চীন বিপ্লবের সফল পরিণতি, সেদিন পার্টি র‍্যাঙ্ক ও পার্টি-অনুগামী সংগ্রামী মানুষের মনে শুধু যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল তা নয় ; পার্টির ওপর মহলে তুলেছিল এক নতুন বিতর্কের ঝড়।

পলিট ব্যুরোর পক্ষ থেকে বি. টি. আর. দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানালেন যে চীন বিপ্লবের চরম সাফল্য সত্ত্বেও ভারতের ক্ষেত্রে তার রণনীতি-রণকৌশল প্রযোজ্য নয়। রুশ বিপ্লবই ভারতবর্ষের প্রধান দিক্-নির্দেশক! তিনি লিখছেন :

'রুশ বিপ্লবের সমগ্র অভিজ্ঞতা ভারতের ক্ষেত্রে পুরোপুরি প্রাসঙ্গিক! রুশ বিপ্লবের ইতিহাসই ভারতের একমাত্র মডেল ; কারণ ভারতের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের বেলায়—সামন্ততান্ত্রিক-সাম্রাজ্যবাদী-বুর্জোয়া জোটের প্রধান চালিকা-শক্তি হল বুর্জোয়া শ্রেণী এবং বুর্জোয়াশ্রেণীই প্রধান শত্রু।'

পলিট ব্যুরো অন্ধ্র নেতৃত্বের বক্তব্যকে খণ্ডন করতে গিয়ে বলেন :

'অন্ধ্রের সমালোচকরা কখন কখন এমনভাবে সওয়াল করিয়াছেন যে রুশিয়া ছিল যেন একটি শিল্পোন্নত দেশ—অর্থাৎ বর্তমান ভারতবর্ষ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের দেশ—অতএব রাশিয়ার অভিজ্ঞতা ভারতবর্ষের ব্যাপারে খুব বেশী প্রযোজ্য নহে। ইহা ভুল। প্রথমত, কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের ষষ্ঠ কংগ্রেস সমস্ত পৃথিবী এবং ভারতবর্ষের মত উপনিবেশগুলির জন্য যে কর্মপন্থা নির্ধারণ করে তাহাতে রুশিয়ার অভিজ্ঞতা ও লেনিনপন্থী সাধারণ কৌশলের উপর নির্ভর করিয়াই ভারতবর্ষের জন্য শ্রমিক ও কৃষকের গণ-তান্ত্রিক শ্রেণী প্রভুত্বকে (ডিক্টেটরী) সম্মুখবর্তী লক্ষ্যবস্তু হিসাবে গ্রহণ করা হয়।

দ্বিতীয়ত, রুশিয়াকে অগ্রসর দেশ বলিয়া ভারতবর্ষ হইতে গুণগতভাবে পৃথক ধরনের দেশ বলিয়া মনে করাই ভুল। প্রকৃতপক্ষে, অর্থনীতির দিক দিয়া রুশিয়া ছিল অনুন্নত।

মনে রাখিতে যইবে, শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে, ভারতবর্ষ ও বিপ্লবের পূর্বেকার রাশিয়ার মধ্যে যে পার্থক্যই থাকুক না কেন উহা গুণগত নহে এবং রুশ বিপ্লবের সমস্ত অভিজ্ঞতাই ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।' (মার্কস-বাদী, ৩য় সংকলন, পৃ ৯০-৯১)

অন্ধ্র নেতৃত্বের বিরুদ্ধে পলিট ব্যুরোর অভিযোগ : তাঁরা নিজেদের ভ্রান্ত নীতির সমর্থনে মাও সে তুং-এর রচনা থেকে কতকগুলি উদ্ধৃতির সাহায্য নিয়েছেন। কারণ তাঁরা মনে করেন,

'মার্কসবাদ কোনো গোঁড়া মতবাদ নহে। ইহা এমন একটি বিজ্ঞান যাহা আমাদের কর্মপন্থা পরিচালনার শক্তি যোগায়। অক্টোবর বিপ্লবের পর এই দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের মধ্যে বিভিন্ন দেশে, উপনিবেশে আধা-উপনিবেশে বিপুল

বিপ্লবী সংগ্রাম চলিয়াছে। তাহারা আমাদের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা দেয়। এইযুগে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভাণ্ডারে অত্যন্ত মূল্যবান শিক্ষাসমূহ জমা হইয়াছে। ঐতিহাসিক চীনা মুক্তি সংগ্রামের নেতা মাও তাঁহার অপূর্ব, বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের ফলে নয়া গণতন্ত্রের তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশে সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হইবার বিপ্লবী সংগ্রামের ইহা এক নূতন রূপ। শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেণী-প্রভুত্ব ডিক্টেটরী হইতে স্বতন্ত্র নূতন গণতন্ত্রের তত্ত্ব মাও প্রচার করিয়াছেন।'

এ প্রসঙ্গে পলিট ব্যুরোর মন্তব্য :

'প্রথমেই এই কথাটি জোরের সহিত বলিতে চাই যে, মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্টালিনকেই ভারতের কমিউনিস্টরা প্রামাণ্য হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহাদের ছাড়া মার্কসবাদের অন্য কোন নতুন উৎস তাঁহারা আবিষ্কার করেন নাই এবং মার্কসবাদের নূতন অবদান বলিয়াও উহাকে ঘোষণা করেন নাই। নয়টি কমিউনিস্ট পার্টির সম্মেলনে মার্কসবাদের এই নূতন সংযোজনার উল্লেখও করা হয় নাই। মার্কসবাদীদের একটি সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য সম্মেলনে যাহাকে গ্রহণের উপযুক্ত বলিয়া ঘোষণা করিল না, সেই নূতন আবিষ্কারকে সুপারিশ করিবার দায়িত্ব এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় কমিটি নেতৃত্বের একাংশের গ্রহণ করা অত্যন্ত অন্যায়। এই ধরনের নির্দেশ দানের পূর্বে, এই অবদান সম্পর্কে নূতন মনোভাব গ্রহণের পূর্বে অন্ধ্র সেক্রেটারিয়েটের দশবার চিন্তা করা উচিত ছিল। কারণ, হাল্কাভাবে নূতন অবদান ও আবিষ্কারের কথা বলা কমিউনিস্টদের চলিবে না, কারণ এই ধরনের দাবী বহুবার প্রচ্ছন্ন বিকৃতি বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে (টিটো, ব্রাউডার ইত্যাদি)।' (মার্কস-বাদী, ৩য় সংকলন, পৃ ১১৫-১১৬)

ষোলো

দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে আলোচনা প্রসঙ্গে কয়েকজন কমরেড মন্তব্য করেন যে, খসড়া রাজনৈতিক প্রস্তাব বা থিসিসের কলেবর বিরাট এবং তাতে বহু বিষয় বিক্ষিপ্ত আকারে স্থান পেয়েছে। তাছাড়া দলিলটির ভাষাও যথেষ্ট ঋজু নয়। এই দলিলে ভারতের বিপ্লবের বর্তমান স্তর, রণনীতি-রণকৌশল ও লড়াইয়ের পদ্ধতি নিয়ে পরস্পরবিরোধী ব্যাখ্যার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। বস্তুত 'অন্ধ্র দলিল' তার একটা নিদর্শন।

অতএব 'অন্ধ্র দলিলে'র জবাবে ও রাজনৈতিক থিসিসের পরিপূরক হিসেবে, পলিট ব্যুরো ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বরে 'ভারতের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের রণনীতি ও রণকৌশল' শীর্ষক দলিল উপস্থিত করেন। পলিট ব্যুরো গৃহীত এই নতুন লাইনের সারমর্ম :

১. 'দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রস্তাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তির ভূমিকা ও অবস্থান সম্পর্কে যে বিশ্লেষণ ও ভবিষ্যদ্‌বাণী করা হয়েছিল, কংগ্রেসের পরবর্তী আটমাসের ঘটনাবলি তাকে সত্য বলে প্রমাণ করেছে। অর্থনৈতিক সংকট মাসে মাসে তীব্রতর হয়েছে এবং অবশেষে বুর্জোয়া শ্রেণী ও তাদের গভর্নমেন্ট একেবারে সংকটের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে।

এই সংকটের সমাধান করা পুঁজিবাদীদের দ্বারা সম্ভবও নয়; ফলত নূতন সংঘাত বেধে উঠছে। এরই ফলে গত ক'মাসে সৃষ্টি হয়েছে সংগ্রামের উত্তাল তরঙ্গ। এইসব সংগ্রামের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয়েছে বর্বর দমননীতি (কেরালা, তামিলনাড, অন্ধ্র, পশ্চিমবঙ্গ); শ্রমজীবী মানুষের উপর নেমে আসছে ফ্যাসিস্ট বিভীষিকার তাণ্ডব।

এক নতুন বৈশিষ্ট্য এসব লড়াইয়ের বেলায় পরিলক্ষিত হয়। শুধু যে চরম অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্য থেকে এই লড়াই দানা বাঁধছে তা নয়; কংগ্রেস সরকার সম্পর্কে দ্রুত মোহমুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই লড়াইয়ের আগুন জ্বলে উঠছে এবং সোজাসুজি কংগ্রেস সরকারকে অমান্য করে শ্রমজীবী মানুষ লড়াইয়ে নেমে পড়ছে। দমননীতির জবাবে বারংবার জঙ্গী লড়াই বেধে উঠছে। আগেকার অবস্থায় এই দমননীতির দশভাগের একভাগেই জনতার মনোবল ভেঙে পড়ত। কিন্তু এখন এই চণ্ডনীতি জনতার ঘৃণার উদ্রেক করে; লড়াইয়ের মনোবল দৃঢ়তর হয়। জনতার প্রতিরোধ ক্ষমতা পরিমাপের পুরানো মাপকাঠি ধুলোয় মিশে গেছে। যারা পদে পদে ভয় পায়, নির্বিরোধ নির্ঝঞ্ঝাট জীবনের মোহ যাদের পিছনে টেনে রাখে—জনতা আর সেই পুরানো জনতা নেই।

বর্তমান সময়ে আংশিক সংগ্রামগুলি তাই ব্যাপক গণসংগ্রামে পরিণত হচ্ছে, পরিণত হচ্ছে জঙ্গী লড়াইতে—যা ছোটখাট গৃহযুদ্ধের রূপ নিচ্ছে। আগেকার স্থায়িত্বের যুগের মতো, আজ আর আংশিক এবং রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্যে কোন চীনের প্রাচীর দাঁড়িয়ে নেই।

২. 'বিপ্লবের অবস্থা এবং রণনীতির লক্ষ্য অনুযায়ী সংগ্রাম পদ্ধতি স্থির হয়: বুর্জোয়া শ্রেণীর পতন ঘটানোর উদ্দেশ্য এবং বিপ্লবী সময়ের অস্তিত্ব ও দ্রুত পরিবর্তনশীল বৈপ্লবিক ঘটনাবলী আমাদের জঙ্গী এবং বৈপ্লবিক ধরনের সংগ্রাম ও সংগঠনের আশ্রয় নিতে বাধ্য করে। তাই ধর্মঘট, কৃষক-সংগ্রাম, সশস্ত্র সংঘর্ষ, সাধারণ ধর্মঘট, রাজনৈতিক ধর্মঘট প্রভৃতি সবকিছু সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দিকে এগিয়ে যায়—এই পরিস্থিতিতে এসবই হল সংগ্রামের ধরন ও পদ্ধতি।

কিন্তু এইসব সংগ্রাম পদ্ধতিই সমস্ত কিছু নয়, এর বাইরেও আছে। আমরা এখনও আইনসভায় যাই—নির্বাচনে অংশ নিই, ডেপুটেশন এবং শোভাযাত্রার নেতৃত্ব করি, শিল্প-বিরোধ মীমাংসার জন্য ট্রাইব্যুনালের আশ্রয় নিই, ত্রিদলীয় সম্মেলনে যোগ দিই এবং ইউনিয়নের সাধারণ সভা থেকে আরম্ভ করে গভর্নমেণ্টের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন, সমালোচনা ও আক্রমণ করে

রাজনৈতিক সভা করি। গ্রুপ মিটিংও বাদ দিই না। পরিস্থিতি বিপ্লবী সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ হলেও প্রতিবাদ আন্দোলন এবং সংগ্রামের প্রাথমিক ও মৌলিক ধরন এবং পদ্ধতি আমরা বাদ দিতে পারি না।

৩. কারণ, পরিস্থিতি বিপ্লবী সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ হলেও সকল স্থানের জনগণ একই প্রকার দ্রুততায় এবং সচেতনভাবে শিখতে বা এগোতে পারবে না। কোথাও কোথাও জনগণ ইতিমধ্যেই প্রস্তুতির স্তর ত্যাগ করে চরম দৃঢ়তার সঙ্গে সংগ্রাম ঘোষণা করতে দৃঢ়সঙ্কল্প। নিঃসন্দেহে তারা বুঝেছে যে গভর্নমেন্টের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। আবার কোথাও জনগণ কোনো আশু সমস্যা অথবা জমি ও বেতনের মৌলিক প্রশ্নের উপর সংগ্রাম আরম্ভ করতে চায়; কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেরই বুঝতে বাকী আছে যে, তাদের সংগ্রাম কোন জমিদারদের বিরুদ্ধেই নয়, এই শাসনের বিরুদ্ধেও। সংগ্রাম যত ঘনিয়ে উঠবে, ততই তারা আশ্চর্য রকম দ্রুততার সঙ্গে সেই সত্য উপলব্ধি করে খণ্ড সংগ্রামের প্রচণ্ড প্রতিরোধ গড়ে তুলবে এবং বুঝতে পারবে যে, এই শাসনের অবসান করতেই হবে। এইভাবে দ্রুততার সঙ্গে খণ্ড সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে জনগণ রাজনৈতিক সংগ্রামের স্তরে পৌঁছাতে শেখে এবং তাদের রাজনৈতিক চেতনা বিকশিত হয়।

মোহমুক্তি এবং চেতনার এই অসমান গতি, জনগণের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার অসমানতা, বিভিন্ন প্রদেশ ও এলাকায় জনগণের বিভিন্ন অংশের মধ্যে শ্রমিকশ্রেণী এবং তাদের পার্টির ঐক্যবদ্ধ শক্তি ও প্রভাবের অসমানতা এবং শেষ পর্যন্ত বুর্জোয়া নেতৃত্বের প্রভাব—এই সমস্ত কিছুর সংমিশ্রণে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে, শ্রমিকশ্রেণীকে সংগ্রামের অত্যন্ত প্রাথমিক ধরন ও পদ্ধতি থেকে আরম্ভ করে অত্যন্ত বিপ্লবী ধরন এবং পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। এই বিভিন্ন ধরনের সংগ্রামের উদ্দেশ্য হবে দ্রুততার সঙ্গে জনগণকে এমন জায়গায় আনা, যেখানে তারা নিজেরাই এই শাসনের উচ্ছেদের জন্য কমিউনিস্টদের ডাকে সাড়া দেবে।

এই কারণেই আমরা দেখতে পাই, তেলেঙ্গানায় সামন্ত-শাসনের বিরুদ্ধে কৃষকেরা সশস্ত্র সংগ্রাম করছে, বিপ্লবী কমিটি জমি বাজেয়াপ্ত এবং বণ্টন করে বৈপ্লবিক পন্থায় জমি সমস্যার সমাধান করছে এবং জনগণের নূতন ক্ষমতার কাঠামো হিসাবে কাজ করছে।

'আবার দেখতে পাচ্ছি, কলকাতা এবং বোম্বাইয়ে অত্যন্ত সাধারণ রকমের ধর্মঘট হচ্ছে এবং শিল্প-বিরোধ-মীমাংসা ট্রাইব্যুনালে যোগ দেওয়া হচ্ছে। একদিকে কেরালায় চলেছে কৃষকদের প্রচণ্ড প্রতিরোধ, আর অন্যদিকে অন্যান্য প্রদেশে চলেছে কৃষকদের অতি মামুলি সভা ও বৈঠক। ফিরোজাবাদে ক্রুদ্ধ শ্রমিকরা কারখানা দখল করছে আর অন্যত্র শ্রমিকরা অত্যন্ত সাধারণ সুযোগ সুবিধা মেনে নিচ্ছে।

৪. যুগটা বিপ্লবের, কাজেই আমরা জানি যে, অত্যন্ত প্রাথমিক সংগ্রামও এমন সব শক্তিকে সক্রিয় করে তুলবে, যার ফলে জনগণ তাদের বর্তমান

চেতনাকে পরাভূত করে এগিয়ে যাবে। তাই আজ আমরা অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সংগ্রামের মাঝে চীনের প্রাচীর খাড়া করি না।

তবুও চেতনার অসমানতার কথাও আমাদের বিবেচনা করতে হবে এবং সংগ্রামীদের চেতনার সঙ্গে মিলিয়ে সংগ্রামের ধরন এবং পদ্ধতি ঠিক করতে হবে। আমাদের বুঝতে হবে, এই অসমানতার কারণ বুর্জোয়ারা এখনও প্রচুর প্রভাব বিস্তার করে আছে এবং শ্রমিকশ্রেণীর প্রভাব অসমান। বুর্জোয়াদের বিচ্ছিন্ন করার সংগ্রামই হচ্ছে অসমানতাকে পরাভূত করে জনগণকে অগ্রবর্তী অংশের চেতনার স্তরে পৌঁছে দেবার সংগ্রাম। সেই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই জনগণ বুঝতে পারবে যে, বিপ্লবী সংগ্রামের দ্বারা বর্তমান সমাজ কাঠামোর উচ্ছেদ ছাড়া বর্তমান অবস্থার হাত থেকে অব্যাহতি নেই।' (মার্কসবাদী, ৩য় সংকলন, পৃ ৭৫-৭৮)

পরবর্তীকালে পি. বি.-র এই রাজনৈতিক লাইনের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়—রুশ বিপ্লবের যান্ত্রিক অনুকরণের এক চরম নিদর্শন এই 'রণনীতি-রণকৌশল' শীর্ষক দলিলটি: 'ধর্মঘট, কৃষকের লড়াই, সাধারণ ধর্মঘট, রাজনৈতিক ধর্মঘট, উন্নত ধরনের লড়াই, তারপর অভ্যুত্থান ও ক্ষমতা দখল এবং এই পথ ধরে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ—এভাবে স্টালিনীয় সংজ্ঞার চৌহদ্দির মধ্যে এক ছকে-বাঁধা রণনীতি পার্টি র‍্যাঙ্কের সামনে হাজির করা হয়। কাগজে কলমে নিখুঁত এক বিপ্লবের ছক।' (এম. বি. রাও, ডক্যুমেন্টস, খণ্ড ৭, ভূমিকা)

আবার গণ-অভ্যুত্থান শুরু হয়েছে এবং বৈপ্লবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে—পলিট ব্যুরোর এই মূল্যায়নের সঙ্গে সেদিন সবাই একমত হতে পারেননি। যদিও পার্টি শৃঙ্খলা ও নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্যের খাতিরে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও কমরেডরা এই নতুন লাইন (রণনীতি ও রণকৌশল) বাস্তবায়িত করার জন্যে সর্বস্ব পণ করেছিলেন।

কমল চ্যাটার্জি (চন্দননগর) বলছেন, 'ভারতবর্ষের পরিস্থিতি ও রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্রের ভুল বিশ্লেষণের দৌলতে—এই লাইন। ১৯৪৬ সালের সত্যিকারের অভ্যুত্থানের সময় তো জোশীর নেতৃত্বে পার্টি কোন নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করতে পারেনি। একটা ভুল শুধরে আরেকটা ভুলের দিকে পা বাড়াল পার্টি। শেষ পর্যন্ত আমরা বাম সংকীর্ণতাবাদী লাইনে চলে গেলাম।'

কুমুদ বিশ্বাস বলেন, ''ট্যাকটিক্যাল' (রণকৌশলগত) লাইন পড়ে দেখলাম পাঁচ জায়গায় পাঁচ রকম লেখা রয়েছে। বীরেন রায় এটা 'পয়েন্ট আউট' করেন (দেখিয়ে দেন)।'

অজয় দাশগুপ্ত বলেন, 'রণনীতি ভুল কি ঠিক বুঝতে পারছি তা নয়। রণকৌশল যে ভুল হচ্ছে, সেটা বুঝতে পারছি। গোড়া থেকেই আমি রণ-কৌশলগত লাইন নিয়ে সন্দেহ করতে শুরু করলাম।'

বীরেন রায় বলেন, 'রণকৌশলগত লাইন-এর দলিল হাতে আসার পর আমরা জনাকয়েক কমরেড এর রাজনৈতিক সঠিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলি। পরে জানতে পারি চীনের কমরেড চু তে-ও দক্ষিণ কলকাতা 'মুক্ত' হওয়া ইত্যাদির সত্যতা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন। আসলে বে-আইনী অবস্থায় রাজনৈতিক হঠকারী লাইন চালু করার সুযোগ বেশি থাকে—যেহেতু কমরেডরা আলাদা আলাদা ডেন-এ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বাস করেন। পার্টি কংগ্রেসের পর একবারও কেন্দ্রীয় কমিটির সভা বসেনি। সি. সি.-র সমস্ত ক্ষমতা চলে গেল পি. বি.-র হাতে। সি. সি. সদস্যারা এক-একটি ডেন-এ বিচ্ছিন্ন।'

অজয় ঘোষ মনে করেন,

'পলিট ব্যুরোর দলিলে কিছু সঠিক বক্তব্যও ছিল। যেমন, জনগণের ঐক্য চাই—শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য গড়ে তুলতে হবে ইত্যাদি। কিন্তু এসব সিদ্ধান্ত কখনো বাস্তবায়িত হয়নি।

কারণ, সঠিক কৌশলের ভিত্তিভূমি হচ্ছে—আন্দোলনের স্তর সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ন, পরিস্থিতির যথার্থ বিশ্লেষণ এবং বিভিন্ন শ্রেণী-শক্তির বিন্যাস সম্পর্কে সঠিক ধারণা। এই বিশ্লেষণ থেকেই কর্তব্য নির্ধারিত হয়। যদি বিশ্লেষণ ভুল হয়—তাহলে কাজের তালিকা তৈরি করেও—সেগুলির উপর যথোচিত গুরুত্ব দেওয়া হবে না বা ভুল পদ্ধতিতে সেগুলি করা হবে।'

রণদিভের যুক্তি হচ্ছে, 'সরকার জনগণ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন, সংস্কারবাদীদের স্বরূপও উদ্ঘাটিত ; অতএব ভারতজোড়া অভ্যুত্থানের পরিস্থিতি তৈরি। জনগণ শুধু সাহসী নেতৃত্বের অপেক্ষায়। পরিস্থিতি সম্পর্কে এহেন মূল্যায়ন থেকে সংকীর্ণতাবাদী স্লোগান ও হঠকারী কৌশলের উদ্ভব অনিবার্য। যার অর্থ হচ্ছে, করণীয় যা কিছু সরাসরি আঘাত হেনে করার চেষ্টা চলবে।' (এম. বি. রাও, ডক্যুমেন্টস, পৃ ৯৯৫)

১৯৪৮ সালের ডিসেম্বরে ঘোষিত 'রণনীতি ও রণকৌশল'-এর লাইন গোটা পার্টিকে নিয়ে এল সরাসরি লড়াইয়ের ময়দানে। ভারতের রাষ্ট্রশক্তি বনাম কমিউনিস্ট পার্টি ও তার অনুগামীদের এক অসম যুদ্ধ শুরু হল এবং এই যুদ্ধ গোটা ১৯৪৯ সাল বরাবর চলতে থাকে।

সতেরো

৯ই মার্চ, ১৯৪৯—নেহরু সরকার ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে মুখোমুখি সংঘাতের দিন। উপলক্ষ্য সারা ভারত রেল ধর্মঘট।

সেদিনের কথা এখনও সত্যেন গাঙ্গুলীর স্মৃতিতে ভাস্বর। সেদিনের রেল শ্রমিক নেতা সত্যেন গাঙ্গুলী বলছেন, 'রেল শ্রমিকদের দাবি একশ টাকা মূল বেতন। এই দাবি করার জন্যে নাগপুরে ফেডারেশনের জেনারেল কাউন্সিলের সভায় ৯ই মার্চ রেলে সাধারণ ধর্মঘটের প্রস্তাব পাশ হয়। কিন্তু

রেলওয়ে মেনস্ ফেডারেশনের জয়প্রকাশ নেতৃত্ব ধর্মঘটের পথে গেল না। তখন আমরা কলকাতায় পাল্টা সংগঠন এ. আই. আর. ডব্ল্যু. এফ. (অল ইণ্ডিয়া রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ফেডারেশন) গড়ে তুলি। ৯ই মার্চ তারিখেই ধর্মঘট হবে স্থির হল।

পরের দিন ফেডারেশনের জেনারেল কাউন্সিলের সভায় আমাদের পাঁচটা বড় ইউনিয়নকে (সভ্য সংখ্যা ১ লক্ষ ২০ হাজার) ফেডারেশন থেকে বিতাড়িত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। তারপর শুরু হল আমাদের একলা চলা। কিন্তু ৯ই মার্চ ধর্মঘট হবে—এই বিশ্বাসে আমরা ভরপুর। আমাদের ডাকে শ্রমিক শ্রেণী নিশ্চয়ই সাড়া দেবে। কারণ, বিপ্লবের লগ্ন সমাগত।'

২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৯, পার্টি সভ্যদের কাছে প্রেরিত এক সার্কুলারে গোটা পার্টিকে সর্বস্ব পণ করার ডাক দিলেন পলিট ব্যুরো। ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে গৃহীত 'রণনীতি ও রণকৌশলে'র লাইন সার্কুলারটির প্রতিটি ছত্রে প্রতিফলিত। ৯ই মার্চের রেল ধর্মঘটেই ঘটবে বৈপ্লবিক রণ-কৌশলের বাস্তব প্রয়োগ। অতএব তাকে সফল করা প্রতিটি পার্টি সভ্যের অবশ্য পালনীয় বৈপ্লবিক কর্তব্য। পি. বি. সার্কুলারের মূল বক্তব্য :

১. এই ধর্মঘট আসলে সরকার ও পুঁজিপতিদের চ্যালেঞ্জের জবাব। পুঁজিবাদী সংকট থেকে উদ্ভূত বৈপ্লবিক সংগ্রামের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ এই ধর্মঘট। এই লড়াই শ্রমিক শ্রেণীর অনুকূলে সংকটের ফয়সালা ঘটাবে এবং উচ্চতর ধাপে গিয়ে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে রূপান্তরিত হবে।

২. শ্রমিকের শক্তি ও তার বিক্ষোভের তীব্রতাকে কমিয়ে দেখা এবং বিশেষ করে রেল শ্রমিকদের মধ্যে আমাদের প্রভাব লঘু করে দেখার প্রবণতা যে পার্টি র‍্যাঙ্ক-এর মধ্যে রয়েছে—সে সম্পর্কে পি. বি. অবহিত। কারণ, পার্টি নেতাদের বেশির ভাগই এসেছেন পেটি বুর্জোয়া শ্রেণী থেকে। তাঁরা বুর্জোয়া সংবাদপত্রের বিষাক্ত সংবাদগুলি গলাধঃকরণ করে থাকেন এবং সহজেই শ্রমিকের উপর আস্থা হারিয়ে বসেন। আসল ছবিটা কী? ছবি হচ্ছে—আমাদের শক্তি অসামান্য। যদি আমরা শ্রমিকদের ময়দানে নামাতে পারি, শুধু যে বেশ ক'টি রেলওয়েতে ধর্মঘট করাতে পারবো তা নয়—প্রায় সব জায়গায় আমরা রেলের চাকা বন্ধ করে দিতে পারব। কারণ যখন সোশ্যালিস্ট প্রভাবাধীন শ্রমিক ও অন্যান্যরা শুনবে যে আমাদের লোকজন দলে দলে লড়াইয়ে নেমে গিয়েছে, তারাও তখন ধর্মঘট শুরু করে সংগ্রামী ভাইদের শক্তিবৃদ্ধি ঘটাবে।

৩. এই অবস্থা সৃষ্টি করার জন্যে পার্টিকে স্থানীয়ভাবে নতুন নতুন ক্যাডার পাঠাতে হবে। প্রাদেশিক কমিটি নিশ্চয় লক্ষ্য রাখবেন যাতে জেলাকমিটি-গুলির কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্য প্রকাশ্যে বেরিয়ে এসে ধর্মঘটে সরাসরি নেতৃত্ব দেন এবং ক্যাডারদের কাজকর্ম তদারক করেন। জেলা ও প্রাদেশিক

নেতারা নিশ্চয় সকলে ধরা দেবেন না ; কয়েকজনকে কিন্তু গ্রেপ্তারের ঝুঁকি নিয়েও কাজ করতে হবে। বিভিন্ন বস্তিতে ছোট ছোট বৈঠক তো বটেই —দরকার হলে তাঁরা জনসভায়ও বক্তৃতা করবেন। যাতে অকুস্থলে থেকে কাজের ভুলভ্রান্তিগুলি সংশোধন করতে পারেন—এভাবে তাঁরা আচরণ করবেন। কলকাতার মতো জায়গায় জেলা কমিটির বেশ কিছু সদস্যকে শুধু শহরের আশেপাশে নয়—দরকার হলে আসানসোল ও লিলুয়াতে গিয়েও কাজ করতে হবে।

৪. প্রচার আন্দোলনকে এমন চড়া পর্দায় তুলতে হবে যাতে আমাদের দুর্বল ঘাঁটি অথবা সোশ্যালিস্ট প্রভাবাধীন এলাকার শ্রমিকরাও আমাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলে ওঠে : নেহরু সরকার নিপাত যাক্। শ্রমিক কৃষক সরকার কায়েম কর। নেহরু - প্যাটেলকে টাটা বিড়লার দালাল বলেই যেন আমরা সব জায়গায় চিহ্নিত করতে পারি—এভাবেই বক্তৃতা করতে হবে।

৫. সোশ্যালিস্ট প্রভাবাধীন মজুরদের ধর্মঘটে নামাবার জন্যে তাদের কাছে আবেদন জানাতে হবে—এটাও যেমন ঠিক, আবার যদি কোন সোশ্যালিস্ট মজুর ধর্মঘট ভাঙার কাজে তৎপরতা দেখায়—তাহলে তাকে 'দালাল' ডাকতে আমরা যেন কসুর না করি।

৬. শ্রমিকশ্রেণীর অন্যান্য অংশের মধ্যে সংহতির আন্দোলন তুমুলভাবে গড়ে তুলতে হবে,—যাতে কলকাতা ও বোম্বাইয়ের মতো জায়গায় শ্রমিকরা দলে দলে এমনকি ১৪৪ ধারা অমান্য করেও কলোনিতে গিয়ে সমর্থন জানিয়ে আসে। যদি সম্ভব হয় ৯ই মার্চের ঠিক আগে অন্যান্য কলকারখানার শ্রমিকদেরও রেল শ্রমিকদের সমর্থনে অথবা নিজেদের দাবি-দাওয়া নিয়ে ধর্মঘটে নামতে হবে।

৭. রেল শ্রমিকদের লড়াই আসলে ভারতজোড়া বৈপ্লবিক সংঘাতের অংশ-বিশেষ। এই লড়াই ভাল করে জমাট বাঁধলে, তা যে কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছতে পারে। এমনকি কলকাতার মতো শহরে স্থানীয়ভাবে এই লড়াই অন্যরকম পরিবেশও সৃষ্টি করতে পারে। এই লড়াইকে আজ সমস্ত শ্রমিকের লড়াই এবং আগামী দিনে তাকে সমগ্র জনতার লড়াইয়ে পরিণত করাই হবে আমাদের নীতি।

৮. এই লড়াইয়ে লড়াকু শ্রমিকের মেজাজ যতই চড়তে থাকবে—তখন কোন রকমের আইনকানুন মানার দরকার নেই। শান্তিপূর্ণভাবে গ্রেপ্তার বরণেরও প্রশ্ন ওঠে না। আমাদের যা কিছু আছে তা দিয়েই পুলিশি হামলার জবাব দিতে হবে। কলোনি ও রেল কোয়ার্টারের চারপাশে ব্যারিকেড গড়ে তুলতে হবে। রেল শ্রমিকের উপর আক্রমণকে মোকাবিলা করার জন্যে সমস্ত শ্রমিক ও সাধারণ মানুষকে ডাক দিতে হবে। শ্রমিকের উপর হামলা সশস্ত্র উপায়ে হলেও রুখতে হবে। এমনকি আক্রান্ত হবার আগেই আমরা আক্রমণ চালাব। তাহলে অপ্রস্তুত অবস্থায় আক্রান্ত হয়ে শত্রু হকচকিয়ে যাবে।

৯. প্রতিটি পার্টি কমিটি অথবা ধর্মঘট কমিটি অবশ্যই সশস্ত্র বাহিনীকে

আবেদন জানাবেন। পুলিশ ও মিলিটারির জোয়ানদের লক্ষ্য করে বলতে হবে ' 'শ্রমিকদের গুলি করো না। তোমাদের উপর যারা নিপীড়ন চালাচ্ছে তোমাদের বন্দুক তাদের বিরুদ্ধে ঘুরিয়ে ধরো। অফিসারদের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নাও।' দেখতে হবে যাতে রেল শ্রমিক ধর্মঘটের পাশা-পাশি পুলিশ ধর্মঘট সংগঠিত করা যায়।

১৮ই-১৯শে জানুয়ারির কলকাতার অভিজ্ঞতা হচ্ছে পুলিশের মধ্যে দোদুল্যমানতা দেখা দিয়েছিল। তারা ছাত্রদের উপর গুলি চালায়নি। সেনাবাহিনী ডাকতে হয়েছিল। এই হচ্ছে সময়—যখন এসব সম্ভব।

১০. পরিস্থিতি এখন এমন যে, বহু জায়গায়, শহরে ও গ্রামে, লড়াই সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের আকারও নিতে পারে। সেই লড়াইয়ের নেতৃত্ব দেবার জন্যে আমাদের তৈরি থাকতে হবে। যে-সব জায়গায় রেল শ্রমিকদের মধ্যে আমাদের জোরালো প্রভাব বর্তমান এবং তার পাশাপাশি রয়েছে কৃষক আন্দোলনের শক্তিশালী ঘাঁটি—এদুটোর সমন্বয়ে সেখানকার লড়াই তেলেঙ্গানার পর্যায়ে পেঁছাবে। বেশ কয়েকমাস আমরা সেই লড়াই টিঁকিয়ে রাখতে পারব।

কেবল প্রতিরোধ চালিয়ে এবং সর্বত্র সরকারি প্রশাসন-যন্ত্রকে বিকল করে, অর্থাৎ তার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে আমরা তেলেঙ্গানার লড়াইকে মদত যোগাতে পারি। একটি মোক্ষম রেল ধর্মঘট তেলেঙ্গানার শত্রুদের মেরুদণ্ড চুরমার করে দেবে এবং তারা পালাবার পথ পাবে না। তাহলে তেলেঙ্গানার লড়াই—আমাদের কমরেডদের পক্ষে হায়দ্রাবাদের অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে দেওয়া সহজতর হবে।

১১. সংঘর্ষ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে সুপরিচিত কমিউনিস্টদের শ্রমিকদের পুরোভাগে থাকতে হতে পারে ; যাতে শ্রমিকরাও বুঝতে পারে যে কমিউনিস্টরা তাদের সঙ্গে রয়েছে। যারা এড়িয়ে যাবে—যারা দোদুল্যমানতা দেখাবে—তারা হবে পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধে অপরাধী।

এই প্রথম, সংঘাতের মাধ্যমে আমাদের প্রতিটি পার্টি সভ্যের সাহস ও জঙ্গী বীরত্বের পরীক্ষা হবে। পার্টির প্রতি তাদের আনুগত্য ও সংগঠনী ক্ষমতা এবং প্রতিটি পার্টি ইউনিটের নেতৃত্বদানের যোগ্যতা এই লড়াইয়ের মাধ্যমে পরীক্ষিত হবে। আমরা কীভাবে নেতৃত্ব দিই, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে কীভাবে লড়াইয়ে ঝাঁপ দিই তার উপর নির্ভর করছে আগামী কয়েকমাসের মধ্যে হাজারে হাজারে শ্রমিক আমাদের দিকে চলে এসে—আমাদের পার্টিকে ভারতের শ্রমিক শক্তির বৃহত্তম দুর্গে পরিণত করবে, না বর্তমানে যা রয়েছে সেই অকিঞ্চিৎকর শক্তি হিসাবেই আমাদের পার্টি শুধু অস্তিত্ব রক্ষা করে চলবে। (রেলওয়ে ধর্মঘট বিষয়ে পার্টির পলিট ব্যুরো-র সার্কুলার। ডক্যুমেন্টস, খণ্ড ৭, পৃ ৬১৬-৪৬)

পি. বি. সার্কুলারটি যেন পার্টি র‍্যাঙ্কের কাছে আসন্ন বিপ্লবের বার্তা বয়ে এনেছে। পি. বি-র ধারণায় পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ। অতএব ৯ই মার্চ

উপলক্ষ্যে অনেক কিছু ঘটার সম্ভাবনা—একটা বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের সময় যা ঘটে। শহরের রাস্তায় পুলিশ ও মিলিটারির বিরুদ্ধে শ্রমিকের সশস্ত্র লড়াই, পুলিশ বিদ্রোহ এবং একাধিক তেলেঙ্গানা সৃষ্টির সম্ভাবনাকেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পরিস্থিতির এই ব্যাখ্যার উৎস কী? নেতাদের সামনে তখন ১৮ই-১৯শে জানুয়ারির কলকাতার দৃষ্টান্ত। তার মধ্যে কি তাঁরা পাঠ করেছেন আসন্ন বিপ্লবের সংকেত!

১৮ই ও ১৯শে জানুয়ারি কলকাতায় যা ঘটেছিল তার কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে নৃপেন ব্যানার্জির স্মৃতিচারণায়। তিনি বলছেন, 'উনপঞ্চাশ সালের গোড়ার দিকে পরিস্থিতি আবার বদলাতে থাকে। নেহরু এলেন সারিপুত্ত ও মোগল্লায়নের অস্থি সংরক্ষণের ব্যাপারে। সে-উপলক্ষে প্রথম ঘটল শিয়ালদহের কাছে রিফিউজি মিছিল এবং তার উপর চলল লাঠিচার্জ। তার প্রতিবাদে ছাত্র-মিছিল। নেহরুর খাতিরে পুলিশ যেন বেশি মাত্রায় সক্রিয়। এমনকি রাস্তায় আর্মার্ড কার-ও দেখা গেল।'

কলকাতার রাস্তায় আবার পরিচিত দৃশ্য—রাস্তায় ট্রাম আর জলের ট্যাংক দিয়ে ব্যারিকেড। বস্তির ছেলেরা আবার পুলিশের সঙ্গে লড়ছে।

সরোজ চক্রবর্তী লিখছেন:

'ছাত্র হাঙ্গামার প্রচণ্ডতার মধ্য দিয়ে ১৯৪৯ সাল শুরু। পরে সেটা দৈনন্দিন ব্যাপারে গিয়ে দাঁড়ায় আর কলকাতার মানুষের গা-সওয়া হয়ে যায়। জানুয়ারিব তৃতীয় সপ্তাহে শিয়ালদহ অঞ্চলে বাস্তুহারা মিছিলের বিরুদ্ধে পুলিশ কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ করে। তার প্রতিবাদে ১৮ই জানুয়ারি বিশ্ব-বিদ্যালয়-চত্বরে ছাত্ররা বিক্ষোভ দেখায়। ১৪৪ ধারা অমান্য করে ছাত্র মিছিল রাইটার্স বিল্ডিং-এর দিকে যাবার চেষ্টা করলে হাঙ্গামা বাধে। বেলা আড়াইটে থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চলে জোর হাঙ্গামা চলতে থাকে। ন'টি ট্রাম পুড়ে যায়; পুলিশের গুলিতে চারজন নিহত ও পনের জন আহত হয়। পরের দিন প্রায় দু'হাজার ছাত্র ও বাস্তুহারা মিলে পুলিশ মর্গে হানা দিয়ে গত দিনে গুলিতে মৃতদের দেহ দাবি করে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আশেপাশে তখন পুলিশের উপর বোমা ও ইট অবাধে ছোঁড়া হতে থাকে। এদিনও পুলিশের গুলিতে পাঁচজনের মৃত্যু ঘটে। ট্রাম ও স্টেট বাস আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। পাঁচটি স্টেট বাস ও দশটি ট্র্যাম পুড়ে ছাই হয়ে যায়। (প্রসঙ্গত ১৯৪৮ সালের ৩১শে জুলাই কলকাতার রাস্তায় প্রথম স্টেট বাস চলতে থাকে)। সেদিন শ্রমমন্ত্রী কালীপদ মুখো-পাধ্যায়ের বাড়িতেও অগ্নিসংযোগ করা হয়।

পরিস্থিতি পুলিশের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এবং ডাঃ রায়কে সামরিক বাহিনীর শরণ নিতে হয়।' (উইথ ডাঃ বি. সি. রায়, পৃ ১১৩-১৪)

আঠারো

সরকার ধর্মঘট বানচাল করতে বদ্ধপরিকর। ৯ই মার্চ রেল ধর্মঘট ডাকার পেছনে তারা কমিউনিস্টদের বিপ্লব-বাসনা দেখতে পেয়েছে।

পণ্ডিত নেহরু ২৮শে ফেব্রুয়ারি পার্লামেন্টের সদস্যদের কাছে বলেন: 'সদস্যগণ নিশ্চয় জানেন যে ভারত সীমান্তের অপর প্রান্তে কমিউনিস্ট বিপ্লবের সূচনা হইয়াছে; সেই একই নীতি অনুসরণ করিয়া ভারতেও জনসাধারণকে সক্রিয় বিপ্লবের জন্য প্ররোচনা দেওয়া হইয়াছে।'

শ্রীযুক্ত দেশবন্ধু গুপ্ত (উত্তর প্রদেশ)-এর প্রশ্নের জবাবে পণ্ডিত নেহরুর বিবৃতির মূল অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে:

'কমিউনিস্ট পার্টির বহু বিশিষ্ট সদস্য আত্মগোপন করিয়াছে এবং বিভিন্ন স্থানে বিশেষভাবে রেলওয়ে ব্যবস্থায় নাশকতামূলক কার্য্য চালাইবার জন্য সংঘবদ্ধভাবে চেষ্টা করা হইতেছে, এরূপ পর্য্যাপ্ত প্রমাণও সরকারের নিকট রহিয়াছে। রেলকর্ম্মচারীদের একাংশের দ্বারা অনুষ্ঠিত ধর্মঘট কঠোর হস্তে দমন করিতে সরকার বদ্ধপরিকর। কমিউনিস্ট পরিচালিত ইউনিয়নগুলির দ্বারা যে ধর্ম্মঘটের আশঙ্কা করা হইতেছে সে সম্পর্কে গত দশ দিনের মধ্যে সর্ব্বসমেত ৮৭০ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। সরকার শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত দাবী স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য কিন্তু কোনপ্রকার শাসানি অথবা ভীতি প্রদর্শনের কাছে তাহারা আত্মসমর্পণ করিবে না।

কমিউনিস্ট পার্টি কেবলমাত্র সরকার-বিরোধী নীতিই অবলম্বন করে নাই, উপরন্তু এরূপ সকল পন্থার আশ্রয় লইয়াছে তাহাকে প্রকাশ্য বিপ্লবের আহ্বান বলা চলে। বর্ত্তমানে এই নীতি ভারতের কয়েক স্থানে কার্য্যকরী করার চেষ্টা চলিয়াছে। ফলে নরহত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন এমন কি নাশকতামূলক কার্য্যেরও তারা আশ্রয় লইয়াছে।

পণ্ডিত নেহরু আবো বলেন, সরকার তাহার নীতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়াই কমিউনিস্ট পার্টির বহু সদস্যকে গ্রেপ্তার করিয়াছে এবং অপরাপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। প্রাদেশিক সরকারসমূহকেও গুরুত্বপূর্ণ কলকারখানাগুলিকে নাশকতামূলক কার্য্য হইতে রক্ষা করিবার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। সম্প্রতি দমদম ও কলিকাতার আশেপাশে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা হইতে দেশের কোন কোন দলের কার্য্যকলাপ ও উদ্দেশ্যের আভাস পাওয়া যায়। কলিকাতার ময়দানে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের উদ্যোগে এক সভা হয়। উক্ত সভায় ছাত্র ফেডারেশনের জনৈক সদস্য বলেন যে, ছাত্রদের মধ্যে একদল নাশকতামূলক কার্য্য করিবার জন্য প্রস্তুত। [সদস্যটির নাম নৃপেন ব্যানার্জি। তিনি বলেন, 'আমি আর কমলাপতি রায় পার্টির নির্দেশে ময়দানে এমন জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়েছিলুম যে নেহরু পর্যন্ত সেটা উল্লেখ করেন।'] দমদম ঘটনার সহিত

সংশ্লিষ্ট আর. সি. পি. আই. দল কয়েক মাস পূর্বেকার টালা জলকলের ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট। উক্ত জলকলের কলকব্জা উড়াইয়া দেওয়ার জন্য তখন চেষ্টা হইয়াছিল। আমি এইমাত্র সংবাদ পাইয়াছি যে গত দুই দিনের মধ্যে তিনবার ট্রেন লাইনচ্যুত করার চেষ্টা হইয়াছে।' (যুগান্তর, ১. ৩. ৪৯)

নেহরুর এই বিবৃতি যেন কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুঙ্কার। রেল শ্রমিক ধর্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতে এক যুদ্ধকালীন আবহাওয়া সৃষ্টি করা হল। শুরু হল মাত্রাহীন সন্ত্রাস। রেলের অফিস, ওয়ার্কশপ, রেল কলোনি, লোকোশেড, ইয়ার্ড, রেল কোয়ার্টার—সর্বত্র নিশ্ছিদ্র প্রহরার ব্যবস্থা। এই অবরোধের মধ্যে যারা রয়েছে, তাদের পক্ষে ধর্মঘটের সপক্ষে প্রচার করা এক দুঃসাহসিক ব্যাপার এবং এই অবরোধ ভেদ করে বাইরের সংগঠক ও প্রচারকরা রেল শ্রমিকদের কাছে কী করে পৌঁছবে!

বি. টি. রণদিভে লিখছেন:

'কোন ধর্মঘটের আগে এত ধর-পাকড় কখনও হয়নি। ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে এই প্রথম। এর আগে কোন একটি শিল্পের সঙ্গে জড়িত এত শ্রমিককে গ্রেপ্তার করা হয়নি। কার্যত সামরিক আইন চালু করা হয়েছে রেল ধর্মঘট ভাঙার জন্যে। কমসে কম দু'হাজার রেল শ্রমিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। 'টাইমস্ অব ইন্ডিয়া'র সংবাদসূত্রে জানা যায় যে ধর্মঘটের আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে আটশ শ্রমিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অনেক জায়গায় গোটা রেল কলোনি অঞ্চলকে সশস্ত্র বাহিনী ঘেরাও করে তল্লাসি চালায়। এমনই নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থা যাতে একটা মাছিও গলে না যায়। বাইরের সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। দু'হাজার রেল শ্রমিক গ্রেপ্তার হওয়ার অর্থ প্রতিটি পার্টি-মিলিট্যান্ট ও সক্রিয় কর্মীকে তুলে নেওয়া হয়েছে। (ডকুমেন্টস, খণ্ড ৭, পৃ ৫৪১)

এত ধর-পাকড় ও হামলা সত্ত্বেও ধর্মঘটের সমর্থনে প্রচার আন্দোলন পার্টি চালিয়ে যায়। কলকাতার বুকে দুটি উদ্দীপিত মিছিল পথ পরিক্রমা করে। মিছিলে অবশ্য ছাত্র-যুবক-মহিলা পার্টি সভ্য ও দরদীদের প্রাধান্য। রেলের লোকজনের সংখ্যা খুবই কম। এরকম একটা মিছিল নারকেলডাঙা রেল ব্রিজের কাছে গিয়ে মার খেল। সোশ্যালিস্ট পার্টির লোকেরা ইট-পাটকেল ছুঁড়ে মিছিল ভেঙে দিল। পার্টির নির্দেশে বাইরে থেকে ছাত্র ও মহিলা স্কোয়াড রেল কোয়ার্টার ও কলোনি অঞ্চলে প্রচারে নামল। যেমন প্রভা চ্যাটার্জি লিখেছেন:

'এদিকে প্রতিভা (গাঙ্গুলী) মহিলা কর্মীদের সংগঠিত করছে সরকারের এই হামলার বিরুদ্ধে। বক্তৃতা দিচ্ছে রেল শ্রমিকদের মধ্যে। বস্তিতে, রেল কোয়ার্টারে এই ধর্মঘটের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করছে—এই ধর্মঘট শুধু দাবী-

দাওয়ার লড়াই নয় ; এটা রাজনৈতিক লড়াই—সরকারকে স্তব্ধ করে দেওয়ার লড়াই।' (শহীদ প্রতিভা গাঙ্গুলী, পৃ ৪৪)

৬ই মার্চ এরকম একটা মহিলা স্কোয়াডের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি হয়ে গেল। ঘটনাস্থল চীৎপুর রেলওয়ে ইয়ার্ড। শ্রমিকদের মধ্যে প্রচারে বেরিয়েছিল মেয়েরা এবং তাদের সঙ্গে ছিলেন রেল শ্রমিক সংগঠক রামসুনীল ঘোষ—যিনি মুনিয়াদা নামে বেশি পরিচিত। পুলিশ হঠাৎ মুনিয়াদা-র উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অনেক হাতাহাতি করেও মেয়েরা মুনিয়াদাকে উদ্ধার করতে পারেনি।

ধর্মঘটের দিন এগিয়ে আসছে—কিন্তু শ্রমিকদের মধ্যে সেই প্রত্যাশিত সাড়া কোথায়? ডালহৌসি পাড়ার আবহাওয়া যেন বড় চুপচাপ। ফেয়ারলি প্লেসে ও গার্ডেনরীচের কেরানীবাবুরা শুধু মুখ বুজে কাজ করে চলেছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি অফিসের লোকজনেরও ভাবলেশহীন মুখ। তাহলে কি নয়া '২৯শে জুলাই' সৃষ্টি হবে না?

পার্টির সভ্য ও দরদীরা কিন্তু প্রত্যাশায় দিন গুনছে। আসল পরিস্থিতির খবর তাঁরাই জানেন—যাঁরা সরাসরি ধর্মঘট সংগঠিত করার কাজে যুক্ত—রেল আন্দোলনের নেতা এবং বাইরের সংগঠক।

সত্যেন গাঙ্গুলী বলছেন, 'আত্মগোপন করে বামনগাছি, লিলুয়া, আসানসোল, অণ্ডাল, বর্ধমান, শিয়ালদহ, নারকেলডাঙ্গা, নৈহাটী, কাঁচড়াপাড়া—সব মিলিয়ে ৬০-৭০টা বৈঠক করলাম। সব বৈঠকে শ্রমিকরা চুপচাপ ছিল। শেষের দিকে আমাদের জঙ্গী ক্যাডাররাও বৈঠকে আসত না। যখন সশস্ত্র-বাহিনী সারা রেল কলোনি ও রেলপথ টহল দিয়ে বেড়াতে লাগল—তখন আমাদের সঙ্গে পার্টির মার্কামারা লোকজন ছাড়া আর কেউ নেই।'

কুমুদ বিশ্বাস বলছেন, 'আমায় পার্টি চীৎপুরে রেল ইউনিয়নের কাজ দিল। আমার বন্ধু সানি অর্থাৎ ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত অভিযোগ আনল যে আমি শ্রমিকদের মধ্যে 'ডিমর‍্যালাইজেশন' (নিরুদ্দীপনার ভাব) আনছি। সে জ্যোতি বসুকে পাঠাল। জ্যোতিবাবুকে দেখে শ্রমিকরা ভয় পেয়ে গেল—পাছে পুলিশে ধরে। আমি জ্যোতিবাবুকে বলি, আপনাকে দেখে যে শ্রমিক ভয় পায়—সে কি কখনও ধর্মঘট করে!'

অজয় দাশগুপ্ত বলছেন, '৯ই মার্চ রেল স্ট্রাইক উপলক্ষ্যে হরিপদ চ্যাটার্জি বজবজে গেল। তাকে বললাম, রেলের গ্যাংম্যানরা ভয় পাচ্ছে। যে শ্রমিকরা ভয় পাচ্ছে—তারা স্ট্রাইকে যাবে এটা সম্ভব নয়। হরিপদ বলল—জুট ওয়ার্কাররা রেল বন্ধ করে দিক। জ্যোতি বসুর সঙ্গে দেখা করে বললাম—রেল শ্রমিক যদি কাজ বন্ধ করে তাহলে জুট-ও করবে।'

সন্ত্রস্ত রেল শ্রমিক যদি ধর্মঘটের সাহস হারায়—তাহলে! মনোরঞ্জন হাজরা বলছেন, '৯ই মার্চ পার্টি থেকে বলল, দশজন লোক নিয়ে রেল

থামাতে। বললাম—এসব পাগলামি। রেল লাইন উপড়ে ফেলতে বলুন—ফেলছি। এসব কী? পার্টি থেকে আমায় তাড়িয়ে দিল।'

কৃষ্ণ চক্রবর্তীর মতো আনকোরা অনভিজ্ঞ কমরেডও বেশ নিষ্ঠা সহকারে ধর্মঘট সংগঠনের কাজে লেগেছিলেন। তিনি বলছেন, 'পার্টি আমায় পাঠাল নৈহাটীতে। পার্টির প্রতি অনুগত বি. অ্যান্ড. এ. আর.-এর বহু শ্রমিক-কর্মচারী তখন সেখানে। অথচ শ্রমিকদের মধ্যে ত্রাস। ইউনিয়ন অফিসে কেউ বসতে চাইত না। একটা ছেলে স্বেচ্ছায় এসে বসতে চাইল। অথচ অন্য কমরেডদের আপত্তি—ছেলেটি যদি পুলিশের লোক হয়! আমি ছেলেটির বাড়ি গিয়ে তার সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিয়ে দেখেছি ভয়ের কিছু নেই। কমরেডরা নিজেরাও বসবে না—অথচ ওকেও বসতে দেবে না। অর্থাৎ একধরনের আতঙ্ক। এই আতঙ্কের পরিবেশে ধর্মঘটের প্রস্তুতি চলছে। বস্তিতে বস্তিতে লুকিয়ে মিটিং। মাঝে মাঝে পুলিশের হামলা। শ্রমিকরা সামনে এগিয়ে না এলেও খবর দিত। একদিন মাইক সাজিয়ে হ্যাজাক জ্বেলে বস্তিতে গোপনে সভার আয়োজন করেছি। আমি তখন বক্তৃতা দেবার উপক্রম করছি—এমন সময় রব উঠল—পুলিশ! পুলিশ! আমি গ্রাহ্য না করেই বলবার চেষ্টা করছি। কিন্তু কয়েকজন শ্রমিক জবরদস্তি আমায় তুলে নিয়ে বস্তির গভীরে চলে গেল। পার্টির ডাকে সাড়া না দিলেও পার্টিকে তারা ভালবাসত।'

রেল শ্রমিক সন্ত্রস্ত। সরকারও কিন্তু কম ত্রস্ত নয়। ৮ই মার্চ 'যুগান্তর'-এর সংবাদ-শিরোনামা:

৯ই মার্চ কম্যুনিস্ট পরিকল্পিত ধর্মঘট প্রতিরোধে
সতর্কতামূলক ব্যবস্থা
কলিকাতার গুরুত্বপূর্ণ স্থান সমূহে মিলিটারী মোতায়েন

—— —

পরিষদে প্রধানমন্ত্রী ডাঃ রায়ের ঘোষণা
শান্তিরক্ষায় জনসাধারণের সহযোগিতা প্রার্থনা
স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের গৃহে রাখিবার অনুরোধ

'...টালা, পলতা ও পামার বাজারে এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ কোম্পানীর বিভিন্ন শাখা, বজবজ পেট্রোল ডিপো, চিৎপুর রেলওয়ে অঞ্চলে সোমবার হইতে মিলিটারী প্রহরা নিযুক্ত হইয়াছে। গ্যাস কোম্পানী, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, ট্রাম কোম্পানীর কারখানা, সেন্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিস ও অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে সশস্ত্র পুলিশ পাহারা দিতেছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক প্রেস নোটে বলা হইয়াছে, কলিকাতার শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা, আইনানুগত নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধান এবং জল বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রভৃতি অত্যাবশ্যক সার্ভিস সমূহ অব্যাহত রাখার জন্য সরকার রাস্তায় রাস্তায় সশস্ত্র বাহিনীর টহলের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ৮ই ও ৯ই মার্চ

তারিখে সহরের বিদ্যায়তনগুলি বন্ধ রাখা হইবে। দুষ্কৃতকারীরা যাহাতে অল্পবয়স্ক বালক বালিকাদের দিয়া নিজেদের মতলব হাসিল করিতে না পারে গভর্ণমেন্ট তজ্জন্য অভিভাবকদের ঐ দুইদিন ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়ীতে রাখিবার অনুরোধ জানাইয়াছেন।' (যুগান্তর, ৮. ৩. ৪৯)

৯ই মার্চ দিনটি শুধু প্রতীক্ষায় কেটে গেল। অনেক সভ্য ও দরদী সেদিন শুধু রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে। না, রেল শ্রমিকদের অবাধ্য মিছিল সেদিন রাস্তায় নামেনি। অন্য কোন কারখানার শ্রমিকও বেপরোয়া মনোভাবের পরিচয় দেয়নি। রেল লাইনের আশেপাশে শুধু গুটিকয়েক বিস্ফোরণের শব্দ। রেল শ্রমিক নেতারা অবশ্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শ্রমিকদের ধর্মঘটে নামাবার চেষ্টা করেছেন।

কৃষ্ণ চক্রবর্তী বলেছেন, 'হঠাৎ একদিন (৮ই মার্চ) রাত্রি ৯টা নাগাদ দেখি আমার ডেনে সত্যেন গাঙ্গুলী এসে উপস্থিত। কমরেড আপনি! এতরাত্রে এখানে! পরের দিন রেল ব্রীজের উপর স্লোগান - বক্তৃতা - দু একটা পটকার শব্দ এবং সত্যেন গাঙ্গুলীর গ্রেপ্তার বরণ!'

সত্যেন গাঙ্গুলী বলছেন, '৯ই মার্চ আমার প্রোগ্রাম ছিল নৈহাটীতে গাড়ি অচল করা। পুলিশ কর্ডন ভাঙার জন্যে পাঁচজন ছাত্র ও পনেরজন রেল-শ্রমিক নিয়ে কুড়ি জনের এক লিস্ট তৈরি হয়েছিল। ছাত্র পাঁচজনা এল, বেল শ্রমিকরা এল না। একটু দূরে একটি ছাত্র স্কোয়াডের অ্যাকশন করার কথা ছিল। কোন অ্যাকশন হল না। জি. আর. পি. 'লক আপ'-এ আমাদের আটক করার প্রায় আধঘণ্টা পর কয়েকটা বোমার শব্দ—তাও রেল স্টেশন থেকে অনেক দূরে। সন্ধ্যেবেলা প্রেসিডেন্সি জেলে এসে দেখি প্রায় একশজন ধরা পড়েছে। আলিপুর দমদম মেদিনীপুর মিলিয়ে প্রায় চারশ। পুলিশ সঠিকভাবেই গ্রেপ্তার করেছে—দু'একজন বাদে সবাই পার্টি সদস্য অথবা কর্মী।'

পরের দিন (১০ই মার্চ) 'যুগান্তর'-এর সংবাদ-শিরোনামা :

৯ই মার্চ রেল ধর্ম্মঘটের অপপ্রয়াস শোচনীয় ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত
কলিকাতা ও সহরতলী এলাকায় স্বাভাবিক অবস্থা অব্যাহত
শান্তিরক্ষায় পুলিশ ও মিলিটারী মোতায়েন

রেল. ডাক ও তার বিভাগের কার্য্যালয়ে উপস্থিতির সংখ্যা অন্যদিনের তুলনায় অধিক

কয়েকটি ছোটখাট ঘটনা

'ব্যাণ্ডেল হইতে একখানি লোকাল ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর কামরার গদীতে আগুন দেখিতে পাওয়া যায়। উহা অনতিবিলম্বে নিভাইয়া ফেলা হয়।

হাওড়া-আমতা লাইট রেলওয়ের দক্ষিণ বাড়ি স্টেশনের নিকট সকাল হইতে কয়েকজন স্ত্রীলোক ও শিশু লাইনের উপর বসিয়া থাকে। হাওড়ার এস. পি. ঘটনাস্থলে যাইয়া আটত্রিশ জনকে গ্রেপ্তার করেন। স্থানীয় বাজারে

হরতাল করার চেষ্টায় দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। তারই জের হিসাবে এই গ্রেপ্তার। সকালে বজবজগামী ট্রেনে শিয়ালদহ ও বালিগঞ্জের মধ্যবর্তী স্থানে বোমা পড়ে। জোড়াবাগান থানার উপর বোমা পড়ায় একজন কনস্টেবল আহত হয়। জগুবাবুর বাজারের নিকট দুইখানি এবং টালিগঞ্জ এলাকায় একখানি ট্রামে বোমা পড়ে। টালিগঞ্জে প্রিন্স আনওয়ার শাহ রোডে জনৈক কনস্টেবল বোমার ঘায়ে গুরুতর আহত হয়।' (যুগান্তর, ৯. ৩. ৪৯)

পরের দিনও রেলশ্রমিকদের কাছে ধর্মঘটের ডাক পৌঁছে দেওয়া হয়। নেতারা তখনও ধরা পড়েনি তাঁরা গ্রেপ্তারের ঝুঁকি নিয়ে রেল শ্রমিকদের কাছে যান। শ্রমিক কমরেড রামপ্রসাদ ও কয়েকজন ছাত্র কমরেডকে সঙ্গে নিয়ে রেল শ্রমিক নেতা কমল সরকার ১০ই মার্চ সকাল ৯টায় শিয়ালদহের ক্যারেজ ডিপার্টমেন্ট ইয়ার্ডে আচমকা গিয়ে হাজির হন। রামপ্রসাদের স্লোগানে ছাত্র কমরেডরা সাড়া দেন: 'রেলকা চাক্কা বন্ধ করো—রেলকা চাক্কা বন্ধ করো। জ্যোতি বোস জিন্দাবাদ।'

এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় বিস্মিত ও বিহ্বল শ্রমিকদের কাছে কমল সরকার হিন্দীতে বক্তব্য রাখেন, 'আপনারা দেখুন লাল ঝাণ্ডার লোকেরা আপনাদের সামনে হাজির—শত পুলিশী নির্যাতনেও তারা ঘাবড়ায়নি। আপনারাও ঘাবড়াবেন না। হরতালে নামুন!'

পুলিশ! পুলিশ!—মুহূর্তে জটলা ভেঙে গেল। মিনিটের মধ্যে পুলিশ আর রেলরক্ষী বাহিনী জায়গাটা ঘিরে ফেলল। কমল সরকার, রামপ্রসাদ ও আর একজন রেল ইউনিয়নের কর্মীকে পুলিশ পিছমোড়া দিয়ে বাঁধল। নীরবে এই দৃশ্য দেখল রেল শ্রমিকরা—আপশোসে মাথা নাড়ল—কিন্তু রেলের চাকা বন্ধ হল না।

কমল সরকারদের যখন পুলিশ ধরে নিয়ে যাচ্ছে তখন আরেক দৃশ্যের অবতারণা—রাইটার্সের প্রধান ফটকের সামনে। অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কয়েকজন সরকারী কর্মচারী কমরেড চেঁচাচ্ছেন: 'বন্ধুগণ, আজ যাবেন না—আজ ধর্মঘট। বন্ধুগণ, আজ যাবেন না—আজ ' কথা শেষ করার আগেই প্রস্তুত পুলিশ অফিসার মুষ্টিমেয় পিকেটারদের টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল। আর কেরানীবাবুরা জোর পায়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

উনিশ

৯ই মার্চের পর পার্টি র‍্যাঙ্কের মধ্যে দেখা দিল এক ধরনের হতাশামিশ্রিত ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া। তারা নেতাদের কাছে জানতে চায়, কেন এই ব্যর্থতা। দেশের কোথাও তো রেল ধর্মঘটের ইশারাটুকুও দেখা গেল না, শ্রমিক অভ্যুত্থান তো দূরের কথা। পার্টি সভ্যদের এই প্রতিক্রিয়া নেতাদেরও অজানা নয়।

কমরেডদের ক্ষুব্ধ জিজ্ঞাসার অন্তরালে তাঁরা শুধু মধ্যবিত্তসুলভ 'হতাশা' ও 'আতঙ্কগ্রস্ত' মনোভাবের অভিব্যক্তিই দেখতে পেলেন।

রেল ধর্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাদেশিক কমিটি প্রকাশিত ১২নং কমিউনিস্ট বুলেটিনে মন্তব্য করা হয় :

'...সাময়িক পরাজয়ে পার্টির মধ্যবিত্ত কমরেডদের মধ্যে কিছুটা আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে এবং সেই আতঙ্কের সুযোগ গ্রহণ করিয়া শ্রেণী শত্রুরা তাহাদের মধ্যে হতাশা সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছে। যাহারা বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে বৈপ্লবিক পরিস্থিতি বলিয়া স্বীকার করে না, যাহারা শ্রমিক কৃষক ছাত্রের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ ও অভ্যুত্থানকে দেখিতে পান না, যাহারা দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের সংগ্রাম-নীতিকে এখনো গ্রহণ করে নাই, তাহারা এতদিন কোণঠাসা ছিল। ধর্ম্মঘট সফল না হওয়ার ফলে এখন তাহারা মাথা তুলিবার চেষ্টা করিতেছে : তাহারা 'প্রমাণ' করিবার চেষ্টা করিতেছে যে ৯ই মার্চ্চ রেলের সাধারণ ধর্ম্মঘটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা 'হঠকারিতা' বা 'এ্যাডভেঞ্চারিজম' হইয়াছে ; তাহারা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছে যে বৈপ্লবিক সংগ্রামের জন্য শ্রমিক শ্রেণী এখনো 'প্রস্তুত' নয় '

তারপর বি. টি. আর.-ও সংশয়ী কমরেডদের এক হাত নিলেন। র‍্যাংক-এর কাছে সাধারণ সম্পাদক প্রেরিত সার্কুলারে প্রথমেই মন্তব্য করা হয় :

'এ পর্যন্ত যেসব রিপোর্ট এসেছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে যারা দোদুল্যমান তারা তাদের স্বভাবসিদ্ধ সিদ্ধান্তে পৌঁছে গিয়েছে।'

সার্কুলারটির মর্মবস্তু :

'যে ধর্মঘটের ডাক দেওয়া উচিত ছিল ১লা জানুয়ারি—সেখানেই দেরি হয়ে গেল আড়াই মাসের মতো। দ্বিতীয়ত, সরকারের পক্ষ থেকে নজিরবিহীন দমন পীড়ন। যারা বেইমান—যারা সংশয়ী—তারা এই উন্মত্ত ও ব্যাপক দমননীতির কথা উল্লেখ পর্যন্ত করে না।

মনে রাখা দরকার, এ ধরনের সাংঘাতিক দমন পীড়ন শুধু রেল ধর্মঘটের ক্ষেত্রে নয়, আগামী দিনে সবক'টি ধর্মঘটের বেলায় ঘটবে। কারণ, আমাদের ধনিক শ্রেণী তাদের মার্কিন প্রভুদের দেখাতে চায় যে তারা কমিউনিস্টদের কবল থেকে ভারতকে রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর। চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহে আতঙ্কিত ধনিকশ্রেণী সংঘর্ষের সূত্রপাতেই পুরোদস্তুর দমননীতির রাস্তা বেছে নিয়েছে।

এটা তাদের শক্তি নয়, দুর্বলতার পরিচয়। তারা কংগ্রেস ও সোশ্যালিস্টদের প্রভাবের উপর ততখানি আস্থা রাখতে পারেনি।

পার্টি সভ্যদের এটা বুঝতে হবে যে দমননীতি ও বিশ্বাসঘাতকতার সমন্বয়ে রেল শ্রমিকদের এই পরাজয় সাময়িক।

তামিলনাড প্রাদেশিক কমিটি-র মতো কেউ কেউ বলেন, জয়প্রকাশ সম্পর্কে শ্রমিকশ্রেণী পুরোপুরি মোহমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ধর্মঘট থেকে বিরত থাকা উচিত ছিল।

না, তা উচিত ছিল না। আমাদের সামনে ধর্মঘটের ডাক দেওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা ছিল না। কথা দিয়ে নয়—একজন সাধারণ শ্রমিক, কাজ দিয়েই বিপ্লবী ও সংস্কারবাদীদের মধ্যে তফাৎ বুঝতে পারে।

লড়াই করতে গেলে, কি ধর্মঘট বা ক্ষমতা দখলের সংগ্রামে—জয় পরাজয় তো রয়েছেই।

আমরা এখন পরবর্তী পর্যায়ের লড়াইয়ে যাচ্ছি। আমাদের অনুকূল ঘটনা হচ্ছে :

এক। নেহরু সরকার যে লাঠি গুলির রাজ—এ সত্য সাধারণ শ্রমিকের কাছে কাছে প্রকট। তারা মনে করে, ভালভাবে মোচড় দিতে না পারলে এই সরকারের কাছ থেকে কিছুই আদায় করা যাবে না।

দুই। জয়প্রকাশ কোম্পানী আজ ধর্মঘট-ভাঙা দালাল বলে চিহ্নিত।

কিন্তু প্রতিকূল ঘটনা হচ্ছে, পার্টি র‍্যাংক-এ পাতিবুর্জোয়াসুলভ আতংক ছড়িয়ে পড়েছে। রেলশ্রমিকদের পশ্চাৎপদ অংশ আজ মুষড়ে পড়েছে।

এটা স্বীকার করতেই হবে যে বেশীর ভাগ পার্টি সভ্যের লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা নেই। তারা দীর্ঘস্থায়ী লড়াইয়ে অভ্যস্ত নয় ; অথচ এককালে তারা কংগ্রেসী গুণ্ডাদের বিরুদ্ধে সাহসের সঙ্গে লড়েছে। তাদের সেই লড়াকু ঐতিহ্য জাগিয়ে তুলতে হবে।

শেষ কথা, ১৮-১৯শে জানুয়ারীর অদম্য আশাবাদ ও ৯ই মার্চের নিরাশা—একই পরিস্থিতির এপিঠ-ওপিঠ।

আশু কাজ

১। ৯ই মার্চ ও পরবর্তী ঘটনা বিশ্লেষণ করে রেল শ্রমিকদের মধ্যে ইস্তাহার বিলি কর। বল যে নৈরাশ্যের কোন কারণ নেই।

২। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ক্ষেত্রে কাজের ধারা পাল্টাও। আত্ম-গোপনরত অবস্থায় গণসংযোগের উপায় নির্ধারণ কর।

৩। ধৃত শ্রমিকদের মুক্তির দাবি জানাও—এবিষয়ে উদ্যোগী হও।'

(সাধারণ সম্পাদকের সার্কুলার, ২১. ৩. ১৯৪৯)

কুড়ি

৯ই মার্চের ব্যর্থতার জন্যে পার্টি সংগঠনের সংস্কারবাদী চরিত্রকে মূলত দায়ী করা হয়। সঠিক রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর সব কিছুই নির্ভর করে সংগঠনের ওপর। দেশে বৈপ্লবিক পরিস্থিতি বিরাজ করছে, গণ-সংগ্রাম দিকে দিকে ফেটে পড়ছে—গণবিক্ষোভ গণ-অভ্যুত্থানে পরিণত হচ্ছে। অথচ পার্টি সংগঠনের সংস্কারবাদী চেহারা প্রধান প্রতিবন্ধক হয়ে গণ-আন্দোলনকে পদে পদে পিছনে টেনে ধরেছে। এই চিন্তাধারা পি. বি.-তে প্রাধান্য লাভ করে এবং পি. বি.-র মতে বাংলা কমিটিতে দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদের ঝোঁক মাথাচাড়া দিয়েছে। বে-আইনী যুগের নতুন পরিস্থিতিতে আইনী যুগের নির্বাচিত কমিটিগুলি অচল। কারণ আইনসঙ্গত কাজকর্মে অভ্যস্ত নেতারা পরিবর্তিত অবস্থায় প্রতিপদে ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে। যতই আন্দোলন ও পুলিশী সন্ত্রাস তীব্রতর—পার্টির অন্তর্নিহিত দুর্বলতা ততই প্রকট।

অপরপক্ষে প্রাদেশিক কমিটি একই অভিযোগে অভিযুক্ত করেন কলকাতা জেলা কমিটিকে এবং আরও ঝাঁঝালো ভাষায়।

রেল ধর্মঘটের বিপর্যয়ের পর অনতিবিলম্বে পি. বি. পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটির পুনর্গঠন করেন। বিগত প্রাদেশিক সম্মেলনে নির্বাচিত কমিটিকে বাতিল করার সুপারিশ জানিয়ে কমরেড রবি (ভবানী সেন) পি. বি.-র কাছে এক দীর্ঘ দলিল পেশ করেন। পি. বি. রচিত 'রণনীতি-রণকৌশল' দলিলে এর আগে কমরেড রবি সম্পর্কে বলা হয়েছে : প্রদেশকে পরিচালনার প্রধান দায়িত্ব ছিল গৌর (সোমনাথ লাহিড়ী) আর রবি-র ওপর। সংস্কারবাদের নিরন্তর চাপের মধ্যে একমাত্র রবি-ই খাড়া ছিলেন ; পার্টি নীতি তিনিই রক্ষা করেছেন এবং উভয় ধরনের বিচ্যুতির বিরুদ্ধেই লড়েছেন। অতএব রবি-র সুপারিশ যে পি. বি. গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবে এটা বলা বাহুল্য। তার উপর ছিল পি. বি.-র কাছে মল্লিকের (মহম্মদ ইসমাইল) নালিশে ভরা প্রতিবেদন। প্রাদেশিক কমিটি শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি যথোচিত গুরুত্ব দিচ্ছে না—তাঁর প্রতি অবহেলা দেখানো হচ্ছে এবং অন্যান্য শ্রমিক ক্যাডারদেরও তাচ্ছিল্য করা হচ্ছে, ইত্যাদি।

অতএব নির্বাচিত প্রাদেশিক কমিটি বাতিল করে পি. বি. সাতজনের এক কমিটি গঠন করেন—যাতে রয়েছেন : মল্লিক (ইসমাইল), নিতাই (নৃপেন চক্রবর্তী), বিরাট (গোপেন চক্রবর্তী), সূর্য (ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত), সাধু (ধীরেন মজুমদার) আমানুল্লা (রেজ্জাক) ও নন্দন (অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য)। এই নতুন কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন মল্লিক। একই মডেলে জেলা কমিটি-গুলিও গঠিত হয়। নব গঠিত কমিটির আয়তন হবে ছোট—তাতে প্রাধান্য থাকবে শ্রমিক, গরীব কৃষক ও ক্ষেত মজুরের এবং একজন মজুর অথবা কৃষক হবেন নবগঠিত কমিটির সম্পাদক।

নবগঠিত প্রাদেশিক কমিটি এক মুহূর্ত'ও দেরি না করে কলকাতা জেলা কমিটি পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত নেন।

এ সম্পর্কে প্রাদেশিক কমিটির প্রস্তাবে বলা হয়েছে :

'পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কমিটির উপর পলিট ব্যুরোর প্রস্তাব, কমরেড মল্লিকের বিবৃতি প্রভৃতি পড়িবার পর কলিকাতা জেলার প্রত্যেকটি সভ্যই জেলা কমিটির পুনর্গঠনের প্রয়োজন উপলব্ধি করেছিলেন। রেল ধর্ম্মঘটের সিদ্ধান্ত কার্য্যে পরিণত করার সময় সাধারণ পার্টি সভ্যরা স্পষ্টই বুঝিতে পারেন যে, জেলা কমিটির আমূল পরিবর্ত্তন ব্যতীত বর্ত্তমান বিপ্লবী যুগের কোন শ্রেণী-যুদ্ধই সাফল্যের সহিত পরিচালনা করা সম্ভব নয়। প্রাদেশিক কমিটি লক্ষ্য করিয়াছেন যে, প্রত্যেকটি শ্রমিক সংগ্রাম কার্য্যত বিরোধিতা করিবার ফলে, শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ সন্তানদের পার্টিতে স্থান না দিবার ফলে, গণসংগ্রামের পথ ত্যাগ করিয়া মধ্যবিত্তসুলভ সন্ত্রাসবাদের দিকে ঝুঁকিবার ফলে, আমলাতান্ত্রিক মনোভাব এবং উপদলীয় মনোভাব প্রকাশ করিয়া সংগঠনের ক্ষেত্রে বুর্জোয়া সংস্কারবাদকে আঁকড়াইয়া থাকিবার ফলে জেলা কমিটি এবং জেলা সেক্রেটারিয়েট সাধারণ সভ্যদের আস্থা সম্পূর্ণরূপে হারাইয়াছেন। জেলা কমিটির পুনর্গঠনের দাবী সাধারণ সভ্যদের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

কলিকাতা জেলার সাধারণ পার্টি-সভ্যদের ইচ্ছা অনুসারে এবং পলিট ব্যুরোর প্রস্তাবে যে সকল বৈপ্লবিক সাংগঠনিক মূল নীতি লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহার ভিত্তিতে প্রাদেশিক কমিটি নিম্নলিখিত সভ্যদের লইয়া নূতন জেলা কমিটি গঠন করিয়াছেন: (১) হরেন (২) কালীপদ (মালাকার) (৩) মালেক (৪) ইরসাদ (৫) সীতারাম (৬) প্রভাত দাশগুপ্ত (৭) কমলাপতি রায়।'

প্রসঙ্গত এই তালিকায় মোট সাত জনের মধ্যে পাঁচজন শ্রমিক কমরেড স্থান পেয়েছেন।

বরখাস্ত জেলা কমিটির সদস্য ছিলেন বীরেন রায় ও গোপাল আচার্য। বীরেন রায়ের মতে, কমিটি ভাঙার কাজে কমরেডদের সমর্থন ছিল। গোপাল আচার্যেরও তাই অভিমত। তিনি বলেন, 'প্রাদেশিক কমিটি, জেলা কমিটি সব নতুন করে তৈরি হয়ে গেল 'ফ্রম অ্যাবভ' (ওপর থেকে)। তার বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য কোন প্রতিবাদ পার্টিতে হল না—সবাই 'রি-অরগানাইজেশন' (পুনর্গঠন) মেনে নিল। 'লাস্টিং পিস'-এর সম্পাদকীয় বেরুবার পর নতুন করে চিন্তা শুরু হয়।'

প্রসঙ্গত, পি. সি.-র প্রস্তাবে কুমুদ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ভাষা প্রয়োগ করা হয়। যেমন,

'সবচেয়ে বেশী শ্রমিক-বিরোধী মনোভাব, সবচেয়ে বেশী আমলাতান্ত্রিক চরিত্র, সবচেয়ে বেশী জমিদারী মনোভাবের প্রকাশ পাইয়াছে জেলা পার্টি সম্পাদক শেখরের (কুমুদ বিশ্বাস) কাজের মধ্যে। শ্রমিক ক্যাডারদের যত্ন নেওয়া, তাঁহাদের বাছাই করা, তাঁহাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যা হাল করিতে সাহায্য করা—এই সকল ব্যাপারে কমরেড শেখর অমার্জনীয় তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়াছেন।'

কুমুদ বিশ্বাসের মতে, জেলা কমিটি ভেঙে দেওয়ার ব্যাপারে পি. সি. প্রস্তাবটি একটা 'আগ্‌লি ডকুমেন্ট' (কুৎসিত দলিল)।

হাওড়া জেলা কমিটিতেও শ্রমিক নেতৃত্ব কায়েম করা হল। সমর মুখার্জি বলছেন, 'আমায় সরিয়ে দিয়ে প্রথমে বসাল দেবী চ্যাটার্জি ওরফে মোহনকে। পরে নৃপেন চক্রবর্তী-রা বলল—মোহন আসলে মণির লোক। আমার টেক্‌-নাম মণি। আমিই হান্নাসকে নৃপেন চক্রবর্তীর কাছে নিয়ে যাই। হান্নাস বলতে থাকে—সমরদা ছাড়া আর কে সেক্রেটারি হবে? নৃপেন চক্রবর্তী বলেন—না। তুমিই নেতা। তুমিই শ্রমিক। তোমার মধ্যে নেতা হবার সব গুণ রয়েছে।'

চতুর আলি কিন্তু হান্নাসের মতো নন—তিনি সপ্রতিভ ও আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। তিনি বলছেন, 'বে-আইনী যুগে ব্যারাকপুর ডি. সি.-র সেক্রেটারি আমি। আমার টেক্‌-নাম বেচন। জগদ্দলে ডি. সি. সেণ্টার। কামারহাটিতে তখন স্ট্রাইক চলছে। খবর পেলাম ওয়ার্কারদের রাখা যাচ্ছে না। ঠিক আছে, মিটিং ডাকো—ছাই মাঠে। আমার বক্তৃতার পর সবাই মিছিল বার করবে। তেল চিটচিটে গেঞ্জি গায়ে সাধারণ শ্রমিক সেজে গেলাম মিটিং-এ। পাঁচটা রাস্তা আটক করে পুলিশ অপেক্ষা করছে। তারা টের পেয়েছে, চতুর আলি এসেছে। সকুর রোড ধরে শোভাযাত্রা চলল। একটা গলি দিয়ে আমি কেটে পড়লাম। তিতলী ঘাট দিয়ে, পানিহাটি হয়ে নিজের ডেনে ফিরে এলাম। নানা ড্রেসে আমি দিনের বেলাতেও কামারহাটিতে যাতায়াত করতাম। একদিন রাত বারোটায় আগরপাড়াতে এক গোয়ালার কাছে 'শেল্টার' (আশ্রয়) নিই। পাতা জ্বালিয়ে রাত কাটাই। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে কাজ করতে থাকি।'

পার্টিতে শ্রমিকের কদর হঠাৎ যেন বেড়ে গেল। সব জেলা কমিটিতেই এক চিত্র। মধ্যবিত্তরা সরে গিয়ে জেলা নেতৃত্বে শ্রমিকদের জায়গা করে দিল। যেমন, স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁকুড়া জেলা কমিটি প্রসঙ্গে বলছেন, 'প্রমথবাবু ও আমার আলোচনার পর সাত জনের একটা সাময়িক জেলা কমিটি গঠন করা হয়। বিড়ি শ্রমিক নেতা রবি বাউড়ীকে সম্পাদক করা হয়। মধ্যবিত্তদের বাদ দেওয়া হয় পাছে এই সময় পার্টির সঙ্গে বেইমানি করে বসে কেউ।' (বাঁকুড়া জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের স্মৃতিকথা, পৃ ৩৯)

চতুর্থ পর্ব

শত্রুর জটিল জড় নিঃশেষে উপড়ে ফেলে
আমার মৃত্যু হবে রক্তাক্ত ময়দানে
সংগ্রামের রাত্রি শেষে
নতুন দিনের সূর্যে শ্রান্ত চোখ রেখে।

—অনিল কাঞ্জিলাল / রোগশয্যায়

এক

ননী ভৌমিকের 'আগন্তুক' গল্পের নায়ক মুরারি স্বপ্ন দেখেছিল—এ দুনিয়াটাকেই বদলে দিতে হবে। নতুন পাওয়া এক রাজনৈতিক আদর্শ আর আবেগ তাকে দুরন্ত করে তুলেছিল। মনে পড়ে কলকাতার সেই বিরাট জনসভার কথা। সেই সভায় বড় বড় নাম-করা নেতার মাঝে উঠে দাঁড়িয়েছিল এক মজুর। অল্প একটুখানি বক্তৃতা করেছিল সে। চ্যাটালো পেশল হাতটা মুষ্টিবদ্ধ করে বক্তৃতার শেষে কর্কশ মোটা গলায় মজুরটা হেঁকে উঠেছিল—'হিল্লা দেঙ্গে! হিন্দুস্থানকো হিল্লা দেঙ্গে!' মুরারির স্বপ্নের মধ্যে সে আওয়াজটা আজও বাজে এক গম্ভীর ঘণ্টাধ্বনির মতো—হিল্লা দেঙ্গে! হিন্দুস্থানকো হিল্লা দেঙ্গে!

এটা গল্প। মুরারিরই বয়সী যুবক তখন ননী রায়। তিনি বলছেন, 'ধামসিমলার বুড়ো সাঁওতালকে বললাম—তোর বন্দুকটা আমায় দিবি? তা দিয়ে সোভিয়েট বানাব। সে রহস্যময় হাসি হেসে বলল—তোরা কি আমাদের সঙ্গে থাকবি!' এটা গল্প নয়।

দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে কিন্তু উপেন জানার মতো আশ্চর্য মানুষেরা। কংসারি হালদার বলছেন, 'একদিন উপেনের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছি। ভেতর থেকে চাপা কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে। উপেনের ছেলেকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে—তার বৌ কাঁদছে। এদিকে উপেন কেবলই আমায় বলছে—কমরেড, আমি জমি নিয়ে কী করব! আমার ছ'বিঘা আপনি নিয়ে নিন। আমার পরিবারের খরচা সোভিয়েটই দেবে।'

—'আরে, আমি জমি নিয়ে কী করব!' বিব্রত কংসারির উত্তর। কিন্তু উপেন শুনছে না। কেবলই এক কথা বলে চলেছে। এটাও কিন্তু গল্প নয়।

১৯৪৯ সালের দিনগুলিতে কমিউনিস্ট পার্টি যেন স্বপ্নের সওদাগর। স্বপ্ন ফেরি করছে দরজায় দরজায়। আর মেতে উঠেছে একদল মজুর-কৃষক ছাত্র-লেখক-শিল্পী। অবশ্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, একজন লেখকও মজুর। তিনি কৃষ্ণ চক্রবর্তীকে বলেন, 'যদি বয়স থাকত তাহলে ট্রেড-ইউনিয়ন করতে যেতাম। যদি লেখক হতে চাও—তাহলে যাও ট্রেড ইউনিয়ন করো গিয়ে।'

কলকাতার রাজপথে গুলিবিদ্ধ লতিকা সেন কবি মঙ্গলাচরণের শান্তি কেড়ে নিয়েছিলেন। আর রাম বসু শুনেছিলেন—পরাণ মাঝির হাঁক। রাম বসু শুধু কবিতা লিখেই থেমে যাননি—তিনি হয়েছিলেন কংসারি হালদারের ক্যুরিয়ার। কলকাতা ও কাকদ্বীপের মধ্যে পার্টির ডাক আনা-নেওয়া করতেন রাম বসু।

কমল চ্যাটার্জি বলছেন, 'একদিন দিয়ারা স্টেশনে নেমে বড়া-কমলাপুরে হাঁটতে হাঁটতে চলে আসে এক লম্বা-চওড়া লোক—পায়ে বুট জুতো। দেখেই চিনে ফেলি—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এখানকার আন্দোলনে পুলিশকে ফাঁকি দেওয়ার ধরন দেখে তিনি লেখেন 'হারানের নাতজামাই' গল্পটি। তেমনি শিল্পী রেবা দাশগুপ্তা এসেছিলেন ছবি আঁকতে।'

এটাও ঠিক—'হিন্দুস্থানকো হিল্লা দেঙ্গে'—এই হাঁক মারার মতো জঙ্গী শ্রমিক কমিউনিস্ট পার্টি সৃষ্টি করেছিল।

'পটারী এবং এলেনবেরীর শ্রমিকদের অপূর্ব ঐতিহাসিক প্রতিরোধ সমস্ত শ্রমিকদেরই মন স্পর্শ করেছে। কারখানায় কারখানায় আজ তাঁরা এই কথাই আলোচনা করেন যে মরদের বাচ্চা এই লাল ঝাণ্ডার পার্টি, কোম্পানী ও সরকারী জুলুমের বিরুদ্ধে এই পার্টিই দেখাচ্ছে জয়ের রাস্তা।'

(পার্টি চিঠি, ১. ১১. ১৯৪৯)

বেঙ্গল পটারী কারখানার ছাঁটাই নারী-শ্রমিক মুনিয়া যেন খাপখোলা তলোয়ার। প্রথমে যেদিন মহম্মদ আলি পার্কে এক ছাত্রসভায় তাকে মাইকের সামনে কিছু বলার জন্যে দাঁড় করানো হয়—সেদিন সে হেসে কুটি-কুটি। তারপর থেকে কী আশ্চর্য পরিবর্তন তার! সভায়-সভায়—মিছিলে-মিছিলে তাকে দেখা যেত—আর মনে হতো সে হয়ে উঠেছে এক নতুন মানুষ। তারপর যখন ময়দানে শান্তি সম্মেলনের মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করল—তখন কী আশ্চর্য সপ্রতিভ সে! সে জানে—সে একজন জাত মজুর। তাকেই দুনিয়া পাল্টানোর লড়াইয়ের নেতৃত্ব দিতে হবে।

জঙ্গী মজুর আন্দোলনের জীয়ন কাঠির স্পর্শে জেগে উঠল একদল ছাত্র। লড়াইয়ের ময়দানে অবতীর্ণ একদল জঙ্গী ছাত্র—যারা সমাজ-বিপ্লবের স্বপ্নের শরিক।

২৩-২৭শে জুলাই, ১৯৪৯, কলকাতায় সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশনের দ্বাদশ সম্মেলন বসে। সে উপলক্ষ্যে একটি পর্যালোচনায় লেখা হয়:

'এমন এক সময় এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যখন ৩০ বৎসরব্যাপী অতীত ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে ভারতের ছাত্র আন্দোলন একটা সম্পূর্ণ নতুন পথের মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

সারা বছর ধরে শিক্ষা-সংক্রান্ত দাবি নিয়ে যে বিরাট লড়াই চলেছে তা মিশে গেছে কংগ্রেস নেতাদের পুঁজিবাদী একনায়কত্বের বিরুদ্ধে সমগ্র জনসাধারণের রাজনৈতিক লড়াইয়ের সঙ্গে। ছাত্র আন্দোলনের ঐতিহাসিক, যুগান্তকারী বৈশিষ্ট্য রয়েছে এইখানে; ছাত্র আন্দোলনের ৩০ বছরের অতীত ইতিহাসের সঙ্গে এইভাবে তার সম্পর্ক ছেদ হয়েছে।

এ হল এক নতুন ধরনের ছাত্রসাধারণ—বোম্বাই, কলকাতা, কানপুর আর তামিলনাডের বাহাদুর শ্রমিক শ্রেণীর গণতান্ত্রিক লড়াইয়ের বীরত্বপূর্ণ

ঐতিহ্য আর মানদণ্ডে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে এ'দের লড়াই। ছাত্রদের প্রেরণা যোগাচ্ছে ভায়ালার, পুন্নাপারা আর তেলেঙ্গানার শ্রমিক-কৃষক বীরেরা। ১৯৪৮ সাল আর ১৯৪৯ সালের প্রথম ছ'মাস ধরে কংগ্রেসী শাসনের বিরুদ্ধে প্রচন্ড লড়াইয়ে লিপ্ত এই ছাত্রসমাজ। তাই অধিবেশনের সময়েই রয়েছেন, এ. আই. এস. এফ.-এর এক হাজার জন সভ্য কারাপ্রাচীরের অন্তরালে।' (ভারতের ছাত্র আন্দোলন: মার্কসবাদী, ৬ষ্ঠ সংকলন)

গ্রামাঞ্চলে লড়াইয়ের এলাকা ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে। 'কাকদ্বীপের পিছনে পড়ে থাকব না'—এই আওয়াজ উঠেছে সেখানে। পার্টি জঙ্গী মজুর ও ছাত্রদের গ্রামের কৃষকের পাশে দাঁড়াবার ডাক দিয়েছে।

'শ্রমিকদের ভিতর অনেক জঙ্গী শ্রমিক কারখানা থেকে ছাঁটাই হয়েছেন। তাঁদের ভিতর থেকে অনেককেই পার্টি-সংগঠক করে গ্রামে গ্রামে পাঠাতে হবে। শ্রমিক ছাড়া জঙ্গী ছাত্রদের ভিতর থেকে রাজনৈতিক প্রচারক এবং শিক্ষক পাওয়া যাবে। তাঁদের দিতে হবে শ্রমিক এবং কৃষকদের কাছে পার্টির নীতি, সংগ্রামের লক্ষ্য এবং কর্ম্মপন্থা ও পার্টির প্রচার পুস্তিকার অর্থ ব্যাখ্যা করে বেড়ানোর কাজ।' (পার্টি চিঠি, ১. ১১. ৪৯)

ধীরে ধীরে কাকদ্বীপের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে ভাঙর-নন্দীগ্রাম-বিষ্ণুপুর-হাটাল-মাশিলা। মেদিনীপুর, হাওড়া ও বাঁকুড়ার ঘুমন্ত এলাকাগুলি জেগে উঠছে। জানকবুল লড়াইয়ে পুরুষের পাশে মেয়েরাও সামিল।

কলকাতার রাজপথে লতিকা-প্রতিভা-গীতা-অমিয়া ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। আর তাদের বোন গ্রামের গরীব ঘরের মেয়ে অহল্যা-সরোজিনী-বাতাসী-উত্তমীদের আত্মদান বাংলার নারী সমাজের গৌরব বাড়িয়েছে। তাদের বীরত্ব সাহস ও বুদ্ধির কাছে শত্রু আজ অসহায়। তাদের কাহিনী যেন কল্পনাকেও হার মানায়।

কমল চ্যাটার্জি বলছেন, 'একদিন রাত্রিবেলায় কমলাপুরের এক পাকা বাড়িতে বসে মিটিং করছি আমরা পনেরো-ষোলো জন। রোয়াকের দু'ধারে রয়েছে এক ঘড়া জল আর একটা গরুর ডাবা। অতর্কিতে পুলিশ হানা দিল। সঙ্গে সঙ্গে ঘোমটা দেওয়া এক বৌ জলের ঘড়াটা উল্টে দিল—আর এক বৌ দিল গরুর জাবনা ভরা ডাবাটা উল্টে। উঠোনটা হয়ে গেল পেছল। পুলিশ ঢোকার সঙ্গে খেল এক আছাড়। দ্বিতীয় পুলিশ পড়ল প্রথম পুলিশের ঘাড়ে, আর তৃতীয় পুলিশ দ্বিতীয় জনের ওপর। এই ফাঁকে আমরা পালালাম। শুধু পড়ে রইল পুলিশের জন্যে দশ বার জোড়া জুতো।'

তিনি বলেছেন মেয়েরা এভাবে বাঁচিয়েছে শেফালী নন্দীকে। পুলিশ এসেছে—আর শেফালীকে নিয়ে মেয়েরা পুকুরে নামল। তাকে মাঝখানে রেখে চারজন মেয়ে প্রায় আদুড় গায়ে স্নান করতে লাগল। ঘাটে যে মেয়েটি বাসন মাজছিল, সে নির্বিকারভাবে বাসন মেজে চলল। পুলিশকে দেখে

লুন্ঠীদি বিকট গলায় গালাগাল করতে থাকে—পুলিশের কি মা-বোন জ্ঞানও নেই ! মেয়েরা যেখানে স্নান করছে—কোন লজ্জায় তারা সেখানে আসে !'

কারারুদ্ধ বন্দীরাও বাইরের গণসংগ্রামকে শক্তিশালী করে চলেছেন অভাবনীয়রূপে। লাল ঝান্ডাকে তাঁরা কারাগারের ভিতরও অপরাজেয় করে তুলেছেন। তাঁরা প্রমাণ করেছেন যে কমিউনিস্টকে বন্দী করলেও তার লড়াই থামে না।

শত্রুর বিরুদ্ধে আজ কমিউনিস্টরা জ্বালিয়েছে ক্রোধের মশাল। তার স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে পড়ছে কলে কারখানায় ক্ষেতে খামারে স্কুলে কলেজে।

কিন্তু ভিজে বারুদ বিস্ফোরণ ঘটায় না।

দুই

এম. বি. রাও লিখছেন, ১৯৪৯ সালের মে-মাস নাগাদ সারা ভারতে কারারুদ্ধ কমিউনিস্ট ও তার সহযোদ্ধা পঁচিশ হাজার এবং তাছাড়া বিচারাধীন বন্দীর সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের কাছাকাছি। (উৎস ; ক্রসরোড্‌স্‌, ১৩. ৫. ৪৯)

পলিট ব্যুরোর মতে, রাজবন্দীদের সংগ্রাম নেহরু সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কারান্তরালে আমাদের কমরেডদের লাগাতার বীরত্বপূর্ণ লড়াই দেশে ও বিদেশে সরকারের সুনামহানি ঘটায়।

'কারাবাস করার অর্থ শ্রেণী সংগ্রাম থেকে নিরাপদ দূরত্বে বিশ্রাম ও বিদ্যাচর্চা নয়'—একথা রাজবন্দী কমরেডদের স্মরণ করিয়ে লেখা হয় :

'কারখানায়, রাস্তায়, আদালতে অথবা কারাগারে—যেখানেই সে থাকুক না কেন, একজন কমিউনিস্টকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে—সর্বহারা শ্রেণী, পার্টি ও সমস্ত মেহনতী মানুষের জন্য সে সংগ্রামরত। অত্যাচারী শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সে একজন অবিচল সংগ্রামী। জেলখানা তার বিশ্রামক্ষেত্র নয়। সেটাও লড়াইয়ের আর একটি ফ্রন্ট এবং অত্যন্ত কঠিন ফ্রন্ট।' (ডকুমেন্টস, খণ্ড ৭, পৃ ৫৯৯)

বাংলার কারাবাসরত কমরেডরা পি. বি.-র এই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। প্রাদেশিক কমিটির এক বুলেটিনে বলা হচ্ছে :

'জেলের মধ্যে আমাদের বন্দী কমরেডগণ অতুলনীয় ঐতিহাসিক সংগ্রাম চালাইয়াছেন। জেলের মধ্যে রাজনৈতিক বন্দীদের লড়াই আমাদের দেশে নূতন নয়। কিন্তু এমন লড়াই আর কখনও হইয়াছে কি ? ধনিকশ্রেণীর জেলখানার মধ্যে বন্দী শ্রমিক শ্রেণীর নেতারা ধনিক সরকারের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছেন ; বৃটিশ ইউনিয়ন জ্যাক ও ধনিক শ্রেণীর তেরঙ্গা ঝান্ডার বদলে জেলখানার মধ্যে বন্দীরা লাল ঝান্ডা উড়াইয়া দিয়াছেন।

জেলখানার মধ্যে যুদ্ধ শিবির তৈয়ার হইয়াছে, ব্যারিকেড যুদ্ধ চলিয়াছে। জেলের পর জেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি চলিয়াছে; নিরস্ত্র কমরেডগণ প্রতিরোধ চালাইয়াছেন, ইট, কাঠ যাহা কিছু পাইয়াছেন, তাহা লইয়া বেয়নেট বন্দুক ব্রেনগানের বিরুদ্ধে মৃত্যুঞ্জয়ী সাহসের সহিত লড়িয়াছেন। চারজন বন্দী প্রাণ দিয়াছেন। আহতের সংখ্যা অগণিত। বন্দীদের এই লড়াই সর্ব্বহারা শ্রেণীর অনমনীয় দৃঢ়তাকে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। জেলখানার এই সংগ্রাম জনতার বিপ্লবী শক্তিকে উৎসারিত করিয়া দিয়াছে, বিপ্লবী সংগ্রামের নূতন ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়াছে।'

কমল চ্যাটার্জি বলেছেন, 'জেলেও লড়াই এবং অসম লড়াই। মহীতোষ নন্দীকে ছেলে চুরির কেসে ধরা হয়েছে। আমরা হুগলি জেল থেকে সিদ্ধান্ত নিই—কিছুতেই মহীতোষ নন্দীকে কোর্টে নিয়ে যেতে দেওয়া হবে না। প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়—গুলি চলে এবং রটে যায় যে মহীতোষ ও আমি মারা গেছি।

শ দুই-তিন মেয়ে মিছিল করে কোর্ট প্রাঙ্গণে হামলা করেছে—নিরস্ত্র বন্দীদের গুলি করে মারার প্রতিবাদে।'

তিনি বলছেন, 'হুগলিতে প্রথমে দশদিন এবং সাতদিন পর আবার তিপ্পান্ন দিন আমরা অনশন ধর্মঘট করলাম। মেদিনীপুর জেলের কমরেডরা-তো বিরাশি দিন অনশন ধর্মঘট করল নারায়ণ চৌবের নেতৃত্বে।'

সন্ধ্যা চ্যাটার্জি বলছেন, 'জেলে লড়াই চলছে। আমবা যা পারি তাই ছুঁড়ছি—কাঁচের গ্লাস, কাপ ডিশ। এমন সময় আমার বাচচা মেয়ে ওপর থেকে নেমে এল—সঙ্গে সঙ্গে তার পা কেটে রক্তারক্তি। এসময় একদিন জানতে পারলাম, হুগলি জেলে গুলি চলেছে। খুবই উৎকণ্ঠিত আমি। আমার কাছে একটা খবর মণিদি—কনকদিরা চেপে যাচ্ছে। তখন গুজব রটেছিল কমল মারা গেছে। পরে দেখা গেল এটা নিছক গুজব।'

একদিন ভোর রাত্রিতে শৈলেন মুখার্জি বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার হলেন। ভোর চারটেয় বড়তলা থানার কলে মুখ ধোবার সময় পুলিশ তাঁকে বলল, 'আমাকে মাফ করুন।' তারপর ঘটনাস্থল আলিপুর প্রেসিডেন্সি জেল। জেলে চোরডাকাত কয়েদীরা কি ভালোই না বাসত তাঁদের। রাজবন্দীদের কাছাকাছি আসার জন্যে তারা ব্যাকুল।

শৈলেন মুখার্জি বলেছেন, 'শুরু হল জেলের মধ্যে লড়াই। হাতকড়া দেওয়া—প্রিজন ভ্যানে করে রাজবন্দীদের কোর্টে নিয়ে যাওয়া চলবে না। পরপব দু'জন প্রতিবাদ জানাল। কী মার তাদের! তারপর তাদের জেলে ফেরত না এনে অন্য কোথাও রেখে দিল। একজন মেয়েও অমান্য করল। তাকে চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে ভ্যানে তুলল।

পরের জনকে ডাক পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল বোঝাপড়া। না, সে যাবে না। তাকে নিতে এল কারারক্ষীরা। 'সাতখানা' ওয়ার্ডের সবাই

অর্থাৎ আশি জন দোতলার একটা ঘরে জড়ো হল। সিঁড়ি আটকে দেওয়া হল। লোহার খাটিয়া নীচের দিকে ফেলে দেওয়া হতে থাকে। তারা ফিরে গেল। পাগলা ঘণ্টি বাজছে তখন। ডেপুটি কমিশনার হায়দারের নেতৃত্বে ও পুলিশ কমিশনার এস. এন. চ্যাটার্জির উপস্থিতিতে শুরু হল বড় রকমের আক্রমণ। দমকলের সিঁড়ি বেয়ে উঠে একদিকে জানালার ফাঁক দিয়ে ভেতরে গলিয়ে দেওয়া হচ্ছে টিয়ার গ্যাসের শেল। অপরদিকে জানালা দিয়ে ছুটে আসছে অবিশ্রান্ত গুলি। আমরা সবাই অবনী লাহিড়ীর নির্দেশে মেঝেতে একদম উপুড় হয়ে শোয়া। প্রতিরোধ ভেঙে গেল। তারপর পুলিশ ঢুকে একদফা পাইকারি হারে মার।

এরপর যেতে হবে পানিশমেন্ট সেল-এ। এক গলিপথের দু'ধারে দাঁড়িয়ে আছে যমদূতের দল লাঠি আর ডাণ্ডা হাতে। তারা পেটাবে। হ্যাঁ, তারা পেটাল। তারপর অজ্ঞান। হাসপাতালের বেডে জ্ঞান ফিরে এল। ব্যান্ডেজ এখানে-ওখানে। কিন্তু কিছু খাওয়া চলবে না। 'হাঙ্গার স্ট্রাইক' (অনশন ধর্মঘট) শুরু হয়েছে। ডাক্তারবাবু বললেন, আপনারা কি এভাবে মরতে চান? যদি না চান—তাহলে রোজ সরষে তেল মাখুন। নুনজল আর পাতিলেবু খেয়ে আঠারো দিন হাঙ্গার স্ট্রাইক। চোর ডাকাতরা কাঁদছে। তারাও একদিনের জন্য হাঙ্গার স্ট্রাইক করল। তারপর আমি বক্সার জেলে।'

চিন্মোহন সেহানবীশ বলছেন, 'আমাদের বিরোধী শক্তির প্রধান একজন বিশ্ববিখ্যাত ডাক্তার। তিনি একটা 'লিকুইড' (তরল পদার্থ) তৈরি করেছিলেন—ডিম, ভিটামিন ও অন্যান্য পুষ্টিকর উপাদান দিয়ে। সেটা জোর করে খাওয়ালে মরা খুব কঠিন। ওরাও ভালোমতো তৈরি। দুই 'হাঙ্গার স্ট্রাইক'-এর মধ্যে সময়ের ব্যবধান ক্রমশ কমে যাচ্ছে। ফলে সকলের শরীর ভাঙছে। ১৫ই ডিসেম্বর, জেলের মধ্যে আমরা ব্যারিকেড করে লড়লাম। নতুন একটা ছেলে জেলে এসে ঘাবড়ে গিয়ে প্রশ্ন করল, ইস্যুটা কী? ইস্যু! ইস্যু কিছু নেই। আসল হচ্ছে লড়াই। জেল-লড়াইয়ের মধ্যে অবনী লাহিড়ী, কালী ব্যানার্জি ও আমি। তাছাড়া আমি ছিলুম 'সেন্সর'।'

উমা সেহানবীশ বলছেন, 'একদিন সতপাল ডাং খবরের কাগজটা আমায় এগিয়ে দিল। পড়ে দেখি, প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দীদের সঙ্গে পুলিশের গুরুতর সংঘর্ষ হয়েছে। সতপাল জানে আমার স্বামী জেলে। আমার পরিচয় ধরা পড়ে, যেদিন দাদা আমাদের ডেন-এ এসেছিল। সতপাল বলে ওঠে, এখন বুঝলাম তুমি কে।'

সেদিন তখনও জানি না চিনু কেমন আছে। কয়েকদিন পর দাদার চিঠিতে জানতে পারি চিনু 'ইনজিওর্ড' (আহত)। তখন আমাদের ডেন-এ স্টালিনের জন্মদিন পালন চলছে। আমি সংসার খরচ থেকে বাঁচিয়ে একটু খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেছি। পাশের ঘরে সবাই খাচ্ছে আর আমি চুপ করে বসে আছি। হঠাৎ দেখি বি. টি. আর. ঘরে ঢুকেছে। বি. টি. আর.

বললেন, 'আমি শুধু তোমায় দেখতে এসেছি। তোমার ওপর আমার পরিপূর্ণ আস্থা আছে।' বি. টি. আর.-এর আসার কথা ছিল না ; তবুও এসেছেন আমায় ভরসা দিতে।'

শিবশঙ্কর মিত্র বলছেন, 'দমদম জেলে কাকাবাবু আমাকে লড়াইয়ের ছক তৈরি ও কমরেডদের লড়াইয়ের কায়দাকানুন শেখানোর ভার দিলেন। এই লড়াই হয়তো আমাদের একমাস ধরে করতে হতে পারে। অসম লড়াই—অবরুদ্ধ অবস্থায় লড়াই। ওদের হাতে লাঠি বন্দুক টিয়ার গ্যাস। আমাদের আছে থান ইট আর সিঁড়ি জ্যাম করার জন্যে লোহার খাটিয়া। টিয়ারগ্যাস সেলকে অকেজো করার জন্যে জল আর বালি।

আমরা ঢিল ছুঁড়ব—ওরা গুলি করলে পর বুকে হেঁটে সেল-এ ঢুকে যাব। এক মাসের মতো চিঁড়ে চিনি যোগাড় করা হল। কি করে আড়াল নিতে হয়—কি করে দুবার গুলি চলার ফাঁকে এক সেকেণ্ডেরও কম সময়ে গুঁড়ি মেরে পিছু হটে যেতে হয়—এসব একমাস ধরে যতখানি সম্ভব শেখালাম।

'আমারই সামনে তারা মারা যায়—প্রভাত, মুকুল, আর সুমন্ত। তারপর দিন থেকে শুরু হয় হাঙ্গার স্ট্রাইক।'

ঘটনাটা জাতীয়তাবাদী দৈনিকে এভাবে পরিবেশিত হয় :

দমদম জেলে কম্যুনিস্ট নিরাপত্তা বন্দীদের
ব্যাপক উচ্ছৃঙ্খলা

পুলিশের সহিত সংঘর্ষে তিনজন নিহত

আটজন বন্দী আহত · নয়জন পুলিশ ও তিনজন জেল ওয়ার্ডার জখম

নিহতদের নাম : (১) প্রভাত কুণ্ডু (২) সুমন্ত চক্রবর্তী (৩) মুকুল চক্রবর্তী।
(যুগান্তর, ১১. ৬. ৪৯)

জেলখানার ভিতরে এই অসম লড়াইকে কুমুদ বিশ্বাস আদৌ সমর্থন করেননি। তিনি বলেন, 'জেলখানার মধ্যে গুলি খাওয়ার ঘটনাতে আমি বারবার আপত্তি করেছি। ব্যাপারটা নিষ্ঠুর, মুর্খামি। পার্টি যদি জেল ভেঙে বেরুনোর প্ল্যান করত তো বুঝতাম—এটা 'লজিক্যাল' (যুক্তিসম্মত)।

আসলে পার্টি চেয়েছিল জেলখানায় রাজবন্দীদের সংগ্রামকে বাইরের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করতে। রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে সভা-শোভাযাত্রা, জেল গেটে বিক্ষোভ মিছিল—এই ছিল পার্টির কর্মসূচি।

পার্টির আহ্বান ছিল : 'কংগ্রেসী অন্ধকারার উপর ঝাঁপাইয়া পড়।' ঘটনাপঞ্জি উদ্ধৃত করে পার্টির পক্ষ থেকে দাবি করা হয় যে, এই ডাকে শ্রমিক শ্রেণীর একাংশ বিশেষভাবে সাড়া দিয়েছে। যেমন,

'৮ই জুন প্রেসিডেন্সি জেলে ও ৯ই জুন দমদম জেলে গুলি চলে। ১০ই ও ১১ই জুন শিবপুর ও গৌরীপুরের মজুরগণ হরতাল, মিছিল, সভা করিয়া বিক্ষোভ দেখান। শ্রমিকরা আই. এন. টি. ইউ. সি-র শিবপুরের অফিস

দুটি পুড়াইয়া দেন—কংগ্রেস নেতা কালোবরণ ঘোষকে ঘেরাও করেন। সভা করিয়া হাজরা পার্ক হইতে প্রেসিডেন্সি ও আলিপুর জেলের গেটে বিক্ষোভ প্রদর্শনেও শ্রমিকগণ বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। ১৫ই জুন আসানসোলের ধাঙ্গড়গণ ধর্মঘট করেন। তারপর আবার ২১শে জুন হইতে সংগ্রাম শুরু হয়। হাজীনগর, গৌরীপুর, নদীয়া জুট মিলে ২১শে জুন শ্রমিকরা বিক্ষোভ দেখান। ২২শে তারিখ বন্দীহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে শ্রমিকগণ মাহেশ থানা, শ্রীরামপুর সাব-জেল গেট ও আই. এন. টি. ইউ. সি'র অফিস আক্রমণ ও ভস্মীভূত করেন। ২৫শে জুন বারাকপুর সাব-জেলের সামনে মজুররা বিক্ষোভ দেখান। ২৬শে জুন মেটিয়াবুরুজ ও শিবপুরে মজুরদের বিক্ষোভ মিছিল হইতে বন্দীহত্যার প্রতিবাদ জানানো হয়। কংগ্রেস নেতা সুশীল ব্যানার্জীর বাড়ী মজুরগণ ঘেরাও করেন। ২৭শে জুন টেক্সম্যাকো মজুরদের নেতৃত্বে বেলঘরিয়ায় সাধারণ ধর্ম্মঘট হয়। ২৯শে জুন বজবজে মজুরদের বিরাট মিছিল বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।'

(কমিউনিস্ট বুলেটিন—১৫)

তাছাড়াও অনশনরত রাজবন্দীদের সমর্থনে নানা জায়গা থেকে ছোটখাট বিক্ষোভ মিছিলের খবর আসে।

২৭শে জুন: ১৪৪ ধারা ভেঙে ডালহৌসি স্কোয়ার অঞ্চলে রাজবন্দীদের মা-বোনদের বিক্ষোভ মিছিল বার হয়। পুলিশ কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার করে। তিন জন মহিলা ও সাতজন ছাত্র গ্রেপ্তার হয়।

২৭শে জুন: বেলঘরিয়ায় ইণ্ডিয়া পটারি, আর্ট পটারি এবং ছোটখাট আরও কয়েকটি কারখানায় ধর্মঘট হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে চারজন শ্রমিককে গ্রেপ্তার করা হয়।

২৭শে জুন: ব্যারাকপুরে চারশ শ্রমিক, ছাত্র ও মহিলার মিছিল।

২৮শে জুন: কলকাতায় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হল-এ অনুষ্ঠিত এক সভার পর লেখক-শিল্পীদের এক মিছিল বার হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। মিছিলকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ বাধে এবং পুলিশের গুলিতে একজন নিহত ও অনেকে আহত হয়। ('মঞ্জিল', ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ৩রা জুলাই '৪৯)

১৪৪ ধারা ভেঙে জমায়েত ও তারপর মিছিল এবং সবশেষে পুলিশের সংঘর্ষ। তাতে লাঠি, গুলি, কাঁদুনে গ্যাস একপক্ষে এবং অপরপক্ষ থেকে ইট পাটকেল ও বোমা হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হতো। সংঘর্ষ কোন কোন ক্ষেত্রে কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত স্থায়ী হতো। অঞ্চলটা হয়ে পড়ত এক খুদে রণাঙ্গন। সাধারণ মানুষ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে এই দ্বৈরথ পর্যবেক্ষণ করত। বন্দীদের সমর্থনে আন্দোলনের এই ছিল বাঁধা ছক।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে—পার্টির প্রভাবের বাইরে রাজবন্দীদের অনশন ও আত্মদান কতখানি অভিঘাত সৃষ্টি করেছিল সেদিন? সম্ভবত সমাজের

গভীরে সামান্য আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। যদিও দক্ষিণ কলকাতার উপ-নির্বাচনে রাজবন্দীদের অনশন ও বন্দীহত্যা ছিল একটি জোরালো ইস্যু এবং কংগ্রেস প্রার্থীর পরাজয়ের অন্যতম কারণ।

সে-সব অবশ্য আরও পরের কথা।

তিন

২৭শে এপ্রিল, ১৯৪৯। দিনটিকে মনে রেখে শ্রীমতী কনক মুখোপাধ্যায় লিখেছেন :

আমি এক তন্দ্রাহীন, স্বস্তিহীন স্মৃতির যন্ত্রণা,
রক্তভেজা ধরণীর হৃদয়ের মণিকোঠা হতে
তোমাদের দ্বারে দ্বারে বারবার ডাক দিয়ে যাই
আমি সেই মৃত্যুহীন মাতৃহারা 'সাতাশে এপ্রিল'।
(২৭শে এপ্রিল, ১৯৫৬)

কী ঘটেছিল সেদিন? 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র পাতায় পরিবেশিত সংবাদ থেকে জানা যায় :

বুধবার কলিকাতায় শোচনীয় হাঙ্গামা

চারিজন মহিলা এবং একজন পুলিশ কনস্টেবল সহ সাতজন নিহত

বোমা বিস্ফোরণ ও পুলিশের গুলীবর্ষণ

'গত বুধবার অপরাহ্নে বৌবাজার স্ট্রীট অঞ্চলে শোচনীয় হাঙ্গামার ফলে ৪ জন মহিলা, ১ জন পুলিশ কনস্টেবলসহ মোট ৭জন নিহত এবং ৫/৬ জন আহত হয়। এই ঘটনায় পুলিশ কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার করে এবং গুলি চালায়। হাঙ্গামার ফলে কয়েকটি বোমাও নিক্ষিপ্ত হয়।

প্রকাশ যে ঐদিন অপরাহ্নে (৫টা) ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির নামে একটি মহিলা সভা অনুষ্ঠিত হয় : ঐ সভায় অনশনব্রতী নিরাপত্তা বন্দীগণের দাবীর প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মনোভাব নিন্দা করিয়া বক্তৃতা হয়।

সভান্তে মহিলাগণ এক শোভাযাত্রা সহকারে বৌবাজার স্ট্রীট ধরিয়া অগ্রসর হইতে থাকেন। ঐ সভায় উপস্থিত কিছু সংখ্যক পুরুষও ঐ শোভাযাত্রায় অংশ নেয়। কিন্তু শহরে ১৪৪ ধারা জারী থাকায় পুলিশ শোভাযাত্রার অগ্রগতি বাধা দেয় এবং শোভাযাত্রীদের ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য কাঁদুনে গ্যাস ছোঁড়ে…

হতাহতের তালিকা

কলিকাতা মেডিকেল কলেজ

১। লতিকা সেন (৩০) ৩/১ ল্যান্সডাউন রোড—হাসপাতালে ভর্তির পরে মৃত্যু
২। অমিয়া দত্ত (৩২) ৩, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড ঐ
৩। গীতা সরকার (২৫) নার্স, কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ ঐ
৪। প্রতিভা গাঙ্গুলী (৩০) ১২৯, ধর্ম্মতলা স্ট্রীট—মৃত অবস্থায় আনীত
৫। অজ্ঞাতনামা পুরুষ (৪০) ঐ
৬। যমুনা দাস মাহাতো (৩২) পুলিশ-হাসপাতালে ভর্তির পর মৃত্যু
৭। মৃণালিনী দেবী (২২) নার্স, কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ—অবস্থা আশঙ্কাজনক
৮। দয়ারাম তেওয়ারী (৪২) ঐ
৯। অজ্ঞাতনামা পুরুষ ঐ

কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ

অজ্ঞাতনামা পুরুষ (২৫) মৃত অবস্থায় আনীত

ক্যাম্বেল হাসপাতাল

সরকারী বাসের একজন ড্রাইভার—প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়।'

কলকাতার রাজপথে পাইকারি হারে নারীহত্যার ঘটনা এককথায় নজির-বিহীন। এই অভাবনীয় ঘটনায় মানুষ মাত্রই অভিভূত হতে বাধ্য—শোকার্ত হতে বাধ্য।

অতএব কমিউনিস্ট-বিদ্বেষী কংগ্রেসী দৈনিক 'আনন্দবাজারের' কর্তৃপক্ষ এই মর্মান্তিক ঘটনাকে উপেক্ষা করতে পারেননি—সম্পাদকীয় স্তম্ভে তাকে 'শোচনীয়' আখ্যা দিতে বাধ্য হয়েছেন। অবশ্যি তারই সঙ্গে হত্যাকারী পুলিশের অপরাধ লঘু করার চেষ্টা হয়েছে এবং এই অমূল্য প্রাণের বিনষ্টির জন্যে দায়ী করা হয়েছে কমিউনিস্টদেরই। এখানে উল্লিখিত সম্পাদকীয় নিবন্ধটির সারাংশ তুলে দেওয়া হচ্ছে।

'শোচনীয় ঘটনা

'...কমিউনিস্ট দল তাহাদিগের রাজনৈতিক কর্মপন্থারূপে জনসাধারণের জীবনে অশান্তি সৃষ্টির জন্য এবং শান্তি-শৃঙ্খলার ব্যবস্থাকে উপদ্রুত করিবার জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে, এই হাঙ্গামা তাহারই একটি দৃষ্টান্ত। কমিউনিস্ট বন্দীদিগের অনশন ধর্ম্মঘটের প্রতি সহানুভূতি জানাইয়া গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতে হইলে মহিলাদিগকে

লইয়া আইনবিরুদ্ধ শোভাযাত্রা বাহির করিতে হইবে ইহারও কোন নীতি-সঙ্গত যুক্তি নাই। প্রতিবাদজ্ঞাপন করিবার বহুবিধ শান্তিপূর্ণ ও সঙ্গত-পন্থা সত্ত্বেও এইভাবে আইনভঙ্গের উদ্যোগ যাহারা করিয়াছে তাহাদের প্রকৃত লক্ষ্যও সহজে বুঝিতে পারা যায়। একটা হাঙ্গামা সৃষ্টি করিতে হইবে এই উদ্দেশ্য লইয়াই সুপরিকল্পিতভাবে, প্রস্তুত হইয়া কমিউনিস্টদিগের দ্বারা এই মহিলা শোভাযাত্রা বাহির করান হইয়াছিল। ···শান্তিপ্রিয় জনসাধারণের সকলেই স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তি-সম্পন্ন মানুষ, কোন ঘটনায় কাহারও প্রাণহানি হইলে স্বভাবতঃই জনসাধারণ বেদনাবোধ করিয়া থাকে এবং প্রাণহানির জন্য (বিশেষতঃ মহিলার) যাহারা দায়ী তাহাদের বিরুদ্ধে মন বিক্ষুব্ধ হয়। গত বুধবারের ঘটনায় চারিজন মহিলা সহ ৭ জন নিহতের সংবাদে সকলেই বেদনাবোধ করিবে।···

···যখন গায়ে পড়িয়া হাঙ্গামা সৃষ্টি কমিউনিস্টদের একটা প্রধান রাজ-নৈতিক কর্ম্মপন্থা হইয়া উঠিয়াছে তখন পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষের তাহার প্রতি-বিধানের জন্য বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করিবার প্রয়োজনও হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। যাহাতে এইরূপ ঘটনা আদৌ না ঘটিতে পারে তাহার জন্য সুপরিকল্পিত প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

···বুধবারের ঘটনার বিবরণে যাহা পাওয়া যাইতেছে, তাহা হইতে মনে হয় যে পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষ শোভাযাত্রা বাহির হইবার পূর্ব্বেই সময়োচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিতেন। তাহা হইলে হাঙ্গামার সুযোগ হ্রাস পাইত অথবা উহা আদৌ ঘটিত না।' (সম্পাদকীয়: আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৯. ৪. ৪৯)

রচনাটি শুধু অন্ধ কমিউনিস্ট-বিদ্বেষের বিষে জর্জর নয়—নৃশংসও বটে। রচনাটিতে কোথাও জল্লাদ পুলিশের বিরুদ্ধে একটি নিন্দার শব্দও সম্পাদক মশাই খরচ করেননি। লতিকা-প্রতিভারা নেহাৎ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে; তাই হয়তো ঘটনাটি 'শোচনীয়' বলেই তিনি অভিহিত করেছেন। অহল্যা-সরোজিনী-উত্তমী-বাতাসীরাও তো মেয়ে। তাদের মৃত্যুতে তো জাতীয়তা-বাদী দৈনিকের সম্পাদক মশাই এ ধরনের কোন সমবেদনা-জ্ঞাপক শব্দ খুঁজে পান না! পরিশেষে সাংবাদিকতার নির্মোক খসে যায় এবং সম্পাদক মশায় হয়ে যান—পুলিশের একজন স্বয়ং নির্বাচিত উপদেষ্টা।

অপরদিকে এই ঘটনায় কমিউনিস্ট লেখক ও কবিদের কলম ঝলসে ওঠে—তা থেকে ঝরে পড়ে অশ্রু-রক্ত-আগুন। তখন কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় লেখেন:

শান্তি নেই সেদিন থেকেই।
কী ক'রে ভুলব আমি, কী ক'রে ভুলব
সেদিন লতিকা সেন কলকাতার প্রকাশ্য রাস্তায়
বন্দী স্বামী-পুত্রদের মুক্তি দাবি ক'রে

বুলেটে জবাব পেল :
দেখেছি কেমন ক'রে দৃপ্ত কণ্ঠ ডুবে গেল ভলকে ভলকে রক্ত
রক্তের উচ্ছ্বাসে ;
দেখেছি কেমন ক'রে পাগলা কুত্তা হেলমেট মাথায়
লাঠি—গুলি—গ্যাসে—দাঁতে—নখে
রক্তবমনে উদ্‌গারে
বিষ্ঠায় নোংরায়
জীবনকে ক্লেদাক্ত করল।
শান্তি নেই সেদিন থেকেই। শুধু তারপর
অনেকদিন মাঝ রাত্রে ঘুম ভাঙা স্তম্ভিত, শুনেছি
দুধের বাচ্চার কান্না—যেন একলা অন্ধকার ঘরে
ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে কোন এক মাতৃহীন শিশু—
মা তার হারিয়ে গেছে তারাভরা কান্নার আকাশে !
('শান্তি নেই', মেঘ বৃষ্টি ঝড়, ১৯৪৯)

কমিউনিস্ট পরিবারের মা-বোনের মৃত্যু সেদিন সৃষ্টি করেছিল প্রতিটি কমিউনিস্টের মনে এক অসহ্য জ্বালা-যন্ত্রণা-ক্রোধের বিস্ফোরণ। লতিকা সেন যে পার্টির মহামূল্যবান সম্পদ ! বাংলার পার্টিতে তিনি ছিলেন প্রথম নারী-সদস্যা। লতিকা-প্রতিভারা সৃষ্টি করল এক নতুন 'লিজেন্ড'। কী করে অবহেলায় প্রাণ দিতে হয়—এই পাঠ নতুন করে পেল কমিউনিস্টরা—লতিকা-প্রতিভা-অমিয়া-গীতা-র আত্মদানে।

তাই সেদিন লেখা হয় এ ধরনের ক্রোধোদ্দীপ্ত রচনা :

রক্তাক্ত অধ্যায়

'কলকাতার বুকের উপর ২৭শে এপ্রিল নারীর রক্তে কংগ্রেসী পুলিশের যে তাণ্ডব নৃত্য হয়ে গেল, জাতির জীবনে তা আর কখনো ঘটেনি। কলকাতার সৎ নাগরিক এ বীভৎস দৃশ্য আর কখনও চোখে দেখেননি। কলকাতার নাগরিক আর বাংলার নিপীড়িত মানুষের কাছে বিধান সরকারের কৃষক মজুর প্রীতির ভণ্ডামির মুখোশ আজ আরও পরিষ্কার হয়ে গেল। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড মনে করিয়ে দেয় রক্তলিপ্সু চিয়াং'এর কথা। চীনের নিপীড়িত কৃষক-ছাত্র নর-নারীর রক্তে চীনের মাটি লাল করে দিয়েছিল চিয়াং। ক্ষমতাগর্বী মদমত্ত চিয়াং ভাবতেও পারেনি চীনের শোষিত নর-নারী রক্তের প্রতিশোধ নিয়ে তাকে পীত-সমুদ্রের পরপারে বিতাড়িত করে নিজেদের হাতে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী চীন গড়ে তোলার ভার নেবে। তেমনি আজ নিপীড়িত জনতার সামনে ২৭শে এপ্রিল অমিয়া, প্রতিভা, লতিকা ও গীতার রক্ত চিয়াং'এর দোসর বিধান সরকারের ভবিষ্যৎ পরিণতির সম্ভাবনাকে আরো স্পষ্ট করে দিয়ে গেল। প্রতিভার ছিন্ন আঙ্গুলগুলি, গীতা,

লতিকা আর অমিয়ার হৃৎপিণ্ড-উপড়ানো রক্ত বৌবাজারের রাজপথের ধূলো থেকে সুখী ভারত গড়ে তোলার চেতনাকে আগুনে-পোড়া ধারালো ইস্পাতের মতো আরো দৃঢ় ও শক্তিশালী করে দিয়ে গেল।

যে সুখী সংসার গড়ে তোলার জন্য খেত-খামার কল-কারখানা আর শহরের মধ্যবিত্ত মেয়েরা লড়াই করছেন তাদেরই সহযোদ্ধারা আজ বিধান সরকারের কারাগারে সরকারী জুলুমের বিরুদ্ধে অনশন করে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছেন। বিধান সরকারের ভাড়াটিয়া কাগজগুলি এই সরকারের জুলুমের এক বর্ণও প্রকাশ করতে সাহস করে নাই। সরকারী আদেশকে তারা নত শিরে মেনে নিয়েছে। কিন্তু যে মা-বোনেদের সুখী সংসার গড়ে তোলার সংগ্রামের জন্য এঁরা বন্দী—সেই মা-বোনেরা এই বীর বন্দীদের ভুলতে পারেননি। কলকাতার জনতার কাছে বন্দী সন্তানদের উপর সরকারী জুলুমের কথা তাদের জানাতে হবে। তাই সমিতির ডাকে শোভাযাত্রায় বেরিয়ে এলেন হাওড়া, হুগলী, ২৪ পরগণার সুদূর পল্লীগ্রাম থেকে মহিলারা, এলেন কলকাতার বস্তিবাসী আর মধ্যবিত্ত মেয়েরা। ঘরের টান পিছু টানতে পারেনি। গুলি, লাঠি, টিয়ার গ্যাসের ভীতিও তাদের আতঙ্কিত করেনি। কংগ্রেসের কারাগারে সন্তানরা তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে—আর এক মুহূর্তও দেরি নয়—জনতাকে জানাতে হবে সরকারী জুলুমের কথা—বাঁচাতে হবে সন্তানদের।

শুরু হলো শোভাযাত্রা। অবলা নারীর মিথ্যা অপবাদকে হেলায় তুচ্ছ করে শত শত নারীর দৃপ্ত কণ্ঠে ধ্বনিত হলো বিধান সরকারের জুলুমের কথা, ধ্বনিত হলো বীর সন্তানদের মুক্তির কথা। কিন্তু যে ইংরাজ জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যার উদ্যোক্তা সেই ইংরেজের পদাঙ্ক অনুসরণকারী কংগ্রেসী পুলিশের বুলেটের ঘায়ে লুটিয়ে পড়লো লতিকা, প্রতিভা, অমিয়া, গীতা আর পথচারী যুবক বিমান।...

...শুধুমাত্র কলকাতার রাস্তায় চারটি মেয়ের প্রাণ নেয়নি কংগ্রেসী বিধান-সরকার। তার বহু আগে সুদূর পল্লীগ্রামে চালিয়েছে তাদের পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড। মেয়েদের এই আত্মদান সংগ্রামের স্পৃহাকে দমাতে পারেনি একটুও, বরং এদের লড়াইয়ের ঐতিহ্য বহন করে এগিয়ে যাবে সংগ্রামী মেয়েরা বিজয়ের পথে। তাই প্রতিশোধের প্রস্তুতি আজ ঘরে ঘরে। প্রতিটি মেয়ে-পুরুষের মনে আজ জ্বলন্ত আগুন পুঞ্জীভূত হয়েছে। এই বারুদস্তূপ যেদিন জ্বলে উঠবে সেদিন এই নর-পশুদের একজনও বাদ যাবে না। তারই প্রস্তুতি চলেছে গ্রামে গ্রামে, কৃষক সমিতির নেতৃত্বে। গ্রামের এই কৃষক মেয়ে শহীদদের রক্তের আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন কল-কারখানার শ্রমিক মেয়ে আর কলকাতার মধ্যবিত্ত মেয়েরা। কংগ্রেসী সরকারের গুলি স্তব্ধ করে তাঁরা এগিয়ে চলেছেন, মৃত্যুর মিছিল তাঁদের বাধা দিতে পারেনি। তাঁদের এই মৃত্যুই মৃত্যুকে জয় করে গড়ে তুলবে সুন্দর সুখী সংসার।'

(লতিকা তোমার তপ্ত শোণিত ধারায়, ১৯৪৯)

২৭শে এপ্রিল, ১৯৪৯। স্মৃতির উজান ঠেলে দিনটিতে যদি আর এক-বার পেঁছানো যায়, তাহলে দেখা যাবে 'ভারতসভা হলে' শ' আড়াই মেয়ে জড়ো হয়েছেন এবং অনিলা দেবী সেই সভায় বক্তৃতা করছেন। সভা শেষে মেয়েরা ১৪৪ ধারা ভাঙার জন্যে রাস্তায় নামবে। বৌবাজারের মোড় থেকে মেডিকেল কলেজ পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকাটার পরিবেশ যেন এক অজানা আশঙ্কায় থমথমে। পথচারীরা ত্রস্ত পায়ে চলে যাচ্ছে। দোকানিরাও সতর্ক—যখন তখন দোকানের দরজা বন্ধ করতে হতে পারে।

অনিলা দেবী সেদিন এমন এক বক্তৃতা করেছিলেন—যা শুনে অনায়াসে গুলির সামনে বুক পেতে দেওয়া যায়। বক্তৃতা শেষ করে তিনি আরেকটি সভায় বক্তৃতা করার জন্যে মুসলিম ইন্সটিটিউট হলের দিকে রওনা দেন। তিনি বলছেন :

'যাবার পথে লতিকাদির সঙ্গে দেখা, জিজ্ঞাসা করলেন, 'যান কোথায় ?' হাসতে হাসতে উত্তর দিলাম, 'আপনি যান গুলি খেতে, আমি চলি মুসলিম ইন্সটিটিউটে।' তিনিও হেসে বললেন, 'তা যদি হয় দেখবেন সবাই মিলে আমার অনাথ ছেলেটিকে।'

মুসলিম ইন্সটিটিউটের সভায় আবেদন পেশ করছি, এমন সময় একটি মেয়ে এসে খবর দিলে, মিছিলে গুলি চলেছে, আহতও হয়েছেন কয়েকজন। গলা বুজে এলো।

ছুটলাম বৌবাজারের দিকে। বৌবাজারের মোড় তখন মিলিটারি-পুলিশ পাহারায় অবরুদ্ধ প্রায়। শুনতে পেলাম, গুরুতরভাবে আহত লতিকা, প্রতিভা, অমিয়া ও গীতা। আহতদের পুলিশ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। অব্যক্ত ব্যথায় মনটা আচ্ছন্ন হয়ে গেল। প্রতিভা, অমিয়া, গীতা—পরিচিত সবাই। আর লতিকাদি যে বড্ড কাছের মানুষ। একই বিদ্যালয়ের সহকর্মী। তাঁকে যে গুলি খাবার কথা আমিই বলেছিলাম। তাঁর ছোট্ট সমর যে বাড়িতে তাঁর ফেরবার পথ চেয়ে।

এমারজেন্সি ওয়ার্ডের সামনে গিয়ে ভিতর থেকে একজন অল্পবয়স্ক ডাক্তারকে বাইরে আসতে দেখলাম ; শুনলাম সবাই শেষ। তাঁর কাছে আরো শুনলাম, লতিকাদির স্বামী ডাঃ রণেন সেনের গোপন আস্তানার ঠিকানা জানার জন্যে পুলিশ লতিকাদিকে বার বার প্রশ্ন করেছে, কিন্তু অসহ্য মৃত্যু যন্ত্রণায় আচ্ছন্ন লতিকাদি মুহূর্তের জন্যেও তাঁর বৈপ্লবিক মানসিকতা হারাননি। পুলিশের সব চেষ্টা ব্যর্থ করেছেন।' (যে স্মৃতি ভোলার নয় / সাতাশে এপ্রিল)

ট্রাম, বাস থেমে গেছে—দোকান-পাট বন্ধ। মিছিল ছত্রভঙ্গ। গলির মোড়ে মোড়ে স্তব্ধ মানুষের ভিড়। কিছু ছাত্র, কিশোর ও মহিলার দঙ্গল বয়ে নিয়ে চলেছে একটি প্রাণহীন দেহ সকলের স্তব্ধ দৃষ্টির সামনে দিয়ে।

একটি অজ্ঞাতনামা পুরুষের নিথর দেহ। এই নামহারা মৃতের উদ্দেশে রাম বসু নিবেদন করলেন :

একটি হত্যা

ও যেখানে পড়ে আছে রক্তপদ্ম ফুটেছে সেখানে।

জনহীন রাজপথ সংজ্ঞাহীন ট্রামের লাইন
এপাশে নিষ্প্রাণ বাড়ি জড়সড় অন্ধকার মুখে
কয়েকটা পুলিশ ট্রাক, হেলমেট, রাইফেল, জীপ,
একটি শেলের শব্দ, মাটি ফেটে ধোঁয়ার নাগিনী
পাক খেয়ে উঠে পড়ে, শূন্যে দোলে চক্রময় ফণা।

রক্তাক্ত সে শুয়ে আছে পৃথিবীর সান্ত্বনার কোলে।

ওখানে রয়েছে শুয়ে গুলিবিদ্ধ একটা মানুষ
বুকে তার রক্তপদ্ম মুখে তার চৈত্রের পলাশ
অঙ্গ জুড়ে শান্ত নদী যন্ত্রণার গোলাপ বাগানে
তাকে ঘিরে গাছ পাখি বসন্তের প্রকৃতি আকাশ।

একটা হত্যার রক্তে ভেসে গেল শহরের মুখ
চমকে নিভলো আলো। তারপর ঘন অন্ধকারে
তার খোলা চোখে এল আস্তে আস্তে ভোরের আকাশ
সেই চোখে চোখ রাখে এত সাধ্য ছিল না খুনীর

ও যেখানে শুয়ে আছে সেখানেই জয়ের সম্মান
সেখানেই সূর্য ওঠে, সেখানেই জেগে থাকে ধান।

চার

শোকোচ্ছ্বাসের স্বতঃস্ফূর্ততায় কিন্তু পরের দিন হরতাল করানো গেল না। যথারীতি ট্রাম-বাস চলল, অফিস-কাছারি বসল। মজুররাও কাজ বন্ধ করল না। কাশীপুরে ন্যাশানাল কার্বনের গেটে দাঁড়িয়ে মজুরদের উদ্দেশে রণজিৎ দাশগুপ্তের প্রশ্ন : মজদুর লোক ক্যা হিজড়া বন্ গিয়া ? মজুররা গায়ে মাখল না ; তারা কারখানার ভেতরে চলে গেল। উল্টে দালাল ও পুলিশের হাতে নৃপেন চক্রবর্তীর দাদা কৃষ্ণ চক্রবর্তী খেলেন বেদম মার।

শহরের এখানে ওখানে বিক্ষিপ্ত কয়েকটি ঘটনার খবর পাওয়া গেল। তার মধ্যে ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণের অংশবিশেষ :

'মধ্যাহ্নের কিছু পরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্রদের এক সভা হয় এবং উহাতে বুধবার পুলিশের অনুষ্ঠিত কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া বক্তৃতা হয়। সভার শেষে কতকগুলি বালিকাকে পুরোভাগে রাখিয়া আনুমানিক দু'শ জনের এক শোভাযাত্রা পথে বাহির হয়।

রাস্তার নানাস্থানে এই সময় লোকজন জমায়েত হয়। বৌবাজার স্ট্রীট ও কলেজ স্ট্রীটের সংযোগস্থলে অনেক পুলিশ মোতায়েন থাকে। মেডিকেল কলেজের গেটের সামনে পুলিশের সহিত শোভাযাত্রীদের সংঘর্ষকালে বোমা ও ইটপাটকেল নিক্ষিপ্ত হয় এবং রাস্তার পীচ গলাইবার গাড়ীর তরল পীচে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয়। রাস্তা হইতে দুই একখানি ঠেলা গাড়ী সংগ্রহ করিয়া উহাতেও অগ্নি সংযোগ করা হয় এবং ঐ সকল জ্বলন্ত গাড়ী দ্বারা পথ রোধ করা হয়। এই হাঙ্গামার সময় শোভাযাত্রার একাংশ মেডিকেল কলেজের ভিতর ঢুকিয়া পড়ে।

অতঃপর উভয়পার্শ্ব হইতে রাস্তার উপর ইট-পাটকেল বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। জনতা ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার করে ও গুলি ছোঁড়ে।

অন্যান্য ঘটনা

প্রাতঃকালে বালীগঞ্জের দুইখানি ট্রামগাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করার চেষ্টা হয়। এই সম্পর্কে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয় : পরে শ্যামবাজার সেকশনে একটি ঘটনার পরে কলিকাতার উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে ট্রাম বন্ধ রাখা হয়।

অপরাহ্নে এক জনতা আপার সার্কুলার রোড ও মির্জাপুর স্ট্রীট সংযোগ-স্থলে ট্রামে অগ্নি সংযোগ করে। গাড়ীখানির প্রভূত ক্ষতি হয় : লাঠিধারি জনৈক কনস্টেবল জনতার অন্তর্ভুক্ত কয়েক ব্যক্তির দ্বারা গুরুতরভাবে প্রহৃত হয় বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায়। পরে ঘটনাস্থলে একটি পুলিশবাহিনী আগমন করে এবং জনতা ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য গুলি ছোঁড়ে। কেহ উহাতে হতাহত হয় নাই। পূর্বাহ্নে বিজ্ঞান কলেজের নিকট একখানি ট্রামগাড়ীর উপর এসিড বাল্ব নিক্ষেপের ফলে জনৈক কণ্ডাক্টার সামান্য আহত হয়। অতঃপর চীৎপুর ও নিমতলা সেকশনে ট্রাম চলাচল বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।'

(আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৯. ৪. ৪৯)

কলকাতার রাস্তায় পুলিশের এই নৃশংস নারীহত্যার খবর বন্দীদের কাছে গোপন রাখার চেষ্টা করে জেল কর্তৃপক্ষ। কিন্তু তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কৃষ্ণ চক্রবর্তী তখন প্রেসিডেন্সি জেলে। তিনি বলছেন, 'আমি তখন জেল হাসপাতালে। অনশনরত কমরেডরা অপেক্ষায় থাকত বাইরের খবরের জন্যে। আমিই প্রথম কাগজ পেতাম এবং তা পড়ে ভেতরে পাঠিয়ে দিতুম। তাদের পড়া হবার পর কাগজ আমার কাছে আসত এবং আমি ফেরত দিতুম। সেদিন ভোর ছ'টায় কাগজ পড়ে দেখি লতিকা-প্রতিভা

গুলিতে নিহত। কাগজখানি ভেতরে পাঠালাম। সঙ্গে সঙ্গে পোস্টার লেখা হল এবং দেয়ালে সাঁটা হল। সকাল আটটায় জেল সুপারিণ্টেডেণ্ট আসার সঙ্গে সঙ্গে তাকে থালা বাসন বাটি ছুঁড়ে অভ্যর্থনা জানানো হল।

বন্দীরা খবর পেল কী করে? জেল কর্তৃপক্ষের সন্দেহ আমার উপর এসে পড়ে। কাগজ কোথায়? আমি তাড়াতাড়ি কাগজ চেয়ে নিয়ে এসে ফেরত দিলুম। নাহলে এই চ্যানেল উড়ে যেত।'

বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে একমাত্র শরৎচন্দ্র বসু এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানান। বিবৃতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন:

'কলিকাতার রাস্তায় বুধবার অপরাহ্ণে যাহা ঘটিয়াছে উহা একটা নৃশংস ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নহে। নিরস্ত্র রমণীদের উপর গুলী না চালাইয়া যে গভর্ণমেন্ট অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারেন না সে গভর্ণমেণ্টের টিকিয়া থাকিবার কোন অধিকার নাই। মার্জিত রুচি সম্পন্ন প্রত্যেক নাগরিকের মুখে আজ এই দাবিই শোনা যাইতেছে যে 'ডাক্তার রায়ের মন্ত্রীমণ্ডলীকে বাংলার শাসন কর্তৃত্ব ত্যাগ করিতে হইবে।' আমি ঐ দাবিই অভিব্যক্ত করিতেছি।' (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৯. ৪. ৪৯)

ক্রুদ্ধ ও শোকাহত কমরেডদের মনে সেদিন এই প্রশ্ন বারবার দেখা দিয়েছিল—এতবড় নজিরবিহীন নারীহত্যার ঘটনা ঘটে গেল কলকাতার প্রকাশ্য রাজপথে—কিন্তু কই. ট্রামবাস অফিস আদালত তো অচল হল না! যা কিছু ঘটনা—সে তো পার্টি কমরেডরা ঘটিয়েছে। কারও ভেতরে কোন বিকার নেই যেন। এই ভাবলেশহীন মুখগুলোর মনের খবর কে বলে দেবে!

চিত্ত মৈত্র বলছেন, 'লতিকা-প্রতিভা যেদিন মারা গেল—সেদিন সন্ধ্যায় এক যাত্রার আসরে ঢুকে আমরা ক'জন আচমকা বক্তৃতা শুরু করি। লোকে প্রথমে বুঝতে পারে না। ভাবে এটাও বোধ হয় যাত্রা। পরে বুঝতে পেরে আমাদের তাড়া করে। তারা তো যাত্রা শুনতে এসেছে।'

কলকাতার মানুষের বিবেক অসাড়—এই ভেবেই ছাত্র কমরেডরা সেদিন বাড়ি ফিরে গিয়েছিল। কোথায় সেই কলকাতা—১৯৪৫ সালের নভেম্বরের কলকাতা! ১৯৪৬-এর ফেব্রুয়ারির কলকাতা!

ইলিয়া ইরেনবুর্গ তাঁর স্মৃতিকথায় বলছেন:

'কোন একটা ঘটনায় মানুষের কী প্রতিক্রিয়া ঘটবে—সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা কঠিন। কখনও কখনও এক হাজার মানুষকে হত্যা করলেও লোকের মনে কোন রেখাপাত করে না। আবার কখনও একজন মাত্র মানুষকে খুন করলে গোটা দুনিয়া কেঁপে ওঠে।' (মেময়ার্স, ১৯২১-৪১, পৃ ৮৩)

পাঁচ

১৯৪৯-এর জুন। কারাগারে বন্দীরা এখনও অনশনরত। অপরদিকে দক্ষিণ কলকাতার আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষ্যে ক্রমশ প্রকট হচ্ছে সাধারণ মানুষের কংগ্রেস- ও সরকার-বিরোধী মনোভাব। ঠিক এ সময়ে আরেকটি সংঘর্ষের সংবাদ :

এণ্টালিতে কম্যুনিস্ট পরিচালিত শ্রমিকদের সহিত পুলিশের প্রচণ্ড সংঘর্ষ

পটারী কারখানার গোলযোগের জের শ্রমিকগণ কর্তৃক কারখানা দখলপূর্বক বেপরোয়া মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার ঃ পুলিশের ৫১ রাউণ্ড গুলী বর্ষণ

এক ব্যক্তি নিহত ঃ কতিপয় পুলিশ অফিসারসহ ত্রিশ জনের অধিক আহত

'বুধবার সকাল সাড়ে এগারটা হইতে প্রায় তিন ঘণ্টা কাল ধরিয়া এই সংঘর্ষ চলে। এণ্টালী এলাকার পটারী কারখানার বহু শ্রমিক গত বুধবার সকাল প্রায় সাড়ে এগারটায় কারখানার দুইজন ছাঁটাই শ্রমিককে পুনর্নিয়োগের দাবী করে। তাহার পরিণতিতে এই সংঘর্ষের সূত্রপাত।' (যুগান্তর, ৯. ৬. ৪৯)

সাম্প্রতিক কালের শ্রমিক আন্দোলনের এক সন্দেহাতীত দিকচিহ্ন—এই ঘটনাটি। তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছেন পটারি শ্রমিক নেতা জগৎ বোস, 'মালিকপক্ষ রামধনু নুনিয়া ও নির্মল আচার্যকে ছাঁটাই করে। সংগ্রামের নতুন কায়দা হল—ডিপার্টমেণ্ট থেকে দাবি তুলতে হবে—ওদের নিতে হবে। এবং ওদের সঙ্গে নিয়ে শ্রমিকরা কাজে যাবে। তাই হল। পুলিশ এল এবং পুলিশের সাথে মারপিট হল। মাদ্রাজি প্যারামিলিটারি ফোর্স এসে কারখানা ঘিরে ফেলল। চারঘণ্টা ধরে শ্রমিকরা 'এল-টু' ছুঁড়ে তাদের সঙ্গে লড়েছে। মেয়েরাও রয়েছে এই লড়াইয়ে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় মুনিয়া খাতুন ও রুখিয়া বিবি। খাকসু কুমার, বিশ্বনাথ কুমার ও দুখি মুচি জঙ্গী শ্রমিকদের মধ্যে সবচেয়ে আগুয়ান। শ্রমিকরা গুঁড়ি মেরে মেরে নীচের থেকে ওপরে ইট পাথর বয়ে নিয়ে জড়ো করতে থাকে। পূর্বদিকের রেল লাইন থেকে পুলিশ দেখতে পায় এবং সিঁড়ি তাক করে গুলি করে। রামলক্ষ্মণ নুনিয়া গুলিতে মারা যায়। মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে রাম লক্ষ্মণের দেহ শ্রমিকরা ওপরে নিয়ে যায়।

চারঘণ্টা লড়াইয়ের পর পুলিশ আশ্বাস দেয়—তোমরা বেরিয়ে যাও—তোমাদের কিছু করা হবে না। বেরুবার সময় শ'দেড়েক শ্রমিককে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের মধ্যে রয়েছে দুখি মুচি। সেই শ্রমিকদের শিখিয়েছিল কী করে গামছায় 'এল-টু' বেঁধে পুলিশের দিকে ছুঁড়তে হয়। পুলিশের সঙ্গে লড়াইয়ের সময় তার ব্যাগ ভর্তি রেশন কারখানায় ছিল। গ্রেপ্তার হবার পর পুলিশের সঙ্গে ঝগড়া করে সে রেশন নিয়ে আসে কারখানার গেট থেকে।

ক্যাম্বেল হাসপাতালের মর্গে রামলক্ষ্মণের মৃতদেহ। মিছিল করে তার দেহ আনতে যেতে হবে। সবাইকে বলা হল—গাঙ্গুলী ময়দানে কাল মিটিং হবে। সেখান থেকে মিছিল বেরুবে। আমি বিবিবাগান বস্তির সামনে দাঁড়িয়ে। মাঠে লোক নেই। তিনটি ছেলে তখন লাল ঝাণ্ডা হাতে মাঠে দাঁড়িয়ে স্লোগান দিতে লাগল—লাল ঝাণ্ডাকি জয়। হঠাৎ কোথা থেকে দুহাজার লোক জড়ো হল। অজয় বোস ও আমার নেতৃত্বে ক্যাম্বেল হাসপাতালের দিকে মিছিল চলতে থাকে। কিন্তু হাসপাতাল পর্যন্ত গিয়ে আবার মিছিল ফিরিয়ে আনা হল। পুলিশের সাথে এক গুরুতর সংঘর্ষ এভাবে এড়ানো গেল।

তারপর পটারি কারখানার দরজা বন্ধ ও চার-পাঁচশো লোক ছাঁটাই। আমরা ধর্মঘট ঘোষণা করলাম। পার্টি আরও হঠকারিতার রাস্তায় আন্দোলন নিয়ে যেতে চাইলে আমি বিরোধিতা করলাম। পার্টি আমায় সাসপেন্ড করল। কয়েকদিন পর চিলড্রেন পার্কের জমায়েত ঘেরাও করে পুলিশ তিন-চারশো শ্রমিকসহ আমায় গ্রেপ্তার করল।'

কিন্তু পটারি শ্রমিকের লড়াই চলতে থাকে। একটি সংবাদ সূত্রে জানা যায়।

'পটারী শ্রমিকের প্রতিরোধ সংগ্রাম ৭০ দিন পার হইল। শ্রমিকেরা দাঁতে দাঁত চাপিয়া লড়িয়া যাইতেছেন। প্রত্যহ গেটের সম্মুখে পিকেটিং চলিতেছে। গেটের সম্মুখ হইতে, রাস্তার পাশ হইতে প্রত্যহ একজন, দুইজন করিয়া শ্রমিক গ্রেপ্তার হইতেছেন। এই পর্যন্ত গ্রেপ্তারের সংখ্যা সাড়ে তিন শত ছাড়াইয়াছে। · ১৩ই আগস্ট সত্যাগ্রহী মেয়ে শ্রমিকদের উপর পুলিশ বর্ব্বরভাবে লাঠিচার্জ করে। পঞ্চাশজন গুরুতর আহতদের মধ্যে ১০ জন মহিলা।

· তিন সপ্তাহ যাবৎ লক-আউট তুলিলেও মালিক ২০০ দালাল ও নূতন আমদানী লোক ছাড়া একজন সাচ্চা শ্রমিককেও পক্ষে পায়নি।' (মঞ্জিল, ১০ম সংখ্যা, ২১শে আগস্ট ১৯৪৯)

জগৎ বোস বলছেন, '১৯৪৯ সালে পটারির সমসাময়িক ঘটনা এলেনবেরি। টালিগঞ্জে ও হাওড়ায় এলেনবেরির মোটর ওয়ার্কশপ শ্রমিকরা দখল করে। আমি হাওড়ায় গিয়েছিলুম এবং দুদিন শ্রমিকদের সঙ্গে থেকে তাদের আসল সমস্যা বুঝতে পারলাম। কাঁচামাল যোগাড় হবে কী করে? তৈরি মালই বা বিক্রি হবে কোথায়?

পটারি ও এলেনবেরির শ্রমিকদের লড়াই থেকে উন্মোচিত হয় শ্রমিক আন্দোলনের এক নতুন দিগন্ত:

'আজকের বৈপ্লবিক পরিস্থিতিতে কোন আংশিক সংগ্রাম, কোন অর্থনৈতিক সংগ্রামই আজ আর সেই গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ থাকে না, উহা রাজনৈতিক সংগ্রামে পরিণত হয়; এমনকি ক্ষমতা দখলের প্রশ্নকেও সামনে আনে।' (কমিউনিস্ট বুলেটিন, ১২)

পটারি ও এলেনবেরি শ্রমিকদের লড়াই এই তত্ত্বকে জোরদার সমর্থন যোগাল। শ্রমিকদের প্রতি পার্টি থেকে আহ্বান জানান হল: পটারি ও এলেনবেরির পথে এগিয়ে চলো।

অন্তত একটি ক্ষেত্রে এলেনবেরির পুনরাবৃত্তি ঘটানার চেষ্টা হয়। ঘটনাস্থল—কাশীপুরের ন্যাশনাল কার্বন। সংবাদসূত্রে জানা যায়: ২৭শে জুন কাশীপুর ন্যাশনাল কার্বন কোম্পানিতে শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশ ও গুণ্ডাদের এক জোরালো সংঘর্ষ ঘটেছে। গুণ্ডার লাঠির ঘায়ে মিস্ত্রী শৈলেন মিত্র নিহত। লালঝাণ্ডা ইউনিয়নের অন্তত পনেরজন সদস্য বেয়নেট ও লাঠির ঘায়ে গুরুতর আহত। সংঘর্ষের ফলে ৪ জন পুলিশ এবং জাতীয় টি. ইউ.-র কয়েকজন সমর্থকও জখম হয়। আমদানি-করা লোকদের সর্দার ছবি সিং-ও আহতদের মধ্যে রয়েছে। পুলিশের তিনটি রাইফেল ও একটি পিস্তল শ্রমিকরা ছিনিয়ে নিয়েছে। প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে এই সংঘর্ষ চলে। পুলিশ শেষ পর্যন্ত ৭০ জন শ্রমিককে ধরে নিয়ে যায়।

শ্রমিকদের দাবি

১০০ টাকা—মূলবেতন
৫০ টাকা—মাগগি ভাতা
২০ টাকা—ঘর ভাড়া

বিনাবিচারে নিরাপত্তা আইনে আটক ইউনিয়নের সভাপতি বীরেন ভট্টাচার্য ও সেইসঙ্গে অন্যান্য সমস্ত রাজবন্দীর মুক্তি। (মঞ্জিল, ১০ই জুলাই, ১৯৪৯)

এই ঘটনা প্রসঙ্গে চিত্ত মৈত্র বলছেন, 'সে সময়ে আমাদের লক্ষ্য—আমরা এলেনবেরির কারখানা দখলের মতো ঘটনা কাশীপুরে সৃষ্টি করব। ঠিক হল ন্যাশনাল কার্বন দখল করা হবে এবং আমি গিয়ে ম্যানেজারের চেয়ারে বসব। প্রথমে শ্রমিকরা যাবে একটা 'চার্টার অব ডিমান্ডস্' নিয়ে—কথাবার্তা শুরু হতে না হতেই লেবার অফিসার ও ম্যানেজারকে তারা মারধর করবে। তারপর বাইরে থেকে আরও লোকজন নিয়ে আমরা ঢুকে পড়ব। আমাদের সমস্ত পরিকল্পনা জানাজানি হয়ে যায়। সেদিন (২৭শে জুন '৪৯) 'স্টেটস্‌-ম্যান' কাগজে সব বেরিয়ে পড়ে। সুতরাং মালিকপক্ষ তৈয়ার—পুলিশও তৈয়ার। আমাদের পক্ষ থেকে কয়েকজন শ্রমিক গেল—দাবিদাওয়ার তালিকা নিয়ে। লেবার অফিসার বলল—বেশ, তবে আলোচনা হোক। কিসের আলোচনা। শ্রমিকরা তাকে টেনে এক চড় মারল। ওরা তৈয়ার ছিল—পুলিশ এসে কারখানা ঘিরে ফেলল। গুণ্ডাদের হাতে দু'জন শ্রমিক খুন হয়ে গেল। ১৩৯ জন শ্রমিক গ্রেপ্তার হল ও তাদের মধ্যে চারজনের পরে সশ্রম কারাদণ্ড হয়। আমাদের খোঁজে পলিশ বস্তিতেও ঢুকে পড়ে।

নেতারা আমাদের ঠকাতে লাগল। কিছুই করা হল না কাশীপুরে।

ঠিক হল ডক ময়দানে আবার মিটিং করে পুলিশের সঙ্গে 'ক্ল্যাশ' (সংঘর্ষ) করা হবে। কারখানার ছুটির পর শ্রমিকরা বেরুতেই আমি বক্তৃতা শুরু করি। শ্রমিকরা শুধু বলতে লাগল, 'হাতজোড় করছি—আপনি এখান থেকে চলে যান। চলে যান।' অবশেষে তারা আমাকে টেনে নিয়ে চলে গেল। বুঝলাম, আমাদের ডাকে কেউ সাড়া দেবে না। যখন দেখলাম আমাদের দেখে লোক পালাচ্ছে—তখনই ধাক্কা খেলাম।

ন্যাশনাল কার্বনের ছাঁটাই শ্রমিক সুশীল ঘোষের পরিবারকে বাঁচাতে চাইলাম। আমরা ওর জন্যে মুষ্টি ভিক্ষা—কৌটোয় পয়সা জমানো—এসব করি। তবুও ওর দুই বাচ্চাকে বাঁচাতে পারলাম না। ওর বাচ্চাকে ক্যাম্বেল থেকে নিমতলায় নিয়ে যাই। বাবা দেখতে এসে বললেন, বাচ্চাটাকে তোরা বিনা চিকিৎসায় মেরে ফেললি!—সুশীল ঘোষ এখনও আমাদের সঙ্গে রয়েছে।'

ছয়

লতিকা-প্রতিভা-রামলক্ষ্মণ নুনিয়ার মৃত্যু, জেলখানায় বন্দীহত্যা, কলকাতার বুকে বাস্তুহারাদের উপর পুলিশী হামলা—সব কিছুরই হিসাব-নিকাশের দিনটি যেন ১২ই জুন ১৯৪৯। সেদিন দক্ষিণ কলকাতা উপনির্বাচন। সরোজ চক্রবর্তীর মতে এটা এমনই একটা উপনির্বাচন যার পরিণতিতে ডাক্তার রায়ের মন্ত্রীসভার পতন ঘটার উপক্রম।

স্বাধীনতা-উত্তর কংগ্রেসের প্রথম নির্বাচনী সভা অভূতপূর্ব হাঙ্গামায় লণ্ডভণ্ড। সভাটি ৫ই জুন দেশপ্রিয় পার্কে আহূত হয়। কংগ্রেস পতাকা ভস্মীভূত হয় এবং এসিড বালব ও ইট পাটকেলের আঘাতে কংগ্রেস নেতা প্রতাপচন্দ্র গুহ রায় ও বিজয় সিং নাহার আহত হন। চরম বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে সভা ভণ্ডুল হয়ে যায়। তারপর জনতার শোভাযাত্রা নিকটবর্তী কংগ্রেস নির্বাচনী কার্যালয়ের উপর হানা দিয়ে সেটাকে চুরমার করে। পুলিশ আসে, গুলি চলে ও একজন প্রাণ হারায়। শ্রমিক নেতা মুরারি মোহান্তিও পুলিশের গুলিতে আহত হন। (যুগান্তর, ৬. ৬. ৪৯)

সরোজ চক্রবর্তী লিখছেন:

'দক্ষিণ কলকাতার রাজনীতি-সচেতন মানুষেরা ১২ই জুন ভোট কেন্দ্রে যান। সেদিন বিশেষ কোন গণ্ডগোল হয়নি। একটি উপনির্বাচন উপলক্ষ্যে এই প্রথম সামরিক বাহিনীর শরণ নেওয়া হয়। আমি আমার স্ত্রীকে সঙ্গে করে আশুতোষ কলেজের মহিলা-ভোট কেন্দ্রে যাই। তখন বেলা তিনটা। শরৎবাবুর সমর্থকরা বুথের সামনে জমাট বেঁধে দাঁড়িয়ে অনবরত চীৎকার করছে, 'সুচেতা কৃপালিনী বেরিয়ে এসো—নেহরুর চর বেরিয়ে যাও।'

কংগ্রেসের নির্বাচন সংগঠনের কাজে সহায়তা করার জন্যে সুচেতাকে নেহরু পাঠিয়েছিলেন।

ক্রুদ্ধ জনতার হাত থেকে মহিলাটিকে রক্ষা করা তখন পুলিশ ও মিলিটারির পক্ষে এক কঠিন কাজ। সুচেতাকে বেরিয়ে আসতে হল এবং সংগে সংগে বিক্ষোভকারীরা তাঁর দিকে ধেয়ে গেল। পুলিশ ও সেনা-বাহিনীর লোকেরা সুচেতার চারপাশে কর্ডন তৈরি করে অতি কষ্টে তাঁকে গাড়িতে তুলে দিলেন। বিদ্রূপ ও গালাগালের কলরোলের মধ্যে সুচেতা চলে গেলেন। আমরা এরকম দৃশ্য আগে কখনও দেখিনি।

'১৪ই জুন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার খবরে নির্বাচনের ফলাফল জানা গেল। ১৯ হাজার ৩০০ ভোট পেয়ে শরৎচন্দ্র বসু নির্বাচিত হয়েছেন এবং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস প্রার্থী সুরেশ দাস পেয়েছেন ৫ হাজার ৭৫০টি ভোট। এতদিন পর্যন্ত কংগ্রেস-বিরোধী মোর্চা দানা বাঁধেনি। এবার শরৎচন্দ্র বসুকে ঘিরে কংগ্রেস-বিরোধী সংযুক্ত বাম মোর্চার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। এই পরাজয় মন্ত্রীসভা ও প্রদেশ কংগ্রেসের ভিত্তি নাড়িয়ে দিয়েছে। কংগ্রেস সংগঠনের কাজকর্ম বেশ কিছুদিনের জন্যে বন্ধ হয়ে গেল।' (উইথ ডক্টর বি. সি. রায়, পৃ ১১৯-২১)

'যুগান্তর'-এর সম্পাদকীয় নিবন্ধে এই নির্বাচনী পরাজয় থেকে কংগ্রেসকে শিক্ষা নিতে বলা হয় এবং মন্তব্য করা হয়, 'ইহা শরৎবাবুর জয় নহে, কংগ্রেসের পরাজয়।' (যুগান্তর ১৫. ৬. ৪৯)

'যুগান্তর'-এ প্রকাশিত আর একটি সংবাদ সূত্রে জানা যায়,

'কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার জনপ্রিয়তা হ্রাস ও কম্যুনিস্টদের তৎপরতা বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধানের জন্য পারিষদীয় বিষয় সমূহের সহকারী মন্ত্রী শ্রীযুক্ত সত্যনারায়ণ সিংহ আসিয়াছেন। তিনি ৯ই জুলাই দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিয়া পশ্চিম বঙ্গের সর্ব্বত্র যে বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে তাহার প্রতিকার কল্পে তাঁহার সুপারিশ সমূহ পণ্ডিত নেহরু এবং সর্দ্দার প্যাটেলের নিকট পেশ করিবেন।' (যুগান্তর, ৮. ৭. ৪৯)

দক্ষিণ কলকাতার উপনির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয় আগামী দিনের সংকেত-বাহী। ক্রমবর্ধমান বেকারি, বাস্তুহারা স্রোত এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্রের অহরহ দাম বাড়ার ফলে কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা দ্রুত হ্রাসমান। সমাজ-জীবনে পুঞ্জীভূত যাবতীয় বঞ্চনা ও ক্ষোভ যেন এই নির্বাচনের মাধ্যমে সোচ্চার হয়ে উঠেছে।

এই নির্বাচনে কমিউনিস্টদেরও সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। প্রসঙ্গত, দেশপ্রিয় পার্কের ঘটনায় পুলিশের গুলিতে কমিউনিস্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতা মুরারি মোহান্তি আহত হন। এই নির্বাচনের তাৎপর্য বিশ্লেষণান্তে কমিউনিস্ট পার্টির উপলব্ধি :

'দক্ষিণ কলিকাতার উপনির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয় শ্রেণী সংগ্রামকে তীব্রতর করিয়াছে। এই উপনির্ব্বাচন কোন সাধারণ নির্ব্বাচন নয়—ইহা ক্ষমতা দখলের সংগ্রাম। এই নির্ব্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীর পরাজয় শ্রমিকশ্রেণীর সামনে সেই ক্ষমতা দখলের প্রশ্নকেই উপস্থিত করিয়াছে। …উপনির্ব্বাচনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জনগণের যে বিক্ষোভ ফাটিয়া পড়িয়াছে তাহা ক্রমশঃ রূপ পাইবে আরো অসংখ্য শ্রেণী-সংগ্রামে কারখানায় ও ক্ষেত-খামারে। শ্রমিক-শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা না আসা পর্য্যন্ত এই বিক্ষোভ দমিবে না। ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা ধ্বংস করার কাজে লাল ঝাণ্ডা যে পথ দেখাইয়াছে, নির্ব্বাচনী সংগ্রামকে যেভাবে শ্রেণী সংগ্রামের স্বার্থে পরিচালিত করিয়াছে, তাহাই বামপন্থী সাধারণ কর্ম্মীদের আকৃষ্ট করিয়াছে। তাহারা দলে দলে লাল ঝাণ্ডার কার্য্যক্রমে সমর্থন জানাইয়াছে।' (মণ্ডিল, ১ম সংখ্যা, ১৯. ৬. ৪৯)

সাত

সংকটের কবলে কংগ্রেস দল ও মন্ত্রীসভা এবং সংকট মোচনের জন্যে তিন দিনের সফরে নেহরুর কলকাতা আগমন। নেহরুর সফর উপলক্ষ্যে কমিউনিস্ট পার্টি নানা জায়গায় বিক্ষোভ সংগঠিত করে। সেই বিক্ষোভের আওতায় নেহরুর জনসভাও বাদ যায়নি। 'যুগান্তর'-এর সংবাদসূত্র থেকে জানা যায়।

'…যখন হাজার হাজার নাগরিক প্রধান মন্ত্রীকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য পথে বাহির হইয়া আসে ঠিক সেই সময় শ্যামবাজারের মোড়ে হাজার হাজার জনতার মধ্যে এক কোণ হইতে তিনটি মহিলাসহ প্রায় বিশজন লোক 'নেহরু ফিরিয়া যাও' বলিয়া ধ্বনি তোলে এবং দূর হইতে কতকগুলি জিনিস ছুঁড়িয়া মারে। শ্রীমতী ইন্দিরার হাতে একটি শক্ত ধরনের জিনিস পড়িতে দেখা যায় এবং গাড়ীতে আরও কিছু পুস্তিকার মত সাদা কাগজ নিক্ষিপ্ত হয় বলিয়া মনে হয়।

শ্যামবাজারের মোড়ে গোলযোগের ফলে পুলিশের লাঠি চালনায় নয় জন আহত হয় ও তার মধ্যে তিন জনকে কারমাইকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মোট বাইশজন আটক ব্যক্তির মধ্যে, পাঁচজন বাদে বাকীদের মুক্তি দেওয়া হয়।

কৃষ্ণপতাকা সহ প্রায় ষাটজন লোক ধ্বনি সহকারে শিয়ালদহ স্টেশন পর্য্যন্ত যায় এবং সেইখান হইতে ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়।' (যুগান্তর, ১৩. ৭. ৪৯)

পরবর্তী গোলযোগ কেন্দ্র নেহরুর জনসভা। ১৪ই জুলাই ব্রিগেডে নেহরুর জনসভার জন্যে বিশেষ বন্দোবস্ত লক্ষণীয়। শালকাঠের শক্ত বেড়ার

খোপগুলির মধ্যে জনসাধারণ—১৮ ফুট উঁচু মঞ্চ—সাদা পোশাক ও সশস্ত্র পুলিশের সমারোহ। তবুও শেষ রক্ষা হল না। নেহরুর মঞ্চে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে বিরাট বিস্ফোরণ। বহু লোক মনে করেন তোপধ্বনি। কিন্তু ক্রমেই জানা যায় যে বোমার আঘাতে একজন পুলিশ নিহত।

'যুগান্তর'-এর নিজস্ব সংবাদদাতা লিখছেন:

'কলিকাতায় গতকাল (বৃহস্পতিবার) পণ্ডিত নেহরুর জনসভায় বোমা নিক্ষেপের ফলে একজন পুলিশ কনস্টেবল নিহত ও তিনজন আহত হইয়াছে। এই জনসভায় কম্যুনিস্টরা ক্রমাগত গোলমাল করিতে থাকায় এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে বোমা অথবা এসিড বালব্ নিক্ষেপ করায় দর্শকদের সহিত তাহাদের সংঘর্ষ হয় এবং তাহাতে পঁয়ত্রিশজন আহত হয়, তন্মধ্যে এগারজন পুলিশ কর্ম্মচারী। ময়দানে সভার শেষে একজন যুবক জনৈক উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্ম্মচারীকে লক্ষ্য করিয়া গুলী ছুঁড়িলে অশ্বারোহী পুলিশ পশ্চান্ধাবন করিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করে। প্রকাশ যে এই ব্যক্তির নিকট হইতে একটি রিভলবার ও নয়টি গুলী পাওয়া গিয়াছে। যুবকের নাম মৃণালকান্তি চ্যাটার্জী ওরফে টুকু। বেলিয়াঘাটা অঞ্চলে বাড়ী।' (যুগান্তর, ১৫. ৭. ৪৯)

নেহরু-বিরোধী বিক্ষোভের তিনটি দিন পুলিশ নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকেনি। তারা মোট একশ' জনকে গ্রেপ্তার করেছে এবং দশটি জায়গায় লাঠি ও গুলি চালিয়েছে। কমিউনিস্টরা নেহরু-বিরোধী কর্মসূচিতে বেশি লোক টানতে পারেনি—একথা ঠিক। কিন্তু কংগ্রেস সম্পর্কে সাধারণ মানুষ যে ক্রমশ উদাসীন হয়ে পড়ছে—একথাও অনস্বীকার্য।

সম্ভবত এই সত্য নেহরু তাঁর তিন দিনের সফরে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি দেখছেন কমিউনিস্টরা অবাধে তাণ্ডব চালিয়ে যাচ্ছে—অথচ লোকে তাদের ধরে পেটাচ্ছে না। ব্রিগেডের জনসভায় তাঁকে খেদোক্তি করতে দেখা যায়। তাঁর অবাক জিজ্ঞাসা:

'আমাদের দেশের এই বিরাট শহরে এতবড় জনতা থাকিতে তাহা কি করিয়া বরদাস্ত করিতেছে সে কথা আপনারা বিচার করুন। সময় সময় আট-দশজন যুবক আসিয়া ট্রাম, বাস থামায়—বলে 'ট্রাম হইতে নাম'। তখন ভিজা বিড়ালের মত সকলে নামিয়া যায়। সমস্ত জনতা যদি ইহাই চলিতে দেয়, তবে মনে রাখিবেন তাহার অর্থ এই দাঁড়াইবে যে কলিকাতায় মানুষের থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিবে, সকল পেশা কাজ-কারবার বন্ধ হইয়া যাইবে। শহরে একটা পক্ষাঘাতের অবস্থা হইবে। আমাদের রাজনীতি কি কতকগুলি লঘুচিত্ত বালকের হাতে গিয়া পড়িবে।' (যুগান্তর, ১৫. ৭. ৪৯)

বিড়লার মুখপত্র 'ইস্টার্ন ইকনমিস্ট'-এর ১৫ই জুলাই সংখ্যায় নেহরুর

কলকাতা সফর ও সাম্প্রতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে এক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাতে বলা হয়:

'এই সপ্তাহে প্রধান মন্ত্রীর কলিকাতা সফরে আগেকার মত বিজয় মিছিল হইতে পারে নাই। যদিও দশ লক্ষ লোক তাঁহার কথা শুনিয়াছিল, তবুও স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল যে, লোকের তাঁহার সম্পর্কে মোহমুক্তি ঘটিয়াছে। এমন কি আগে যাহা তিনি কখনও দেখেন নাই এইবারে সোজাসুজি বিরোধিতাও দেখা গিয়াছিল। ইহা পরিষ্কার যে পশ্চিম বাংলায় কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিপত্তি প্রাদেশিক সরকারের অপেক্ষা কম ক্ষুণ্ণ হয় নাই; আরও ভয়ানক কথা যে বিশেষ কোন যুক্তি না থাকিলেও প্রতিপত্তি বাড়িয়াছে তাহাদের, যাহারা শুধু কংগ্রেসের নয়, স্বাধীনতা ও সুশৃঙ্খল উন্নতির শত্রু... ইহা হইতে পরিষ্কার বোঝা যাইতেছে যে, সম্পূর্ণ নূতন ধরনের বেপরোয়া-ভাব বাংলাদেশে দেখা যাইতেছে। এই মনোভাব বাড়িতেছে বলিয়া কংগ্রেসের অতীতের অবদানের প্রতি নজর আকর্ষণের চেষ্টা নিরর্থক হইয়াছে; ইতিমধ্যেই তাহার সবই বিস্মৃতির তলে গিয়াছে। এমন কি প্রধানমন্ত্রী যে বলিয়াছিলেন, কংগ্রেসই দেশের রাজনৈতিক একতার একমাত্র আধার, তাহাও আর জনসাধারণের মনে কোন দাগ কাটিতে পারে নাই।' (মঞ্জিল, ২৪. ৭. ৪৯)

পরবর্তী ঘটনাপঞ্জী থেকে এটা স্পষ্ট যে রায় মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা করার কথা কংগ্রেস নেতারা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেছেন। ১৭ই জুলাই 'যুগান্তর'-এ প্রকাশিত এক খবরে প্রকাশ: পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি ও আইনসভা ভেঙে দেওয়ার প্রস্তাব বিবেচনাধীন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় পণ্ডিত নেহরু এই মর্মে সুপারিশ করেছেন। নেহরুর মতে, পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেস ও মন্ত্রীসভা—দুই-ই জনসাধারণের অপ্রিয়ভাজন হয়ে উঠেছে।

২৯শে জুলাই-এ প্রকাশিত 'যুগান্তর'-এর পরবর্তী সংবাদসূত্রে জানা যায়, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি আগামী ছ'মাসের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে বলা হয়:

'... প্রদেশের অধিকাংশ জায়গায় ১৪৪ ধারা জারি রহিয়াছে। সভা-সমিতি, মিছিল করার অধিকার বন্ধ রহিয়াছে। দৈনিক ও সাপ্তাহিক খবরের কাগজ অন্ততঃ ২৫টি বন্ধ করা হইয়াছে। প্রায় ৫০০০ মজুর-কৃষক-ছাত্র আটক বা বিচারাধীন রহিয়াছেন। কংগ্রেসী ঘাতকদের হুকুমে ২২ জন নারী নিহত হইয়াছেন। পুরুষ হতাহতের সংখ্যার ইয়ত্তা নাই। শ্রমিকদের পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনী রহিয়াছে। হলঘরে পর্যন্ত সভা করার অনুমতি কাড়িয়া লওয়া হইতেছে। প্রগতিশীল বই বিক্রয় পর্যন্ত বন্ধ করা হইতেছে। ন্যূনতম নাগরিক অধিকার কাড়িয়া লইয়া হাজার হাজার মজুর-

কৃষককে জেলে রাখিয়া কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী রাখিয়া নির্বাচনের ব্যবস্থা জনসাধারণের সাথে তামাসা ছাড়া আর কিছুই নয়।

ঐ সাধারণ নির্ব্বাচনের আগেই এখনই পুরা নাগরিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার, ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার, সকল রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি, কমিউনিস্ট পার্টির উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটের অধিকার জনসাধারণ আদায় করিবে। বাঁচার মত মজুরি ও ৮ ঘণ্টা খাটুনী, ছাঁটাই বন্ধ, মূল শিল্প জাতীয়করণ, বিনা খেসারতে জমিদারী উচ্ছেদ ও জমি জাতীয়করণ করিয়া লাঙ্গল যার জমি তার এই ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য শ্রমিক ও শোষিত জনতার লড়াই চলিতে থাকিবে।' (মঙ্গল, ২৪. ৯. ৪৯)

নির্বাচনের আবশ্যকীয় শর্ত হিসাবে ব্যক্তি স্বাধীনতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও শ্রমিক কৃষকের আশু দাবির ভিত্তিতে আন্দোলন জনপ্রিয় হতে পারত সেদিন—যদি কমিউনিস্টরা অন্যদেরও সামিল করে ধারাবাহিক গণ-জমায়েতের মাধ্যমে আন্দোলনের কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে যেত। কিন্তু তার পরিবর্তে তারা এগিয়ে গেল একক সংঘর্ষের পথে।

আট

মানুষের শীতল ঔদাসীন্যের মুখোমুখি আরেকটি ১৫ই আগস্ট। কমিউনিস্ট পার্টি আরেকবার এই মেকি 'স্বাধীনতা'কে ধিক্কার জানাবার আহ্বান জানাল। এইদিন শ্রমিক, ছাত্র, বাস্তুত্যাগী ও জনসাধারণের এক বিরাট অংশ কমিউনিস্টদের ডাকে সমাবেশ ও মিছিলে সামিল হয়। সংবাদ-সূত্রে জানা যায়, কলকাতার বুকে ঐদিন বি. পি. টি. ইউ. সি. ও অন্যান্য বামপন্থীদের জমায়েতে যত লোক প্রতিবাদ ঘোষণা করেন—তার সংখ্যা পঁচিশ-তিরিশ হাজারের কম হবে না।

'নেশন' পত্রিকার (১৬. ৮. ৪৯) এক সংবাদে প্রকাশ, বজবজের কাছা-কাছি বুরুল গ্রামে বিক্ষোভকারীদের উপর গুলি চালিয়ে সরকার ১৫ই আগস্টের 'মর্যাদা' অক্ষুণ্ণ রাখেন।

যাদবপুর, বেহালা ও উত্তর কলকাতায় ছাত্র-ছাত্রীদের বিক্ষোভ মিছিল মেকি 'স্বাধীনতা'কে ধিক্কার জানিয়ে পথ পরিক্রমা করে। শিবপুরের কয়েকটি বাড়িতে কালো পতাকা উড়তে দেখা যায়। বাগনান থানার সামনেই কালো পতাকা তোলা হয়। তাছাড়া রাস্তার মোড়ে মোড়ে ঝাঁটা, জুতো ঝুলতে দেখা যায়।

ঐদিন বাঁকুড়া শহরে শ্রমিকরা ধর্মঘট পালন করে। ধর্মঘটী শ্রমিকদের শোভাযাত্রা শহর পরিক্রমার পর বিকেল পাঁচটায় কালীতলা ময়দানের সভায় জমায়েত হয়। এর পাশাপাশি 'কংগ্রেসী' উৎসব প্রহসনে পরিণত হয়।

সারা শহরে মাত্র কয়েকটি বড় বড় ধনী চোরাকারবারীদের অট্টালিকা, জেলা হাকিম ও সরকারী কুঠিতে তেরঙ্গা ঝাণ্ডা উড়তে দেখা যায়। সকালে ও বিকেলে দুবার কংগ্রেসীরা দশ-বারো বছরের দশ-পনেরটি বাচ্চা জুটিয়ে 'শোভাযাত্রা' করার চেষ্টা করলে শহরে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়।

বর্ধমান শহরেও একই দৃশ্য। প্রতিবাদী শ্রমিক-ছাত্রের সভায় যেখানে ছ' হাজার লোক—কংগ্রেসের সভায় সেখানে দশ-বারো জন। ডায়মণ্ডহারবার ও বসিরহাটের কংগ্রেসী সভা জনতার দখলে চলে যায়। বহুদিন পর আবার আসানসোলের কয়লাখনি অঞ্চলে লাল ঝাণ্ডা হাতে শ্রমিকদের মিছিল দেখা যায়। ভাটপাড়ায় পাঁচমন্দির প্রাঙ্গণে সরস্বতী দেবীর সভানেতৃত্বে মহিলা ও ছাত্রীদের এক প্রতিবাদসভায় শতাধিক মহিলা ও ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন। সভার শেষে একটি শোভাযাত্রা বার হয়।

ঐদিন নানা জায়গা থেকে হামলা ও সংঘর্ষের সংবাদ আসে। যেমন, বেলেঘাটায় বিক্ষোভ মিছিলের উপর কংগ্রেস অফিস থেকে একদল গুণ্ডা বোমা ছোঁড়ে। ইছাপুরে বিক্ষোভকারীদের উপর আই. এন. টি. ইউ. সি.-র লোকজন হামলা করে। হাওড়ার মুগকল্যাণে ছাত্র-মহিলা মিছিলের উপর হামলা চালায় কংগ্রেস সেবাদল। গুরুতরভাবে আহত হন লেখক শচীকান্ত ঘোষ, গণনাট্য সংঘের কর্মী মৃণাল ঘোষ ও ছাত্রী লীলা চক্রবর্তী। তবুও শোভাযাত্রীদের দমানো যায়নি—আক্রমণ প্রতিরোধ করে তাঁরা বাজার ও আট-দশটি গ্রাম প্রদক্ষিণ করে।

কিন্তু ভয়ংকর ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বাধে আরও কয়েকদিন পর বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর এলাকায় বাঁধগাবা গ্রামে। সংবাদসূত্রে জানা যায় :

'১৮ই আগস্ট বাঁধগাবা গ্রামে সশস্ত্র পুলিশবাহিনী ৭-৮শ রাউন্ড গুলি চালিয়েছে। ফলে ১ জন মেয়ে মজুর ও ১ জন ছেলে মজুর নিহত এবং ৬ জন মজুর আহত। গুলি বৃষ্টির মধ্যে মজুর কৃষকেরা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করে। পুলিশের বেপরোয়া গুলি বর্ষণের চোটে গাছের ডালপালা পর্যন্ত ঝরে পড়ে।' (মশাল, ৪. ৯. ৪৯)

সেদিনের কথা বাঁকুড়ার প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিকথায় ধরে রেখেছেন। তিনি লিখেছেন :

'১৫ই আগস্ট বিষ্ণুপুরে এমন একটা মিছিল করা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল যাতে লোকে চমকে যায়। সেদিন সকাল থেকে লোক জমতে শুরু করে মনসা-পাড়ায়। ঠিক হয় মিছিলের নেতৃত্ব দেব আমি। ময়রাপুকুর হয়ে মিছিল ঢুকবে শহরে।

বিষ্ণুপুরের লোক সেদিন ঐতিহাসিক মিছিল দেখেন। দশ হাজারের বেশি মানুষের মিছিল। বাঁধগাবায় মিছিল শেষ হয়। টাঙ্গি, বল্লম, তীর ধনুক তো ছিলই, আর ছিল কাড়ানাকাড়া। কাড়ানাকাড়া বাজিয়ে শহরকে গরম করে দিয়ে মিছিল চলতে থাকে শহরের বুকে। ভয়ে সেদিন এস. ডি. ও.

এবং পুলিশ পালিয়ে যায় শহর থেকে। শহরের লোক রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে মিছিলকে প্রণাম করেছিল সেদিন।

উপর মহলে খবর যায় অবস্থা আয়ত্তের বাইরে। কলকাতা থেকে ডি. আই. জি.-স্থানীয় একজন অফিসারকে এখানে পাঠানো হয়। পুলিশ সুপারকে বদলি করা হয়। চারদিকে আতঙ্ক ছড়ানো হচ্ছে আমাদের নাম করে। কমিউনিস্টদের খতম করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

আঠারোই আগস্ট সকালের দিকে গুলির আওয়াজ শুনি। আমি তখন ক্ষিরাইবনীতে। শব্দ শুনে বাঁধগাবার দিকে আসতে থাকি। আমার সঙ্গে রবি লোহার। শুনলাম যে ভোরের দিকে মেয়েরা ঘরের বাইরে যেতে চাইলে পুলিশ বাধা দেয়। (আগের থেকেই কৃষ্ণ বাঁধের পূর্ব পাড়ে ভট্টাচার্যদের ধান কলে অনেক সশস্ত্র পুলিশ রাখা হয়। পুলিশের কাছে খবর ছিল যে বাঁধগাবায় আমি সহ কমিউনিস্ট নেতারা সব আছেন।) মেয়েরা বাধা দেওয়ার কথা গ্রামে বললে তিরিশ চল্লিশজন পুরুষ ও নারী লাঠি, ঝাঁটা, কাস্তে, কুড়ুল নিয়ে পুলিশকে আক্রমণ করতে যায়। পুলিশও ভয় পেয়ে আত্মরক্ষার জন্য পাঁচ রাউন্ড গুলি চালায়। গুলির আঘাতে সুরধনী ও বৃন্দা শহীদ হন। নাকাড়া টিন ইত্যাদি বাজানো শুরু হয়। কাতারে কাতারে লোক আসতে থাকে। পুলিশ এনফোর্সমেন্ট-ও বাড়তে থাকে। এসে দেখি দুটো শিবির থম থম করছে। কামারপুকুরের তিন চারটা জংলী ছেলে গোপনে খাল ধারে এসে পুলিশকে তীরের আঘাত মারে, তাতে ছ-সাতজন পুলিশ জখম হয়। তারপর শুরু হয় পুলিশের তাণ্ডব। শরৎ লোহার, সহদেব টাঙ্গি, পশুপতি লোহার ও বাঁকু লায়েক শহীদের মৃত্যু বরণ করেন। আহতও হন তিরিশ চল্লিশ জন। এত গুলি চালানো সত্ত্বেও সেদিন মানুষ কিন্তু ভয়ে পালিয়ে যায়নি। পুলিশ মৃতদেহগুলোকে বাঁশে করে যেমন করে মৃত পশু ঝুলিয়ে নিয়ে যায়, সেভাবে শহরের রাস্তা দিয়ে নিয়ে এসে থানার সামনে ফেলে রাখে। উদ্দেশ্য মানুষকে ভয় পাইয়ে দেওয়া।

উপস্থিত ১৫-১৬ জন নেতৃস্থানীয় কমরেডের সঙ্গে পরামর্শ করে ছয় সাত হাজার লোককে নটী হীরের জঙ্গলের দিকে ঠেলে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হয়।

গ্রামে গ্রামে হন্যে হয়ে আমাদের খুঁজতে থাকে পুলিশ। আর খোঁজে সে-দিনের গুলিতে আহতদের। গাঁয়ের মানুষ গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হলো পুলিশের ভয়ে। জঙ্গলে গাছ কেটে পাতার কুঁড়ে করে আমরা আছি, লোকেরাও আছে। সতর্কতা আমাদের বেড়েছে। সংগঠনকেও জোরদার করা হয়েছে। এর কিছুদিন পরেই পুলিশ জগন্নাথপুরে একটা ঘটনা ঘটাল। ঘরছাড়া মানুষগুলো জগন্নাথপুরে ঘর-বাড়ীর খবর আনতে জনাকয়েক লোককে পাঠায়। বিমল সরকার ও মানিক দত্ত গাঁয়ের বাইরের জঙ্গলে ছিলেন। গাঁয়ের সদগোপ ছেলেরা গরু চরাতে এসে এদের দেখে ভয়ে চীৎকার করে গাঁয়ে ফিরে যায়। সেখানে পুলিশ ক্যাম্প ছিল। জগন্নাথপুরের প্রেসিডেন্ট পুলিশকে ঘটনাটা বলে এবং পুলিশ এসে সামনে নির্মল নায়েক ও গেড়ু

মহাদণ্ডকে দেখতে পায়। পুলিশ নির্মল নায়েকের বুকে বন্দুকের নল লাগিয়ে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে হত্যা করে। গেড়ু মহাদণ্ড কিছু দূরে ছিল বলে তার বুকে বন্দুকের গুলি লেগে মারা গেলেও পুলিশ তার মৃতদেহ পায়নি। কমিউনিস্টরা তার মৃতদেহ জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে পুঁতে দেন। এই ঘটনায় ভয় আতঙ্ক আরো বাড়ল। গাঁয়ের লোক গাঁয়ে আর ফিরল না।' (বাঁকুড়া জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের স্মৃতিকথা, পৃ ৪১-৪৩)

কাকদ্বীপ থেকে যে রক্তঝরা কাহিনীর সূচনা তা বিস্মৃত হয়ে পৌঁছল বাঁকুড়ার অরণ্য-ভূমিতে। 'স্বাধীনতা'র তৃতীয় বৎসরে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ মানুষ অনুভব করল স্বাধীনতার স্বাদ রক্তের মতো লোনা।

নয়

অহল্যা-বাতাসী-সুধীর-সুরেনদের রক্তে ভেজা কাকদ্বীপের মাটি জন্ম দিল এক নতুন কাহিনী। শিশু তেলেঙ্গানা।

> অহল্যা মা তোমার সন্তান জন্ম নিল না
> আজ ঘরে ঘরে সে সন্তানের প্রসব যন্ত্রণা।

সেদিন গণবিপ্লবীদের কণ্ঠে এই গান প্রতিধ্বনি জাগাত মিছিলে মিছিলে আরও হাজার কণ্ঠে। তারপর কত জল বয়ে গিয়েছে ইছামতী দিয়ে। কিন্তু গান থেমে গেলেও তার রেশ যে অফুরান। তাই পরবর্তী প্রজন্মের কবিকেও লিখতে হয় :

> কাকদ্বীপ আর ডুবির ভেড়িতে
> বুড়ো চাষীদের চোখগুলি জ্বলে
> নাতি নাতনির কাছে কাহিনীর ছলে
> অশোক বোসের কথা বলে।

কে এই অশোক বোস? এই নামে আজ কেউ চিনবে না তাঁকে। প্রকাশ রায় নামে হয়তো কেউ কেউ তাঁকে চিনতেও পারে এবং প্রকাশ রায়ও আজ নেই। তিনি মারা গিয়েছেন ১৯৮৩ সালে মধ্যপ্রদেশের রাজনন্দন গাঁওয়ে।

কাকদ্বীপ ইতিবৃত্তের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য দুটি নাম—কংসারি হালদার আর অশোক বোস।

কংসারি হালদার বা মধুদার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই সদ্য পাশ-করা ডাক্তার, শহুরে মানুষ পূর্ণেন্দু ঘোষ অভিভূত। তাঁর ভাষায়,

'কংসারি হালদারকে দেখতে একেবারে গ্রাম্যচাষীর মত। হাতে ঠিক আমার থলির মতই একটা থলি, তবে মধুদার থলিটা মাদারীর থলি। হেন জিনিস নেই যা তার মধ্যে পাওয়া যাবে না, মশারি থেকে আরম্ভ করে পেরেক হাতুড়ি পর্যন্ত সবকিছুই তার মধ্যে আছে। ডাক্তারের ওপরেই তিনি ডাক্তারী করলেন। মাদারীর ঝোলা থেকে বেরিয়ে এল ছুঁচ তুলো আর স্পিরিট। ছুঁচটা পুড়িয়ে নিয়ে পটাপট ফোস্কাগুলো গেলে জল বার করে দিলেন আর কি একটা দিশি ওষুধ লাগিয়ে ন্যাকড়ার পট্টি বেঁধে দিলেন।' (নতুন জুতো পায়ে দীর্ঘপথ হাঁটায় অনভ্যস্ত ডাক্তারের পায়ে ফোস্কা পড়েছিল।)

অশোক বোসের সঙ্গে যেদিন প্রথম দেখা, সেদিন ডাক্তার দেখলেন :

'দাওয়ার ওপর মাদুর বিছিয়ে বসে আছেন একজন মাঝবয়সী লোক। টেমির আলোতে একমনে লিখে চলেছেন। দাওয়াটা যেমন অন্ধকার লোকটির গায়ের রং ততোধিক কালো, কেবল টেমির আলোতে খাঁড়ার মত নাকটা চকচক করছে। হাতের ঝোলা একপাশে রেখে মুখটা ঠাওর করে দেখলাম—মাঝবয়সী তো নয়ই, বয়েস খুব বেশী হবে তো বড়ো জোর ত্রিশ বত্রিশ।'

মিটিং-এ গেলাম। একটা ঘরে জনা পঁচিশেক কৃষক বসে আছেন। যেতেই তো হৈ হৈ করে অভ্যর্থনা। এই মিটিং-এ অশোক বোসের ভেতর থেকে বিদ্যুৎকে বেরিয়ে আসতে দেখলাম। একদমে কথা বলে ফুসফুসের শেষ হাওয়াটুকু পর্যন্ত বার করে দিয়ে কথা শেষ হয়। সভায় উপস্থিত সকলের মধ্যে একটা বিদ্যুৎ ঝলক খেলে যায়, রক্ত গরম হয়ে ওঠে। কথাগুলো যেন প্রাণ পেয়ে ঘরময় ঘুরে ফিরছে। এরকমের অনুভূতি ইতিপূর্বে আর কখনও হয়নি যদিও আমি বেশ বড়ো বড়ো নেতার ভাষণ শুনেছি।' (প্রসঙ্গত, অশোক বোস কাকদ্বীপে বিদ্যুৎ নামে পরিচিত।)

১৯৪৭-৪৮ সালে পশ্চিম বাংলার অন্য কোথাও তেভাগা আন্দোলনের অস্তিত্ব ছিল না। এখানে কিন্তু তেভাগা আন্দোলন থেমে যায়নি। কৃষকরা নিজ খামারে ধান তুলেছিল। ১৯৪৭-৪৮ সালে ধান কাটা অবধি কাকদ্বীপ সরকারি ভাষায় 'অশান্ত'। ১৯৪৮-৪৯ সালেও তেভাগার দাবিই জোরদার থাকে। ১৯৪৯ সালে আন্দোলনের নবপর্যায় শুরু। তিন ভাগের দুভাগ নয়, সমস্ত ধানই চাইল কৃষক, চাইল 'লাঙল যার জমি তার' হোক।

কাকদ্বীপ-ইতিবৃত্তের উন্মেষ ও বিকাশের বিবরণ কংসারি হালদারের মুখ থেকে শোনা যাক। তিনি বলছেন :

'১৯৪৩ সালের সাইক্লোন-বিধ্বস্ত কাকদ্বীপ ঘুরে এসে খুব খারাপ লাগল। ঠিক করলাম এখানেই কাজ করব এবং ডায়মণ্ডহারবারে অফিস খুলে বসলাম। জুটে গেল যতীন মাইতি আর গুণধর মাইতি। ১৯৪৬-এ তেভাগার জোয়ারে কাকদ্বীপ, বড়াকমলাপুর আর জয়নগরে লড়াই খুব জোর শুরু হয়। জয়নগরেই প্রথম গুলি চলে। অন্য অঞ্চল থেকে কিন্তু

সুন্দরবন এলাকার অবস্থা একেবারেই পৃথক। দুর্ভিক্ষ ও সাইক্লোনের ধাক্কায় মানুষের চরম দুরবস্থা। কাকদ্বীপ-সাগরদ্বীপ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অঞ্চল। সেজন্যে এখানে অত্যাচার সবচেয়ে বেশি চলে লোকচক্ষুর অন্তরালে। লাট-দারের নাম মণীন্দ্র নন্দী। কাকদ্বীপ ও হাসনাবাদের জন্যে তেভাগা আন্দোলনের প্ল্যান নেওয়া হয়। আমায় কাকদ্বীপের দায়িত্ব দেওয়া হল। আমি প্রথমে আসি বুধাখালি। পরে যাই লয়ালগঞ্জে। ইতিমধ্যে চন্দনপিঁড়ি, ফ্রেজারগঞ্জ আর লয়ালগঞ্জে কৃষক সমিতি তৈরি হয়েছে—পার্টি গড়ে উঠেছে। ওদিকে জোতদারের অত্যাচারও চরমে উঠেছে। আমাদের সহায় সম্বলের নিতান্ত অভাব। তার উপর দুর্গম অঞ্চল। সরাসরি যাতায়াত একেবারে অসম্ভব। প্রথমে লক্ষ্মীকান্তপুর পৌঁছে হাঁটাপথ ধরতে হত—পথে পড়ত গোটা দুই নদী—সেগুলো পেরুতে হত। পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে চলাফেরা করতে হত।

আমার পরিক্রমা শুরু হত প্রথমে বুধাখালি এসে—সেখান থেকে বারো মাইল দূরে লয়ালগঞ্জ; তারপর চন্দনপিঁড়ি—মাঝখানে পড়ত রাজনগর। ১৯৪৬ সাল থেকেই এগুলি আমাদের ঘাঁটি হয়ে গেল। স্থানীয় লোক আমাদের—যতীন মাইতি, গুণধর মাইতি, জগন্নাথ; লয়ালগঞ্জের গজেন মালি, মাণিক হাজরা ও ভূষণ কামিলা। বোমায় চারটে আঙুল হারাল শিবরামপুরের ভূষণ কামিলা। তাছাড়া ছিল রাজনগরের ঈশ্বর কামিলা ও মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আগত শিবরামপুরের মন্মথ ঘড়ুই ও ননী ঘড়ুই—দুই ভাই—এরা দুজনে যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করেছে ও নির্যাতন সহ্য করেছে। পার্টির লোকজনদের খাওয়াতে এক বছরে এদের পাঁচশ মণ ধান খরচ হয়েছে। আর মনে পড়ে লয়ালগঞ্জের বিজয় মণ্ডলকে।

কৃষক সমিতির পক্ষ থেকে আমাদের স্লোগান—জোতদারদের খামারে নয়—কৃষকের খামারে ধান তোলো। কত যে আদায় করত জোতদার। আঁড়িবাড়ি। বাড়ি হচ্ছে এক মণ ধানে দু'মণ ধান ফেরত দিতে হবে। তার উপর দরোয়ানি, কাকতাড়ানি ও ঝাড়ুদারানি। ধান চাষ করে ধান তুলে দিয়ে কৃষক আবার মহাজনের কাছে গেল ধান কর্জ করতে। এটাই পরিচিত দৃশ্য। নিঃস্ব হয়ে জন্মেছে সে—নিঃস্বই থেকে গেল মৃত্যু পর্যন্ত। তার ঘর বাঁধার অধিকার নেই—পুকুর কাটার অধিকার নেই। ছাতা মাথায় দিয়ে কাছারি বাড়ির সামনে দিয়ে হাঁটতে পারবে না সে—পারবে না জুতো পায়ে দিয়ে পথ চলতে। ঘরে সুন্দরী মেয়ে থাকলে তো কথাই নেই। তাকে এক লাট থেকে অন্য লাটে পালিয়ে যেতে হত।

১৯৪৭ সালে ঠিক হল ওদের মনুষ্যত্ববোধ জাগিয়ে তুলতে হবে। বলতে হবে, তোমরাও মানুষ। শুধু ফসল পাওয়ানো নয়—মনুষ্যত্বও জাগাতে হবে। রাজনগরে প্রথম জুতো পায়ে দিয়ে চাষীরা কাছারির সামনে চলাফেরা করল। ঐ বছরেই প্রথম পুলিশ ক্যাম্প বসল এবং প্রত্যেক কাছারি বাড়ি হয়ে গেল পুলিশ ক্যাম্প। উকিল অতুল শাসমলের নেতৃত্বে গঠিত হয়

জোতদার অ্যাসোসিয়েশন। অতুলের দালাল চাষীর ঘর আমরা ভেঙে দিই। একদিন শিবরামপুরে মিটিং করছিলাম। তখন ওরা রাত্রির অন্ধকারে আমাদের আস্তানা ঘেরাও করে—কয়েকজনকে ধরে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার করে। আমি পালাই। পরে একদিন অতুল শাসমল, তার ছেলে আর অতুলের বাবা—অতুলদের তিন পুরুষ ধরে আমরা পিটলাম।

আন্দোলন কিন্তু ছড়িয়ে পড়েছে। চাষীরা ধান পাচ্ছে—নিজস্ব গোলায় অথবা পঞ্চায়েতি খামারে তারা ধান তুলছে। ১৯৪৮ সালে এসে পড়ল নতুন পার্টি লাইন—ধাক্কা মারলেই এই সরকার পড়ে যাবে। সোভিয়েট গড়ার জায়গা হিসেবে জালালগঞ্জকে বেছে নেওয়া হল। অশোক বোস এল। অস্ত্রশিক্ষার তালিম দেওয়ার জন্যে হরপাল সিং ও এসে দিন সাতেক থেকে গেল। সাঁওতাল মঙ্গল সর্দার, গজেন মালি, ভূষণ কামিলা আর বিজয় মণ্ডল হল শিক্ষার্থী। কামার ঈশ্বর মাইতি অস্ত্রশস্ত্র বানাত। ১৯৪৮ সাল থেকে ইস্টার্ন রাইফেল বাহিনী রামনগর, জালালগঞ্জ ও শিবরামপুর ঘিরে রাখল। ১৯৪৮-এর নভেম্বরে চন্দনপিঁড়িতে গুলি চলল। মারা গেল অহল্যা, সরোজিনী ও অশ্বিনী।

ঘটনাটি এই। ৪ঠা নভেম্বর গ্রামে এক মিটিং হয়। ৬ই নভেম্বর সকালে ধান কাটা শুরু হয়। হঠাৎ খবর এল স্থানীয় পার্টি সম্পাদক রাখাল জানায় নৌকায় পুলিশ আসছে। বৈ[illegible] বশাকর দাস শাঁখ বাজিয়ে সকলকে সতর্ক করে দেন। এসময় অহল্যা ছোট মেয়ে শ্রীমতী ও ছেলে [illegible]কে নিয়ে পাশের [illegible] মণ্ডলের বাড়ি ধান কুটছিল। শাঁখ শুনে সবাই সর্দার মাইতির বাড়িতে কমিউনিস্ট পার্টির অফিসে দাঁড়ায়। মেয়েরা আগে, তাদের হাতে কাটারি ও বঁটি। পুরুষেরা পেছনে—হাতে লাঠি। আগে [illegible] দেখে সেনবাবুদের নায়েব পরেশ দাশ। সঙ্গে বারোজন পুলিশ এবং সেনবাবুদের কর্মচারী রাইচরণ মাইতি। এখানে হাতাহাতি হয় ও কৃষকরা পুলিশের রাইফেল ছিনিয়ে নেয়। ক্ষমা চেয়ে তবে পুলিশ বন্দুক ফেরত পায় ও পরেশকে রেখে চলে যায়। এসময় মহেন্দ্র বিজলী পরেশকে ধরে নিয়ে বৈকুণ্ঠ করণের বাড়ি বন্ধ করে রাখে। কৃষকরা আবার গিয়ে দেখে সেনবাবুদের দিক থেকে সশস্ত্র পুলিশ আসছে। ধানখেতের পাশে পুলিশ-কৃষক মুখোমুখি। রাইচরণ চেঁচায়, 'ফায়ার! ফায়ার!' দারোগা বাঁশি বাজিয়ে দেয় ও গুলি শুরু হয়। অহল্যা পূর্ণ গর্ভবতী—তার বুকে গুলি এসে লাগে। অহল্যা একটু দৌড়য়—একটু হাঁটে—তারপর হামাগুড়ি দিয়ে স্বামী ও ছেলের কাছে যায়। সেখানেই তার মৃত্যু হয়। সেদিন নিহত হয় অহল্যা, অশ্বিনী, সরোজিনী, উর্মী, বাতাসী, গজেন ভুঞা, অধর ও দেবেন। অহল্যা ও বাতাসী ছাড়া অন্যদের দেহ পুলিশ নিয়ে যায়। এরপর কৃষকরা নিজেরা বিচার করে পরেশকে কেটে সপ্তমুখী নদীর পাঁকে পুঁতে দেয়। পরদিন মিছিল করে ঘুরিয়ে অহল্যাকে তাঁর স্বামীর ধানজমিতেই দাহ করা হয়।

কংসারি হালদার বলছেন, 'নিহত অশ্বিনী ও অহল্যার স্বামী পার্টি সদস্য। চন্দনপিঁড়ি একটা দ্বীপ। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, তার উপর নদীতে কুমীর। তবুও বাইরে থেকে অনেকে গেল নদী সাঁতরে চন্দনপিঁড়িতে—তাদের সাহস দেওয়ার জন্যে। আমরা ক'জন চরে বানিগাছের ঝোপে আশ্রয় নিয়েছি—বুনো শুয়োর তাড়াচ্ছি। দুপুরে মেয়েরা এসে ভাত দিয়ে যেত। পুরুষদের চলাফেরা করার অসুবিধে—তাদের 'আইডেনটিটি কার্ড' দেওয়া হয়েছে। তাই মেয়েরাই সামনে এসে হয়েছে। যেদিন মেয়েরা আসতে পারত না, সমুদ্রের কাঁকড়া ধরে খেতাম।'

১৯৪৮-এর ৩১শে ডিসেম্বর বুধাখালিতে গুলি শুরু হয়। সামনে ছিলেন যতীন মাইতি, বিহারী ভাকুয়া, রাম মণ্ডল, নগেন্দ্র বারিক, মুরারি হালদার, মানিক হাজরা, ধরণী মাইতি, কুমেদ সাহু, নিত্য জানা, কৌশল্যা মেওয়া ও তুলসী সামন্ত। বেলা দশটা নাগাদ প্রায় দুশো লোক জমায়েত হন। সেদিন ধান কাটা হবে। সকালে এক ভাগচাষীর জমিতে ধান কাটা হয়। বিকেলে আবেকজনের জমিতে ধান কাটার সময়ে স্থানীয় জমিদারের কাছারি থেকে প্রায় দশ-এগারোজন সশস্ত্র পুলিশ আসে। কুমেদ সাহুর বিরুদ্ধে পরোয়ানা ছিল। ধান নিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশ কুমেদকে চিনতে পারে ও তাকে ধরে। জনতা পুলিশকে ঘিরে ফেলে। নগেন এক পুলিশকে বলেন, 'ভাই, তুমি তো সরকারের কাছে মাত্র আটায় টাকা পাও—তুমি কেন আমাদের ধরতে এসেছ?' তবুও জমাদারের মুঠো শিথিল হয় না। সহসা এক চাষী মেয়ে তার চোখে ধুলো ছুঁড়ে মারে। কুমেদকে ছেড়ে দিয়ে জমাদার চোখে হাতচাপা দেয়। 'মলাম! মলাম!'—বলে চেঁচাতে চেঁচাতে পড়ে যায় মাটিতে।

তখন পুলিশ গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। নীলকণ্ঠ ও সুরেন পড়ে যায় মাটিতে। এরপর সুধীর পড়ে লুটিয়ে। সুধীরকে পুলিশ টেনে নিয়ে যায়। কৃষকরা আহতদের নিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে যায়।

জঙ্গী কৃষক কমরেডদের প্রাথমিক চিকিৎসার ট্রেনিং দেবার জন্যে পার্টি ডাক্তার পূর্ণেন্দু ঘোষকে পাঠায় কাকদ্বীপ। তিনি বলছেন:

'বিকেলে বুধাখালি থেকে লোক এসে হাজির। সেখানে ফায়ারিং হয়েছে, তিনজন কমরেড শহীদ হয়েছেন আর এগারোজন ঘায়েল হয়েছেন, যাঁদের মধ্যে দুজনের চোট বেশি, দাওা ডাক্তারকে এখুনি যেতে হবে। এক মিনিটও দেরী না করে থলেটা নিয়ে তৎক্ষণাৎ রওনা দিলাম যে নৌকো করে ওরা এসেছিল সেই নৌকোতেই। মাঝরাতে বুধাখালি পৌঁছে গেলাম। গিয়ে অবস্থা দেখে আমি তাজ্জব! মাত্র ক'দিনের শিক্ষা পাওয়া কমরেডরা অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছেন। আহত এগারো জনকেই তারা সরিয়ে ফেলেছে। পুলিশের হাতে ধরা পড়তে দেয়নি। ক্ষতস্থানগুলো থেকে রক্তপড়া বন্ধ করে পট্টি বেঁধে দিয়েছে। আর এসপিরিন খাইয়ে তাদের যন্ত্রণা

কমিয়ে আমাকে আনতে পাঠিয়েছে। দুজন যারা বেশি ঘায়েল তাদের একজনের বগলের তলায় আর পিঠের শিরদাঁড়ায় বন্দুকের ছররা ঢুকে আছে। অন্যজনের '৩০৪ বুলেট' ডান পায়ের হাঁটুর ওপরে অনেকখানি মাংস তুলে নিয়েছে। প্রথমে গুলি বার করার চেষ্টা হল। সঙ্গে না আছে লোকাল এনাস্থেসিয়ার ওষুধ, জেনারেল [এনাস্থেসিয়া] তো দূরের কথা। আবার এদিকে চীৎকার করা চলবে না, কারণ গ্রামের মধ্যেই পুলিশের অধিষ্ঠান। এবং মাঝে মাঝে তারা রোঁদে বেরোয়। আহত কমরেডটি আশ্বাস দিলে যে সে একদম আওয়াজ করবে না! তখন অপারেশন শুরু হোল। একজন তার হাতটা তুলে চালের ঠেকোর সঙ্গে চেপে ধরে রইলো, একজন টেমি ধরে আলো দেখাতে লাগলো আর আমি জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অপারেশন করা আরম্ভ করলাম। এনাস্থেসিয়া অবশ্যই দেওয়া হোল তবে সেটা ভোকাল এনাস্থেসিয়া, অর্থাৎ আমার জানা বিপ্লবীদের গৌরবময় গল্প বলে যেতে লাগলাম; মুখও যেমন চলছে, হাতও তেমন চলছে। আশ্চর্য কমরেডটির সহ্য করার ক্ষমতা। চোখ খোলা, কাটা হচ্ছে সে সেটা দেখছে; রক্ত ঝরছে সে সেটাও দেখছে, কাটার যন্ত্রণা সে অনুভব করছে কিন্তু মুখ দিয়ে আঃ উঃ আওয়াজটুকুও বার করছে না। গোল ছোট আংটার মত ছররা চাকুর ডগায় এসে গেছে এমন সময় পাহারাদার কমরেডটি দৌড়ে এলো—পুলিশ রোঁদে বেরিয়েছে—এইদিকেই আসছে। আমরা টেমির আলো নিভিয়ে দিয়ে চুপ করে বসে রইলাম। এতো নিস্তব্ধতা নেমে এলো যে জীবনের অস্তিত্ব আছে বলেই মনে হচ্ছিল না; কেবল আমার বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস শব্দ। প্রতীক্ষা যেন অন্তহীন। কিছু পরে ধপ ধপ করে ভারী বুটের শব্দে কুঁড়ে ঘরটাকে কাঁপিয়ে দিয়ে পুলিশ পার্টি চলে যেতে আবার আমরা টেমি জ্বালিয়ে কাজ শুরু করলাম! অপারেশন শেষ হতে হতে ভোরের আলোর ইশারা দেখা গেল। সুতরাং অন্য আহত কমরেডটিকে নিয়ে নৌকো চড়ে রওনা দেওয়া হল আগের গ্রামে ফিরে যাওয়ার জন্যে। নৌকো যখন খাল পেরিয়ে দরিয়াতে পড়লো, তখন পুরো ব্যাপারটাকে স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছিল।

। তেভাগার স্মৃতি, পৃ ৮-১০

চন্দনপিড়ি ও বুধাখালির ঘটনায় আন্দোলন কিছুটা মার খেলেও কাকদ্বীপের কৃষক দমে যায়নি। শহীদদের আত্মদান বৃথা যায়নি। কাকদ্বীপের চাষীর দীর্ঘদিনের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে ডুয়ালগঞ্জে।

মৈত্রেয় ঘটক লিখছেন :

১৯৪৮ সালের মে দিবসে রাজনগর স্কুলে প্রকাশ্য মিটিং হয়—যাতে গজেন মালী, যোগেন গড়িয়া, আব্বাস হুসেন ইত্যাদি বক্তৃতা করেন। এই মে দিবসের দিন থেকেই এই অঞ্চলের বেশ কিছু কাছারিবাড়ি দখল করে ধান ইত্যাদি কৃষকদের মধ্যে বিলি করে দেওয়া হয়। এর কয়েকদিনের মধ্যেই স্থানীয় জমিদার দ্বারিক সামন্তের কাছারিবাড়ি ঘেরাও করা হয় কিন্তু

স্বারিক সামন্ত পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। কিছুদিনের মধ্যে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে এই এলাকায় জমিদার-জোতদারদের কিছু সময়ের জন্য প্রায় নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া সম্ভব হয়। এই সময় থেকে আন্দোলনকারীরা জায়গার নাম দেন লালগঞ্জ। এসময়ে পার্টি থেকে দাবী করা হয় যে লালগঞ্জ 'মুক্ত এলাকা' এবং এখানে 'মজুর চাষী রাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।' (কাকদ্বীপ ১৯৪৬-৫০)

কংগ্রেসি শাসনের আমলে লালগঞ্জে সোভিয়েট গড়ার পরীক্ষামূলক চেষ্টা হয়। কতদূর সার্থক হয়েছিল এই পরীক্ষা। সমসাময়িক বিবরণ থেকে যতটুকু আভাস পাওয়া যায়,তার তাৎপর্য কিন্তু কম নয়। এ প্রসঙ্গে অশোক বোস রচিত এক পুস্তিকা থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হল।

'কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পাঁচ হাজার বিঘা জমির ওপর প্রায় দু'শো ঘর মানুষ কংগ্রেসী রাজত্বের আইন কানুনের বন্ধন ছিঁড়ে ফুটে বেরিয়ে এই এলাকাকে পুরানো শোষণের ব্যবস্থা থেকে মুক্ত করেছে। এখানকার সংগ্রাম কমিটি এই নতুন মুক্ত এলাকার নাম দিয়েছে 'লালগঞ্জ'।

লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক স্বারিক সামন্ত, আদিত্য সামন্ত, পুলিন দাস, কৃষ্ণপদ মজুমদারের কাছারী দখল করে—পাঁচ হাজার বিঘা জমিকে কংগ্রেসী ও জোতদারী শাসনের কবল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে, সম্পূর্ণভাবে সংগ্রাম কমিটির দখলে এনে নতুন ব্যবস্থা চালু হয়েছে, ১৫ই আগস্ট ১৯৪৯-এর কয়েকদিন আগে।

সেই দিন থেকেই নতুন করে জমি বিলি শুরু হয়। মানুষের ক্ষেত-মজুর, ভাগচাষ ও চাকারাণ বৃত্তি ঘোচে। সর্বহারা মানুষ ভিটে ও জমির মালিক হয়ে বসে। পরিবারের লোকসংখ্যা অনুযায়ী সংগ্রাম কমিটি জমি দেয়। যাদের বাসনপত্র ছিল না, কাছারীর বাজেয়াপ্ত করা বাসন থেকে তাদের অভাব পূর্ণ করা হয়। যে কাছারীর পুকুর ও খালে কেউ কোনও দিন একটা ছিপও ফেলতে পারতো না—সংগ্রাম কমিটি হুকুম দেয়—'যে যত খুশী মাছ ধরে নিয়ে যাও এবার।'

কাছারীতে অনেক চাষের যন্ত্রপাতি আর লাঙল বলদ ছিল। যে সব ক্ষেত-মজুর ও ভাগদারের ঐসব অভাব ছিল, সংগ্রাম কমিটি তাদের এইসব যন্ত্রপাতি ও বলদ ভাগ করে দেয়। কাছারীর বাজেয়াপ্ত করা শত শত মণ ধানের একটা অংশ থেকে বীজধানের সমস্যা দূর করা হয়। এছাড়াও জরুরী অবস্থার জন্য সংগ্রাম কমিটি আইন করে দেয় যে এই বছর পরস্পর পরস্পরকে বদল দিয়ে চাষ তুলতে হবে। অর্থাৎ যার গরু লাঙল আছে তাকে খেটে দেবে এবং সে তার বদলে গরু লাঙল দিয়ে সাহায্য করবে।

১৫ই আগস্ট থেকে প্রত্যেক দিন নির্দিষ্ট সময়ে জনসাধারণের আদালত বসে। এই আদালতে কুড়ি-পঁচিশ জন থেকে দুই তিন শত পর্যন্ত লোক জমে। মেয়েরাও এই বিচার দেখতে আসেন। প্রত্যেকটি অপরাধের শাস্তি

উপস্থিত সমস্ত লোকের মত নিয়েই ঠিক করা হয়। আদালতের কাজ শুরু হলে একে একে দরখাস্ত পড়তে থাকে। বেশীর ভাগ দরখাস্তেই দেখা যায় সেই এলাকার জোতদার লাটদার মহাজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং পুরানো অত্যাচারের বিবরণ। ১৫ই থেকে ২৫শের মধ্যে দশদিনে ১১২ নম্বর বিচারের দরখাস্ত পড়ে।

প্রত্যেকটি দরখাস্ত অনুযায়ী গণ-আদালতের বিচার করা হয়। অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী কোন মহাজনের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, কারো অর্থদণ্ড, কারো নাকমলা-কানমলা, কারো বা জুতো পেটা, ভলান্টিয়ার পাহারায় হাজতবাস—এই ধরনের শাস্তি দেওয়া হয়। তাদের মধ্যে অনেকেই অপরাধ স্বীকার করে। লাল ঝান্ডা হাতে নিয়ে প্রতিজ্ঞা নেয় এবং নতুন আইন শৃঙ্খলা মেনে নিয়ে কাজ শুরু করে। সংগ্রাম কমিটি থেকে এদেরও চাষের জন্য জমি এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় বটে, কিন্তু কড়া নজরও রাখা হয়।

এমনি করেই নতুন জীবন শুরু হয় লালগঞ্জের মানুষদের। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ক্ষমতা দখলের পরে কি ভাবে মানুষ তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়—কি করে সকল বাধা-বিপত্তি চূর্ণ করে তারা নতুন সমাজ, আইন আদালত সবই প্রতিষ্ঠা করে—কি করে 'মজুর-চাষী রাজ' মানুষকে প্রকৃত গণতন্ত্র, মনুষ্যত্বের অধিকার, সুখ-শান্তি দিতে পারে তা 'লালগঞ্জে'র মানুষ বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বুঝতে পারে।' (বংশের শিশু তেলেঙ্গানা : লালগঞ্জ)

এই উদ্দীপিত বর্ণনার উচ্ছ্বাসটুকু বাদ দিয়েও এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়—লালগঞ্জের মানুষ অন্তত কিছু দিনের জন্যে সুখের মুখ দেখেছিল—পেয়েছিল নতুন জীবনের স্বাদ। এটা ১৯৪১ সালের গোড়ার দিকের ছবি—আন্দোলন যখন তুঙ্গে। গরীব ভাগচাষীরা রক্তের স্বাদ পাওয়া বাঘের মতো তখন লড়ছে।

আন্দোলনের এই পর্যায়ে জমিদার ও তাদের লোকজন শহরে পালাতে বাধ্য হয় ও সরকার পাঠায় বাড়তি পুলিশ। তারপর শুরু হয় ব্যাপক পুলিশি সন্ত্রাস এবং আন্দোলনের নেতাদের ধরার জন্যে চিরুনি অভিযান। রাইফেল ও বেয়নেটের রাজত্ব কায়েম হয়। পুলিশ হামলা মোকাবিলা করার জন্যে পাঁচ-ছ'জন লোক নিয়ে এক-একটা স্পেশ্যাল স্কোয়াড ছিল। এরকম স্কোয়াডের সংখ্যা গোটা চারেক। বুধাখালিতে গুলি চলার পর পার্টি কিছু ছিটেগুলি ও দেশী বন্দুক পাঠায়। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, পুলিশ ও আধা-সামরিক বাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ের স্পেশ্যাল স্কোয়াডগুলো নিতান্তই অপটু।

কংসারি হালদার বলছেন, 'ক্রমশ পার্টি নেতারা ভুল নির্দেশ পাঠাতে লাগলেন। নির্দেশ এল : স্কুল আর কাছারি বাড়ি পুড়িয়ে দাও। তাহলে পুলিশ ক্যাম্প বসাতে পারবে না। এসব গৃহদাহের ঘটনায় গরীব চাষী যদিও খুশি—মধ্যবিত্ত বিগড়ে যেতে বসল।'

১৯৪৯ সালের শেষ দিকে কাকদ্বীপে ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলের এক

বাহিনী পাঠানো হয়। পুলিশ, রক্ষীদল আর ইস্টার্ন রাইফেলের সৈন্যদের সাহায্যে এলাকা ঘিরে একের পর এক চিরুনি অভিযান চালিয়ে গ্রামের পর গ্রাম থেকে অজস্র কৃষক গ্রেপ্তার হলেন। ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসের মুখে প্রতিরোধ ভেঙে পড়ার উপক্রম। আর একা কাকদ্বীপ কতটা রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে কতক্ষণ টিঁকে থাকবে! পশ্চিম বাংলায় তখন কোথাও গণঅভ্যুত্থান বা ব্যাপী আন্দোলনের চিহ্নমাত্র নেই। কংসারি হালদার বলেছেন, 'যেদিন লতিকা-প্রতিভা মারা যায়, সেদিন আমি কলকাতায়। কলকাতার জমায়েত দেখে ভবানী সেনকে লিখলাম—এই তো আপনাদের শক্তি, আপনারা হাজার লোক র‍্যালি করাতে পারছেন না। আর সুন্দরবনের মতো এরকম বিচ্ছিন্ন এলাকা, যেখানে পাঁচটা গ্রামের লোক জড়ো করলেও পাঁচশো লোক হবে না—সেখানে আমরা কী করব?'

'কলকাতা থেকে কাকদ্বীপের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা ক্রমশ দুরূহ হয়ে ওঠে। শ্যামবাজারে ছিল কাকদ্বীপের গোপন কেন্দ্র। সেখানে কংসারি হালদার, অশোক বোস ও অন্যান্যরা মিলিত হতেন। কাকদ্বীপে যাওয়ার পথে লক্ষ্মীকান্তপুর পোলের হাটের এক ব্যবসায়ীর ঘরে রাত কাটিয়ে তাঁরা পরের দিন ভোরে হাঁটা পথে রওনা দিতেন। বুধাখালি বা লয়ালগঞ্জে সন্ধ্যা নাগাদ তাঁরা পৌঁছে যেতেন। তাঁদের চলার পথে বিপদের ঝুঁকি ক্রমশ বাড়তে থাকে। একে একে সবাই ধরা পড়ছে। [illegible] একটা বড় দ্বীপ। তার কাছে একটা নৌকোয় আশ্রয় নিয়েছেন কংসারি। পুলিশ এসে পড়ায় তাঁকে সেখান থেকে পালাতে হয়। আর একদিন নিমাই নস্করের হাটে ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে যান। বকখালির চরে গজেন মালি ও বিজয় মণ্ডল আগ্নেয়াস্ত্র সমেত ধরা পড়েন। অশোক বোস এলাকা ছেড়ে চলে যান। তিনি তখন প্রশাসনের কাছে সবচেয়ে চিহ্নিত ব্যক্তি। জমিদার আর সরকারি তরফ থেকে তাঁর মাথার ওপর বহু হাজার টাকা পুরস্কার—জীবিত বা মৃত। কৃষ্ণবিনোদ রায় খবর পাঠান, যে করে হোক আত্মগোপন করে থাকতে, না হলে তাঁকে ফাঁসির হাত থেকে বাঁচানো যাবে না। কোথাও আশ্রয় নেই, কোথাও নিরাপত্তা নেই। বুকে যক্ষ্মার ছোবল নিয়ে, বিপর্যয়ের দায়িত্ব মাথায় নিয়ে অশোক বোস চিরদিনের জন্যে মুছে গেলেন।

ধরা পড়ে মোট ২৭ জন—যদিও কাকদ্বীপ ষড়যন্ত্র মামলায় জড়ানো হল ৩৬ জনকে। সে সময় ধরা পড়েননি অশোক বোস, কংসারি হালদার, যোগেন্দ্র গুড়িয়া, ঈশ্বর কামিলা, ভগুদাস ও হরিপদ শাসমল। এঁদের পলাতক অবস্থাতেই মামলা হয়। শেষ অবধি ১৯৫৩ সালের ১১ই ডিসেম্বর ট্রাইব্যুনালের রায়ে ৯ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। তাঁরা হলেন: গজেন মালি, বিজয় মণ্ডল, ভূষণ কামিলা, মানিক হাজরা, তারিণী সাও, ভীম ঘড়ুই, দ্বিজেন্দ্র দিন্দা, ক্ষীরোদ বেরা ও সুজয় বারিক। বাকি আঠারো জন ছাড়া পায়। এছাড়াও অবশ্য অন্যান্য বহু মামলায় বিভিন্ন এলাকায় অনেক কৃষককর্মীকে ধরা হয় ও তাঁদের দীর্ঘদিন জেলে থাকতে হয়।

এসব সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত সাঁওতাল পরিবারগুলি পার্টির সঙ্গ ছাড়ল না। আর থেকে গেল পার্টির সাথে উপেন জানার মতো আশ্চর্য মানুষেরা।

দশ

গ্রাম-বাংলার রক্তভেজা প্রান্তরে স্বপ্নের কুঁড়িগুলি দল মেলতে চায়—চাষীর জমির স্বপ্ন। চাষী বৌ-এর ফসলের স্বপ্ন। লাল ঝাণ্ডা তাঁদের কাছে যেন এক যাদুকাঠি। এই যাদুকাঠি হাতে নিলে শরীরে এক আশ্চর্য বল আসে। মরণের ভয় থাকে না—উল্টে শত্রুই ভয় পায় এই লাল ঝাণ্ডাকে! স্মৃতির উজান বেয়ে চলতে গিয়ে রাসবিহারী ঘোষের চোখের সামনে ফুটে ওঠে এক অলৌকিক দৃশ্য: 'এলাকার পর এলাকা জুড়ে লাল ঝাণ্ডা উড়ছে, কৃষক ধান কাটছে আর তুলছে নিজের বাড়িতে। অনেকে আবার লাল ঝাণ্ডা তৈরি করতে জানত না, কাস্তে হাতুড়ি আঁকতে জানত না। আলতা দিয়ে কি পুঁই বীচি বেটে কাপড় লাল করে যে কোন লাঠিতে লাগিয়ে চলে আসত, হয়তো কাস্তে হাতুড়ি উল্টোপাল্টা করে আঁকত!'

সেদিন চাষীর আনাড়ি হাতে তৈরি লাল ঝাণ্ডা চাষী বৌ-এর রক্তে আরও লাল হয়ে উঠেছিল। ১৯৪৮ সালের অক্টোবরের সেই দিনটি থেকে এই রক্ত-ভেজা কাহিনী শুরু।

'সরকারী পুলিশের চোখের সামনে ডোঙাজোড়ার কৃষকের রক্ত জল-করা পরিশ্রমের ধান নিয়ে যাচ্ছে চোরাকারবারী চালান দিতে। কৃষক মেয়েরা জানেন, গ্রাম থেকে এই ধান বাইরে গেলে তার উপোসী সন্তানের মুখে আর ভাত তুলে দিতে পারবেন না, না খেতে পেয়ে স্বামী তিলে তিলে শুকিয়ে মরবে। তাই ধান কিছুতেই বাইরে নিতে দেবেন না মেয়েরা। রুখে এলেন চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধে—প্রাণ যায় তবু ধান দেবো না। কিন্তু চোরা-কারবারীর রক্ষাকর্তা পুলিশ ছুটে এসে গুলি চালালো মেয়েদের উপর। ডোঙাজোড়ার শ্যামল শস্যক্ষেত্রে লুটিয়ে পড়লেন দুটি রক্তাক্ত মা।' (রক্তাক্ত অধ্যায় / লতিকা তোমার তপ্ত শোণিতধারা)

এই প্রথম। 'স্বাধীনতা'র পর কংগ্রেসী রাজত্বে এই প্রথম। তারপর একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। ডোঙাজোড়ার পর চন্দনপিঁড়ি—তারপর বুধাখালি—তারপর ডুবির ভেড়ি—তারপর সাঁকরাইল—তারপর এবং তারপর। সর্বত্র একই কাহিনী। রক্তভেজা কাহিনী। প্রতিবাদ-প্রতিরোধের কাহিনী। কিন্তু প্রতিরোধ আন্দোলন সবক্ষেত্রে দানা বাঁধেনি যেমন জমাট বেঁধেছিল হুগলির বড়া কমলাপুরে ও ডুবির ভেড়িতে এবং বর্ধমানের অগ্রদ্বীপে। সেদিন কাকদ্বীপের পরেই বড়া কমলাপুর, ডুবির ভেড়ি ও অগ্রদ্বীপের নাম এক নিশ্বাসে উচ্চারিত হত—সগৌরবে উচ্চারিত হত।

সংগ্রামী এলাকা হিসাবে বড়া অপেক্ষাকৃত পুরানো এবং কাকদ্বীপের সমসাময়িক। বড়া কমলাপুরের সংগ্রামের কাহিনী বলছেন কমল চ্যাটার্জি। তাঁর ভাষায়, 'হুগলিতে জমিদারী প্রথা-বিরোধী প্রচারের জমি প্রথম তৈরি হয় সিঙ্গুর থানায়। ১৯৪৬-এ সিঙ্গুরে কৃষক সম্মেলন হয় প্রকাশ্যে। বড়া সিঙ্গুর থানার অন্তর্গত। এখানে ১৯৩৬-৩৭ সাল থেকে কৃষক সমিতির ভিত গড়ে ওঠে। জমিদার বাড়ির ছেলে অজিত বোস এখানকার প্রধান নেতা। জমিদার পরিবারের লোক হয়েও অজিত বোস জমিদারি প্রথার বিরুদ্ধে প্রচার করছে দেখে এখানকার কৃষকরা খুব উৎসাহ পায়। কৃষক-সমিতি দ্রুত বাড়তে থাকে। সিঙ্গুর থানার যোগীন সিংহ একজন প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার। সমস্ত ইউনিয়ন বোর্ড তাঁর দেখলে। ১৯৩৭ সালে হল বড়ার নির্বাচন। তখন নির্বাচন হত হাত তুলে প্রকাশ্যে। নির্বাচনের দিন চারেক আগে আমি সেখানে যাই। ভোটের দিন ছোটখাট সংঘর্ষ হল বটে, খোলাখুলি ভোটের ফলেও দেখা গেল কৃষক সমিতি অধিকাংশ আসনে জিতেছে। স্বভাবতই বড়া পরের যুগে কৃষক আন্দোলনের শক্ত ঘাঁটি হয়ে দাঁড়াল।

কৃষকরা আওয়াজ তুলল, 'বোস জমিদারদের খাজনা দেব না।' জমিদাররা বড়ার বাজার থেকে তোলা আদায় করত—কখনও কখনও বেশ জোর জুলুম করেই। তোলা দেব না—এই আওয়াজও কৃষক সমিতি তুলল। খাজনা দেব না—তোলা দেব না—এই দুই ধ্বনি মনের দিক দিয়ে আগে থেকে সংঘর্ষের জমি তৈরি করল। মিছিলে দেখা যাচ্ছে লাল কাপড়—লাল কাগজ। আবার লোধা আদিবাসীরা বাঁশের ডগায় শিমুল ফুল বেঁধেও মিছিল করতে লাগল। লাল রং এখন প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের প্রতীক। নিয়মিত 'স্বাধীনতা'-ও বিক্রি হত। একবার জমিদারের লোকেরা ভূষণের হাত থেকে 'স্বাধীনতা' কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে। কৃষকরা এগিয়ে আসাতে তারা পালিয়ে গেল। বেশ শক্ত আন্দোলনের 'বেস' (ভিত) এই রাগ ও বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে।'

কমল চ্যাটার্জি বলছেন, 'আমাদের 'বেস'-কে ভাঙার জন্যে তখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কিরণশঙ্কর পাঠাল পুলিশ। মাঝি পাড়ায় এক বড় কৃষকের বাড়ির উঠোনে বসল পুলিশ ক্যাম্প। পুলিশ গ্রামে গ্রামে গ্রেপ্তার করার জন্যে হামলা শুরু করে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আপনা থেকেই প্রতিরক্ষার সংগঠন গড়ে ওঠে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মধ্যে। কেউ তাদের শেখায়নি কীভাবে সংকেত জানাতে হবে। পুলিশ এলে মেয়েরা শাঁখ বাজাত—বাচচারা খবর পেঁৗছে দিত—লোকেরা পথ দেখিয়ে নিয়ে যেত পানের বরোজের মধ্যে। তারা নিজেরাই মাথা খাটিয়ে এই সংগঠনের কায়দা-কানুন তৈরি করে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা প্রতিজ্ঞা করে, অজিত বোসকে কিছুতেই ধরা পড়তে দেব না। একজন ডাক্তার পুলিশকে খবর দিত। জানতে পেরে সবাই তাকে হটিয়ে ভেতরে পাঠিয়ে দিল।

সবাই আত্মগোপন করে আছে। বিশেষ কেউ ধরা পড়েনি। এমন সময় পুলিশ কমলাপুর গ্রাম থেকে শত্রুঘ্ন গড়ানকে অতর্কিতে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ তাকে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে। এদিকে লোকজনও জমায়েত হয়ে পুলিশের পিছু পিছু যাচ্ছে। হঠাৎ কার্তিক ও গুঁইরাম শত্রুঘ্নকে পুলিশের হাত থেকে ছিনিয়ে নেবার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে গুলি চলে। কার্তিক ও গুঁইরাম মারা যায়। শত্রুঘ্নকে নিয়ে পুলিশ পালায়। তারপর থেকে চলতে থাকে শোভাযাত্রার পর শোভাযাত্রা। বড়া-কমলাপুর হয়ে ওঠে জমিদার-বিরোধী আন্দোলনের শক্ত ঘাঁটি। কোন নির্দিষ্ট দাবির ভিত্তিতে এটা হয়নি।

এটা প্রধানত পান চাষের জায়গা। এই জায়গা পার্টির লোকজনদের প্রধান আশ্রয়কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এমন কি জেলা পার্টির নেতারাও এখানে এসে মিটিং করতে থাকে। কাজেই এই শক্ত ঘাঁটি চুরমার করার জন্যে চলতে থাকে ক্রমাগত পুলিশ অ্যাকশন। দিনে দুবার-তিনবার পুলিশ আসা-যাওয়া করতে থাকে। পুলিশের বুটের শব্দ পেলেই সবাই সজাগ হয়ে উঠত। ঘরে ঘরে বেজে উঠত শাঁখ। সবাই সদা সতর্ক। গাছের ডালে ডালে উলঙ্গ অর্ধ-উলঙ্গ ছেলেরা নিজেদের মধ্যে খেলা করছে। কিন্তু একটা চোখ রয়েছে মাঝিপাড়ার দিকে। যেই পুলিশের নড়াচড়া চোখে পড়ত—অদ্ভুত স্বরে পাখির ডাক ডেকে উঠত। যাদের ধরার জন্যে পুলিশের এত তোড়জোড়—তাঁরা লুকিয়ে পড়ত পানের বরোজে। পানের বরোজ—এক একটা দুর্গ-বিশেষ—তার মধ্য দিয়ে প্রায় দেড় মাইল পথ পাড়ি দেওয়া যায়।

১৯৪৯ সালে কারফিউ জারি হল। মাঠের চারপাশে দশ হাত পর-পর পুলিশ পোস্টিং হল। একদিনে তিনবার পর্যন্ত কারফিউ জারি হয়েছে। এই অবস্থায়ও আনারস ক্ষেতের মধ্য দিয়ে গুঁড়ি মেরে বেরিয়ে আসি। মাইল তিনেক দূরে ক্ষেত-মজুর পল্লীতে চলে আসি।'

পুলিশের দাপটে গাঁ-ঘর একেবারে জনশূন্য। পুলিশি উৎপাতে চলাফেরা যখন একেবারে অসম্ভব, তখন এগিয়ে আসে মেয়েরা। ১৯৪৯-এর ১৭ই ফেব্রুয়ারি তিনশ' মেয়ে মনোরঞ্জন হাজরার নেতৃত্বে শ্রীরামপুর কোর্টে এস. ডি. ও.-র কাছে মিছিল করে আসে। এস. ডি. ও.-কে মনোরঞ্জন হাজরা বলেন, 'এসব কী করছেন আপনারা? যাদের নামে কেস আছে—তাদের ধরুন। অত্যাচার করছেন কেন?'

তারপর একদিন রিষড়া স্টেশনে অজিত বোস ধরা পড়েন। কমল চ্যাটার্জিও পাণ্ডুয়ার মালঞ্চপাড়ায় ক্ষেত-মজুর আন্দোলনের সূত্রে কংগ্রেস সেবাদলের হাতে ধরা পড়েন। মনোরঞ্জন হাজরা হন পার্টি থেকে বহিষ্কৃত। ১৯৪৯-এর মাঝামাঝি নাগাদ বড়া কমলাপুরের আন্দোলন ঝিমিয়ে পড়ে।

কমল চ্যাটার্জি বলছেন, 'বড়ার পর ডুবির ভেড়ি সে যুগের প্রধান সংগ্রামী কেন্দ্র। কিন্তু দুটোর ধরন আলাদা। সাধারণ সামন্ততন্ত্র-বিরোধী লড়াই-এর

চরম বিকাশ ঘটেছিল বড়াতে আর তে-ভাগার দাবিকে কেন্দ্র করে ডুবির আন্দোলন উত্তাল হয়ে উঠেছিল। ১৯৪৬-এ তে-ভাগার প্রচার শুরু হল পোলবা থানার অন্তর্গত ভেরি অঞ্চলে। এটা সিঙ্গুর থানার বর্ডারও বটে। ১৯৪৭ সাল জুড়ে জোর প্রচার চলতে থাকে এবং ১৯৪৮ সালে কয়েকটা গ্রামে তে-ভাগা চালু হয়। খুব বেশি গ্রামে নয়। কৃষক নিজের খোলানে ধান তুলে তিন ভাগের দু'ভাগ রেখে দিয়ে বাকি এক ভাগ জমিদারকে দিতে চায়। তখন ভেরি অঞ্চলের জোতদার শ্রেণীর লোকেরা দলবদ্ধভাবে বিরোধিতা করতে থাকে। একটা শক্ত পার্টি-বেস গড়ে ওঠে। ডুবির ভেরি - আনন্দনগর অঞ্চলে গোটা চারেক পার্টি সেল ছিল। সুধন্বা ধাড়া, উমাচরণ পাল, দুই ভাই—বিষ্টু ভৌমিক ও আশু ভৌমিক, অর্জুন মণ্ডল ও পাখিরা প্রমুখ পার্টি সদস্য এসেছিলেন কৃষক পরিবার থেকে। বাইরে থেকে এসে পার্টি করতেন গোপাল দাস, নিমাই ভট্টাচার্য ও মহীতোষ নন্দী। যাতায়াত করতেন—কালীচরণ ঘোষ, তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়, ভবানী মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা চট্টোপাধ্যায়, পুষ্প ঘোষ, তুষার চট্টোপাধ্যায় ও সুশীতল রায়চৌধুরী।

এই অঞ্চলের তে-ভাগা আন্দোলনের প্রধান নেতা তখন গোপাল দাস। নিমাই ভট্চায ও মহীতোষ নন্দী গোপাল দাসের সহযোগী। একদিন গোপাল দাস যখন একটা ঘরে কর্মীসভা করছিলেন—তখন জোতদার বিজয় বক্সী এক দো-নলা বন্দুক নিয়ে দরজা আটকে দাঁড়িয়ে শাসাতে থাকে, 'এখানে কৃষক সমিতি করা চলবে না।' তখন কর্মীরাও ঘরের ভেতর থেকে স্লোগান দিতে থাকে। লোকজন জড়ো হয়। তারা বিজয় বক্সীর হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নিয়ে ভেঙে ফেলে দেয়। তাকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে—মারতে মারতে সরিয়ে দেয়। এর পর বসল পুলিশ ক্যাম্প।

সংগঠক, নেতা—সবাইকে পুলিশ খুঁজতে থাকে; কাউকে কিন্তু ধরতে পারে না। পুলিশি হামলার মুখোমুখি আপনা থেকে গড়ে ওঠে সতর্কতা-মূলক সংগঠন। পাহারা দেওয়া—সংকেত জানানো—শাঁখ বাজানো। ফলে অর্জুন ধারা ও আশু ভুঁইঞার মতো চার-পাঁচ জন বৃদ্ধ কৃষক ছাড়া পুলিশ জোয়ান মর্দ কাউকে ধরতে পারেনি।

১৯৪৯ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারি। সেদিন সন্ধ্যার পর পুলিশ বন্দুক হাতে বাঁধের ওপর ওঠে: লোকজন ছুটে এসে স্লোগান দিতে থাকে; দল বেঁধে পুলিশের পথ আটকে দাঁড়ায়। মেয়েরা থাকে সামনের সারিতে।—বলে, পুলিশকে আমরা কিছুতেই গ্রামে ঢুকতে দেব না। পুলিশ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। কিছুক্ষণ এভাবে চলল। হঠাৎ একটা পুলিশ খুব কাতর-ভাবে একটু জল খেতে চাইল। জল খেতে চাইছে শুনে, মেয়েদের একটু মায়া হল। অনমনীয় ভাব একটু শিথিল হল। একজন আরেকজনকে জল দিতে বলে। ঠিক সেই মুহূর্তে 'ফায়ার'—অর্ডার আসে। সঙ্গে সঙ্গে গুলি চলে এবং পাঁচজন মেয়ে পড়ে যায় ও মারা যায়। তাদের নাম: মুক্তকেশী মাঝি,

পাঁচুবালা ভৌমিক, চন্ডীবালা পাখিরা, দাসীবালা পাল ও পুষ্পবালা মাঝি।
কয়েকটি বিহ্বল মুহূর্ত। তারপরই দেখা দেয় তুমুল উত্তেজনা। প্রাণভয়ে পুলিশ পালাতে থাকে। আমরা তখন লুকিয়ে আছি বড়া কমলাপুরে। ডাঃ উমাপতি ব্যানার্জি, দিদিমণি ও আমরা পনেরো-কুড়িজন পায়ে হেঁটে আনন্দনগর পর্যন্ত চলে আসি। কিন্তু নিহতদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি। ডুবির ভেড়ির সঙ্গে চন্দননগরের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। চন্দননগরের পশ্চিম দিকে বৌ-বাজার। ডুবির কৃষকরা সেখানে কেনাবেচা করতে আসত। ডুবির খবর পেঁাছে যায় চন্দননগরে। পার্টি থেকে প্রচার করা হয়, ডুবির মৃতা মায়েদের এখানে আনা হবে এবং উপযুক্ত মর্যাদা সহকারে দাহ করা হবে। আপনারা অভ্যর্থনা করার জন্যে প্রস্তুত হোন। চন্দননগরে চাঞ্চল্য দেখা দেয়। এখানে ছাত্র ফেডারেশনের ভালো অবস্থা। পার্টির ছাত্র-যুবকরা সেখানে যাবার চেষ্টা করে। চন্দননগরের নামকরা ছাত্র, বৈদ্যনাথ ভড় ও আরও কিছু ছেলে সেখানে রওনা দেয়। তারা ঘোষালপুরে হাজির হয়। একজন ফটোগ্রাফারও সেখানে যায় —মৃতাদের ফটো তোলে। চন্দননগরে মহিলা সমিতিরও ভালো সংগঠন। তারা প্রচার করে এবং হৈচৈ তোলে। ডুবির খবর পেঁাছবার পর একটি ছাত্র ধর্মঘটও হয়। কিন্তু মৃতদেহ চন্দনগরে আনা সম্ভব হয়নি। চন্দননগরে ঢোকার সব রাস্তা আটক করে পুলিশ মোতায়েন হয়। মৃতদেহগুলি কুন্তী নদীর তীরে সজ্জলা শ্মশানে পুঁতে ফেলা হয়।'

ডুবির ভেরিতে নেমে আসে শ্মশানের স্তব্ধতা। মানুষ আতঙ্কে নীল। পুলিশ এত নির্মম! মেয়েদেরও তারা রেয়াত করে না! যে কোন প্রতিরোধের পরিণাম যে নির্ঘাত মৃত্যু। ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষকে বল-ভরসা দেওয়ার জন্য পার্টি থেকে সন্ধ্যা চ্যাটার্জিকে পাঠান হল। তাঁর কাজ মেয়েদের উৎসাহিত করা। সন্ধ্যা চ্যাটার্জি বলছেন, 'গিয়ে দেখি সবাই এত সন্ত্রস্ত যে কথা বলতে চাইছে না। এমন কি ভালো ভালো কর্মীরাও ভয়ে আশ্রয় দিতে চাইছে না। শেষ পর্যন্ত এক পোড়ো বাড়িতে রাত কাটাবার জায়গা পেলাম। সঙ্গে আমার অসুস্থ মেয়ে। সে কেবল কাঁদছে। আমি আনাড়ি মা। আমার নাজেহাল অবস্থা দেখে সঙ্গিনী বলতে থাকে—তুমি কাদের জন্যে এখানে এসেছ? যারা তোমার থাকার জায়গা পর্যন্ত দিচ্ছে না! মেয়ে কেবল কাঁদছে—আর ওদিকে পুলিশ টহল দিচ্ছে। মেয়ের কান্না থামাবার জন্যে মেয়ের মুখে কাপড় গুঁজে দিচ্ছি। আমি তখন বেপরোয়া। মেয়ের কথার চেয়েও বড় চিন্তা আমার কীভাবে পার্টির নির্দেশ পালন করব। কিন্তু সেখানে বিশেষ কিছু করা গেল না।'

অগ্রদ্বীপের 'আন্দোলন মূলত সামন্ততন্ত্র-বিরোধী আন্দোলন এবং তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল গোটা কাটোয়া মহকুমায়।

অগ্রদ্বীপ আন্দোলনের পশ্চাৎপট প্রসঙ্গে বলছেন সৌরি ঘটক, 'আমায় পাঠানো হল অগ্রদ্বীপ। নদীর বাঁক অগ্রদ্বীপের এক অংশকে নদীয়ায়

নিয়ে ফেলে। নদীয়ার এসব অঞ্চল অত্যন্ত অনুন্নত। দুঃসহ মানুষের অবস্থা। অখাদ্য আউশ বেসন গোলা আম-কাঁঠাল খেয়ে তারা কোন রকমে বেঁচে আছে। কোমর সিধে করে তারা খাড়া হতে জানে না। মল্লিক পরিবারের উঠবন্দি প্রজা। বছর শেষ হতে না হতেই জমি গোচরের জন্যে বিলি হয়ে যেত গোয়ালাদের মধ্যে। গোয়ালারা আবার জমিদারের লাঠিয়াল। গোয়ালাদের গরুর পাল কৃষকের ফসল খেয়ে শেষ করে দিত। জমিদার বাড়িতে বেগার দিতে হত। মেয়েদের উপর অত্যাচার চলত। কাছারি বাড়িতে বিচার হত। অর্থাৎ সব মিলিয়ে এক নির্ভেজাল 'ফিউডাল' পরিবেশ।'

শশাঙ্ক চট্টোপাধ্যায় বলছেন, 'জ্ঞান মল্লিক, পটল মল্লিক—এরা অত্যন্ত অত্যাচারী জমিদার। মল্লিক বাবুদের মধ্যে একজন আবার ছিলেন অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট। তাই সরকারি মহলেও তাঁদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি। বাবুদের বা তাঁদের আশ্রিতদের বিরুদ্ধে কোন মামলা-মোকদ্দমা তো দূরের কথা—থানায় ডায়েরি করারও কোন উপায় নেই। জমিদারের লোকের মারের চোটে ব্রাহ্মণ পর্যন্ত মারা গেছে। অথচ গলায় কাছা বেঁধে দারোগাকে ছেলে বলেছে, 'বাবা আমার জ্বরে মারা গিয়েছে।' জমিদারের হাতি কৃষকের কলাগাছ খেয়ে ভুট্টি নাশ করে দিয়েছে। প্রতিবাদ নেই। লেখাপড়া বারণ—তাও স্বীকার।'

এসময় হঠাৎ একদিন সুবোধ চৌধুরী অগ্রদ্বীপে এলেন এবং অগ্রদ্বীপের ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন। অগ্রদ্বীপের সন্তান—চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের অন্যতম বিপ্লবী সুবোধ চৌধুরীর ইচ্ছে ছিল—মুক্তি পেয়ে মায়ের কাছে এসে থাকবেন। তারপর তিনি চলে যাবেন আসানসোল—শ্রমিক আন্দোলন করবেন। সুবোধ চৌধুরী গ্রামে এসে দেখলেন—জমিদারের গরু চাষীর ফসল খেয়ে খেয়ে বেড়াচ্ছে। প্রতিবাদ নেই। প্রতিবাদের মানসিকতাও নেই এখানকার মানুষের। একদিন সারারাত জেগে পাহারা দিয়ে সব গরুকে ধরে—সুবোধ চৌধুরী চাষীদের সঙ্গে করে জমিদার বাড়িতে হাজির হলেন। জমিদার যদিও চাষীদের জোর ধমকে দিল—কিন্তু চাষী-চেতনায় ঘটল রূপান্তর।

সৌরি ঘটক বলছেন, 'সেদিন থেকে চাষীরা চলে গেল এক নতুন জগতে। প্রতিবাদের ভাষার সন্ধান পেল তারা। তাদের আগ্রহ হল এক স্কুল করার এবং স্কুল বসল সুবোধ চৌধুরীর বৈঠকখানায়। প্রাইমারি স্কুল চালু হল। পার্টির কর্মীরা যথাক্রমে বড় মাস্টার, মেজ মাস্টার ও ছোট মাস্টার বলে অগ্রদ্বীপের কৃষকের কাছে পরিচিত হলেন।'

তারপর ঘটল কৃষক সমিতির আত্মপ্রকাশ—মূলত সুবোধ চৌধুরীর নেতৃত্বে। শশাঙ্ক চট্টোপাধ্যায় বলছেন, 'অগ্রদ্বীপে ডাকা হল থানা কৃষক সম্মেলন। এ. কে. বি. কে. (আহমদপুর-কাটোয়া ও বর্ধমান-কাটোয়া) রেলওয়ে শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে প্রচার স্কোয়াড গেল সেখানে। জগদীশ মিস্ত্রী, মৃত্যুঞ্জয় দাস, ওয়ারিশ—এই স্কোয়াডে ছিলেন। তাঁদের অবদান—তাঁদের উদাহরণ উদ্বুদ্ধ করল কৃষকদের। তারপর শুরু হল মামলার পর মামলা। কৃষকরা একেবারে নাজেহাল। সুবোধদা নিকুঞ্জ

মোক্তারকে গিয়ে ধরলেন। তিনি উদারভাবে কৃষকদের জমিনের বন্দোবস্ত করে দিলেন। এসবের মধ্যে জড়িয়ে পড়ার ফলে সুবোধ চৌধুরীর আর আসানসোলে গিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন করা হল না।'

দেশ 'স্বাধীন' হবার পর জমিদাররা একটু থমকে গেল। কী ধরনের রাজ এটা—একটু দেখে নেওয়া দরকার। এদিকে মিটিং-মিছিল চলছে, স্কুলও চলছে। দশমীর দিন বিসর্জন দেখতে গিয়ে চাষী আর জমিদারের অনুগত খুনোদের মধ্যে এক সংঘর্ষে আহত হয়ে মহাদেব কাটোয়ায় এল। হাসপাতালে তাকে দেখতে গিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন: 'ভাই, খুব মেরেছে—না? আমাদেরও মারবার দিন আসছে।'

পার্টি বে-আইনী হওয়ার পর সুবোধ চৌধুরী আত্মগোপন করেন। অগ্রদ্বীপে তখন পুলিশ ক্যাম্প বসেছে। ১৪৪ ধারা জারি হয়েছে। একদিন গ্রামের রাস্তায় একলা পেয়ে সৌরি ঘটক আর সুশীল চক্রবর্তীকে পুলিশ ধরে ফেলে। জমিদারের লোকেরা রাতের অন্ধকারে দুজনকেই সাবাড় করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু পুলিশের আপত্তিতে তা আর হয়নি। সুশীল চক্রবর্তী পরে দমদমে জেলে গুলিতে মারা যান। সৌরি ঘটক জামিনে ছাড়া পেয়ে অগ্রদ্বীপে ফিরে আসেন। পরে সৌরিকে ফের ধরা হয় এবং এবার সরাসরি বক্সায় চালান। শশাঙ্ক চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'কয়েকজন পুলিশকে কমিউনিস্ট পার্টির কথা বলতে গিয়ে সৌরির এই বিপত্তি।'

১৯৪৯ সাল জুড়ে চলতে থাকে কৃষকদের সশস্ত্র মিছিল—দা, বল্লম, তীর-ধনুক নিয়ে। এদিকে পুলিশের তৎপরতারও কিছু কমতি নেই। গ্রাম ঘিরে বাড়ি বাড়ি সার্চ এখন দৈনন্দিন ব্যাপার। ঐবছর সপ্তমী পুজোর দিন পার্টি এক জমায়েতের ডাক দিল। আত্মগোপনকারী নেতারা বক্তৃতা করবেন—এটাও জানানো হলো। আত্মগোপনকারী সুবোধ চৌধুরী ও অন্যান্য নেতারা এই সভায় উপস্থিত হন। হঠাৎ পুলিশ চলে আসে সভায় এবং তারপর শুরু হয় পুলিশের সাথে কৃষকদের হাতাহাতি ধস্তাধস্তি। কৃষকরা পুলিশের দুটো রাইফেল ছিনিয়ে নেয় এবং পুলিশ এলোপাথাড়ি গুলি চালায়। পুলিশ আর চাষী সবাই পালায়। পরে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, কিশোর সুনীল পাল বেয়নেট-বিদ্ধ এবং মৃত। তাকে গলায় কলসী বেঁধে নদীতে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। পরের দিন পুলিশ গ্রামে ঢোকে খোয়া-যাওয়া রাইফেলের সন্ধানে। গ্রামের সব পুরুষ তখন গ্রাম ছেড়ে পালায়। পুলিশ রাইফেল দুটি খুঁজে পেল না। রাইফেল দুটিকে সুবোধ চৌধুরী কাকদ্বীপে পাচার করে দেন। রাইফেলের খোঁজে চলে ব্যাপক গ্রেপ্তার ও নির্যাতন। নির্যাতিত সংগ্রামী নেতা কমরেড মণি কর্মকার জেলখানায় মারা যান। পুলিশ সংগ্রামী কৃষকদের পাড়া 'গোপীনাথ পাড়া' লাঙল দিয়ে চষে ফেলে।

এবার অগ্রদ্বীপের কৃষকদের আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ার পালা। ইতিমধ্যে অগ্রদ্বীপের লড়াই কাছাকাছি এলাকার মানুষদের মনেও সাহস যুগিয়েছে! তার জের হিসাবে হঠাৎ দাঁইহাটেও একটা ঘটনা ঘটে। এখানে হাট বসে মঙ্গল

আর শুক্রবার। অগ্রদ্বীপের চাষীরাও এই হাটে কেনাবেচা করতে আসে। খাজনা ছাড়াও তোলা আদায় করা হত এখানে। এক হাটবারে চার-পাঁচশ সশস্ত্র চাষী এসে হাট ঘেরাও করে। আওয়াজ তোলে—খাজনা নিচ্ছ আবার তোলা কিসের? সঙ্গে সঙ্গে জমিদারের লোকেরা পালায়—চাষীও পালায়। হাট ভেঙে যায়। পুলিশ আসে—কিন্তু ধরতে পারে না কাউকে।

অগ্রদ্বীপের পলাতক কৃষকের পিছু পিছু ঘটতে থাকে কৃষক আন্দোলনের বিস্তার। আত্মীয়তার সূত্র ধরে তারা যেখানেই যায় সেখানেই গজায় কৃষক সমিতির অংকুর। তার মধ্যে কয়েকটা জায়গায় বেশ শক্ত পোক্ত ঘাঁটি তৈরি হল। যেমন পারুলে গাঁ। অজয়ের ধারে একটি ছোটগ্রাম—মাত্র পঞ্চাশ-ষাট ঘর লোকের বসতি। অগ্রদ্বীপের চাষীরা সদ্‌গোপ এবং চাষী কায়স্থ। পারুলে আর অগ্রদ্বীপের মধ্যে বৈবাহিক সূত্রে সামাজিক সম্পর্ক ছিল। পুলিশের অত্যাচারের পর সবাই পারুলে গিয়ে ভিড জমাল। সবাই কুটুমের বাড়ি আশ্রয় নিয়েছে। এবং প্রতিটি বাড়ি হোটেল হয়ে গেল—এ বাড়িতে দশজন লোক খাচ্ছে—ও বাড়িতে পনেরো জন লোক খাচ্ছে। গোটা গ্রাম পার্টির পক্ষে চলে এল। জেলা পার্টির সদর দপ্তর হয়ে পড়ল গাঁটা—নেতারাও নিরাপদে বসে এখানে জেলাকমিটির মিটিং করছেন। কারণ অবাঞ্ছিত কেউ এই গাঁয়ে নেই।

শশাংক চট্টোপাধ্যায় বলছেন, পলাতক সুবোধ চৌধুরী আত্মীয়তার সূত্র ধরে কৃষক সংগঠনের কনট্র্যাক্ট যোগাড করতে লাগলেন এবং তিনিও সুবোধ চৌধুরীর সঙ্গে থেকে পলাতক জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন। অতএব ভ্রাম্যমান সুবোধ চৌধুরীর সঙ্গে সঙ্গে পেঁাছে যায় কাটোয়ার গাঁ গঞ্জে ও সংলগ্ন নদীয়া জেলায় চাষীদের ঘরে ঘরে। (অগ্রদ্বীপের ডাক)

এগারো

১৯৪৯-এর ৮ই নভেম্বর ডাকা হল চটকল শ্রমিকের সাধারণ ধর্মঘট। চটকল শ্রমিকের কাছে পার্টির বিপুল প্রত্যাশা। পার্টির বিশ্বাস, 'চটকলে সাধারণ ধর্মঘট আরম্ভ হলেই সমগ্র আন্দোলনের চেহারা বদলে যাবে। এ সাধারণ ধর্মঘট হবে এক প্রবল বিপ্লবী সংগ্রামের সূচনা।' (পার্টি চিঠি, ১. ১১. ৪৯)

পার্টির নেতাদের ধারণা, 'শ্রমিকের পরাজয়ের পালা শেষ হয়ে যাচ্ছে, জয়ের পালা আরম্ভ হয়েছে। এবার সুরু হয়েছে সরকার, কোম্পানী এবং দালালদের পিছু হটার পালা। একটা প্রচণ্ড প্রতি আক্রমণের জন্য শ্রমিকদের কুচকাওয়াজ চলেছে কারখানায় কারখানায় এবং বস্তীতে বস্তীতে। শ্রমিকের দুর্জয় পদক্ষেপ শাসকশ্রেণীর মনে সৃষ্টি করেছে যমের ভয়।' (ঐ)

চটকল ধর্মঘটের এই সিদ্ধান্ত চটকল শ্রমিক নেতা ও সংগঠকদের মধ্যে অনেকেই সেদিন সঠিক বলে মনে করেননি। তাঁদের ধারণা, শ্রমিকদের

মধ্যে সাড়া পাওয়া তো যাবেই না—উল্টে অনেক কষ্টে যেটুকু সংগঠন গড়ে উঠেছে তাও ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।

অজয় দাশগুপ্ত বলছেন, 'আমি, নীরেন ঘোষ, নরেশ দাশগুপ্ত ও শিশির গাঙ্গুলী এই চারজন নিয়ে জুট ফ্র্যাকশান। ১৯৪৯-এ জুট স্ট্রাইক ডেকে বিপ্লবের মহড়া সৃষ্টি করা হল। আমি বলি, ট্রাইব্যুনালের রায় বেরিয়েছে এবং ওয়ার্কাররা কিছু পেয়েছে। এখন স্ট্রাইক করা যাবে না। আমাকে তখন ফ্র্যাকশান থেকে সরিয়ে দেওয়া হল।'

১৯৪৯ সালে বজবজে পাঠান হয় ছাত্রনেতা কমল চ্যাটার্জিকে। তিনি বলছেন, 'বজবজে বাঙ্গালহেরিয়া গ্রামে পুরানো কিছু 'জুট কনট্যাক্ট' ছিল। যেমন আব্দুল সাহেব, তাঁর ভাইপো বজলু ও রসিদ ভাই। আমি তাঁদের বাড়িতে থেকে নতুন করে আবার সংগঠন গড়ার চেষ্টা করি। আমি, সন্তোষ ঘোষ ও অজয় দাশগুপ্ত বজবজ থেকে বিড়লাপুর পর্যন্ত সংগঠন গড়ে তোলার জন্যে আপ্রাণ পরিশ্রম করেছি। একটু একটু করে সংগঠন দানা বাঁধছে—আর পার্টির এক-একটা সার্কুলার, এক-একটা অ্যাকসন বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো সংগঠনকে চুরমার করে দিচ্ছে। এবং তার সর্বশেষ নমুনা এই ৮ই নভেম্বরের ধর্মঘটের ডাক।'

প্রসঙ্গত, ১৯৪৬-এর নির্বাচনের ধাক্কায় বজবজে লালঝাণ্ডা ইউনিয়ন তছনছ হয়ে যায়। সুরেশ ব্যানার্জির লোকেরা মেরে ধরে কমিউনিস্টদের বজবজ থেকে উৎখাত করে। তারপর যাঁরা অনেক কষ্ট ও মেহনত করে লালঝাণ্ডা ইউনিয়নকে বজবজে ফের খাড়া করেন—তাঁদের অন্যতম অজয় দাশগুপ্ত। তিনি ১৯৪৬-এর নভেম্বরে পাকাপাকিভাবে বজবজে চলে আসেন। তারপর থেকে শুরু তাঁর একটানা প্রয়াস।

অজয় দাশগুপ্ত বলছেন, 'আমার দৈনিক কাজের রুটিন হল এই: প্রথম ট্রেনে 'স্বাধীনতা' চলে আসত। তখন ভোর সোয়া পাঁচটা। 'স্বাধীনতা'র বাণ্ডিল ট্রেন থেকে নামিয়ে আমার দিনের কাজ শুরু। বাণ্ডিল বগলে নিয়ে রেললাইন ধরে হাঁটতে হাঁটতে ক্যালিডোনিয়া ও চিভিয়েট মিলের গেটে পৌঁছতাম। চিভিয়েট অবশ্য যুদ্ধের জন্য বন্ধ। ভোর চারটেয় একটা শিফট্ শুরু। চারটে থেকে নটা—নটা থেকে বেলা দুটো—দুটো থেকে সন্ধ্যা ছটা—ছটা থেকে রাত এগারটা। এভাবে শিফট্ চালু ছিল। ভোর সাড়ে পাঁচটায় মিল গেটে পৌঁছে গেলাম। শ্রমিকরা তখন চা খেতে বেরিয়েছে। তাদের শুনিয়ে চেঁচিয়ে 'স্বাধীনতা' পড়তাম। দেখতাম, কিছু লোক আগ্রহভরে শুনছে কয়েকদিন পর বললাম, কিনুন না—একখানা কাগজ চার পয়সা দিয়ে। এই সূত্রে হারিয়ে যাওয়া পার্টি সদস্য ও সমর্থকদের খুঁজে পেলাম আস্তে আস্তে।

তারপর সেখান থেকে যেতাম বজবজের চৌরাস্তায়। সেখানেও কাগজ হক্ করতাম। গ্রাহকদের কাগজ দিয়ে, চিত্রগঞ্জ গেট থেকে হাঁটতে হাঁটতে আড়াই মাইল দূরে বজবজ মিলের গেটে পৌঁছতাম সাড়ে সাতটায়। তখন

দেশে দশঘণ্টা রোজ চলছে। সেখানেও একইভাবে কাগজ পড়া ও বেচার চেষ্টা করতাম। মিল চালু হবার পর মিলের কাছে পার্টি অফিসে এসে সকালের খাওয়াটা সেরে নিতাম। আবার ওখান থেকে ওরিয়েন্ট মিল—পথে পড়ত অ্যালবিয়ান ও লোথিয়ান। ওখানে পৌঁছতাম পৌনে ন'টায় যাতে দু'শিফট্-এর লোককে একসঙ্গে ধরা যায়। তারপর ফিরে এসে একটু বিশ্রাম করে বেলা সাড়ে বারোটায় বজবজ মিলের গেটে হাজির হতাম। তখন দুপুরের ছুটি আধঘণ্টার জন্যে। এই আধঘণ্টার টিফিন হচ্ছে কথা বলার সময়। পনেরো কুড়ি মিনিট তখন নিশ্চিন্তে কথা বলা চলে। এসব সেরে তারপর স্নান খাওয়া। খেতাম শ্রমিকদের সাথে। তারা সকাল সাতটার রান্না বেলা দুটোয় খেত। বিকেলে সাতটা মিলের লোক ধরে মিটিং করার চেষ্টা চলত।'

অজয় দাশগুপ্ত বলছেন, 'বজবজে দু'ধরনের শ্রমিক। কিছু অবাঙালি বাদে সবাই বাঙালি। মিল কোয়ার্টারে সাধারণত অবাঙালিরা থাকত। তারা বাসাড়ে। বাঙালিরা শনিবার রেশন নিয়ে গ্রামে চলে যেত। ছ'মাইল-সাত মাইল দূর থেকে যারা আসে তারও হেঁটে আসে। চটকলের 'হিন্টার-ল্যান্ড' বলতে বোঝায় এক বিরাট গ্রামাঞ্চল। সন্ধেবেলায় আমি সেখানে যেতাম। মিলের কাছাকাছি যারা স্থায়ী বাসিন্দা তাদের ঘিরেই পার্টির বেস গড়ে উঠতে থাকে। চিত্রগঞ্জ-বজবজ-কালীপুর মিলের কাছাকাছি পাড়ায় ধীরে ধীরে পার্টির আসর জমে ওঠে।

১৯৪৭-এর এপ্রিল-মে নাগাদ সুধীন মৈত্র এসে পড়ায় খানিক কাজ-ভাগাভাগি হল। তিনি অফিস আগলাতে লাগলেন এবং খাওয়া-দাওয়ারও একটু সুরাহা হল। ইতিমধ্যে সাতটা মিলের প্রত্যেকটাতে মিল কমিটি তৈরি হয়েছে। পেট্রোলিয়ামেও পার্টি গ্রুপ গড়ে উঠেছে। গোটা ১৯৪৭ সন ধরে 'কনসোলিডেশন' (সংহতি) ও 'এক্সপ্যানশন' (বিস্তার) চলতে থাকে। তখন একদিকে গোডাউন খালি করা হচ্ছে—অপরদিকে আবার শ্রমিকদের মজুরি অত্যন্ত কম। অ্যান্ড্রু ইউল হচ্ছে তখন সবচেয়ে বড় সংস্থা। গোটা সাতচল্লিশ সন ধরে সার বেঁধে আন্দোলন চলতে থাকে। প্রধান দাবি হচ্ছে—মাইনে বাড়ানো আর বদলিওয়ালাদের স্থায়ী করা। আন্দোলনের ট্যাকটিকস্ হচ্ছে—দাবি ঠিক করে গেট মিটিংয়ের মাধ্যমে দাবি সম্বন্ধে শ্রমিকদের ওয়াকিবহাল করা। কিন্তু প্রধান জোর পড়ত মিলের ভেতরে প্রচারের ওপর। মিল কমিটিকে সচল রাখা হত এবং তাদের মিলের ভেতরে কীভাবে কথা বলতে হবে—তা শেখানো হত। বড় বড় মিটিং-ও হয়েছে। সে-সব সভায় বঙ্কিম মুখার্জি, আব্দুল মোমিন ও ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত বক্তৃতা করেছেন।

বজবজে আবার লালঝাণ্ডা ইউনিয়ন জমে ওঠে। এই 'রিভাইভ্যাল' (পুনরুত্থান)-এর কারণ হচ্ছে আমরা কয়েকজন ভালো কর্মী পেয়েছিলুম। যেমন, বজবজ চটকল শ্রমিক ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট আবুহোসেন মোল্লা, বজবজ মিলের শাহ আলম, ক্যালিডোনিয়ান মিলের শিবু দাস, লোথিয়ানের কানাই

রায়, অ্যালবিয়ানের গোবর্ধন ও ওরিয়েন্টের বাবর আলি। সাদউমানি তখন উদীয়মান তরুণ কর্মী। তাছাড়া ছিল চিভিয়টের ভীষ্ম সর্দার ও কেষ্ট হালদার। আমি যেটা করতে পেরেছিলুম, সেটা হচ্ছে পুরানো যোগাযোগ আবার খুঁজে বার করা ও পার্টি সভ্য যারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল—তাদের ফিরিয়ে আনা। এদের সকলকে আবার কাজের মধ্যে নামানো গেল। তার ফলে শ্রমিকদের কাছে পেঁছানো সহজ হয়। মধ্যবিত্ত নেতা ও সংগঠকদের সম্বন্ধে চটকল শ্রমিকদের অবিশ্বাস ও সন্দেহ প্রবল। চটকলে বঞ্চনার ইতিহাসে মজুর দেখেছে, এরা আসে—মালিকের সাথে কথা বলে—আবার চলে যায়। এটাকে বলা যায় একধরনের শৌখিন মজদুরি।

নৌকোয় শ্রমিকরা গঙ্গা ধরে ভাঁটিতে যেত। রোববার রাতে তারা ফের নৌকোয় উঠত। মধ্যে মধ্যে এরকম একটা নৌকোয় চড়ে বসতাম। আবদুল সাহেব বলত—শ্রমিকের বৌ সাজতে বসে শনিবার। গ্রামে যখনই যেতাম রাত্রিতে সেখানে থেকে যেতাম। পরের দিন তাদের সঙ্গেই ফিরে আসতাম।

মিলের মধ্যে প্রচার করার সময় কংগ্রেসী ইউনিয়নকেও বলা হত—তোমরাও এসো আমাদের সঙ্গে। তখনকার চালু ঝোঁক ছিল—একটা ট্রাই-ব্যুনাল বসাতে হবে। কংগ্রেসী ইউনিয়নের কাছে যাওয়া হত যুক্ত আন্দোলন ও সংগ্রামের প্রস্তাব নিয়ে। মিল ম্যানেজারের কাছে যাওয়া হত—কখনো প্রতীক ডেপুটেশন—আবার কখনও গণ-ডেপুটেশন।

১৯৪৮-এর দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের পর আমার ট্যাকটিকস্ বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়াল। ওপর থেকে বলা হল : কী করছ! আই. এন. টি. ইউ. সি.-র অফিসটা পুড়িয়ে দাও।—কেন পোড়াব?—ওরা যে শ্রেণীশত্রু!

অথচ আমার ট্যাকটিকস্ অনুসরণ করেই বজবজ তখন পার্টির সবচেয়ে মজবুত ভিত। তখন বলা হল আমি জোশীর চেলা। আমার মতো 'জোশীআইট' (জোশীপন্থী)-কে কব্জায় রাখার জন্যে বাইরে থেকে লোক পাঠানো হল। ১৯৪৯ সালে বাবা মারা যান। জামসেদপুরে মা-র সাথে দেখা করে ফিরে আসার পর পার্টি আমায় বলে, তোমায় বজবজ যেতে হবে না।'

বাইরে থেকে গিয়ে বজবজে এভাবে মাটি কামড়ে পড়েছিলেন সন্তোষ ঘোষ, মলয় ঘোষ, সুধীন মৈত্র ও ছাত্রনেতা কমল চ্যাটার্জি। তাঁদের রক্ত-জল করা পরিশ্রমে তৈরি সংগঠন এক ধাক্কায় চুরমার হয়ে গেল। চটকল শ্রমিকরা ৮ই নভেম্বর হরতালের ডাকে সাড়া দেয়নি। শুধু বজবজে নয়—কোথাও হরতাল হয়নি।

অজয় দাশগুপ্তকে ধর্মঘটের তিন সপ্তাহ আগে বজবজ থেকে মেটে-বুরুজে পাঠিয়ে দেওয়া হল। কয়লা সড়কের মোড়ে রয়েছে ইস্পাহানি, ক্লাইভ ও ইউনিয়ন চটকল। চটকল শ্রমিক মেটেবুরুজেও হরতালে সামিল হয়নি। মেটেবুরুজে বসে তিনি শুনলেন—বজবজে ভীষণ গোলমাল।

সাদইমানি, রামাচরণ, গফুর—সবাই ধরা পড়েছে। তাছাড়া সন্তোষ ঘোষকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

আসলে সন্তোষ ঘোষ ধরা পড়েছেন। সন্তোষ ঘোষেরও ধারণা—হরতাল কিছুতেই সম্ভব নয়। হরতালের আগের রাত এক খোলা মাঠে কর্মীসভায় বসে তিনি স্পষ্ট ভাষায় তাঁর ধারণা ব্যক্ত করেন। তবুও পার্টির সিদ্ধান্ত মেনে তিনিও যান বজবজ মিলের গেটে অন্যদের সঙ্গে। কলকাতা থেকে কয়েকজন ছাত্র ও ছাত্রী কমরেড গিয়েছিলেন সেখানে। তাঁরাও মিল গেটে গিয়ে পিকেট লাইনে দাঁড়ান। মজুরদের কাছে হরতাল করার জন্যে বারবার আবেদন করা হয়। তারা ভ্রূক্ষেপ করে না। এমন সময় আচমকা মিলের দরওয়ানরা সন্তোষ ঘোষ ও কয়েকজন কমরেডকে টেনে মিলের ভেতরে নিয়ে যায়। দরওয়ানদের লাঠির ঘায়ে সন্তোষ ঘোষ ছাড়াও আহত হন ছাত্র কমরেড নিভা সেনগুপ্ত ও আরও দুজন স্থানীয় কমরেড। তাঁদের মেরে আধ-মরা অবস্থায় গুদাম ঘরে ফেলে রাখা হয়। মজুররা আসছে—দেখছে আর চলে যাচ্ছে। দরোয়ানরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে—এদের বয়লারে ফেলে দিলে কেমন হয়। স্থানীয় একজন কমরেড কেঁদে উঠলেন। সন্তোষ ঘোষ তখন বলছেন, 'কমরেড, জুলিয়াস ফুচিক-এর কথা স্মরণ করুন।'

বজবজে তখন অল্পবিস্তর সবাই আহত। রক্তাক্ত অবস্থায় কমল চ্যাটার্জি ও অন্যান্য কমরেডদের অভিরামপুর গ্রামে আনা হয়েছে।

হরতাল শুধু বজবজে নয়—কোথাও হয়নি। কিন্তু হরতাল ঘটাতে পার্টির নেতারা মরিয়া। কমল চ্যাটার্জি (চন্দননগর) বলছেন, 'ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হলে যদি সাড়া না পাও—তাহলে শ্রমিকদের ভয় দেখিয়ে হটিয়ে দাও। বোমা ছোঁড়ো। এটাই তখন পার্টি লাইন।'

এই অভিজ্ঞতার অন্যতম শরিক কৃষ্ণ চক্রবর্তী। তিনি বলেছেন, 'আটপুর গেলাম। ভোর চারটেয় মেঘনা জুট মিলের দিকে রওনা দিলুম। আমাদের সঙ্গে থলে বোঝাই বোমা। একটাই শুধু আমাদের বক্তব্য। 'মৎ যাও। কামমে যায়েগা তো বোম খায়েগা'; আমাদের ছোট্ট দলে ভাটপাড়ার চোদ্দো বছরের ছেলে কেষ্ট-ও ছিল। আর সমরেশ বোস। দমাদ্দম বোম। কিন্তু শ্রমিকদের ঠেকানো গেল না। তারা কারখানায় ঢুকে গেল। দরওয়ান ও পুলিশের মিলিত আক্রমণে আমরা কে যে কোথায় ছিটকে পড়লাম! কেষ্ট তখন নালায় গড়িয়ে পড়েছে।

আমি কোনরকমে স্টেশনে এসে এক রেলের কামরায় উঠে বসেছি। দুশমনের মতো দেখতে একটা লোক তখন আরেকজনকে বলছে: 'বোমবাজি করা থা। এক আদমীকো খতম কর দিয়া।' আমার চোখ-মুখের অবস্থা দেখে সে সন্দেহকুটিল দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল।

ননী ভৌমিক আমায় পাঠিয়েছিলেন রিপোর্ট আনতে। আমায় লিখতে হবে, শ্রমিকদের মধ্যে অভূতপূর্ব সাড়া ইত্যাদি। সেই রিপোর্ট দিলুম এবং সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা রিপোর্ট পাঠালাম—ননীদা, এই আমার আসল

রিপোর্ট। তার পরিণাম—আমার সঙ্গে আর কেউ দেখা করে না। কোন সার্কুলার বা পার্টি চিঠি আমার কাছে আসে না। একদিন একজন কমরেড এসে আমার কাছ থেকে পার্টির সব কাগজপত্র ফেরত নিয়ে গেল। অর্থাৎ আমি পার্টির আস্থা হারিয়েছি। আমাকে আর বিশ্বাস করা চলে না।'

হরতালের দিন গোন্দলপাড়া জুট মিলের সামনেও একই দৃশ্য। সন্ধ্যা চ্যাটার্জি বলছেন, 'তার আগের রাত আমি, আমার বোন আরতি (কমরেড নির্মল ঘোষের স্ত্রী), অজিত নিয়োগী, জগন্নাথ, হরিপদ ও রবিন দাস—সব একটা ঘরে শুয়ে রয়েছি। একটাই চিন্তা—যেভাবেই হোক হরতাল করাতে হবে। ভোরে গিয়ে দেখি একজনের পর একজন শ্রমিক মিলগেট দিয়ে ঢুকে যাচ্ছে। অজিত নিয়োগী পুলিশকে লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়ে পালাল। বোমা ফাটল না। তখন আমি ও আরতি লাঠি ঘোরাতে লাগলাম। পুলিশ হকচকিয়ে গেল।

নিমাই ভটচার্য তখন সেক্রেটারি। তিনি আমার খুব প্রশংসা করলেন। আর অজিত নিয়োগীকে যাচ্ছেতাই করে বললেন। আমি হয়ে গেলাম এক লাফে আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক।'

একমাস পর আবার অজয় দাশগুপ্তকে বজবজ যেতে হল। খবর এসেছে লোথিয়ান মিলে স্ট্রাইক হয়েছে—অতএব সেখানে তাঁর উপস্থিতি প্রয়োজন। অজয় দাশগুপ্ত বলছেন, 'যেহেতু বজবজ মুক্ত দক্ষিণবঙ্গের রাজধানী হবে—অতএব সেখানে অনবরত লড়াই চালু রাখতে হবে। প্রথমদিন গেটে গিয়ে দাঁড়ালাম—শ্রমিকরা দেখল আর চলে গেল। পরের দিন মালিক পক্ষ কৌশল ঠিক করে ফেলেছে। মালিকের লাঠিয়াল ঝাঁপিয়ে পড়ল। বিলাসপুরী 'ডকা-ডোকী মাগীরা' আমায় ঘিরে যদি না বাঁচাত—তাহলে সেদিন শেষ হয়ে যেতাম। মিল লাইনের মধ্য দিয়ে কাঁটা তারের বেড়ার ফাঁক দিয়ে তারা আমায় বাইরে নিয়ে গেল। আমায় বলল, কাহে আপ আতা হৈ? সব বেইমান। মৎ আইয়ে।

এই হল অ্যাডভেঞ্চারিজমের পরিণতি। চটকল ধর্মঘট শুধু ব্যর্থ নয় চটকল এলাকায় পার্টি আর একবার বিধ্বস্ত।'

বারো

কাকদ্বীপে চলেছে তখন কুম্বিং অপারেশন। শুধু লালগঞ্জ নয়, গ্রাম বাংলায় মানচিত্র থেকে লালবিন্দুগুলি একে একে অপসৃয়মান। পটারির শ্রমিক তখনও রাস্তায়। ভারতীয়া ওলেনবেরির শ্রমিকরাও কারখানার বাইরে। বাইরে বন্দীমুক্তি আন্দোলন ও জেলের ভেতরে লড়াই শুধু রক্তক্ষরাল। শহীদের তালিকাই শুধু দীর্ঘতর হল—অন্ধকারার একটা ইটও খসল না। পশ্চিম বাংলার জেলখানায় কোথাও তিল ধারণের জায়গা নেই।

ধরা পড়েছেন অনেকেই—প্রাদেশিক কমিটি সভ্য ধীরেন মজুমদার—কলকাতা জেলা কমিটির কমলাপতি রায়। কলকাতা-হাওড়া-হুগলি-বাঁকুড়া-চব্বিশ-পরগনার শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের সেরা কর্মীরা জেলে। পার্টির একের পর এক ডাক শুধু প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসছে। গোটা প্রদেশ জুড়ে কমরেডরা জানের পরোয়া না করে লাঠি-গুলির মোকাবিলা করেছেন। জন-সমুদ্রের বুকে জাগেনি কোন ক্ষুব্ধ তরঙ্গ। কেন এই নিশ্চলতা? সংশয়ী মনে জিজ্ঞাসা জাগে—তবে কি পার্টির লাইন ভুল?

কিন্তু সব সংশয় ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তারা আবার জড়ো হয়েছে। শত প্রতিকূলতার মধ্যেও এসেছে তারা। এতদিন তারা লড়েছে স্বদেশের মানুষের জীবন ও জীবিকার স্বার্থে। এতদিন তাই মুখরিত ছিল এই মনুমেন্ট ময়দান—রুটি রুজি জমির দাবিতে। আজ তারা বিশ্বের মানুষের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ। তাদের চেতনায় আজ কলকাতা-রেঙ্গুন-বার্সিলোনা-তেলেঙ্গানা-লেনিনগ্রাড একাকার। একই সত্তায় লীন। আর একটি বিশ্ব-যুদ্ধের হাত থেকে—সমূহ বিনষ্টি থেকে বিশ্বমানবতাকে বাঁচাতে হবে। মার্কিন যুদ্ধবাজদের চক্রান্তকে কিছুতেই সফল হতে দেওয়া চলবে না—কিছুতেই না। ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর বিকেলে তারা আবার জড়ো হয়েছে ময়দানের শান্তি সমাবেশে। ১৪৪ ধারা অমান্য করেই এক সমাবেশ। লক্ষ জনতার সমাবেশ ঘটাতে হবে—এই ছিল পার্টির আহ্বান।

লক্ষ না হোক—হাজার তিরিশেক মানুষ তো বটেই। ইদানীংকালের বৃহত্তম সমাবেশ। যখন কয়েকশ মানুষের বেশি জড়ো করা যাচ্ছে না—তখন এই সমাবেশ তো একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। চারিদিকে এত ব্যর্থতা… এত অপচয়। তবুও এই সমাবেশ কী করে সম্ভব হল? তার উত্তরে অমিয় মুখার্জি বলছেন, ‘সব সত্ত্বেও পার্টির কাছের ও দূরের সমর্থকরা পার্টির সঙ্গেই ছিল। তাই ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর শান্তি সম্মেলনের প্রকাশ্য সভার বে-আইনী জমায়েতে এত জনসমাবেশ! তার অর্থ পার্টির প্রভাবাধীন সব মানুষই পার্টির সঙ্গে আছে। সমালোচনা-হতাশা সত্ত্বেও আছে। যাবে কোথায় তারা!, বিকল্প কী?’

কেন এই শান্তি সমাবেশ! বৈপ্লবিক লড়াইয়ের সময় শান্তি সমাবেশের সার্থকতা কী এবং কতটুকু? তার উত্তরে পার্টির বক্তব্য:

‘…শান্তি সমাবেশ—সাধারণ ধর্মঘট—কৃষকের প্রতিরোধ: এই তিনে মিলে জমাট করে তুলবে ধনিক রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করার শক্তি। তার ফলে প্রকৃত স্বাধীনতা এবং গণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম হবে নিকটবর্তী। বিপ্লবের বিজয়-বিষাণ বেজে উঠবে শহরে এবং গ্রামে। শ্রমিকের নেতৃত্বে হবে শোষিত জন-গণের বিজয় অভিযান।

…যুদ্ধ যেমন সাম্রাজ্যবাদের অস্ত্র, শান্তি তেমনি বিপ্লবের অস্ত্র। শান্তি আন্দোলনের ভিতর দিয়ে জনগণের নিকট মূর্ত হয়ে উঠবে সাম্রাজ্যবাদ-

বিরোধী শিবিরের নেতা হিসেবে সোভিয়েট ইউনিয়নের ভূমিকা। তাই শান্তি সমাবেশ হল আজকের দিনে প্রধান বিপ্লবী সমাবেশ। এ আন্দোলনে পিছিয়ে থাকলে জনতার মনে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের মোহের সুযোগ নিয়ে ধনিক রাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ চক্রান্তকে সফলতার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং বিপ্লবী শিবিরে ভাঙন ধরাবে।

নিখিল ভারত শান্তি সম্মেলনে মাত্র একটা মামুলি সভা নয়। এই সম্মেলনে শ্রেণী সংগ্রামের ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দুনিয়ার জনগণের সঙ্গে ভারতীয় জনগণের সম্মিলিত পদক্ষেপ রচনা করবে

…তারই জন্য যুদ্ধ চাই না শান্তি চাই, এই আওয়াজ অপরাজেয় করে তুলতে হবে।

শান্তির অভিযান নেহরু সরকারের মুখোস খুলে ধরুক, প্রমাণ করুক সমস্ত জনতার সামনে যে সে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের ক্রীতদাস। তার অহিংসার ভড়ং, নিরপেক্ষতার চটক এবং জাতীয়ভাবাদের ছদ্মবেশ নগ্ন হয়ে ধরা পড়ুক—জনতার প্রত্যেকটি অংশের কাছে দুর্জয় বিপ্লব গর্জন করে উঠুক প্রলয়মত্ত শক্তি নিয়ে।' (পার্টি চিঠি, ১. ১১. ১৯৪৯)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন :

'২৬শে নভেম্বর, ১৯৪৯। ময়দানে প্রকাশ্য সম্মেলন। একটা-দেড়টা থেকে ছোট-বড় প্রসেসন এসে জমছে। এমনি লোকও আসছে। মহিলা প্রচুর। লাখের উপর জমায়েত।' (ডায়েরি / এক্ষণ, ১৩৮১)

মনুমেন্ট ময়দান কানায় কানায় ভরে গেল। সুদৃশ্য কোন মঞ্চ তৈরি করা হয়নি। যে কোন মুহূর্তে পুলিশের হামলা হতে পারে—জায়গাটা রণক্ষেত্রের রূপ নিতে পারে। অতএব মনুমেন্টের পূব দিকের সিঁড়িতে বসলেন শান্তি সম্মেলনের সভাপতি, সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন নেতা বৃদ্ধ চক্করাই চেট্টিয়ার। সাধন গুপ্ত শোনালেন গান এবং সলিল চৌধুরী বাজালেন হারমোনিয়াম। সাধন গুপ্তের উদাত্ত গলায় গান সেদিন শিহরিত করেছিল হাজারো মানুষকে। 'চাষী তুই জমি কর দখল'…সাধন গুপ্তের স্ব-রচিত এই গান জনতার মেজাজের সঙ্গে সেদিন আদৌ বেমানান নয়। বরঞ্চ শান্তির ললিত বাণীর চেয়ে অনেক বাস্তব।

'তারপর মিছিল। মশাল হাতে কয়েক হাজার নরনারীর মিছিল। সকলের মনে উন্মাদনার ছোঁয়া। হাজার মানুষের কণ্ঠে ধ্বনিত হল—যদি যুদ্ধ বাধে তাহলে ভারতের নওজোয়ান সোভিয়েটের সঙ্গে থাকবে। হম্ ভারতকা নওজোয়ান সোভিয়েটকা সাথ হ্যায়। ঘোষিত হল, সাম্রাজ্যবাদের ক্রীড়নক নেহরু সরকারের দিন ঘনিয়ে এসেছে। তারও দশা হবে, তার সাঙাৎ চিয়াং কাই শেক-এরই মতো।

সন্ধ্যা নেমে এল—ধীরে ধীরে রাত ঘনিয়ে এল। পুলিশ বাধা দিল না। গুলি নয়—লাঠি নয়—কাঁদুনে গ্যাস নয়। অবাক দৃষ্টিতে রাস্তার দু'ধারের লোক দাঁড়িয়ে মিছিল দেখছে। একজনের কোলে বাচ্চা। বাচ্চাটির হাতে মিছিলকারী একজন মশাল গুঁজে দিল। বাচ্চার বাবার মুখে স্মিত হাসি। আবার যেন ফিরে এসেছে সেই দিনটি: ১৯৪৫ সালের ৪ঠা মে—বার্লিন বিজয় উৎসবের দিন।

তেরো

কয়েকটি বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে ১৯৪৯ সাল অতিক্রান্ত। পুলিশ বনাম কমিউনিস্ট সংঘর্ষ এখন কলকাতার মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ। এ প্রসঙ্গে ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য—যার সভাপতি অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও সম্পাদক কবিরাজ যাদবেশ্বর ভট্টাচার্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের প্রধান, অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ১৯৪২ সাল থেকে একজন প্রগতিশীল কংগ্রেসী ও কমিউনিস্টদের বন্ধু বলে পরিচিত। সেদিন যখন 'প্রগতিশীল কংগ্রেসী' ও অকমিউনিস্টরা প্রায় সবাই কমিউনিস্টদের সংশ্রব এড়াতে তৎপর—তখনও অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় কমিউনিস্টদের সংশ্রব ছাড়েননি এবং বেশ কিছুটা ঝুঁকি নিয়েই তিনি নানাভাবে বে-আইনী কমিউনিস্ট পার্টিকে সহায়তা করে চলেছেন। আর কবিরাজ মশায় ছিলেন আজীবন পার্টি-দরদী মানুষ।

কলকাতার নানা পার্কে ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটির নামে সভা এবং সভান্তে মিছিল ও অনিবার্য সংঘর্ষ—এটাই ছিল প্রতিদিনের দৃশ্য। তার ফলে, সমগ্র এলাকাটি যেন একটি ছোটখাট রণক্ষেত্র। ফুটপাতের হকার ও পথচারীদের ছুটোছুটি হুড়োহুড়ি। মাঝে মাঝেই বোমা ও কাঁদুনে গ্যাসের শেল ফাটার বিকট শব্দ এবং অন্তত ঘণ্টা কয়েকের জন্যে স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা বিপর্যস্ত। এরকম একটা দিনে, পিপলস্ রিলিফ কমিটির গাড়িটি পুলিশ বাজেয়াপ্ত করে এবং গ্রেপ্তার করে অ্যাম্বুলেন্সের চালক ও ডাক্তারকে। 'যুগান্তর'-এর (১৩. ১২. ৪৯) সংবাদসূত্রে জানা যায়: পুলিশের অভিযোগ, রিলিফ প্রতিষ্ঠানের অ্যাম্বুলেন্স থেকে শোভাযাত্রীদের বোমা সরবরাহ করা হয়েছে। সেদিন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের বাসভবনের সামনে 'একশত স্ত্রীলোক সহ পাঁচশত লোকের এক মিছিল বিক্ষোভ দেখালে শোভাযাত্রা থেকে ছয়জন স্ত্রীলোক সহ বারজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়।'

এ ধরনের সভা ও বিক্ষোভ মিছিল আরও বার কয়েক ঘটে—যেমন ১৮ই ডিসেম্বর ও ৩১শে ডিসেম্বর। ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারি 'যুগান্তর'-এর পাতায় কমিউনিস্টদের এ ধরনের কাজের সমালোচনা করে এক সম্পাদকীয়

নিবন্ধে লেখা হয় : 'কমিউনিস্টদের বোমায় নিরীহ পথচারী আহত' এবং আজ শান্তিপ্রিয় নাগরিকের জীবন ও জীবিকা নিদারুণভাবে বিপদগ্রস্ত।

কমিউনিস্টদের জন্যে ১৯৫০ সাল শুরু—আর এক দফা সরকারি হামলার মধ্য দিয়ে। ৬ই জানুয়ারি 'যুগান্তর'-এর সংবাদে প্রকাশ :

'পশ্চিমবঙ্গে কম্যুনিস্টপন্থী সাতটি প্রতিষ্ঠান বে-আইনী ঘোষিত। জনসাধারণের শান্তির পক্ষে বিপজ্জনক বলিয়া সরকারী ব্যবস্থা। ভারতীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৬নং ধারা অনুযায়ী বে-আইনী ঘোষিত প্রতিষ্ঠানগুলির নাম : বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন, ছাত্রী সংঘ, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, পীপলস্ রিলিফ কমিটি, কিষাণ সমিতি, ক্ষেত মজদুর সমিতি ও নওজোয়ান লীগ।'

নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়েনি—বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিটি ও শান্তি সংসদ। বস্তুত এই অবৈধ ঘোষণার ব্যাপারটা নিতান্ত আনুষ্ঠানিক। কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হওয়ার পর থেকেই পার্টি-পরিচালিত গণসংগঠনগুলি কখনও অবাধে কাজ করতে পারেনি। অনবরত খানাতল্লাশি ও গ্রেপ্তার প্রায় গা-সওয়া ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাছাড়া ইতিমধ্যে পার্টি ও গণসংগঠনের মধ্যে সীমারেখাটুকু প্রায় মুছে গিয়েছিল।

এ প্রসঙ্গে জগৎ ঘোষ বলছেন, 'দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের পর পার্টির নেতারা কার্যত সব ইউনিয়ন ভুলে দিলেন। ইউনিয়নের জায়গায় এল স্কোয়াড। গণ-সংগঠনের আলাদা অস্তিত্ব উঠে গেল। সবই পার্টির নামে চলতে লাগল।'

যাই হোক, সাতটি গণ-সংগঠনের বে-আইনী হওয়ার ঘটনাটি, পার্টি-নেতৃত্বের মতে, পার্টি লাইনের সঠিকতার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। পার্টি সদস্যদের উদ্দেশে লেখা হয় :

'প্রিয় কমরেডগণ, ১লা নভেম্বরের পার্টি চিঠিতে আমরা বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়েছিলাম তা যে কত সত্য তার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে গত দুই মাসে।

ঐ চিঠিতে আমরা লিখেছিলাম : 'আমরা এখন জ্বলন্ত বিপ্লবী অবস্থার মধ্যে এসে পড়েছি, শ্রমিক এবং মেহনতী জনতার সংগ্রামী ঐক্য অনেক উচ্চস্তরে উঠে এসেছে, শ্রেণী সংগ্রাম এখন গৃহযুদ্ধের (সিভিল ওয়ার) আকার নিয়েছে।

এই উক্তির প্রমাণ স্বরূপ সরকার বাংলায় মজদুর নওজোয়ান লীগ, ছাত্র ফেডারেশন, ছাত্রী সংঘ, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি, ক্ষেত-মজুর সমিতি এবং পীপলস্ রিলিফ কমিটি এই সাতটি গণ-সংগঠনকে বে-আইনী ঘোষণা করেছে।' (পার্টি চিঠি, ১৪. ১. ৫০)

আরও বলা হল, ২৬শে জানুয়ারি যে সংবিধান চাপানো হবে তাতে রয়েছে ফ্যাসিস্ট ডিক্টেটরশিপ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা। '…রিপাবলিক নামটা ব্যবহার করে নেহরু সরকার মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে।' কমরেড-দের আহ্বান জানিয়ে বলা হল :

'২৬শে জানুয়ারি হবে সারা ভারতে গণতান্ত্রিক বাহিনীর বিপ্লবী কুচ-কাওয়াজের দিন। প্রিয় কমরেডগণ, সার্থক করে তুলুন এদিনটাকে সারা বাংলায় গণ-বিক্ষোভ সৃষ্টি করে। সভা, মিছিল, ধর্মঘট আর প্রতিরোধের ভিতর দিয়ে জাগিয়ে দিন সেদিন শত লক্ষ জনতার ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ। বুঝে-নিক আমেরিকান আর ইংরেজ যুদ্ধবিলাসীরা যে বৃথাই তাদের নেহরু-প্যাটেলের ওপর ভরসা করা।' (ঐ)

ঠিক হয় যে অবিরাম প্রচারের মাধ্যমে 'প্রজাতন্ত্রে'র মুখোস খুলে দিতে হবে এবং নতুন করে আবার শ্রমিকদের কাছে যেতে হবে। মূল প্রচারক্ষেত্র হিসেবে শ্রমিক অঞ্চলকে চিহ্নিত করা হয়। পার্টি কর্মীদের কাছে আহ্বান আসে—'শ্রমিক শ্রেণীকে জয় কর।'

বাইরে থেকে যাঁরা ২৬শে জানুয়ারি উপলক্ষ্যে শ্রমিক এলাকায় প্রচার করতে গিয়েছিলেন, তাঁদের অভিজ্ঞতা কিন্তু মোটেই সুখকর নয়। রবি ভট্টাচার্য বলছেন, '২৬শে জানুয়ারি উপলক্ষ্যে কাশীপুরে গিয়েছিলুম। সেখানে শ্রমিকদের মধ্যে কিছু প্রচারপত্র ছড়িয়ে দিই। কারখানার ছুটির পর গেট মিটিং-এ লোক জড়ো হত না—সাইকেলে করে চলে যেত। তাদের বাড়িতে গেলে তবে তারা কথা বলত।'

প্রচার সেবে অক্ষত শরীরে এলেন রবি ভট্টাচার্য। কিন্তু অক্ষত রইলেন না কৃষ্ণ চক্রবর্তী। তাঁকে আই. এন. টি. ইউ. সি.-র লোকেরা মেরে অজ্ঞান করে দিল। বরানগর হাসপাতালে কৃষ্ণ চক্রবর্তী সংজ্ঞা ফিরে পেলেন। তাঁকে তারিফ জানিয়ে পার্টি চিঠিতে (১৬. ২. ১৯৫০) লেখা হয়: 'কারখানা অঞ্চলে প্রচার করতে গিয়ে কৃষ্ণ চক্রবর্তী যে সাহস দেখালো এবং যে যন্ত্রণা বরণ করলো তা প্রমাণ করে পার্টির রাজনৈতিক পথের সঙ্গে শক্তি। এইসব ক্যাডার আমাদের পার্টির অমূল্য সম্পদ।'

২৬শে জানুয়ারি পার্টির ডাকে বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন হয় দেশপ্রিয় পার্কে। প্রতিটি ইউনিটকে লোকজন নিয়ে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়। অজয় দাশগুপ্ত বলছেন, 'দেশপ্রিয় পার্কের জমায়েতে গুনে গুনে ১৩২ জন লোক এনেছিলুম মেটেবুরুজ থেকে।' এভাবেই জড়ো হয় পার্টির লোকজন। কিন্তু পুলিশ আগে থেকেই পার্ক দখল করে রাখে। অতএব সভা হতে পারেনি এবং বেধে যায় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ।

এই ঘটনা সম্পর্কে 'আনন্দ বাজার'-এ (২৮. ১. ৫০) প্রকাশিত বিবরণ :

কলিকাতায় হাঙ্গামা

'গত বৃহস্পতিবার সায়াহ্নের দিকে দক্ষিণ কলিকাতায় দেশপ্রিয় পার্কের নিকটে এক ঘটনায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীরা দুইখানি ট্রামগাড়ীতে অগ্নি সংযোগ করে এবং ফায়ার ব্রিগেডের একখানি গাড়ী ও একখানি সরকারী বাস আক্রমণ করে।

দেশপ্রিয় পার্কে এইদিন অপরাহ্নে কম্যুনিস্টদের উদ্যোগে আহূত প্রজাতন্ত্র দিবসের বিরোধী সভা অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে ঐ গোলমালের সূত্রপাত হয়। গোলমাল অবশ্য একটি অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ থাকে। উপরোক্ত ঘটনায় প্রায় ২৫ জন আহত হয়, তন্মধ্যে ৫ জন পুলিশ। আহতদের মধ্যে দুই ব্যক্তি গুলিতে ও একজন ফায়ার ব্রিগেডের কর্মী বোমায় আহত হয়। পুলিশ এই ঘটনায় ৪৫ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।'

'যুগান্তর'-এ (২৮. ১. ৫০) প্রকাশিত সংবাদে জানা যায় :

'গুলি বর্ষণে একজন মারা গিয়াছে। ঘটনা সম্পর্কে প্রকাশ যে দেশপ্রিয় পার্কে বি. পি. টি. ইউ. সি-র এক সভা হইবে বলিয়া ঘোষিত হয়। কিন্তু পুলিশ পূর্বাহ্নেই সভা-স্থল অধিকার করিয়া বসিয়া থাকিলে ইহারা অদূরে সমবেত হইয়া নানাপ্রকার ধ্বংসাত্মক শ্লোগান দিতে থাকে। পুলিশ লাঠি চালনা করে। ইহারা বোমা নিক্ষেপ করে।'

কিন্তু কোন কাগজে লেখা হল না সেই ছেলেটির কথা—যার নাম নিখিল। দেশপ্রিয় পার্কে সেদিন কিশোর কমরেড নিখিল ভাদুড়ীকে পুলিশ পিটিয়ে খুন করেছিল।

আরেকটি ঘটনাও অনেকের নজর এড়িয়ে যায়। কালীঘাট ট্রাম ডিপোর সামনে একটি ট্রামে সেদিন আগুন দেবার চেষ্টা হয়। ট্রাম ডিপো থেকে একদল ট্রাম শ্রমিক বেরিয়ে এসে তাড়া লাগায় এবং তারা একজনকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

১৬ই ফেব্রুয়ারির 'পার্টি চিঠি'তে লেখা হল :

'জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে জনগণ আর এক কদম এগিয়ে গেছে ২৫শে এবং ২৬শে জানুয়ারি। ১৯৫০ সালের উদ্বোধন হয়ে গেল বাংলার জনগণের খণ্ড সংগ্রামগুলিকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের উন্নত পর্য্যায়ে তুলে ধরে।

২৬শে জানুয়ারি দক্ষিণ কলকাতায় প্রায় একলক্ষ নরনারী ব্যারিকেড রচনা করে তিন ঘণ্টা ধরে লড়েছে আক্রমণকারী শত্রুসেনার বিরুদ্ধে। কলকাতার রাস্তায় ব্যারিকেড সংগ্রাম গত একবছর আরও কয়েকবার হয়েছে, কিন্তু এবারকার সংগ্রাম সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের।

প্রথমতঃ এবারকার সংগ্রাম অন্যবারের মত কোন আংশিক গণদাবী নিয়ে হয়নি, হয়েছে সরকারী গঠনতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে : এ সংগ্রাম হল সমগ্রভাবে জাতীয় পরাধীনতার বিরুদ্ধে ও ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রশক্তির উচ্ছেদের লক্ষ্য নিয়ে। সাধারণ নাগরিকেরাও সঠিকভাবে ২৬শে জানুয়ারির ঘটনাকে রসিদ আলি দিবসের সংগে তুলনা করেছেন।'

২৬শে জানুয়ারির ঘটনার পর কিন্তু অনেক জল গড়িয়েছে। সেই সূত্রে এজাতীয় বিবরণ ও বিশ্লেষণের বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে পার্টি কমরেডদের মনে জেগেছে নানা প্রশ্ন। এবং পার্টি লাইনের সঠিকতা ও পার্টি নেতৃত্বের বিচক্ষণতা সম্পর্কে কমরেডরা এখন রীতিমতো সংশয়ী।

কারণ, ১৯৫০ সালের ২৭শে জানুয়ারি মুদ্রিত হয়েছে 'কমিনফর্ম'-এর মুখপত্র 'ফর এ লাস্টিং পীস—ফর এ পিপলস্ ডেমোক্রেসি'র পাতায় সেই ঐতিহাসিক সম্পাদকীয় নিবন্ধ। কমরেডরা সবাই তখন তন্ময় চিত্তে তার মর্মোদ্ধারে ব্যস্ত।

ধীরে ধীরে যবনিকা নেমে এল মঞ্চে—শেষ হল একটি যুগ।

চোদ্দো

কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টি সমূহের ইনফরমেশন ব্যুরো অর্থাৎ 'কমিনফর্ম'-এর মুখপত্র 'ফর এ লাস্টিং পীস—ফর এ পিপলস্ ডেমোক্রেসি'র ২৭শে জানুয়ারি, ১৯৫০-এর সংখ্যায় প্রকাশিত হয় : 'উপনিবেশ ও পরাধীন দেশসমূহের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিরাট অগ্রগতি' শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধ। তাতে বলা হয়েছে,

'বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির যে বিশেষ লক্ষণগুলি প্রথমেই চোখে পড়ে তার মধ্যে উপনিবেশ এবং পরাধীন দেশগুলির বিপ্লবী সংগ্রামের অভূতপূর্ব ব্যাপক সুযোগ ('স্কোপ') হচ্ছে অন্যতম। অনেক দেশেই এই সংগ্রাম সশস্ত্র রূপ নিয়েছে এবং প্রাচ্যের কোটি কোটি মেহনতী জনতা এই সংগ্রামে অংশগ্রহণ করছে।'

সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বিশেষ জোর দিয়ে বলা হয় :

'জাতীয় স্বাধীনতা ও গণরাষ্ট্রের সংগ্রামে উপনিবেশ এবং পরাধীন দেশের জনগণের উচিত · চীনের জনগণ যে পথ নিয়েছে·· সেই পথ গ্রহণ করা'।

চীনা জনগণের বিজয়ী মুক্তি-সংগ্রাম-লব্ধ দুটি শিক্ষার উপর আলোচ্য নিবন্ধটিতে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে :

১. 'সাম্রাজ্যবাদী আর তাদের তাঁবেদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং শ্রমিকশ্রেণী ও তার অগ্রবাহিনী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে এক ব্যাপক,

দেশব্যাপী সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠন করতে যারা ইচ্ছুক সেই সমস্ত শ্রেণী, পার্টি, গ্রুপ এবং সংগঠনের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

২. জনগণের মুক্তি-ফৌজ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় অভ্যন্তরীণ অবস্থা যখন সৃষ্টি হয়, তখন কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে জনগণের মুক্তি ফৌজ গঠন করাই হচ্ছে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের বিজয়লাভের একটি চরম শর্ত।'

ভারতবর্ষ প্রসঙ্গে এই প্রবন্ধে বলা হয়:

'ভারতকে দান করা হয়েছে এক ভুয়া স্বাধীনতা। কিন্তু 'পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয়' রয়ে গিয়েছে সেখানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ। মাউন্ট-ব্যাটেনরা চলে গিয়েছে, কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ রয়ে গিয়েছে—ভারতকে সে অক্টোপাশের মতন তার রক্তাক্ত শুঁড়ে আঁকড়ে রয়েছে।

এই অবস্থায় ভারতের কমিউনিস্টদের কাজ হচ্ছে চীন এবং অন্যান্য দেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অভিজ্ঞতা নিয়ে, স্বভাবতই সমস্ত কৃষকের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর মিতালিকে শক্তিশালী করা ও জরুরী প্রয়োজনীয় কৃষি সংস্কার প্রবর্তনের জন্য লড়াই করা। যারা দেশের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে সেই ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে আর যারা তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করছে সেই প্রতিক্রিয়াশীল বড় বড় বুর্জোয়া ও সামন্ত রাজাদের বিরুদ্ধে, দেশের মুক্তি ও জাতীয় স্বাধীনতার জন্য একই সাধারণ সংগ্রামের ভিত্তিতে—সমস্ত শ্রেণী, পার্টি, গ্রুপ এবং সংগঠন যারা ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা এবং মুক্তিকে রক্ষা করতে ইচ্ছুক, তাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ করা হবে অন্যতম কাজ।'

সৌরি ঘটক বলছেন, 'আমাদের আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা ধর্ম-বিশ্বাসের মতো। আমরা যখন দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে হঠকারী লাইন পাশ করি—তখনও আমাদের চোখের সামনে ছিল ঝানভের লাইন, কার্দেলির রচনা ও যুগোশ্লাভ পার্টি-প্রতিনিধি দেদিয়ার-এর উপস্থিতি। আবার যখন আন্ত-র্জাতিক নেতৃত্ব ভুল শুধরে দিল—তখন কমিনফর্ম-এর সম্পাদকীয়তে ভারতবর্ষ সম্পর্কে চার লাইনই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। আমরা মেতে উঠলাম।'

সত্যি কমিউনিস্ট পার্টিতে সেদিন এই রচনাটি এক যুগান্তকারী পরিবর্তনে অনুঘটকের ভূমিকা নিয়েছিল। অনেকের কাছে নিবন্ধটি যেন গাঢ় অন্ধকারের মাঝে একমাত্র আলোর শিখা। পার্টি যে আজ এক কানা-গলিতে ঢুকে পড়েছে, এ বিষয়ে অনেক কমরেড নিঃসন্দেহ। তাই সম্পাদকীয় নিবন্ধটির প্রতিটি অক্ষর তাঁরা পরম শ্রদ্ধা ও গভীর নিষ্ঠা সহকারে পাঠ করা শুরু করেন।

সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলছেন, '২৭শে জানুয়ারি, ১৯৫০-এ কমিনফর্ম-এর বক্তব্য শরৎ বোসের 'নেশন' পত্রিকায় প্রথম বেরুল। লোকে যেভাবে বেদ অধ্যয়ন করে, আমি সেভাবে প্রতিটি শব্দ খুঁটিয়ে পড়লাম। লেখাটা নিয়ে আমি রবি ভটচাযের সঙ্গে দেখা করি। বললাম, পড়ে দেখ। রবি ভটচায

তখন কলেজ টীচার্স কাউন্সিল অব অ্যাবশানের কনভেনর এবং উগ্র বিপ্লবী লাইনের কট্টর সমর্থক। লেখাটা পড়ে রবি ভট্টাচার্যের মুখ পাণ্ডুর হয়ে গেল।

তারপর রীতিমতো শুরু হল অন্তঃ-পার্টি সংগ্রাম। শান্তি বোস, বৌধায়ন চট্টোপাধ্যায় ও যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শিবু সেনের সঙ্গে যোগাযোগ হল। যোগাযোগ ঘটল শান্তি আন্দোলনের কর্মী নরহরি কবিরাজ ও হরিদাস নন্দীর সঙ্গে। আমরা সংগ্রাম শুরু করি ট্রটস্কিবাদের বিরুদ্ধে।

পার্টি জীবনে শুরু হল সম্পূর্ণ নতুন অচেনা এক অধ্যায়। রবি ভট্টাচার্যের মতো যাঁরা তদানীন্তন পার্টি লাইনের কট্টর সমর্থক, তাঁদের এবার অপ্রতিভ হবার পালা। আর অজয় দাশগুপ্ত, অজিত রায় ও শান্তিময় রায় প্রমুখ কমরেড—যাঁরা ছিলেন ধিকৃত, জোশীপন্থী বলে নিন্দিত অথবা রাজনৈতিক মতবিরোধ হেতু পার্টি থেকে বহিষ্কৃত—তাঁরা এখন শক্ত জমির উপর দাঁড়িয়ে। তাঁদেরকে দেখা গেল অন্তঃ-পার্টি সংগ্রামের পুরোভাগে। অবশ্য এতদিন তাঁরা মোটেই নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে থাকেননি। পার্টির ভ্রান্ত রাজনীতির বিরুদ্ধে তাঁদের ঐকান্তিক সংগ্রাম একদিনের জন্যও থেমে থাকেনি। মূলত তাঁদের একক অথবা যৌথ প্রয়াস ছিল—পার্টি-অনুসৃত ভ্রান্ত রাজনীতি ও তার সর্বনাশা পরিণামের প্রতি ভারতের বাইরে ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির দৃষ্টি আকর্ষণ করা। তাঁরা বিভিন্ন দলিল ও লেখাপত্র কমিউনিস্ট পার্টিগুলির নেতাদের কাছে পাঠাতেন—যাতে তাঁরা ভারতের কমিউনিস্ট নেতাদের ভ্রান্ত পথ অনুসরণ করা থেকে বিরত করেন।

এ প্রসঙ্গে অজয় দাশগুপ্ত বলছেন, 'লাস্টিং পীস'-এর সম্পাদকীয়কে ঘিরে যে "আউটবার্স্ট" (বিস্ফারণ) হল—তার জমি ইতিমধ্যে প্রস্তুত। আমি পার্টির ভুল লাইনের সমালোচনা করে বাইরে ডকুমেন্ট পাঠানো শুরু করি। কেউ কেউ বলতেন—এসব যে লিখছ—তাতে কি ভালো হবে? ঐ সম্পাদকীয় বেরুবার পর—তারা চুপ। আর আমি পায়ের নীচে জমি পেলাম।'

একক প্রয়াসের চূড়ান্ত নিদর্শন অজিত রায়ের তৎপরতা। ১৯৪৯ সালের মার্চে তিনি পার্টি থেকে রাজনৈতিক কারণে বহিষ্কৃত হন। তারপর শুরু তাঁর প্রভূত অধ্যয়ন ও কষ্ট স্বীকার পর্ব। এবং তার ফলশ্রুতি—'এ ক্রিটিক অফ সি. পি. আই'স থেসেস—লেনিনিজম অ্যান্ড রিভিশনিজম'—তদানীন্তন পার্টি লাইনের সমালোচনামূলক একখানি ৬০ পৃষ্ঠার পুস্তিকা।

অজিত রায় বলছেন, 'বাঁধাই পর্ব শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুস্তিকা-খানির কয়েক কপি দপ্তরিখানা থেকে নিয়ে দিল্লী-কালকা মেলে চেপে বসি। দিল্লীতে পেঁছে আমি 'প্রাভদা'র সংবাদদাতা গোনিন-এর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে পুস্তিকাখানির একখানা কপি মস্কো পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ করি। গ্রোনিন পাঠাবেন বলে কথা দিলেন।'

তারপর দেখতে দেখতে দু'মাস কেটে গেল। কোন সাড়াশব্দ নেই। কমিনফর্ম-এর সম্পাদকীয় প্রকাশিত হওয়ার পর অজিত রায় মনস্থ করলেন, ভারতের বাইরে যাবেন—প্রথমে লণ্ডন পরে মস্কো। তাঁর ধারণায়, পার্টির

ভ্রান্ত লাইনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রকৃত ক্ষেত্র সেখানে। তাঁর লণ্ডনযাত্রার খরচ জোগালেন স্নেহাংশুকান্ত আচার্য। তাছাড়া তাঁকে সর্বতোভাবে সাহায্য করলেন তাঁর বাল্যবন্ধু—প্রখ্যাত নর্তক বুলবুল চৌধুরী। লণ্ডনে গিয়ে কিন্তু তিনি এক অপ্রত্যাশিত ও নির্মম অভিজ্ঞতার মুখোমুখি। তাঁর যাবতীয় উৎসাহ-উদ্দীপনা নিদারুণভাবে প্রতিহত হল। ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির নেতা কমরেড রজনী পাম দত্ত তাঁর কোন কথা তো শুনলেনই না—যেহেতু অজিত রায় পার্টি থেকে বহিষ্কৃত—উপরন্তু তাঁর সঙ্গে রীতিমতো অপমানজনক ব্যবহার করলেন।

এ ঘটনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে ব্রিটিশ পার্টির সম্পাদককে তিনি লেখেন : আমরা প্রত্যেকে একটা আন্তর্জাতিক আন্দোলনের শরিক। অতএব প্রতিটি দেশের কমিউনিস্ট পার্টির কর্তব্য অন্যদেশের পার্টিকে সর্বতোভাবে সহায়তা করা। যেহেতু আমি সাচ্চা কমিউনিস্ট—তাই আমি ফেনার ব্রকওয়ের কাছে না গিয়ে আপনাদের কাছে এসেছি।—চিঠির জবাব দেওয়া তো দূরে থাকুক, প্রাপ্তি স্বীকার পর্যন্ত করেননি গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক হ্যারি পলিট।

রজনী পাম দত্তের সঙ্গে সাক্ষাৎকারজনিত অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতায় অজিত রায় মর্মাহত। তিনি তখন লণ্ডন প্রবাসী ড. কে. এম. আসরফ-এর সাবধান-বাণী শুনে মস্কো যাত্রার সংকল্প ত্যাগ করলেন। আসরফ-এর বক্তব্য : অজিত রায় যদি কোন রকমে মস্কোতে পেঁছিতেও পারেন—তাতেও তাঁর উদ্দেশ্য সফল হবে না। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে দেয়ালে দাঁড় করিয়ে স্পাই বলে গুলি করা হবে।

অতএব ক্ষুব্ধ ও ব্যর্থ অজিত রায়ের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন।

একক প্রয়াস যেখানে প্রতিহত বা যথেষ্ট ফলপ্রসূ হল না—যৌথ প্রয়াসের ফল সেক্ষেত্রে সার্থক ও সুদূরপ্রসারী। ১৯৪৯-এর শেষাশেষি পার্টি থেকে বহিষ্কৃত পূরণচন্দ জোশীকে কেন্দ্র করে একটা শক্তিশালী গোষ্ঠী দানা বাঁধে। বি. টি. আর. নেতৃত্বে অনুসৃত সর্বনাশা লাইনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্রে জোশী তাঁর বিপুল অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার উজাড় করে দেন। তিনি পর পর তিনখানি পুস্তিকার মাধ্যমে তাঁর নিজস্ব বক্তব্য উপস্থিত করেন। শুধু দেশের মানুষের প্রতি নয়—বিদেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির উদ্দেশেও তিনি একটার পর একটা বিবৃতি প্রচার করেন।

পলিট ব্যুরো-র ট্যাকটিকাল লাইনের বিরোধিতার অপরাধে বহিষ্কৃত শান্তিময় রায়ের সঙ্গে জোশীর প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে ১৯৪৯-এর জুনে। সেদিন তাঁরা ভিক্টোরিয়ার মাঠে বসে স্থির করেন—অন্তঃ-পার্টি সংগ্রাম পরিচালনার জন্যে আলাদা কেন্দ্র তৈরি করতে হবে। তারপর কেন্দ্রীয় কমিটির 'ডেন' ছেড়ে এসে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন গোবিন বিদ্যার্থী। তাছাড়া তাঁরা পেলেন ভূপেশ গুপ্ত, বোধায়ন চট্টোপাধ্যায় ও দেবদাস ঘোষের সক্রিয় সহযোগিতা। সবাই একত্রে কাজ করা শুরু করলেন।

শান্তিময় রায় বলছেন, 'চিঠি লেখা হল এখানকার অবস্থা জানিয়ে তোগলিয়াত্তি, মরিস তোরে ও মাও সে তুং-কে। রজনী পাম দত্তকে চিঠি পেঁাছে দিল তারা সোহিন। রুশ দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি প্রোনিন-এর মারফৎ রাশিয়ায় চিঠি পাঠানো হল। 'ভিউজ' নামে এক পুস্তিকা বার করলেন জোশী। তাছাড়া যাবতীয় দলিল, পত্র-পুস্তিকা, সার্কুলার ইত্যাদি বিনা মন্তব্যে বাইরে নানা জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হত। 'লাস্টিং পীস'-এর সম্পাদকীয়টা মোহিত মৈত্রকে দিয়ে এলাম। তিনি সেটা 'নেশন' পত্রিকায় পুরো ছাপিয়ে দিলেন। তার সাত দিনের মধ্যে শুরু হল তীব্র অন্তঃ-পার্টি সংগ্রাম।'

প্রসঙ্গত, জোশীর প্রকাশ্য বিবৃতি কফিনফর্ম-এর সম্পাদকীয় প্রকাশের আগেই কাগজে বেরিয়েছে। বিবৃতিটি এই :

'কলিকাতা ১১ই জানুয়ারী, ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক শ্রী পি. সি যোশী আজ এক বিবৃতি প্রসঙ্গে কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ 'সন্ত্রাসবাদী কার্যে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন' বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত যোশী বলেন যে, কম্যুনিস্ট পার্টি হইতে তাঁহার বহিষ্কারের সংবাদ এবং বিশেষ করিয়া সংবাদপত্রের মারফত উক্ত সংবাদ জ্ঞাত হওয়া অপেক্ষা বেদনাদায়ক আর কিছু হইতে পারে না। শ্রীযুক্ত যোশী বলেন যে ইহা আমাদের দলের নেতৃবৃন্দের শোচনীয়ভাবে ভ্রান্ত কর্মপন্থার অবশ্যম্ভাবী ফল, উহারা পার্টি কংগ্রেসে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিয়া বামপন্থী গোঁড়ামির দিকে দ্রুতগতিতে ধাবিত হইতেছেন এবং তাহার ফলেই আজিকার দিনের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের আত্মপ্রকাশ ঘটিতেছে। এই ভ্রান্ত নীতি কার্যক্ষেত্রে যত বেশী ব্যর্থ হইবে, ততই পার্টির একনিষ্ঠ ও অনুরক্ত সদস্যদের ব্যাপক ও অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হইবে।' (যুগান্তর, ১৩. ১. ৫০)

পনেরো

পার্টির মধ্যে ঝড় উঠল এবং তার ঝাপটা জেলের মধ্যে গিয়েও পেঁাছল।

মণিকুন্তলা সেন লিখছেন :

'অনশনের শেষ দিকে একটা ঘটনা ঘটল যাতে আবার আমরা পার্টি লাইন নিয়ে গোলমালে পড়ে গেলাম। হঠাৎ দৈনিক কাগজে পড়লাম 'ফর দি লাস্টিং পীস এ্যান্ড পীপলস্ ডেমেক্রেসী'-র একটা উদ্ধৃতি। ঐ কাগজে লেখা হয়েছে ভারতের গণতান্ত্রিক আন্দোলন হবে জাতীয় বুর্জোয়া দল,

শ্রমিক এবং ধনী চাষী আর গরীব চাষী সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে। কী কাণ্ড! আমরা তো তখন শ্রেণীসংগ্রাম করছিলাম। সঙ্গী ছিল শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, চাষী ও ক্ষেত-মজুর। বাকী সবাই শত্রুপক্ষ। কিন্তু পত্রিকায় বর্ণিত গোষ্ঠী নিয়েই যদি আবার মিত্রতা গড়তে হয় তবে এতদিন করছিলামটা কি? 'এ আজাদী ঝুটা হ্যায়' বলে জেলেই বা এলাম কেন? আর উপোস করেই বা মরছি কেন? প্রথমে এটা বুর্জোয়া কাগজের মিথ্যে খবর মনে করতেই ইচ্ছে হলো। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই মূল দলিল পেয়ে গেলাম। সন্দেহ রইল না—এ নিয়ে পার্টির মধ্যে তোলপাড় হবে।' (সেদিনের কথা, পৃ ২১২-১৩)

কেন্দ্রীয় কমিটির ডেন-এ বসে উমা সেহানবীশও শুনলেন—বাইরে খুব তোলপাড় হচ্ছে। তিনি বলছেন, 'এল. পি. পি. ডি.-র সম্পাদকীয়খানা সতপাল-ই আমায় পড়তে দিল। তারপর একদিন প্রদ্যোৎ গুহের সঙ্গে দেখা; দেখি সেও খুব ক্রিটিকাল পার্টির বর্তমান লাইন সম্পর্কে।'

বোম্বাইয়ে পার্টির সদর দপ্তরেও শুরু হয়েছে তখন তুমুল আলোড়ন। সুনীল মুন্সী বলছেন, 'এল. পি. পি. ডি. আসার পর আমরা বারবার পড়লাম এবং বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। একদিন মোহন কুমারমঙ্গলম আমায় বাজিয়ে দেখল। সে বেশ জোর দিয়ে বলল—বি. টি. আর. লাইন ধ্বংস করা দরকার। আমার নিরুত্তাপ ভাব তার পছন্দ হল না। সে বলল, 'তোমরা একদম 'রি-অ্যাক্ট' কর না—এসব কী? অবলোপবাদী লাইনের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে যদি কংগ্রেসে যেতে হয়—সেও ভি আচ্ছা।' একজন লোক যে কীভাবে এক মেরু থেকে একেবারে বিপরীত মেরুর দিকে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে! রমেশ সিনহাও রাতারাতি বি. টি. আর.-এর কট্টর সমালোচক হয়ে উঠল। বি. টি. আর.-এর সমর্থনে পি. এইচ. কিউ.-তে কেউ একটা কথাও বলল না—শুধু রামদাস ছাড়া। সে বেচারিকে অন্যত্র সরে যেতে হল। আবার একজন লোকের উপর যত আক্রমণ! জোশীর জায়গায় এখন বি. টি. আর.। আমার খুব খারাপ লাগল।'

কমিনফর্ম-এর সম্পাদকীয় পড়ে, তাঁর মন্তব্য প্রাদেশিক কমিটিকে লিখে পাঠালেন তুষার চট্টোপাধ্যায়। কমিটি তাঁকে সম্পাদকীয় নিবন্ধটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার জন্যে মালদহ ও নদীয়া জেলায় পাঠান। তিনি দেখলেন, পার্টি র‍্যাঙ্ক নেতৃত্বের ব্যাখ্যা মানতে রাজি নন। তাঁরা নেতৃত্বের উপর আস্থা হারিয়েছেন। তাঁর সুদীর্ঘ পার্টি-জীবনে এ ধরনের অভিজ্ঞতা এই প্রথম।

তুষার চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায়, 'এরপর শুরু হয় আই. পি. এস. (ইনার পার্টি স্ট্রাগল্, অন্তঃ-পার্টি সংগ্রাম)। এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে তখন রণেন সেন, প্রমোদ দাশগুপ্ত, সরোজ মুখার্জি, গোপাল আচার্য, প্রমথ ভৌমিক, তুষার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ পার্টি 'ভেটেরান'-রা মিলিত হয়ে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও পার্টির বর্তমান অবস্থা নিয়ে আলাপ-আলোচনা শুরু করেন।

কিন্তু কুমুদ বিশ্বাসের মতে পার্টি 'ভেটেরান'-রা তেমন কিছু জোরালো ভূমিকা পালন করতে পারেননি। তিনি বলছেন, 'লাস্টিং পীস'-এর সম্পাদকীয় বেরুবার পরও দেখেছি বাম সংকীর্ণতাবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে লড়ার মতো কোন শক্তি ছিল না। কারণ সবাই তার সঙ্গে জড়িত। সোমনাথ লাহিড়ী-ভবানী সেন যেমন জড়িত—আবার নীচের দিকে নিরঞ্জন সেন-সরোজ মুখার্জি'রাও জড়িত।

যাই হোক, পার্টির যে র‍্যাঙ্ক এতদিন পি. বি.-কে জোরালো সমর্থন জানাচ্ছিল—তারা এবার বিদ্রোহ করে বসল। এতদিন পর্যন্ত তারা পার্টির সব নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। পার্টির লাইন তাদের কাছে ছিল প্রশ্নাতীত। যে সামান্য কয়েকজন প্রশ্ন করত বা সংশয়ী ছিল—তাদের একঘরে করে রাখা হত। এমনকি জেলে গিয়েও তারা নিঃসঙ্গ। এ ধরনের অভিজ্ঞতার অন্যতম শরীক বর্ষীয়ান নেতা কমরেড আবদুল্লাহ্ রসুল। তিনি বলছেন, 'চট্টগ্রাম থেকে ফেরার পর আমাকে ক্যানিং অঞ্চলের পার্টির সঙ্গে যুক্ত করা হয়। জোতদার বৈরাগী দাস বিনা সুদে চাষীদের ধান কর্জ দিতে রাজি হয়। তবুও অ্যাকশন করতে হবে। ওর গোলা ভাঙতে হবে। যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং-এর কয়েকজন ছাত্র কমরেড জোতদারের সঙ্গে একটা সংঘর্ষ বাধায়। অ্যাসিড বাল্‌ব্ ছুঁড়ে মারে জোতদারের লোকেরা। ছাত্ররা তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে ফেলে—তাই রক্ষা। আমার নামে রিপোর্ট গেল—আমি এইসব মনে-প্রাণে সমর্থন করছিনে। আমাকে একঘরে করে রাখা হল। ১৯৫০ সালের গোড়ায় বাধল রায়ট। ঢাকা থেকে এস. ও. এস. এল। আমিও বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেলাম। ঢাকা থাকাকালীন জানতে পারলাম—কমিনফর্ম-এর সম্পাদকীয় বেরিয়েছে। পার্টির লাইন ভুল এবং নেতৃত্বের অদল বদল ঘটেছে। গঠিত হয়েছে পি. ও. সি. (প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি) এবং তাতে আমায় নেওয়া হয়েছে।'

সে প্রসঙ্গে আমরা পরে আসছি। কমিনফর্ম-এর ঐতিহাসিক নিবন্ধটি পার্টির ভেতরে দমবন্ধ-করা পরিবেশের অবসান ঘটিয়েছে। এখন নেতৃত্বের সমালোচনায় পার্টি কর্মীরা এমন মুখর হয়ে উঠেছে—যা প্রায় বিদ্রোহের সামিল। তার ধাক্কায় গোপন সংগঠনের নিয়ম-কানুনের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপন্ন।

বীরেন রায় বলছেন, 'ক্যুরিয়াররা 'টেক' (গোপন সংগঠন)-এর নিয়ম ভাঙতে থাকে। তারা একটা ডেন থেকে আরেক ডেন-এ গিয়ে মিটিং করতে থাকে। বে-আইনী হবার একমাসের মধ্যে যে গোপন সংগঠন গড়ে তোলা হয়—তা এবার নষ্ট হবার পথে। একটার পর একটা ডেন 'ব্লোন-আপ' হতে থাকে (ভেঙে যায়)। টাকা-পয়সা বন্ধ হবার দরুন আমরা প্রায় অভুক্ত অবস্থায় থাকতে থাকতে ধরা পড়ে গেলাম। কারণ টাকা জোগাড় করার জন্যে কিছুটা প্রকাশ্যে আমাদের ঘোরাঘুরি করতে হল।'

কংসারি হালদার বলছেন, 'কমিনফর্ম-এর সম্পাদকীয় যখন বার হয়—

কাকদ্বীপে তখন আমাদের পিছু হঠার পালা। নিখিল চক্রবর্তী এসে আমায় বললেন, পার্টির মধ্যে যখন এমন একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছে, তখন আপনারা দু-চারটে লোক যতই 'সিন্সিয়ার' হন—আপনারা কি আন্দোলন চালাতে পারবেন? সুতরাং আপনারা এখন আত্মরক্ষার চেষ্টা করুন। পার্টি যখন আবার খাড়া হবে তখন আন্দোলন করবেন। আপনি তো এখানে থাকতে পারবেন না। আপনাকে ত্রিপুরায় পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

কংসারি বুঝলেন, আপাতত একটা অধ্যায়ের অবসান ঘটল। তিনি 'টেকু'-এর কমরেড ভূপতি মণ্ডলকে ডেকে বললেন, 'যাও, বোমাগুলো নদীতে ফেলে এস।' সে হাত কয়েক দূরে ছুঁড়ে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ আর ভূপতি সাংঘাতিক আহত। আহত ভূপতিকে সঙ্গে নিয়ে এখান থেকে ওখানে ভেসে বেড়াতে লাগলেন কংসারি হালদার।

ষোলো

২২শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫০, এক বিবৃতির আকারে প্রকাশিত হয় কমিনফর্ম-এর ঐতিহাসিক নিবন্ধটি সম্পর্কে পলিট ব্যুরো-র প্রাথমিক মন্তব্য। বিবৃতিটি আসলে কতকগুলি স্বীকৃতির বয়ান। স্বীকার করা হয় যে, এশিয়ায় অন্যান্য দেশের পার্টিগুলির তুলনায় 'প্রকৃত সাফল্যের দিক থেকে সে (ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি) পিছনে পড়ে আছে।' বলা হয়,

'যে সময় সাম্রাজ্যবাদী ও তাদের ভাড়াটিয়াদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে ইচ্ছুক এমন সমস্ত শ্রেণী, পার্টি গ্রুপ এবং সংগঠনের কোটি কোটি লোককে জমায়েত করার এবং জনগণের ক্ষমতার জন্য বিপ্লবী সংগ্রামে তাদের ঐক্যবদ্ধ করার বাস্তব সম্ভাবনা রয়েছে, সে সময় দশ-বিশ-পঞ্চাশ হাজার লোককে জাগিয়ে এবং পরিচালনা করে কমিউনিস্ট পার্টি সন্তুষ্ট থাকতে পারে না।'

'এই পিছিয়ে যাবার কারণ হচ্ছে এই যে, শ্রমিক এবং মেহনতী জনতার সংগ্রামগুলির অবাধ বিকাশ এবং সাহসী পরিচালনায় যে সংস্কারবাদ বাধা দিচ্ছিল তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সময় পলিট ব্যুরো গোঁড়ামি এবং সংকীর্ণতার দিকে কতকগুলি ভুল করে। এইসব ভুল এসমস্ত সংগ্রামের বিস্তার সীমাবদ্ধ করে দেয় এবং তাতে ব্যাপকতম জনতাকে জমায়েত করার কাজে বাঁধা সৃষ্টি করে।'

পার্টি র‍্যাঙ্ক-এর মতে পি. বি.-র বিবৃতি আদৌ অকপট নয়। তাদের মনে হয়েছে, কমিনফর্ম-এর সম্পাদকীয় থেকে সঠিক শিক্ষা গ্রহণের পরিবর্তে শুধুমাত্র কয়েকটি কৌশলগত ত্রুটি স্বীকারের আড়ালে আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করেছেন পি. বি.। উপরন্তু পি. বি.-কৃত বামপন্থী সংকীর্ণতাবাদী

বিচ্যুতি ও তার পরিণতিকে লঘু করে দেখানোর উৎকট প্রয়াসের নিদর্শন এই বিবৃতিটি।

অতএব পি. বি. এখন পার্টি র‍্যাঙ্ক-এর সার্বিক অনাস্থার মুখোমুখি। তাই পি. বি.-প্রচারিত পরবর্তী খসড়া দলিলে (৭. ৪. ৫০) আত্মপক্ষ সমর্থনের ভণিতাটুকুও অনুপস্থিত। আগাগোড়া আত্মসমালোচনা ও অনুশোচনার ভাষায় বিবৃত এই দলিলে প্রথমেই স্বীকার করা হয়:

'এটি শুধু বিপ্লবী সম্ভাবনার পিছিয়ে পড়ার প্রশ্ন নয়। এটি সাধারণ ভুল ছিল না। আমাদের বিপ্লবের বর্তমান স্তর, কর্ম্মনীতি (স্ট্রাটেজি) এবং শ্রেণী সম্বন্ধ নির্ণয় করার ব্যাপারে গুরুতর 'বামপন্থী সুবিধাবাদী' বিচ্যুতি হয়েছিল।'

আরও বলা হয়, ভারত-বিপ্লবের দিশারী হবে চীন:

'চীনের কমিউনিস্ট পার্টি ও তার নেতা কমরেড মাও সে তুং-এর নেতৃত্বে চীনের জনতা বিজয়ের সাথে যে পথ অতিক্রম করেছে, ভারতের মুক্তি সংগ্রামকেও সেই পথ গ্রহণ করতে হবে। ভারত উপনিবেশ ও আধা-সামন্ত দেশ। ভারতের বিপ্লবের প্রকৃতিও চীনের মতই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সামন্ত-বিরোধী। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, সামন্ত-বিরোধী চরিত্র অস্বীকার করার ফলে, ভারতের সমস্যায় বামপন্থী সংকীর্ণতার বিচ্যুতি এসেছে।

দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের পর, এই গত দু'বছরে পি. বি.-র প্রস্তাবগুলিতে এবং পার্টির নেতৃস্থানীয় কর্মীদের কাজে বামপন্থী সংকীর্ণতাবাদী বিচ্যুতি প্রধান স্থান জুড়ে ছিল।

বিপ্লবের চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের গোঁড়ামিমূলক বামপন্থী-সংকীর্ণতাবাদী সিদ্ধান্ত থাকার ফলে সংগ্রামের বামপন্থী বেপরোয়া রূপ দেওয়া হয়েছে। তার অর্থ: আমরা গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের সশস্ত্র সংগ্রাম অবহেলা করেছি। ...আমাদের এই গোঁড়ামিমূলক নীতি ছিল, এই যে বিপ্লবী অভ্যুত্থান প্রথমে শহরেই হতে হবে, গ্রামের সংগ্রাম তারই অনুগামী।

...কলকাতায় সশস্ত্র মিছিলের উপর শক্তি কেন্দ্রীভূত করার ফলে গুরুতর কর্মীক্ষয় হয়েছে ও সংগঠনের ক্ষতি হয়েছে। তেমনি জেলের ভিতরকার কতকগুলি সংঘর্ষ চূড়ান্ত বেপরোয়াবাদের নিদর্শন।

...অনেকক্ষেত্রে আমরা সাধারণ ধর্মঘটের শিশুসুলভ আহ্বান দিয়েছি—শ্রমিকদের সংগঠিত না করেই, সতর্কতার সাথে আয়োজন না করেই এবং পুলিশী সন্ত্রাসের সামনে শ্রমিকদের বের হয়ে আসা সম্ভব কিনা তা বিচার না করেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শ্রমিকরা আমাদের ডাকে সাড়া দেয়নি।

প্রয়োগের ক্ষেত্রেই যে শুধু গোঁড়ামিবাদ আত্মপ্রকাশ করে তাই নয়, পার্টি নীতি নির্ধারণের সময়েও তা দেখা দেয়। আমরা যে অন্ধ পি. সি.-র প্রস্তাব ও 'চীনের পথ' বাতিল করেছিলুম—সেটাই তো গোঁড়ামিবাদের নিদর্শন।

রুশ বিপ্লবের বিপ্লবী কার্যকলাপের নির্ভুল নীতি ভিন্ন অবস্থায় ও ভিন্ন যুগে আমরা ভারতে প্রয়োগ করতে চেয়েছি। আমরা ইতিহাসের শিক্ষা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছি। অনেক মূল বিষয়ে যে চীনের অবস্থা ভারতের অবস্থারই মতো, সেই চীনের বিপ্লবের অমূল্য অভিজ্ঞতা থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছি।'

দলিলটি যেন পি. বি.-র নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের কবুলিয়তনামা। কমিন-ফর্ম-এর মুখপত্রে বিধৃত পঙ্‌ক্তি ক'টি ভারতবর্ষের পার্টিতে নিয়ে এল এক সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন—ঘটাল এক ঐতিহাসিক পালাবদল। রুশ পথ নয়—চীনের পথেই ঘটবে ভারতের শ্রমিক-কৃষকের মুক্তি—এই ধারণা পার্টিতে সঞ্চারিত হল ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত।

প্রসঙ্গত, মাও সে তুং সম্পর্কে সাধারণ সম্পাদকের সমালোচনাত্মক মন্তব্য পলিট ব্যুরো প্রত্যাহার করে নিল :

'পলিট ব্যুরো-র ১৮৪৮ সালের ডিসেম্বরের সভায় সাধারণ সম্পাদকের রণনীতি ও রণকৌশল সম্পর্কীয় রিপোর্ট প্রসঙ্গে কমরেড মাও সে তুং সম্বন্ধে যে সমস্ত সমালোচনা করা হয়েছিল ও পরে যা কেন্দ্রীয় কমিটির তাত্ত্বিক মুখপত্রে (কমিউনিস্ট, ৪ নং, জুন-জুলাই ১৯৪৯) এবং একটি প্রাদেশিক তাত্ত্বিক মুখপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল, সে সমস্ত সমালোচনা পলিট ব্যুরো অকপটে প্রত্যাহার করে নিচ্ছে।' (১০. ৪. ৫০)

সতেরো

২০শে মে ডাকা হয় কেন্দ্রীয় কমিটির সভা। দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের দু'বছর পর এই প্রথম। গঙ্গার ধারে হাওড়ার এক বাগানবাড়িতে মিলিত হলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা। নির্বাচিত মোট ৩১ জন সদস্যের মধ্যে সভায় উপস্থিত ছিলেন ১৯ জন—ইতিমধ্যে কমরেড ভরদ্বাজ প্রয়াত—ছ'জন সভ্য কারাবাস করছেন—দু'জন কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে অপসারিত—একজনকে সভায় বসতে দেওয়া হয়নি এবং দু'জন অজ্ঞাত কারণে অনুপস্থিত। উমা সেহানবীশ বলছেন, 'কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা ছাড়া আমরা তিনজন। আমাদের কাজ রান্না করা ছাড়াও চারদিকে নজর রাখা। আমার সঙ্গে ছিলেন পার্বতী কৃষ্ণাণ ও বাচ্চা নিয়ে একজন মেয়ে কমরেড। তখন গরমের দিন। ই. এম. এস. আর দক্ষিণ ভারতের কমরেডরা ছাতে শুতেন। আর রাত জেগে লেখার কাজ করতেন লাহিড়ী। ১৯৪৯-এর ২৯শে ডিসেম্বরের পর বি. টি. আর.-কে এই প্রথম দেখলাম। কেমন যেন মিইয়ে গিয়েছেন। তিনি কেবল বারান্দায় গঙ্গার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে বসে থাকতেন।'

সভার শুরুতেই দেখা গেল নেতৃত্ব ইতিমধ্যে চলে গিয়েছে অন্ধ্র পার্টির নেতাদের হাতে। 'ভারতের জনতার গণতান্ত্রিক সংগ্রামের প্রধান বৈশিষ্ট্য' শীর্ষক পি. বি. দলিলটি আদৌ সন্তোষজনক নয় বলে শুরুতেই বাতিল হয়ে যায়। তার জায়গায় আলোচিত হয়—ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে বামপন্থী বিচ্যুতি সম্পর্কীয় প্রতিবেদন। দলিলটি অন্ধ্র কমরেডদের রচনা। ২০শে মে থেকে ১লা জুন পর্যন্ত আলোচনার পর গৃহীত হয় বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত।

রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের সারমর্ম

'চীনের পথ ধরেই ভারতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম এগিয়ে যাবে। তার অপরিহার্য শর্ত গ্রামাঞ্চলে গেরিলা যুদ্ধের বিস্তার, মুক্তাঞ্চল সৃষ্টি ও মুক্তি সেনাদলের চূড়ান্ত অভিযানের মাধ্যমে সমগ্র দেশের মুক্তি সাধন অর্থাৎ রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল। কেন্দ্রীয় কমিটি মনে করে, কয়েকটি অঞ্চল ছাড়া ভারতে প্রায় সর্বত্র গেরিলা যুদ্ধের অবকাশ রয়েছে।

পুরানো মাপকাঠি দিয়ে আর জনসমর্থনের পরিমাপ চলবে না। দেশের অধিকাংশ মানুষ পার্টির কর্মসূচি পুরোপুরি গ্রহণ করে রাস্তায় নেমেছে কিনা সেটা আসল কথা নয়—আমাদের প্রতি মানুষের সাধারণ সমর্থন আছে কিনা—সেটাই বিচার্য।

সশস্ত্র গেরিলা বাহিনীর নেতৃত্বে আসীন শক্তিশালী পার্টি অতি সহজেই মেহনতী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারবে। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সমস্ত শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম সেই পার্টির পক্ষে ভৌগোলিক দিক থেকে অনুকূল অঞ্চলে মুক্ত এলাকা সৃষ্টি করে সমগ্র দেশের মুক্তি সংসাধিত করা মোটেই অসাধ্য নয়।

শহর ও শিল্পাঞ্চলে পার্টিকে নমনীয় কৌশলের আশ্রয় নিতে হবে। বে-আইনী পদ্ধতিতে প্রচার, বিভিন্ন ধরনের প্রতিবাদ আন্দোলন, মিছিল, ধর্মঘট, সশস্ত্র সংঘর্ষ—অবস্থা বুঝে সব কিছুই করা চলবে।

সাংগঠনিক সিদ্ধান্তের সারমর্ম

অন্ধ্রের কমরেডদের রচনা—'পলিট ব্যুরোর বাম-সংকীর্ণতাবাদী সাংগঠনিক কার্যকলাপের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন' শীর্ষক দলিলটির ভিত্তিতে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হয়।

১. বর্তমান পলিট ব্যুরো ভেঙে দেওয়া হয় এবং বি. টি. রণদিভেকে সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে অপসারণ করা হয়। বি. টি. আর.-এর বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ :

ক. লেনিন-স্টালিনের শিক্ষামালাকে জলাঞ্জলি দিয়ে তিনি ভারতীয় বিপ্লবের বর্তমান স্তরকে সমাজতন্ত্রী বিপ্লবের স্তররূপে চিহ্নিত করেছেন।

খ. কৃষি বিপ্লবকে সাবোতাজ করে এবং গ্রামাঞ্চলে সশস্ত্র লড়াইয়ের পথ বর্জন করে—তিনি শহরে ও গ্রামে বেপরোয়াবাদী কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত করেছেন।

গ. টিটোপন্থী সাংগঠনিক পদ্ধতির মাধ্যমে পার্টি সংগঠনে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছেন তিনি। পার্টির অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের বিলুপ্তি ও পার্টি জীবনকে বিষাক্ত করার মূলেও তিনি।

ঘ. ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির সঙ্গে সু-সম্পর্কের নীতি লঙ্ঘন করে—প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে তিনি ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির নেতাদের নামে কুৎসা রটনা করেছেন।

ঙ. 'মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্টালিন ছাড়া আর কাউকে মানি না'—এই অজুহাতে সৃজনশীল মার্কসবাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছেন তিনি।

তাছাড়া পার্টিকে রাজনীতিগতভাবে অন্ধকারে রাখার জন্যে তিনি অধিকারীর যোগসাজসে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দলিল কমরেডদের কাছে গোপন করেছেন।

বি. টি. আর.-এর অপরাধের যেন শেষ নেই। এককথায় তিনি ট্রটস্কিবাদী টিটোপন্থী বাম সংকীর্ণতাবাদী রাজনৈতিক লাইনের স্রষ্টা, কর্তা, প্রধান পৃষ্ঠপোষক। পি. বি. তাঁর সঙ্গে তাল মিলিয়েছে—তাঁর যাবতীয় অন্যায় কাজের ইন্ধন যুগিয়েছে। পি. বি.-অনুসৃত লেনিনবাদ-বিরোধী ও বিলোপবাদী লাইনের দৌলতে পার্টি ও গণ-আন্দোলন আজ চরম বিপর্যয়ের মুখোমুখি।

এই সভা থেকে ছোট আকারে এগারোজনের এক অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। তার সদস্যবৃন্দ : সি. রাজেশ্বর রাও (সাধারণ সম্পাদক), এম. বাসব পুন্নায়া, বীরেশ মিশ্র, পি. সুন্দরায়া, ডি. ভেঙ্কটেশ্বর রাও, সোমনাথ লাহিড়ী, মণি সিং, ই. এম. এস. নাম্বুদ্রিপাদ ও এস. ভি. পারুলেকার।

প্রথমোক্ত তিনজনকে নিয়ে নতুন পলিট ব্যুরো গঠিত হয় ; পরে বাকি দু'জনকে কমিটিতে নেওয়া হবে।

স্থির হয় যে আগামী ছ'মাসের মধ্যে প্রাদেশিক কমিটিগুলির প্রতিনিধিবর্গসহ কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত সভা বা প্লেনাম অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভা থেকে রাজনৈতিক প্রস্তাবগুলি চূড়ান্ত রূপদান ও পাকাপাকি গৃহীত হবে।

নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি ভ্রাতৃপ্রতিম কমিউনিস্ট পার্টিগুলি এবং বিশেষ করে সোভিয়েত ও চীনের পার্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক প্রশ্নে তাঁদের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

১৯৫০ সালের ১লা জুন থেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জীবনে সূচিত হল এক নতুন অধ্যায়। কিন্তু অচিরেই দেখা গেল—জুন সি. সি.-র কমিনফর্ম-এর সম্পাদকীয় ব্যাখ্যা পার্টির বিভিন্ন মহলের মনঃপূত হয়নি।

পার্টির সর্বভারতীয় ও প্রাদেশিক নেতৃবৃন্দ জুন সি. সি.-র সমালোচনায় মুখর। রাজনৈতিক ঐক্য এখনও সুদূরপরাহত।

জুন সি. সি. কি তাহলে একেবারে ব্যর্থ? না, পুরোপুরি ব্যর্থ নয়। কমরেড বীরেশ মিশ্রের ভাষায় বললে, জুন সি. সি. অন্তত পার্টির ভাঙন ঠেকিয়েছে।

আঠেরো

কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরে যে এত কাণ্ড হয়ে গেছে—দেশের মানুষ তার খবর পেল আরও দেড় মাস পর।

২০শে জুলাই 'যুগান্তর'-এর পাতায় প্রথম তার খবর পরিবেশিত হয়:

ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির সম্পাদক রণদিভে পদচ্যুত

দলের নূতন পলিটব্যুরো গঠন

কম্: রাজেশ্বর রাও নূতন সম্পাদক নির্বাচিত

দলের পুরাতন নাশকতামূলক নীতির বদলে নূতন নীতি নির্ধারণ

'পার্টির সদর কার্যালয়ের বিবৃতি-সূত্রে প্রকাশ: কম্যুনিস্ট পার্টি এক্ষণে তাঁহাদের জন্য যে নূতন নীতি নির্ধারণ করিয়াছেন, তদনুযায়ী তাঁহারা সমগ্র কৃষি সমাজের সহিত শ্রমিকদের যোগাযোগ দৃঢ় করিবার এবং ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী ও ভারতে তাদের তাঁবেদার বিরাট ধনী ও সামন্ত-তন্ত্রীদের হাত হইতে দেশের স্বাধীনতা রক্ষাকামী সকল শ্রেণী, দল, উপদল ও প্রতিষ্ঠানকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

এই নীতি অনুযায়ী কম্যুনিস্ট পার্টি শ্রমিক সমাজের নেতৃত্বে সমগ্র দেশ-ব্যাপী এক সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠন করিয়া কৃষি ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য সংগ্রাম পরিচালনা করিবেন। চীনের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের আন্দোলন হইতে লব্ধ অভিজ্ঞতা অনুযায়ী এই সংগ্রামের কৌশল নির্ধারিত হইবে।'—ইউ. পি.

ঠিক তার সাতদিন পর আরেকটি সংবাদে জানা যায়, পুলিশ কমিশনার কলকাতা শহর থেকে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। কারণ শহরের অবস্থার উন্নতি হয়েছে। অর্থাৎ গত ছ'মাস পুলিশকে গুরুতর কোন রাজনৈতিক বিক্ষোভের মোকাবিলা করতে হয়নি। কারণ একটাই—কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য ও দরদীগণ এই ক'মাস যাবৎ মতাদর্শগত বিতর্কে মগ্ন। তারই সমান্তরাল আরও একটি উদ্বেগজনক ঘটনা সাম্প্রদায়িক অশান্তির আকারে মাথা চাড়া দিয়েছে। এবং উদ্বাস্তু স্রোত পূর্ববাংলা থেকে কলকাতা অভিমুখে অবিরাম এগিয়ে চলেছে।

১৯৫০ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি 'যুগান্তর'-এর সংবাদ সূত্রে প্রকাশ—কলকাতার বেশ কয়েকটি অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ঘটেছে। তার ফলে ২৪ জন আহত ও ২ জন মৃত। উত্তর কলকাতার একটি অঞ্চলে সান্ধ্য আইন জারি করা হয়েছে এবং শান্তি রক্ষার জন্যে তলব করা হয়েছে সেনাবাহিনীকে। শহরের উত্তর অঞ্চলের বহু মুসলমান ঘরবাড়ি ছেড়ে পার্ক সার্কাসে আশ্রয় নিয়েছে।

১১ই ফেব্রুয়ারির খবরে প্রকাশ, আরও দুটি অঞ্চলকে সান্ধ্য আইনের আওতায় আনা হয়েছে। মানিকতলা ও আমহার্স্ট স্ট্রীট থানা অঞ্চল সান্ধ্য আইন এলাকাভুক্ত।

এবার আর দেশবন্ধু পার্ক অঞ্চলের নিকাশীপাড়া বস্তি রক্ষা পেল না। প্রচণ্ড বোমাবাজি করে সেখানকার মুসলমান বাসিন্দাদের উচ্ছেদ করা হল। চন্দ্র রায় বলছেন, 'আলমবাজারেও একই অবস্থা। ১৯৫০-এর রায়টে এবার ষোলকলা পূর্ণ হল।' ধীরেন মজুমদার বলছেন, '১৯৫০ সালের রায়টের সময় গৌরাঙ্গ ভট্চায বেলগাছিয়ার মুসলমান বস্তি রক্ষা করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে মারা যান। গৌরাঙ্গ একজন ট্রাম কন্ডাক্টার।'

আর সব বিষয়ে মতভেদ থাকলেও, কমিউনিস্টরা অন্তত একটা বিষয়ে সজাগ—প্রাণের বিনিময়ে দাঙ্গা রুখতে হবে। কিন্তু কাজটা কত কঠিন! কলকাতায় রটে গিয়েছে—ঢাকায় রায়ট শুরু হয়েছে। ১৩ই ফেব্রুয়ারি 'যুগান্তর'-এর সংবাদে প্রকাশ : সকাল থেকেই শিয়ালদহ ও দমদম স্টেশনে হাজার হাজার লোক ঢাকার সংবাদের জন্যে ভীড় জমাতে থাকে।

মার্চ মাসের গোড়াতে বরিশালে শুরু হল ব্যাপক দাঙ্গা। দাঙ্গায় নিহতদের তালিকা প্রকাশ হতে থাকে এই বাংলার সংবাদপত্রের পাতায়। তারই বদলা চলতে থাকে এখানে। রায়ট বাধে চন্দননগর ও গোন্দলপাড়ায়। রায়টে নেতৃত্বদানের অভিযোগে রাম চ্যাটার্জি'কে নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়। বরিশালে রায়টের পর উদ্বাস্তু স্রোত প্লাবনের আকারে ধেয়ে আসে কলকাতার দিকে। এই পটভূমিতে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন।

সম্পূর্ণ নতুন পরিস্থিতি। বিপ্লব এখন আর আশু কর্তব্য নয়। বিপন্ন মানুষের ত্রাণকার্যই হয়ে দাঁড়াল কমিউনিস্টদের মুখ্য কর্তব্য। বাংলার বিপন্ন বাস্তুহারাকে বাঁচাবার জন্যে অম্বিকা চক্রবর্তীর ব্যাকুল আহ্বান প্রকাশিত হয় ১লা মে 'যুগান্তর'-এর পাতায় :

'...বাংলার বুকের উপর আবার বীভৎস হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় দলে দলে হিন্দু মুসলমান সর্ব্বহারা হইয়া পূর্ব্ববাংলা হইতে পশ্চিম বাংলায়, পশ্চিম বাংলা হইতে পূর্ব্ব বাংলায় চলিয়া যাইতেছে। আজ যখন বাংলার দুই অংশে লক্ষ লক্ষ হিন্দু মুসলমান গ্রাম ঘর হইতে উৎখাত ও ধ্বংস হইয়া যাইতেছে, তখন দেখিতেছি যে, এইসব দাঙ্গা দুর্গত বাস্তুহারাদের সমস্যা

ধামা চাপা দিয়া নানা অবাস্তব রাজনৈতিক ধূম্রজাল সৃষ্টি করা হইতেছে এবং রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কেহবা যুদ্ধের, কেহবা লুটতরাজ, কেহবা জোরপূর্বক মুসলমানের বাড়ী হিন্দুর দখলের, হিন্দুর বাড়ী মুসলমানের দখলের উস্কানি দিতেছে।'

তিনি বলেন, 'লক্ষ লক্ষ হিন্দু মুসলমান বাস্তুহারাদের ব্যাপক আন্দোলন গড়িয়া তুলিয়া উভয়বঙ্গে মেহনতী জনতার প্রকৃত স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের লড়াইকে শক্তিশালী করুন'।

৪ঠা জুলাই 'যুগান্তর'-এর এক খবরে প্রকাশ: গতসপ্তাহে শিয়ালদহ স্টেশনে পূর্ববাংলা থেকে পঁচিশ হাজার ছিন্নমূল নরনারী এসে পৌঁছেছে। তার মধ্যে সতেরো হাজার স্টেশন চত্বরেই অবস্থানরত। খাদ্য, পানীয় ও স্থানাভাবে তাদের অবস্থা অবর্ণনীয়। জুনের শেষভাগ থেকে বাস্তুহারাদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান এবং প্রতিদিন গড়ে সাড়ে তিন হাজার শরণার্থী শিয়ালদহে এসে পৌঁছচ্ছে। তাদের মধ্যে অনেকে দেশের বাড়িঘর বিক্রি করে দিয়েছে বা ফেলে এসেছে। আর দেশে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে নেই তাদের।

'যুগান্তর'-এর ১৯শে জুলাই-এর খবরে প্রকাশ, শিয়ালদহ স্টেশনে চারজন শরণার্থীর মৃত্যু ঘটেছে এবং উদ্বাস্তুদের মধ্যে নানারকম সংক্রামক রোগের প্রকোপ দেখা যাচ্ছে।

স্বভাবতই এই রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখি—কমরেডরা গেরিলা যুদ্ধ ও সশস্ত্র লড়াইয়ের কথা আপাতত ভুলে যেতে বাধ্য হলেন।

উনিশ

জনজীবনে যখন কমিউনিস্ট কণ্ঠস্বর ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর—পার্টির ভেতরে তখন উতরোল। দেখা যাচ্ছে দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে জুন সি. সি.-র মূল্যায়ন ও কমিনফর্ম-এর সম্পাদকীয় মন্তব্য সম্পর্কে ব্যাখ্যার সঙ্গে অনেকেই একমত নন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, জুন সি. সি.-র 'চিঠি'তে প্রদত্ত রাজনৈতিক লাইন সম্পর্কে হাওড়া জেলা কমিটির সমালোচনার (১০. ৭. ১৯৫০) সারমর্ম:

'নূতন কেন্দ্রীয় কমিটির চিঠিটা সমগ্রভাবে পড়লে এই ধারণা হয় যে তাঁরা সশস্ত্র বিপ্লবের পথ অনেকটা সোজা মনে করেছেন। যদিও কয়েকবার তাঁরা বলেছেন যে এখনই সর্ব্বত্র আমরা সশস্ত্র সংগ্রাম সুরু করতে বলছি না, তবু ঐরকম একটা ধারণা সৃষ্টি হবার যথেষ্ট সুযোগ এই চিঠিখানিতে রয়েছে।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে সহরে আইনী আন্দোলনের কথার উল্লেখ পর্য্যন্ত নেই। অপরদিকে সুবিধাবাদী বামপন্থী কায়দায় শ্রমিকাঞ্চলের সশস্ত্র কার্য্যকলাপের কথা বলা হয়েছে। আইনী কার্য্যকলাপ বাদ দিয়ে এই

কথা বলার মধ্যে সুনিশ্চিতভাবে কেন্দ্রীয় কমিটির বামপন্থী ঝোঁক প্রকাশ পাচ্ছে'। (প্রাদেশিক পার্টি আলোচনা, নবপর্যায়, ২য় সংখ্যা)

কিন্তু নতুন কেন্দ্রীয় কমিটির সমর্থক সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। দেখা যাচ্ছে, কমরেডদের একাংশ নূন সি. সি.-র লাইনের প্রতি আস্থা জানিয়ে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন:

'নূতন কেন্দ্রীয় কমিটির পত্রে আমাদের মধ্যে সত্যিই উৎসাহ সৃষ্টি করেছে। দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ ও বামপন্থী সংকীর্ণতার যুগের ছবি ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। আর সেই অবস্থা থেকে পার্টিকে ও ভারতের বিপ্লবকে রক্ষা করা ও পরিচালনা করার জন্য নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি কেবল যে সঠিক রণনীতি ও রণকৌশল দেখাবার চেষ্টা করেছেন তাই নয়, আমাদের কাছে তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে, পার্টির নেতৃত্ব সবজান্তা ভাব পরিত্যাগ করে শেখার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এবং অপপ্রয়োগ নয়, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার সঠিক প্রয়োগের পথে অগ্রসর হয়েছেন।' (হাওড়া জেলের বিচারাধীন ও সাজাপ্রাপ্ত সমস্ত পার্টি সভ্যদের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত, ২১. ৯. ৫০)

শেষ পর্যন্ত দাঁড়াচ্ছে নূন সি. সি.-র চিঠি পড়ে অধিকাংশ কমরেডই আশ্বস্ত হতে পারেননি। রাজনীতি ও সংগঠন—উভয়কে ঘিরেই তাঁদের মনে অজস্র প্রশ্ন। এবং তার সদুত্তর তাঁরা এই চিঠি থেকে পাচ্ছেন না। নূন সি. সি.-র চিঠির সমালোচনা প্রসঙ্গে কমরেড মঙ্গলের মন্তব্য:

'কেন্দ্রীয় কমিটির চিঠি পড়লে মোটামুটি এই ধারণা হবে যে পার্টিতে যা কিছু বামপন্থী টিটোবাদ হয়েছে তার জন্যে একমাত্র দায়ী পি. বি.।

আজ পার্টি সভ্যদের স্বতঃই মনে হতে পারে এবং হচ্ছে যে তাঁরা নিজেরাও ঐ দলভুক্ত ছিলেন। তাই দু'বছর ধরে সি. সি. মিটিং না হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা কোনরূপ সক্রিয় প্রতিবাদ করেননি।

...গেরিলা লড়াই সুরু করে তার সঙ্গে গণ-আন্দোলনকে জুড়ে দেবার কর্মপন্থা ঘোড়ার আগে গাড়ী জুড়ে দেবার মত। আজ আমাদের সর্ব্বপ্রথম মুখ্য কাজ হবে যুক্তফ্রন্ট গড়া। মাথার উপর নেতাদের যুক্তফ্রন্টও গড়তেই হবে, তার সঙ্গে গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে যুক্তফ্রন্ট গড়ে উঠবে। আজ তার হাজার রকমের সুযোগ এসেছে।...

বাস্তুহারা আন্দোলন আজ সমস্ত বাংলায় বিষফোঁড়ার মত গজিয়ে উঠেছে। যে পার্টি বা দল এদের সাহায্যে এগিয়ে না আসবে তাকে ভবিষ্যতে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে না

...সমস্ত দেশের মধ্যবিত্ত ও গরীব সম্প্রদায় ভাবী যুদ্ধের জন্য ত্রস্ত হয়ে আছে। শান্তি সম্মেলনের নির্দেশ অনুযায়ী সমস্ত দেশে সহি গ্রহণ করা যদি আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে আরম্ভ করি, তার মধ্য দিয়েও মিলিত ফ্রন্ট গড়ে উঠবে। (৪. ১০. ৫০)

দমদম—প্রাচীর ইউনিট লিখছেন (১৫. ৭. ৫০) :

'পার্টির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাদের উৎকণ্ঠা ঘোচানো-ত দূরে থাকুক, এই চিঠি উদ্বেগ বাড়িয়েই দিয়েছে, আমাদের আশা ভঙ্গ করেছে। ··

···সি. সি.-র চিঠি এটি পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, নূতন কেন্দ্রীয় কমিটি রাজনীতিতে নিজেদের বামপন্থী গোঁড়ামি মুছে ফেলতে সক্ষম হয়নি।

···কেন্দ্রীয় কমিটির চিঠিতে এমন কতগুলি সিদ্ধান্ত আছে যেগুলিকে সন্ত্রাসবাদী ও অতিবিপ্লবী কাজ করার আহ্বান বলে ধরা যেতে পারে। উদাহরণ হিসাবে দেখুন—'বেশীর ভাগ জনসাধারণ নিজেরাই রাস্তায় বেরিয়ে আসছে কিনা এবং পার্টির রাজনৈতিক প্রোগ্রাম সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করছে কিনা ইত্যাদি—জনসাধারণের সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি বিচার করার এই পুরাতন মাপকাঠি আমাদের পরিত্যাগ করতে হবে।'

সি. সি.-র এই চিঠিতে বাস্তবতার অভাব, স্বতঃস্ফূর্ততার উপর নির্ভরশীল হওয়া, সংগঠনের কাজকে ছোট করে দেখা এবং দুঃসাহসী কাজের পথ খুলে যায় এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় আর একবার এই কথায় প্রমাণ করে যে—এখনও গত দু'বছরের ভুল, সাধারণ কর্ম্মীদের অভিমত এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতাদের লেখা থেকে আমাদের নেতারা উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেননি।

'শান্তি আন্দোলন—যদিও সি. সি.-র পত্রে এই বিষয়ে অনেক সঠিক সিদ্ধান্ত আছে তবুও আমাদের মনে হয় শান্তি আন্দোলনের ভূমিকার উপর যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়নি বিশেষ করে শহরে। সাম্রাজ্যবাদ ও তার তাঁবেদারদের বিরুদ্ধে জনগণের ব্যাপকতম অংশকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজে শান্তি আন্দোলন আমাদের হাতে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। বর্ত্তমান সরকারের গোলামী চরিত্র এবং এই সরকার যে সম্পূর্ণভাবে ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধজোটের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে তা ফাঁস করে দেবার জন্য আমাদের সামনে যেসব মোক্ষম উপায় আছে শান্তি সংগ্রাম তার মধ্যে একটি।' (প্রাদেশিক পার্টি আলোচনা, নব পর্য্যায়, ৪র্থ সংখ্যা)

প্রসঙ্গত, নতুন সি. সি. ইতিমধ্যে সংগঠন সংক্রান্ত কতকগুলি নতুন পদক্ষেপ নিয়েছেন : যেমন, পুরানো পি. বি. মনোনীত প্রাদেশিক কমিটি ভেঙে দিয়ে—তার জায়গায় পশ্চিম বাংলায় নতুন প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটি বা পি. ও. সি. গঠিত হয়েছে। নবগঠিত পি. ও. সি.-তে আছেন রণেন সেন, সরোজ মুখার্জি, আবদুল্লাহ্ রসুল, ভূপেশ গুপ্ত, বিশ্বনাথ মুখার্জি, ভূপাল পাণ্ডা ও বঙ্কিম প্রসাদ। রণেন সেন সেন তার সম্পাদক। সাধারণ সভ্যদের যতদূর সম্ভব মতামত নিয়ে তাড়াতাড়ি জেলা কমিটি পুনর্গঠন করতে পি. ও. সি. সচেষ্ট।

প্রাচীর ইউনিটের পি. ও. সি. সংক্রান্ত প্রস্তাবে বলা হয় :

'গত কয়েকমাস ধরে পশ্চিম বাংলার সাধারণ পার্টি সভ্যেরা পুরান ট্রট্স্কী-পন্থী-টিটোবাদী পি. বি. মনোনীত পি. সি.-র অপসারণের জন্য লড়াই করছিলেন। তাঁরা চাইছিলেন এমন একটি কেন্দ্র যা পার্টির ভিতর গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবে, সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার হাতিয়ার ব্যবহারের পথের বাধা তুলে নিয়ে সঠিক পার্টি নীতি ঠিক করার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করবে, জনসাধারণের সাথে যোগসূত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে তাদের লড়াইতে নেতৃত্ব দেওয়ার কাজে অগ্রণী হবে। আমরাও এখান থেকে একই দাবী তুলেছিলাম।

বর্তমান পি. ও. সি.-র সমস্ত দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও তার গঠন দ্বারা পার্টির সাধারণ সভ্যদের অন্ততঃ আংশিক জয় হয়েছে।'

কলকাতা ডি. ও. সি. গঠনে অনুসৃত নীতি সম্পর্কে মন্তব্য করে পি. ও. সি-র কাছে জনৈক প্রবীণতম জেল-কমরেড চিঠিতে লেখেন :

'কলকাতার ডি. ও সি. সম্বন্ধে যে সার্কুলার দিয়েছেন তাতে তিনজন মজুর সভ্য হতে হবে উল্লেখ করেছেন কেন? এটা ভুল। গত দু'বছর এই রকম ভুলের ভিতর দিয়ে পার্টির সর্ব্বনাশ হয়েছে। পুরানো পি. বি. ও মনোনীত পি. সি. এই ভুল পদ্ধতি অনুসরণ করতে গিয়ে পার্টির ভিতরেই শ্রেণী-সংগ্রাম গড়ে তুলেছিল। আপনারা কি সেই পথে পা দিলেন? একদিকে মজুর-কৃষক আর একদিকে মধ্যবিত্ত, এইভাবেই পার্টিকে ভাগ করা হয়েছিল। আপন শ্রেণী সত্তা হারিয়ে ও মজুর-কৃষকের স্বার্থকে আপন স্বার্থে পরিণত করেই তো অন্য শ্রেণীর কোন লোক শ্রমিক শ্রেণীর পার্টিতে আসতে পারে। কাজেই, আমাদের পার্টিতে এতজন মজুর হবে, আর এতজন হবে অন্য শ্রেণীর লোক এইভাবে অনুপাত ঠিক করলে পার্টির ক্ষতি হবে। প্রকৃত মজুরও পার্টির নেতা হবেন নিশ্চয়ই। কিন্তু তাঁকে শুধু ব্যক্তিত্বের অধিকারী হলে চলবে না, তাঁকে বিদ্যার অধিকারীও হতে হবে। তা না হলে তাঁরা কখনো নেতা হতে পারবেন না। মজুরকে, বিশেষ করে তরুণ মজুরকে লেখাপড়া শেখাতে হবে।' (পার্টি সমাচার, ২য় সংখ্যা, ২১. ১১. ৫০)

নতুন পি. বি.-র কাছে লেখা একটা চিঠিতে, স্নেহাংশু আচার্যের উপর থেকে বহিষ্কারের আদেশ তুলে নেওয়ার দাবি জানান প্রাক্তন পি. সি. সদস্য বকুল (জ্যোতিবাবু), বিজন (নিরঞ্জন সেন) ও বরেন। নির্বাচিত প্রাদেশিক কমিটির উপর পুরানো পি. বি.-র প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করার দাবিও তাঁরা তারই সঙ্গে জানালেন। কারণ, 'এই দলিলে অধিকাংশ পি. সি. সভ্যদের ওপর দোষারোপ করে তাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করা হয়।' তাঁদের মতে, "এই দলিলটির ভিত্তি হচ্ছে রবির 'পশ্চিম বাংলা পি. সি.-তে সংস্কারবাদ'

শীর্ষক দলিলটি। এটাও একই রকমের কুৎসা রটনাকারী মিথ্যা দলিল।" (ঐ)

জনুন সি. সি.-র চিঠির উপর পি. ও. সি. সদস্যরাও তাঁদের বক্তব্য র‍্যাঙ্কের কাছে উপস্থিত করেন (২২. ১০. ৫০)।

সুখেন (সরোজ মুখার্জি) লিখছেন:

'...শ্রমিক শ্রেণীর ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলনে সংস্কারবাদী নেতৃত্বের কতটুকু প্রভাব—ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলনের কোন কোন অংশ সম্পূর্ণভাবে কমিউনিস্ট প্রভাবাধীন বা কমিউনিস্টদের পরিচালনায় চলে—এ সম্বন্ধে কোন বাস্তব বিচার চিঠিতে নাই। 'শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য চাই'—বুলিটি আওড়ানো হয়েছে সত্য, কিন্তু তা কার্যে পরিণত করার পদ্ধতি সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য নাই। ভারতবর্ষ একটি সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পোন্নত উপনিবেশ—একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

বর্তমান সংকটজনক অবস্থায় পার্টি সংগঠনের যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে আরো প্রমাণিত হয় যে অবিলম্বে তেলেঙ্গানা ছাড়া আর কোন অঞ্চলেই গেরিলা-যুদ্ধ পরিচালনা করার বাস্তব অবস্থা নাই, সেরকম উপযুক্ত সামরিক নেতৃত্ব নাই, পরিকল্পনা ও পরিচালনা করার মত বাস্তব অবস্থাও নাই।'

মহেশ (আবদুল্লাহ্ রসুল) লিখছেন:

'...বিপ্লবী লক্ষ্যে পৌঁছবার পথ হিসাবে 'চীনের পথ' নির্দ্দেশ করা হয়েছে। এই মত আমি ঠিক মনে করি।

কিন্তু চীনের পথ ভারতে প্রয়োগ করতে হলে চীন ও ভারতের বাস্তব অবস্থার মধ্যে পার্থক্য কোথায় ও কী পরিমাণে আছে তা বিচার করা প্রয়োজন। সি. সি.-র চিঠিতে তা করা হয়নি।

এখন চীনের পথ বলতে ঠিক কি বুঝায়? সি. সি.-র চিঠিতে চীনের পথের ব্যাখ্যা করা হয়েছে দুটো সারবস্তু দিয়ে। প্রথম সম্মিলিত জাতীয় ফ্রণ্ট, দ্বিতীয় সশস্ত্র সংগ্রাম—

কমিনফর্ম্ম ব্যুরো, পিকিং ইস্তাহার, লিউ শাও চী ও বালাবুশেভিচের মতে আমাদের দেশে বিপ্লবের বর্ত্তমান পর্য্যায়ে এই ধরনের সম্মিলিত জাতীয় ফ্রণ্ট ও তার নেতৃত্ব গড়ে তোলাই হচ্ছে সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। আমাদের দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসও সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তাকে উল্টে দিয়েছিলেন আগেকার পি. বি.। পুরানো সি. সি এবং নতুন সি. সি.-ও এবিষয়ে পুরানো পি. বি.-র সঙ্গে আপস করার পথ বেছে নিয়েছেন।

সেই আপস নীতির পরিচয় পাওয়া যায় সি. সি.-র চিঠির মধ্যে যেখানে বলা হয়েছে জাতীয় ফ্রণ্টের বুনিয়াদ হবে শ্রমিক শ্রেণী ও 'মেহনতকারী কৃষকদের' মিতালি, শ্রমিকশ্রেণী ও সমস্ত কৃষকের মিতালি নয়। এই 'মেহনতকারী'

শব্দটার উদ্দেশ্য যে পুরানো বামপন্থী সংকীর্ণতাবাদকে বজায় রাখা তাতে কোন সন্দেহ নাই।

সমগ্রভাবে ভারত আজ গ্রামাঞ্চলে সশস্ত্র গেরিলা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত—তথ্য ও যুক্তি হিসাবে এ একটা মারাত্মক কথা।

শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম ও শহরের আন্দোলনে তার ভূমিকা সম্পর্কেও বিশেষ কিছু ব্যাখ্যা করা হয়নি—যেন আমাদের দেশের মুক্তি সংগ্রামে শ্রমিক আন্দোলনের বিপ্লবী প্রভাবের তেমন কোন গুরুত্ব নাই।' (প্রাদেশিক পার্টি আলোচনা, নব পর্য্যায়, ৫ম সংখ্যা, ১২. ১২. ৫০)

গোটা ১৯৫০ সাল জুড়ে সঠিক রাজনীতির সন্ধানে পার্টিতে চলতে থাকে তীব্র বিতর্ক। 'পার্টি ফোরাম'-এ প্রকাশিত হয় এজাতীয় প্রায় একশ' রচনা। এসব রচনায় বালাবুশেভিচ ও ঝুকভ প্রমুখ রুশ ভাষ্যকার এবং মাও সে তুং, লিউ শাও চি ও লি লি শান প্রমুখ চীনা পার্টির নেতাদের রচনাবলি থেকে উদ্ধৃতি যথেচ্ছ ব্যবহৃত হয়।

কিন্তু অন্তঃ-পার্টি সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পার্টি জীবনে দেখা দিল নতুন নতুন উপসর্গ। নৃপেন ব্যানার্জির ভাষায়, 'যখন দেখা গেল যে গত দু'বছরে যা করা হয়েছে তার সবটাই ভুল—তখন পার্টি র‍্যাঙ্ক-এ হতাশা দেখা দেয় ব্যাপক ও চরম আকারে। তার পাশাপাশি নতুন উপসর্গ দেখা দিল—পরস্পরের প্রতি সন্দেহ, অবিশ্বাস ও সিনিসিজম।'

কমিউনিস্ট পার্টির জীবনে সূচিত হয়েছে এক অভিনব অধ্যায়। আস্থার সংকটে কবলিত গোটা পার্টি। আস্থা হারিয়েছে পুরনো নেতৃত্ব অথচ নতুন নেতৃত্বের উপরও আস্থা রাখা যাচ্ছে না।

কুড়ি

আভ্যন্তরীণ বিতর্ক পার্টির বাইরে নিয়ে এলেন যোশী ও ডাঙ্গে। তাঁরা খবরের কাগজে পার্টি নেতৃত্বের প্রকাশ্য সমালোচনা শুরু করেন।

৩০শে মে, ১৯৫০, 'যুগান্তর'-এর সংবাদে প্রকাশ :

'পি. সি. যোশী মনে করেন, 'ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি দ্রুত ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে। আন্তর্জাতিক কম্যুনিজমের বিদেশী সমর্থকদের নিকট এক পত্রে তিনি তাঁহাদের ভারতীয় কম্যুনিস্টদের কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে অনুরোধ জানান এবং বলেন যে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি দ্রুত ধ্বংসের পথে চলিতেছে। তিনি আরও বলেন যে, ইঁহারা মার্কসবাদের ঘোর বিরোধী আত্মঘাতী একটি নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহাদের অনুচররা সংকীর্ণ সন্ত্রাসবাদে গা ভাসাইয়া দিয়াছে। ফলে পার্টি জনসাধারণের সহিত সংযোগ হারাইয়া ফেলিয়াছে।'

১৯৫০ সালের ৯ই আগস্ট, 'যুগান্তর'-এর পাতায় জোশীর আর একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়। সেখানে জোশী অভিযোগ আনেন: বর্তমান নেতৃত্ব রণদিভের নীতিই অনুসরণ করছে। জোশী বলেন :

'নতুন নেতৃত্বের কার্যপদ্ধতির প্রধান স্লোগান যতদূর সম্ভব অধিক সংখ্যক পল্লী অঞ্চলে অবিলম্বে সশস্ত্র গেরিলা সংগ্রামের উদ্যোগ করা। এই অকারণ সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধের কৌশল চাষীদের নিকট হইতে কার্য্যকরীভাবে কোনও সাড়া পাওয়া যাইবে না এবং ইহার ফলে গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহ ঐক্যবদ্ধ না হইয়া বরং দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে।

শ্রীজোশী পার্টির সদস্যদের উদ্দেশে বলেন যে, নেতৃবর্গ যাহাতে পার্টি কর্তৃক আমার বিচারের ব্যবস্থা করেন, সেইজন্য তাঁহাদিগকে বাধ্য করুন।'

১৯৫০ সালের শেষদিকে জোশী কলকাতায় পার্টি সভ্য ও সমর্থকদের এক সভায় সরাসরি নিজের বক্তব্য রাখেন। নির্মল ঘোষ বলছেন, 'হঠাৎ একদিন ৪৬ ধর্মতলাতে পি. সি. জোশী এসে হাজির। পি. সি. জে. আমাকে ছাদে ডেকে নিয়ে বললেন, তিনি তাঁর পরিচিত পার্টির লোকজনদের নিয়ে একটি সভা করবেন। তিনি আমাকে সেই সভাতে যাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে একটি কার্ড দেন। আমি এবং আরও কয়েকজন বন্ধুতে মিলে তাঁর আয়োজিত মুস্লিম ইন্স্টিটিউটের সভাতে যাই। সেই সভায় সভাপতিত্ব করেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়।'

সাত মাস আটক থাকার পর এস. এ. ডাঙ্গে ১৫ই জুলাই মুক্তিলাভ করেন। তিনি বোম্বাইতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন :

'বোমা ছুঁড়িয়া বা ট্রেন উল্টাইয়া দেশের বর্ত্তমান সরকারকে হঠান যাইবে বলিয়া ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি মনে করে না। তিনি আরও বলেন, যে সব কর্ম্মকর্ত্তা নাশকতামূলক কার্য্যাদির সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল তাহাদের পদচ্যুত করা হইবে। অবশ্য পদচ্যুত করা হইলেও তাহাদের পার্টির সাধারণ সদস্য থাকিতে দেওয়া হইবে।' (যুগান্তর, ২০. ৭. ৫০)

ডাঙ্গে ও জোশীর উক্তি সম্পর্কে পি. বি. ৪ঠা আগস্ট এক বিবৃতি প্রকাশ করেন। বিবৃতিতে বলা হয় :

'ডাঙ্গে সম্প্রতি সাংবাদিক সম্মেলনে যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহা তিনি পি. বি. অথবা সি. সি.-র সহিত পরামর্শ না করিয়া নিজের দায়িত্বে প্রচার করিয়াছেন। সংবাদপত্রে বিবৃতির যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সহিত পার্টির কর্ম্মপন্থার সামঞ্জস্য নাই।

পি. সি. জোশীর দল হইতে বহিষ্কারের বিরুদ্ধে এবং পুনরায় দলে প্রবেশ করিবার আবেদন সি. সি. অগ্রাহ্য করিয়াছেন। জোশী আর কম্যুনিস্ট বলিয়া পরিগণিত হইবার দাবী করিতে পারেন না।' (যুগান্তর, ৫.৮.১৯৫০)

কিন্তু পার্টির ভেতরে সি. সি.-র রাজনৈতিক লাইনের সবচেয়ে জোরালো বিরোধিতা আসে 'তিন পি.' রচিত অন্তঃ-পার্টি দলিল প্রকাশের পর। 'আমাদের পার্টির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন' শীর্ষক দলিল-টির রচয়িতা যথাক্রমে প্রবোধচন্দ্র (অজয় ঘোষ), প্রভাকর (এস. এ. ডাঙ্গে) ও পুরুষোত্তম (এস. ভি. ঘাটে)।

দলিলটির মূল বক্তব্য

বর্তমান পরিস্থিতির মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সরকারি নীতির বিরুদ্ধে ব্যাপক গণবিক্ষোভ থাকা সত্ত্বেও সে অনুপাতে গণ-আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠছে না। শক্তিশালী গণ-আন্দোলন গড়ে তোলা দূরে থাকুক—পার্টি আজ নিজের শ্রেণী থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। পার্টির সভ্য সংখ্যা এক লক্ষ থেকে কমে গিয়ে কুড়ি হাজারে ঠেকেছে। শিল্পাঞ্চলে যেসব জায়গায় পার্টি একদা শক্তিশালী ছিল—সেখান থেকে মুছে গিয়েছে বলা চলে। আজ প্রতিটি অন্তঃ-পার্টি দলিল পুলিশের হাতে চলে যাচ্ছে। পার্টির গোপন আস্তানা-গুলি বর্তমানে আর নিরাপদ নয়। পার্টির ভেতরে পুলিশের চরের ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

২৭শে জানুয়ারি ১৯৫০-এ প্রকাশিত কমিনফর্ম-এর সম্পাদকীয় আক্ষরিক অর্থে পার্টির মধ্যে ঝড় তুলেছিল। তার ফলে পুরাতন নেতৃত্ব বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছে। তাতেও পার্টি কিন্তু সংকটমুক্ত হয়নি। পার্টি আজ অচল এবং ভাঙনের মুখে। প্রশ্ন হচ্ছে, কেন আট মাস অতিবাহিত হবার পরও পার্টির সংকট কাটল না। তার কারণ, নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি কমিনফর্ম-এর সম্পাদকীয় নিবন্ধের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করতে পারেননি। কার্যত তাঁরা সেই বাম সংকীর্ণতাবাদী ও বেপরোয়াবাদী লাইন অনুসরণ করে চলেছেন।

চীনের পথই আমাদের পথ এবং সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়েই আমাদের বিপ্লব সম্পন্ন হবে—এই একটা বিষয়ে আজ সব কমরেড একমত। কিন্তু এ পর্যন্তই আমাদের ঐক্য। আর আশু করণীয় কাজ ও কৌশল সম্পর্কে পার্টির মধ্যে রয়েছে গভীর অনৈক্য।

আমাদের দেশের বৈপ্লবিক আন্দোলনের বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণের অনীহাই ছিল পুরানো পি. বি.-র ভুলের উৎস। তাঁদের সিদ্ধান্ত ছিল : কংগ্রেস সম্পর্কে মানুষ পুরোপুরি মোহমুক্ত এবং তারা কেবল সাহসী নেতৃত্বের জন্যে অপেক্ষমান। তাঁরা এভাবে প্রকৃত ঘটনাকে উপেক্ষা করে দেশের বাস্তব পরিস্থিতির মনগড়া ব্যাখ্যা করেছিলেন।

নতুন সি. সি.-ও একই দোষে দোষী। তাঁরাও লিখেছেন, রক্ত-চোষাদের হাতিয়ার হিসাবে কংগ্রেস সরকারের স্বরূপ জনগণের সামনে আজ পুরোপুরি উদ্ঘাটিত। জনগণের সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে শাসকশ্রেণীকে চুরমার করার পক্ষে পরিস্থিতি আজ পরিপক্ব।

অর্থাৎ সি. সি. বিপ্লবের শর্টকাট রাস্তা খোঁজার পক্ষপাতী। যদিও তাঁরা জানেন যে পার্টি আজ সাংঘাতিক দুর্বল। নিজস্ব শ্রেণী—শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেই পার্টি বিচ্ছিন্ন। দেশের বৃহত্তম অঞ্চলে কৃষক আন্দোলনের অস্তিত্ব নেই। বর্তমানে পার্টির লোক জড়ো করার ক্ষমতা—গত দশ বছরের যে কোন সময়ের তুলনায় দারুণভাবে হ্রাস পেয়েছে।

জুন সি. সি.-র রাজনৈতিক লাইনের সমালোচনার সারমর্ম

১. এই লাইন পুরানো পি. বি.-র সংকীর্ণতাবাদী রাজনীতির এক পরিমার্জিত সংস্করণ।

২. এই লাইন দেশের বাস্তব অবস্থার বিশ্লেষণ না করে চীনের সঙ্গে ভারতের সাদৃশ্য খোঁজার এক যান্ত্রিক প্রয়াস মাত্র।

৩. আন্দোলনের স্তর (গৃহযুদ্ধ ইত্যাদি), পরিস্থিতির পরিপক্কতা, গণ-চেতনার স্তর, আমাদের শক্তি, প্রভাব ও জমায়েত করার ক্ষমতা প্রভৃতি অতিরঞ্জিত করে দেখানো হয়েছে এই লাইনে।

৪. দেশের আন্দোলনের ক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণীর বিশেষ অবস্থানকে উপেক্ষা করা হয়েছে।

৫. শ্বেত সন্ত্রাসের অজুহাতে—শান্তি, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ও কৃষি সংস্কার প্রভৃতি দাবিতে গণ-জমায়েত ও গণ-আন্দোলনের সুষ্ঠু ও নির্দিষ্ট পরিকল্পনাকে বাতিল করা হয়েছে। তার ফলে সরকারের শক্তিকে বাড়িয়ে ও দেশের গণতান্ত্রিক শক্তিকে ছোট করে দেখান হয়েছে।

৬. 'নতুন মাপকাঠি'র নামে তেলেঙ্গানার শিক্ষাকে ভুলে যাওয়া হয়েছে এবং জনসাধারণের জন্যে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

৭. আন্দোলনের অসমান স্তরের কথা ভুলে গিয়ে গতানুগতিক কৌশল ও কতকগুলি বাঁধাধরা বুলির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে এবং আন্দোলনের বাস্তব স্তরের সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন সংগ্রাম পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে।

৮. বাস্তব অবস্থার দোহাই দিয়ে চেতনা ও সংগঠনের বিশেষ গুরুত্বকে লঘু করে দেখা হচ্ছে। পার্টির ভূমিকাও উপেক্ষিত—কারণ পার্টি পুনর্গঠন ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে ছিন্ন যোগসূত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার জরুরি কর্তব্যের কথা অনুল্লেখিত।

৯. কমিনফর্ম-এর সম্পাদকীয়তে বর্ণিত আমাদের আন্দোলনের সুনির্দিষ্ট কর্তব্যের কথা অনুল্লেখিত—যেন সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমেই সব কর্তব্য সমাধা হবে।

১০. বিগত তিন বছরের ঘটনাবলি সম্পর্কে একপেশে ও বিকৃত ধারণা ব্যক্ত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তি যে আজ বহুধাবিভক্ত এবং এটাই যে সরকারের শক্তির উৎস—একথাটা খেয়াল করা হয়নি। সুতরাং ঐক্য গড়ে তোলার কর্তব্যের উপর আদৌ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

১১. গেরিলা যুদ্ধের নামে এক নিকৃষ্ট ধরনের বেপরোয়াবাদী নীতি আমদানি করা হয়েছে এই লাইনে। তার ফলে পার্টি আরও দুর্বল হবে এবং শত্রু আরও শক্তিশালী হবে।

১২. এটা পার্টিকে ধ্বংস করার লাইন।

এসব কারণে আমাদের মতে বর্তমান সি. সি.-র লাইন গ্রহণযোগ্য নয়।

আমাদের আশু কর্তব্য

সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। কংগ্রেস চেষ্টা করছে যাতে তারা নির্বাচনের মাধ্যমে আবার ক্ষমতায় আসতে পারে। সোশ্যালিস্ট পার্টির মতো রাজনৈতিক দলগুলিও আশা করে যে নির্বাচনের ফলে তাদের শক্তিবৃদ্ধি ঘটবে। কেবল আমরাই নীরব। এই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের সমর্থকদেরও পার্টি থেকে দূরে ঠেলে দেবে। আমাদের দাবি হবে—অবিলম্বে নির্বাচন চাই। তার জন্যে আমরা বামপন্থী ও প্রগতিশীল দল এবং যারা সম্প্রতি কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসেছে তাদের নিয়ে ঐক্যবদ্ধ মোর্চা গড়ে তুলব। আমরা আরও বলব পরিপূর্ণ ব্যক্তি-স্বাধীনতা ছাড়া, আমাদের পার্টি ও গণ-সংগঠনের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ছাড়া এবং রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি না দিলে নির্বাচন তামাসায় পরিণত হবে। এই দাবিগুলির পিছনে সমস্ত ধরনের মানুষের সমর্থন থাকবে বলে আশা করা যায়।

তেলেঙ্গানা ও অন্যত্র যেসব জায়গায় আমরা গেরিলা যুদ্ধ চালাচ্ছি—সেসব লড়াই-এর পিছনে ব্যাপক গণ-সমর্থন সৃষ্টি আজ একান্ত জরুরি। তেলেঙ্গানা লড়াই-এর আত্মরক্ষামূলক দিকটাকে সামনে তুলে ধরতে হবে। বলতে হবে, কৃষকের দাবি ন্যায্য। পুলিশ ও ফৌজের অত্যাচার তাদের অস্ত্রধারণ করতে বাধ্য করেছে। জীবন-জীবিকা এবং স্ত্রী-মা-বোনদের ইজ্জত বাঁচানোর এ ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। সরকারকে উৎখাত করার জন্যে আমরা সেখানে গেরিলা যুদ্ধে নামিনি। পার্টির বাইরের লোকের কাছে প্রচার-পুস্তিকার মাধ্যমে এই বক্তব্য পৌঁছে দেওয়া দরকার। গণতন্ত্রকামী নির্দল মানুষজন যাতে তেলেঙ্গানায় গিয়ে স্বচক্ষে প্রকৃত অবস্থা দেখে আসতে পারে তার ব্যবস্থা করা দরকার। 'সংস্কারবাদে'র নামে এসব কাজকে অবহেলা করার অর্থ হচ্ছে তেলেঙ্গানাকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় খতম হতে দেওয়া।

আমাদের আশু কাজ হবে: দেশের বৃহত্তর অঞ্চলে গণ-আন্দোলন, গণ-সংগঠন ও গণ-ঐক্য গড়ে তোলা। কেবল তাহলেই সশস্ত্র সংগ্রামের প্রকৃত ভিত্তি রচিত হবে।

আমাদের বক্তব্যের সঙ্গে সি. সি. লাইনের এখানেই তফাত। তাঁরা সারা দেশ জুড়ে সশস্ত্র লড়াইয়ের তত্ত্ব আমদানি করে ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে দিয়েছেন।

একুশ

অজয় ঘোষ-ডাঙ্গে-ঘাটে রচিত অন্তঃপার্টি দলিল প্রচারিত হওয়ার ফলে অন্তঃপার্টি বিতর্ক নতুন দিকে মোড় নিল। সংহত ও ধারাবাহিক এই পাল্টা রাজনৈতিক লাইন পার্টিতে সৃষ্টি করল এক ধরনের রাজনৈতিক মেরু বিভাজন। বীরেশ মিশ্রের ভাষায়, তখন পাশাপাশি দুটি হেডকোয়ার্টার—জুন সি. সি. ও ডাঙ্গে-অজয় গোষ্ঠী।

কেবল উদ্ধৃতি-কণ্টকিত অজস্র রচনা ও অন্তহীন বিতর্ক। কিন্তু মতৈক্যের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। এই নৈরাশ্যজনক পটভূমিতে, পার্টির সদর দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত কমরেডদের এক সভায় অজয় ঘোষ বলেন।

'আজকের বাস্তব অবস্থা হচ্ছে ভারতের পার্টিতে এমন কেউ নেই যিনি এই সংকট থেকে পার্টিকে মুক্ত করতে পারেন। আন্তর্জাতিক কমরেডরাই আমাদের ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন। যেহেতু আমরা কমিনফর্ম-এর সম্পাদকীয়ের ব্যাখ্যা সম্পর্কে ঐকমত্যে পেঁছিতে পারিনি—অতএব তাঁরাই কেবল এ বিষয়ে আমাদের সহায়তা করতে পারেন। অতএব আন্তর্জাতিক নেতাদের সঙ্গে আমাদের দেখা হওয়া দরকার। 'লাস্টিং পিস'-এর সম্পাদকীয়ের সঠিক অর্থ কী—আমরা কেউ জানি না। যদি কেউ বলেন—তিনি জানেন—সেটা তাঁর আত্মম্ভরিতার নিদর্শন মাত্র।' (ওভারস্ট্রিট ও উইন্ডমিলার, কমিউনিজম ইন ইন্ডিয়া)

অন্তদ্বন্দ্বে বিক্ষত পার্টি যখন অনড় ও অচল, দেশের পরিস্থিতি কিন্তু তখন দ্রুত পরিবর্তনশীল। কংগ্রেসে শুরু হয়েছে ভাঙন এবং মানুষের মধ্যে ঘটছে দ্রুত মোহমুক্তি।

১৫. ৮. ৫০: মানিক বন্দোপাধ্যায় ডায়েরির পাতায় লিখছেন,—'স্বাধীনতা দিবস। ফ্ল্যাগ কিছু কিছু উড়ছে—কিন্তু চারিদিক ঝিমানো। প্রথম বছর—এমনকি দ্বিতীয় বছরের সঙ্গে তুলনায় স্বাধীনতার মৃত্যু দিবস। কোথাও কোন উৎসাহ উদ্দীপনার চিহ্ন নেই।'

সঠিকভাবেই জুন সি. সি.-র চিঠিতে বলা হয়েছে:

'শাসকশ্রেণী সংকটের কবলে, সেখানে বিভ্রান্তি ও আতঙ্ক বিরাজ করছে। টাটা-বিড়লার মধ্যে ঝগড়া বেধেছে। টাটার লোক মাথাই ক্যাবিনেট থেকে বেরিয়ে এসেছে। ডালমিয়া প্রকাশ্যে খবরের কাগজের পাতায় কংগ্রেসের আসল দুটি চাঁই নেহরু ও প্যাটেলের বিরুদ্ধে বিবৃতি দিয়েছে। কংগ্রেস টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে; প্রতিটি প্রদেশেই কংগ্রেস ভাঙছে। যুক্তপ্রদেশে কংগ্রেসের বিদ্রোহী আইনসভার সদস্যবৃন্দ নতুন দল তৈরি করছে···।'

গোটা ১৯৫১ সাল জুড়ে এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। কংগ্রেসীদের মধ্যে যেন দলত্যাগের হিড়িক পড়েছে। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রী

কালাভেংকট রাও-এর বিবৃতি থেকে জানা যায় এ পর্যন্ত ১৫৭৫ জন কংগ্রেস সদস্য দলত্যাগ করেছেন। (যুগান্তর, ১০. ৭. ৫১)

নেহরুর নিজের প্রদেশে দেখা দিয়েছে প্রবল আলোড়ন। ভারতের যোগাযোগ মন্ত্রী রফি আহম্মদ কিদোয়াই ও পুনর্বাসন মন্ত্রী অজিতপ্রসাদ জৈন মন্ত্রিত্ব ও কংগ্রেস সদস্যপদ ত্যাগ করলেন। কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এলেন আচার্য কৃপালনি, সুচেতা কৃপালনি ও শিবলাল সাক্সেনা। তাঁদের পদাংক অনুসরণ করেন উন্নয়ন মন্ত্রী কেশবদেও মালবীয় ও পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি জগনপ্রসাদ রেয়াত।

সরাসরি কংগ্রেস-বিরোধিতায় নামলেন এবার আচার্য কৃপালনি। তিনি এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন: কমিউনিস্টদের জেলে রেখে কমিউনিজমের রাস্তা বন্ধ করা যায় না। কংগ্রেসের নীতি কমিউনিজম ডেকে আনছে ভারতে। (যুগান্তর, ১০. ৮. ৫১)

সাম্প্রতিক পৌরসভা নির্বাচনগুলিতেও কংগ্রেস সুবিধা করতে পারেনি। 'যুগান্তর'-এর (৩. ৭. ৫১) সংবাদসূত্রে জানা যায়, হাওড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী দুজন, বঙ্কিম কর ও রবীন্দ্রনাথ সিংহ ১৬-১৪ ভোটে ইউনাইটেড প্রোগ্রেসিভ ব্লকের প্রার্থী কার্তিকচন্দ্র দত্ত ও শংকরলাল মুখোপাধ্যায়ের কাছে পরাজিত হয়েছেন।

চন্দননগর পৌরসভার নির্বাচনে কংগ্রেস-বিরোধী প্রগতিশীল জোট পঁচিশটি আসনের মধ্যে পঁচিশটিই দখল করেছে।

সাম্প্রতিক পৌরসভা নির্বাচনের ধারা দেখে রফি আমেদ কিদোয়াই বলেন, সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস হয়তো সুবিধা করতে পারবে না। (যুগান্তর, ১৬. ৭. ৫১)

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসেও শুরু হয়েছে ভাঙন। দেড়শ'জন সদস্য কংগ্রেস ত্যাগ করে পৃথক একটি রাজনৈতিক দল গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন অমরকৃষ্ণ ঘোষ, বিমলকুমার ঘোষ, সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, প্রতাপ চন্দ্র গুহ রায়, ফকিরচন্দ্র রায় ও অরুণ ব্যানার্জি। (যুগান্তর, ৪. ৮. ৫১)

দেখা দিয়েছে রাজনৈতিক অস্থিরতার সূচনা।

বাইশ

স্বাধীনতা-উত্তরকালে দেশ ও জাতি যে আরেকটি যুগসন্ধির মুখোমুখি— তার যাবতীয় লক্ষণ সুস্পষ্ট। অথচ কংগ্রেসের বিকল্প শক্তি হিসাবে যাদের অগ্রণী ভূমিকা পালনের কথা—সেই কমিউনিস্ট পার্টির সবল অস্তিত্ব আজ জনজীবনে অনুপস্থিত। তার কারণ রণনীতি ও রণকৌশলগত প্রশ্নে পার্টিতে তীব্র মতবিরোধ। পার্টি শুধু জনজীবনে নিষ্ক্রিয় নয়—তার ঐক্য

ও সংহতি পর্যন্ত বিপন্ন। এই প্রেক্ষাপটে সেদিন অধিকাংশ কমরেড উপলব্ধি করেছিলেন—সঠিক রাজনৈতিক লাইন নির্ধারণের চেয়েও পার্টির ঐক্য-রক্ষা আজ বেশি জরুরি। তার জন্যে চাই পার্টিতে যৌথ নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা।

এই প্রসঙ্গে চিন্মোহন সেহানবীশ বলছেন, 'বক্সা জেলে আমরা জুন সি. সি.-র চিঠি একদম প্রত্যাখ্যান করলাম। তারপর হয়ে গেলাম তিন ভাগ: পুরো প্রত্যাখ্যান—কঠোর সমালোচনা—আংশিক গ্রহণ। আমি. চারু মজুমদার, কেষ্ট ঘোষ, ননী ভৌমিক ও শিবশংকর মিত্র—এই পাঁচজনের মত ছিল—জুন. সি. সি. লাইনের পুরো প্রত্যাখ্যান অথচ যৌথ নেতৃত্ব। তার অর্থ 'তিন পি' দলিলের তিন রচয়িতা অজয় ঘোষ, ডাঙ্গে ও ঘাটে এবং রাজেশ্বর রাও ও বাসবপুন্নিয়া সহ সম্মিলিত নেতৃত্ব। শেষ পর্যন্ত আমাদের লাইন গৃহীত হল।'

অবশেষে গড়ে উঠল যৌথ নেতৃত্ব। দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে নির্বাচিত যে সমস্ত কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মে-জুন-এর সি. সি. সভায় উপস্থিত হতে পারেননি—তাঁদের নিয়ে ১৯৫০ সালের ডিসেম্বরে জুন সি. সি.-র বর্ধিত সভা বসল এবং সেখানে গড়ে উঠল একজাতীয় কাজ চালানোর মতো ঐক্য।

পার্টি জীবনে এক অভূতপূর্ব সংকটের পটভূমিতে এই সভা। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রশ্নে যে প্রবল মতানৈক্য বর্তমান—তা আজ প্রচ্ছন্ন নয়। রাজনৈতিক মতৈক্যের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। একমাত্র ভারতের বাইরে ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলিই পারে এ বিষয়ে সহায়তা করতে। একমাত্র পার্টি কংগ্রেস ছাড়া ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক লাইনের উদ্ভব সম্ভব নয়। অতএব এই সভা থেকে যে সব বিষয়ে ঐক্যমত সৃষ্টি হয়—সেগুলি হল।

১. বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে ঐক্য।
২. অবিলম্বে সাধারণ নির্বাচনের দাবি এবং তার জন্যে লুপ্ত ব্যক্তি-স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে আন্দোলন।
৩. তেলেঙ্গানার বীর যোদ্ধাদের প্রাণরক্ষার সংকল্প—তেলেঙ্গানার সংগ্রাম প্রত্যাহার সম্পর্কে প্রেসে ব্যক্তিগত দায়িত্বে বিবৃতি দান বন্ধ।
৪. আগামী তিনমাসের মধ্যে যাবতীয় প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠান এবং ছ'মাসের মধ্যে তৃতীয় পার্টি কংগ্রেস।

আজকের পরিস্থিতির দাবি: একটি ঐক্যবদ্ধ পার্টি কেন্দ্র।

অতএব গঠিত হল চোদ্দোজন নিয়ে নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি। তাতে রয়েছেন সি. রাজেশ্বর রাও, ডি. ভেংকটেশ্বর রাও, পি. সুন্দরায়া, ই. এম. এস. নাম্বুদ্রিপাদ, এম. বাসবপুন্নিয়া, বীরেশ মিশ্র, মণি সিং, এস. ভি. পারুলেকার —এই আটজন জুন সি. সি সদস্য এবং নতুন এলেন—অজয় ঘোষ, এস. এ. ডাঙ্গে, এস. ভি. ঘাটে, রণেন সেন, মুজফ্ফর আহমেদ ও এস. এস. ইউসুফ।

রাজেশ্বর রাও সম্পাদক রইলেন এবং ই. এম. এস., অজয় ঘোষ, এস. এ. ডাঙ্গে ও এস. এস. ইউসুফকে নিয়ে গঠিত হল নতুন পলিটব্যুরো। পুরাতন পলিটব্যুরোর সদস্য বাসবপুন্নিয়া ও বীরেশ মিশ্র স্বেচ্ছায় সরে গেলেন।

পার্টিসভ্য ও সমর্থকদের প্রতি এক চিঠিতে জানানো হল যে রজনী পাম দত্ত ও ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির সাহায্য প্রার্থনা করা হবে। এবং আশা করা যায় যে সাহায্য পাওয়া যাবে।

অন্তঃপার্টি মতবিরোধ মীমাংসার চরম প্রয়াস হল পার্টির দুই চিন্তাধারার প্রতিনিধি শীর্ষস্থানীয় চারজনের গোপনে মস্কো যাত্রা। সেখানে কমরেড স্ট্যালিন ও সোভিয়েত পার্টির শীর্ষস্থানীয় নেতাদের সঙ্গে ভারতের পার্টির নেতৃবর্গ, অজয় ঘোষ, ডাঙ্গে, রাজেশ্বর রাও ও বাসবপুন্নিয়ার সুদীর্ঘ আলোচনা হয়। সেই আলোচনার পরিণতি—পার্টির খসড়া কর্মসূচি (১৯৫১)—পার্টিতে রাজনৈতিক ঐক্যের বুনিয়াদ। সূচিত হল কমিউনিস্ট পার্টির জীবনে এক নতুন অধ্যায়। যবনিকা নেমে এল ঘটনাবহুল সংঘাতে ভরা এক অধ্যায়ের উপর।

চিত্ত মৈত্রের মতো পুরানো কমরেডরা জীবনের গোধূলিবেলায় সে দিনগুলি স্মরণ করে বলেন, 'শ্রেণীভিত্তিক পার্টি ছিল—শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা ছিল। পার্টিতে কমরেডশিপ ছিল। তখনকার দিন ভালো ছিল। ভুল করেও এগিয়ে যাবার প্রবণতা ছিল।'

তেইশ

কলকাতা হাইকোর্টের এক গুরুত্বপূর্ণ রায়ের দৌলতে পশ্চিম বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি আবার বৈধ সত্তা ফিরে পেল। বেশ কিছুকাল পর আবার সংবাদ-শিরোনামায় কমিউনিস্ট পার্টি :

কমিউনিস্ট দলকে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা বে-আইনী
রাজবন্দীদের আটকাদেশের বৈধতা সম্পর্কে
কলিকাতা হাইকোর্টের গুরুত্বপূর্ণ রায়
ভারতীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনের কয়েকটি
ধারা অবৈধ বলিয়া ঘোষণা

সংবাদে প্রকাশ : 'নিবারক নিরোধ আইন অনুসারে বিভিন্ন জেলে আটক ৮৮ জন রাজবন্দী তাঁহাদের আটকাদেশের বৈধতার প্রশ্ন তুলিয়া যে আবেদন করিয়াছিলেন, সেই আবেদন সম্পর্কে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুত সেন গত শুক্রবার রায় দেন। বিচারপতি শ্রীযুত সেন ও শ্রীযুত চন্দ্র পূর্বেই আবেদনকারীদের মুক্তি দেবার আদেশ দিয়াছিলেন। রায়দান প্রসঙ্গে শ্রীযুত সেন মন্তব্য করেন, "কোনপ্রকার অবৈধ আচরণ না ঘটে, সাধারণতন্ত্রী ভারতের বিচারক হিসাবে আমাদের তাহা দেখিতে হইবে। রাষ্ট্রবিধান অনুসারে বিধান পরিষদকে যে আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা দেওয়া

হয় নাই, বিধান পরিষদ যদি সেইরূপ কোন আইন প্রণয়ন করেন তাহা হইলে তাহা বিধান পরিষদের ক্ষমতা বহির্ভূত বলিয়া ঘোষণা করিতে পারি।"

মাদ্রাজ হাইকোর্ট অনুরূপ এক মামলায় সিদ্ধান্ত করেন যে সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৬নং ধারা ভারতীয় শাসনতন্ত্রের বিধি-বহির্ভূত, সুতরাং ভারতীয় কমিউনিস্ট দলকে অবৈধ ঘোষণা করিয়া যে আদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহাও বাতিল।' (আনন্দবাজার পত্রিকা, ৬. ১. ৫১)

কমরেডদের কাছে সংবাদটি অবিশ্বাস্য—অভাবনীয়। আবার তারা প্রকাশ্যে সভা-শোভাযাত্রা করতে পারবে! লাঠি গুলি চলবে না! পার্টির পত্র-পত্রিকা কাছে রাখা দণ্ডনীয় অপরাধের আওতায় পড়বে না! যেন এক অসহ্য গুমোটের অবসান।

কিন্তু পার্টিতে প্রায় সব বিষয়েই গভীর মতবিরোধ। শান্তি আন্দোলন করতে হবে—শুধু এ বিষয়েই সবাই একমত। নবপর্যায়ে শান্তি আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে এগিয়ে এলেন গণনাট্য সংঘ ও সংস্কৃতি ফ্রন্টের কমরেডরা। এ প্রসঙ্গে নির্মল ঘোষ লিখছেন :

'শান্তি আন্দোলন সম্পর্কে এই সময় নানারকম মতপার্থক্য দেখা যায়। কারণ ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের এক অংশ বলতে শুরু করেন যে শান্তি আন্দোলন হবে বিভিন্ন জায়গায় নিরস্ত্রীকরণের মাধ্যমে। তাঁদের মত ছিল কোথাও কোনরকম অস্ত্রের ব্যবহার না হওয়া উচিত, কারণ ছোট স্ফুলিঙ্গ থেকেই বিরাট অগ্নিকাণ্ড ঘটতে পারে। তাই যে কোন বিচ্ছিন্ন যুদ্ধ, হোক ঔপনিবেশিক জনগণের মুক্তিযুদ্ধ, তাও আমাদের বন্ধ করা প্রয়োজন, কারণ এই বিচ্ছিন্ন যুদ্ধই বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হতে পারে।···

·· আরেক পক্ষের মত ছিল, না, ঔপনিবেশিক দুনিয়ায় গণমুক্তি সংগ্রাম ও শান্তির সংগ্রাম—এই দুটি একসঙ্গে চলবে।···

·· যাই হোক, শান্তি ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনই গণনাট্যের কর্মসূচীতে স্থান পেল। কলকাতা থেকে এই কর্মসূচীকে কার্যকরী করার সিদ্ধান্ত আমরা নিই। এবং প্রায় চার বছরের বিচ্ছিন্নতার পর আমাদের প্রচেষ্টাতে বাংলাদেশের নাট্যগোষ্ঠীগুলির প্রথম ঐক্যবদ্ধ উৎসব হল।' (ভারতীয় গণনাট্য সংঘ। সাংস্কৃতিক চেতনা)

শিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মীদের এই প্রথম গণতান্ত্রিক মোর্চার নাম শান্তি সংস্কৃতি পরিষদ এবং নাট্যকার শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তার আহ্বায়ক (কনভেনর)। শান্তি-সংস্কৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫১ সালে ভবানী-পুরের স্মার্টা গ্রাউন্ডে, পূর্ণ সিনেমার সামনে চড়কডাঙ্গার মোড়ে একটা পোড়ো জমিতে প্যান্ডেল করে।

১৯৪৮-১৯৫০ সাল পর্যন্ত কারাবাস করে বন্দীরা সেই সবে ছাড়া

পাচ্ছেন। ঘরে ফেরার আনন্দের সঙ্গে এই উৎসবে পুনর্মিলনের আনন্দ যেন একেবারে বাঁধ ভেঙে দেয়।

নির্মল ঘোষ লিখছেন :

'স্মার্টা গ্রাউণ্ডের শান্তি-সংস্কৃতি উৎসবের পরই ১৯৫১-র অক্টোবরে বিরাট আকারে শান্তি সম্মেলন হয় মহম্মদ আলি পার্কে। এই শান্তি সম্মেলনে প্রায় সমস্ত পার্টি ও জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা, লেখক, শিল্পী, বিজ্ঞানী, শ্রমিক নেতা ও কৃষক নেতা সর্বপ্রথম এক মঞ্চে এসে হাজির হন। আমার মনে পড়ে সম্মেলনের উদ্বোধনী উৎসবে উপস্থিত হন অসুস্থ অবস্থায় সর্বজনশ্রদ্ধেয় মুজফ্ফর আহ্মেদ সাহেব। মুজফ্ফর আহ্মেদ এই সম্মেলন উদ্বোধন হবার তিন চারদিন আগে মুক্ত হয়েছেন। মহম্মদ আলি পার্কের শান্তি-সম্মেলনের প্যাণ্ডেল উচ্ছ্বাস, আনন্দে, করতালিতে একেবারে ফেটে পড়ল সদ্যমুক্ত কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতার উপস্থিতিতে।' (ঐ)

চীৎকার

পণ্ডিত নেহরু ঘোষণা করেছেন। আগামী নভেম্বরে সাধারণ নির্বাচন। (যুগান্তর, ১৪. ৩. ৫১)

স্বাধীনতা-উত্তর প্রথম সাধারণ নির্বাচনে কমিউনিস্টরা অংশগ্রহণ করবে। এই ঘোষণা ১৯৫১ সালের স্বাধীনতা দিবসে পার্টির পক্ষ থেকে নতুন করে আবার প্রচারিত হয়। 'যুগান্তর' (১৭. ৮. ৫১)-এর সংবাদে প্রকাশ :

বুধবার স্বাধীনতা দিবসে কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠনী কমিটির উদ্যোগে আহুত মহম্মদ আলী পার্কের এক জনসভায়—'প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেস সরকারের অবসানের জন্য সমস্ত প্রগতিশীল ও গণতন্ত্রপ্রিয় দল এবং প্রতিষ্ঠান-গুলিকে লইয়া এক যুক্ত ফ্রন্ট গঠনে আহ্বান জানান হয়।'

এবার নতুন পথে যাত্রা। একে-একে সবাই ঘরে ফিরছেন। কারামুক্ত কমিউনিস্টরা পেলেন আশাতীত অভ্যর্থনা।

জগৎ বোস বলছেন, 'কমিউনিস্টরা ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত খুব ধৈর্যের সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তুলেছে—কৃষক সভাও গড়েছে। যেসব অর্থনৈতিক লড়াই হয়েছে তাতে শ্রমিক-কৃষক উপকৃত হয়েছে। কংগ্রেসের আক্রমণ শুরু হওয়াতে শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের অগ্রগতি থেমে গেল। সংগঠকরা দুঃখ দুর্দশা সহ্য করল—জেলে গেল—মারা গেল। এ সময়ে গরীব মহলে সরকার-বিরোধী প্রতিক্রিয়া দানা বাঁধল। যাদের সরকার ধরেছে—তারা আমাদের জন্যে লড়ছে। অতএব ১৯৫০-৫১ সালে যখন কমিউনিস্টরা জেল থেকে বেরুল—তারা পেল বীরের সম্মান।'

সুবোধ চৌধুরী আবার আত্মপ্রকাশ করেছেন। তিনি নির্বাচনপ্রার্থী। ধ্রুবজ্যোতি মজুমদার বলছেন, 'সুবোধ চৌধুরী নাম ধরে ডাকলেন—কী রে? সঙ্গে সঙ্গে এতক্ষণ যে মুখ গোঁজ করে দাঁড়িয়েছিল—সেই বুনো রাজোয়ারটা ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল—'এতদিনে রাজা মোর আইলেন—আমরা মরে যিছি কোন খবর নাই।'

লোকটার মা বুড়ীটা ছুটে এসে বলল, 'সুবল আইলি!' সে সুবোধ চৌধুরীর মুখ-চোখ হাত বুলিয়ে দেখতে লাগল। কারণ বুড়ী অন্ধ। তার বাড়িতে সুবোধ চৌধুরী কিছুদিন লুকিয়ে ছিলেন।'

দু'বছর পর ছাড়া পেয়ে ননী ভৌমিকের 'আগন্তুক' গল্পের নায়ক মুরারি আবার এসেছে সেই এলাকায়।

'শুধু ফুল নয়। আরো অনেকে এসে দাঁড়িয়েছে ওর চারপাশে। গাঁয়ের বুড়ি বুড়ি মেয়ে, বাচ্চা অনেকে—আরো অনেকে আসছে। মুরারি নির্বোধের মত তার চারিপাশে চাইলো। তার চারিপাশে কি হচ্ছে—সে যেন কিছুই বুঝতে পারছে না। কাঁদছে অনেকে, মুরারির গায়ে হাত দিয়ে পরখ করে দেখছে সবাই, হাত বুলিয়ে দেখছে। ঠাকুর ভালো আছো? ভগবান তুমার ভালো করুক ঠাকুর। বেঁচে থাকো। কবে ছাড়া পেলে গো? হায় হায় আমাদের কথা আর শুধায়ো না। তুমরা কেউ তো ছিলে না ঠাকুর ··এই দেখো, হাল দেখো আমাদের। ধান নাই গো দেশে। · আর এই কাপড় পরে আমরা মেয়েরা চলতে পারি?

মুরারি বিব্রতভাবে এলোমেলো কি কয়েকটা কথা বলল। তারপর চুপ করে গেল।

অত্যাচারের কথা আর বলব না ঠাকুর। তুমি এসেছ। এর একটা বিহিত করো এবার, নয়ত ছাড়ব না—বুড়ি বুড়ি মেয়েরা একান্ত আশায় তাকিয়ে আছে মুরারির দিকে।'

পরিশিষ্ট ১

উল্লিখিত ঘটনাপঞ্জি

প্রথম পর্ব

৪ মে ১৯৪৫—কমিউনিস্ট পার্টি'র ডাকে কলকাতায় বার্লিন-বিজয় মিছিল।

যুদ্ধ চলাকালীন দেশ ও কমিউনিস্ট পার্টি:

ক. ১৯৪২—আগস্ট আন্দোলন ও পার্টি

খ. ১৯৪৩—পঞ্চাশের মন্বন্তর ও পার্টি

গ. ১৯৪২-৪৫—গণপার্টি'তে রূপান্তরের কাহিনী

দ্বিতীয় পর্ব

যুদ্ধোত্তর গণ-অভ্যুত্থান

২১ নভেম্বর ১৯৪৫—আজাদ হিন্দ বন্দীদের মুক্তি আন্দোলন: ধর্মতলা স্ট্রীটে ছাত্রদের উপর গুলি

২২ নভেম্বর ১৯৪৫—অশান্ত কলকাতা

ডিসেম্বর ৪৫

-ফেব্রুয়ারি ৪৬—জাতীয়তাবাদী মহলে কমিউনিস্ট-বিরোধী জেহাদ

১২ ফেব্রুয়ারি ৪৬—রসিদ আলি দিবস: ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ

১৩ ফেব্রুয়ারি ৪৬—বিদ্রোহী কলকাতা

১৪ ফেব্রুয়ারি ৪৬—শহরতলিতে কলকাতার সমর্থনে শ্রমিক-বিক্ষোভ

১৫-১৬ ফেব্রুয়ারি ৪৬—কলকাতার ঢেউ জেলায় জেলায়: বাংলার সর্বত্র গণ-বিক্ষোভ

স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্বোচ্চ স্তর

২০-২৫ ফেব্রুয়ারি ৪৬—নৌ বিদ্রোহ (বোম্বাই ও করাচী)

—নৌ বিদ্রোহের সমর্থনে বোম্বাইয়ে শ্রমিক-অভ্যুত্থান

—নৌ বিদ্রোহের সমর্থনে কলকাতায় শ্রমিক ধর্মঘট

মার্চ ৪৬—ভারতীয় সেনাবাহিনীতে জাতীয়তাবোধের বিস্ফোরণ:

—জব্বলপুরে সেনা ধর্মঘট

—গুর্খা সৈন্যদের বিক্ষোভ

১৯-২২ মার্চ ৪৬—নির্বাচন

—কমিউনিস্ট পার্টি ও নির্বাচন

—নতুন করে কমিউনিস্টদের উপর হামলা

এপ্রিল ৪৬—কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাচনী ফলাফল পর্যালোচনা

ডিসেম্বর ৪৭—বিশেষ ক্ষমতা আইন প্রণয়নের উদ্যোগ
—কালাকানুন-বিরোধী আন্দোলন
—নতুন পথের সন্ধানে কমিউনিস্ট পার্টি
১০ ডিসেম্বর ৪৭—ছাত্র বিক্ষোভ ও ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলি
৫ জানুয়ারি ৪৮—কালা কানুন বিরোধী ধর্মঘটের ব্যর্থ প্রয়াস
২৭ ফেব্রুয়ারি ৪৮—ডিক্‌সন লেনের ঘটনা
২৮ ফেব্রুয়ারি-
৬ মার্চ ৪৮—দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেস
২৬ মার্চ ৪৮—পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনী ঘোষিত

পার্টির বে-আইনী যুগ
(প্রথম অধ্যায়)

মার্চ ৪৮-
মার্চ ৪৯ —পরিবর্তিত অবস্থার উপযোগী সংগঠন, প্রচার ও আন্দোলন
—ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের নতুন লাইন
—চীন বিপ্লব ও কমিউনিস্ট পার্টি
—নতুন পি. বি. দলিল। রণনীতি ও রণকৌশল
৯ মার্চ ৪৯—রেল ধর্মঘটের ডাক
—পার্টি কমিটিগুলির পুনর্গঠন

চতুর্থ পর্ব

পার্টির বে-আইনী যুগ
(দ্বিতীয় অধ্যায়)

এপ্রিল ৪৯-
জানুয়ারি ৫১—রাজবন্দীদের অনশন ও বন্দীমুক্তি আন্দোলন
২৭ এপ্রিল ৪৯—বৌবাজার স্ট্রীটে নারী মিছিলে গুলি
৯ জুন ৪৯—পটারি শ্রমিকদের লড়াই
১০ জুন ৪৯—দমদম জেলে বন্দীহত্যা
১২ জুন ৪৯—দক্ষিণ কলকাতা উপনির্বাচন
১২-১৪
জুলাই ৪৯—নেহরুর কলকাতা সফর ও নেহরু-বিরোধী বিক্ষোভ

কৃষক আন্দোলনের নতুন দিগন্ত (১৯৪৮-৪৯)

ক. কাকদ্বীপ—শিশু তেলেঙ্গানা

খ. বড়া কমলাপুর—ডুবিরভেরি—অগ্রদ্বীপ

৮ নভেম্বর ৪৯—চটকল শ্রমিক ধর্মঘটের ব্যর্থ প্রয়াস

২৬ নভেম্বর ৪৯—কলকাতার শান্তি সম্মেলনের প্রথম সমাবেশ
নভেম্বর-
ডিসেম্বর ৪৯—কলকাতায় পুলিশের সঙ্গে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ
৫ জানুয়ারি ৫০—কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত গণসংগঠনগুলি বে-আইনী ঘোষিত
২৬ জানুয়ারি ৫০—দেশপ্রিয় পার্কে সংঘর্ষ
২৭ জানুয়ারি ৫০—কমিনফর্ম-এর সম্পাদকীয় নিবন্ধ ও অন্তঃপার্টি সংগ্রামের সূচনা
ফেব্রুয়ারি ৫০—নবপর্যায়ে সাম্প্রদায়িক হানাহানি
মে-জুন ৫০—জুন সি. সি. ও নতুন রাজনৈতিক লাইন
—নতুন সাংগঠনিক কার্যক্রম: পার্টি কমিটিগুলির পুনর্গঠন
সেপ্টেম্বর ৫০—পাল্টা রাজনৈতিক লাইন: অজয় ঘোষ, ডাঙ্গে ও ঘাটে-রচিত দলিল
—অন্তঃপার্টি সংগ্রাম তীব্রতর: জোশী ও ডাঙ্গের ভূমিকা
ডিসেম্বর ৫০—ঐক্যবন্ধ নেতৃত্ব ও খসড়া কর্মসূচি
৫ জানুয়ারি ৫১—নিষেধাজ্ঞামুক্ত কমিউনিস্ট পার্টি
জনজীবনে পার্টির প্রকাশ্য আবির্ভাব
—কংগ্রেসের ভাঙন ও রাজনৈতিক অস্থিরতার সূচনা
—সাধারণ নির্বাচনের পথে কমিউনিস্ট পার্টি

পরিশিষ্ট ২

যাঁদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে

১. অজয় দাশগুপ্ত : চল্লিশের দশকে চটকল শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম নেতা। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির কলকাতা জেলা কমিটির নেতৃস্থানীয় সভ্য। বর্তমানে সি. পি. আই-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদের সদস্য।

২. অজিত রায় : সম্পাদক, 'মার্কসিস্ট রিভিয়ু'। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির কলকাতা জেলা কমিটির নেতৃস্থানীয় সদস্য।

৩. অন্নদাশঙ্কর রায় : প্রখ্যাত কথাশিল্পী ও চিন্তাবিদ।

৪. অমিয় মুখার্জি : পশ্চিমবঙ্গ শান্তি সংসদের অন্যতম নেতা। চল্লিশের দশকে কমিউনিস্ট পার্টির উত্তর কলকাতা শাখার সম্পাদক।

৫. অরুণ চৌধুরী : মাধ্যমিক শিক্ষক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা। সি. পি. আই (এম)-এর বীরভূম জেলা কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য।

৬. অরুণ দত্ত : চল্লিশের দশকে ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃস্থানীয় কর্মী ও ছাত্র ফেডারেশনের মুখপত্র 'ছাত্র অভিযান'-এর সম্পাদক।

৭. অসীম রায় : কথাশিল্পী ও সাংবাদিক।

৮. আবদুল মোমিন : ১৯৩০ সালের ঐতিহাসিক গাড়োয়ান ধর্মঘটের নেতা। চল্লিশের দশকে কমিউনিস্ট পার্টির শীর্ষস্থানীয় শ্রমিক নেতা ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সম্পাদক।

৯. আবদুল্লাহ্ রসুল : সারা ভারত কৃষক আন্দোলনের শীর্ষস্থানীয় কমিউনিস্ট নেতা। বর্তমানে সি পি. আই (এম)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য।

১০. উমা সেহানবীশ : বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ। কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত মহিলা সংগঠনের প্রাক্তন নেত্রী।

১১. কমল চ্যাটার্জি (কলকাতা) : চল্লিশের দশকে কলকাতা জেলা ছাত্র ফেডারেশনের অন্যতম নেতা।

১২. কমল চ্যাটার্জি (চন্দননগর) : চল্লিশের দশকে হুগলি জেলা কৃষক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা। বর্তমানে সি. পি. আই (এম)-এর হুগলি জেলা কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য।

১৩. কংসারি হালদার। চল্লিশের দশকে কাকদ্বীপ কৃষক অভ্যুত্থানের অন্যতম প্রধান সংগঠক। বর্তমানে সি. পি. আই-এর পশ্চিমবঙ্গ কন্ট্রোল কমিশনের সদস্য।

১৪. কুমুদ বিশ্বাস। কমিউনিস্ট পার্টির কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক (১৯৪৩-৪৮)।

১৫. কৃষ্ণ চক্রবর্তী: কথাসাহিত্যিক। চল্লিশের দশকে কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত সংস্কৃতি আন্দোলনের কর্মী। বর্তমানে সি. পি. আই (এম)-এর সংস্কৃতি ফ্রন্টের বিশিষ্ট কর্মী।

১৬. খোকা রায়। কমিউনিস্ট পার্টির বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক-মণ্ডলীর সদস্য (১৯৪৩-৪৭)। দেশভাগের পরে পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির শীর্ষস্থানীয় নেতা।

১৭. গোপাল আচার্য। ট্রাম শ্রমিক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য।

১৮. গৌরীশঙ্কর ব্যানার্জি। চল্লিশের দশকে ছাত্র ফেডারেশনের বিশিষ্ট কর্মী। কমিউনিস্ট পার্টির বে-আইনী যুগে গোপন সংগঠনের কর্মী।

১৯. চতুর আলি। ট্রাম শ্রমিক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা। কমিউনিস্ট পার্টির বে-আইনী যুগে বারাকপুর জেলা কমিটির সম্পাদক। বর্তমানে সি. পি. আই (এম)-এর শ্রমিক ফ্রন্টের অন্যতম নেতা।

২০. চন্দ্র রায়। বরানগর ও আলমবাজারে চটকল শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম বিশিষ্ট কর্মী। কমিউনিস্ট পার্টির বরানগর আঞ্চলিক শাখার প্রাক্তন নেতা।

২১. চিত্ত মৈত্র। কাশীপুর ন্যাশনাল কার্বন শ্রমিক ইউনিয়নের বিশিষ্ট কমিউনিস্ট সংগঠক। বর্তমানে মিউনিসিপ্যাল শ্রমিক-কর্মচারী সংগঠনের সভাপতি।

২২. চিন্মোহন সেহানবীশ। কমিউনিস্ট পার্টি-পরিচালিত সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা। বিশিষ্ট লেখক ও চিন্তাবিদ।

২৩. জগৎ বোস। কমিউনিস্ট পার্টি-পরিচালিত পূর্ব কলকাতা শ্রমিক আন্দোলনের পুরোধা। পটারি শ্রমিক সংগ্রামের প্রাক্তন নেতা।

২৪. ঝুনু পাকড়াশী। কমিউনিস্ট পার্টির বে-আইনী যুগে মজদুর নওজোয়ান লীগের অন্যতম সংগঠক।

২৫. তুষার চ্যাটার্জি। চল্লিশের দশকে কমিউনিস্ট পার্টির বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির সদস্য। 'জনযুদ্ধ' (সাপ্তাহিক)-এর সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত।

২৬. দিলীপ ভাদুড়ী : চল্লিশের দশকে কলকাতা জেলা কমিটির সদস্য। শিক্ষাবিদ।

২৭. ধীরেন মজুমদার : কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত ট্রাম শ্রমিক আন্দোলনের পুরোধা। পার্টির বে-আইনী যুগে প্রাদেশিক কমিটির সদস্য।

রণেন সেন : প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা। কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও পলিটব্যুরোর প্রাক্তন সদস্য। সর্বভারতীয় শ্রমিক-আন্দোলনের অগ্রণী ব্যক্তিত্ব।

রবি ভট্টাচার্য : চল্লিশের দশকে কলেজ শিক্ষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কমিউনিস্ট কর্মী। পরবর্তীকালে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সি. পি. আই (এম)-এর সদস্য।

রাম বসু : কবি। কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত সংস্কৃতি আন্দোলনের অগ্রণী কর্মী।

লীলা রায় : অনুবাদক। অন্নদাশংকর রায়ের সহধর্মিণী।

শশাঙ্ক চট্টোপাধ্যায় : চল্লিশের দশকে কাটোয়ার বিশিষ্ট কর্মী। বর্তমানে কাটোয়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান।

শান্তিময় রায় : শিক্ষাব্রতী। জাতীয় সংহতি আন্দোলনের নেতা ও সংগঠক।

শিবশঙ্কর মিত্র : প্রবীণ কমিউনিস্ট কর্মী। বন্যপ্রাণীতত্ত্ববিদ।

শিবানন্দ চট্টোপাধ্যায় : কমিউনিস্ট পার্টির বে-আইনী যুগের গোপন সংগঠনের কর্মী।

শৈলেন মুখার্জি : কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত কলকাতা কর্পোরেশন শ্রমিক আন্দোলনের প্রাক্তন নেতা ও সংগঠক। কলকাতা জেলা কমিটির প্রাক্তন সদস্য।

সতপাল ডাঙ : চল্লিশের দশকে সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশনের শীর্ষস্থানীয় নেতা। বর্তমানে পাঞ্জাবের সি. পি. আই-এর কেন্দ্রীয় নেতা।

সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী : কলেজ শিক্ষক আন্দোলনের সু-প্রবীণ নেতা। প্রাক্তন কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবী।

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার : অগ্নিযুগের বিপ্লবী। উত্তর বঙ্গের পার্বত্য অঞ্চলের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম প্রধান সংগঠক। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক।

সত্যেন গাঙ্গুলী : চল্লিশের দশকে কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত রেল শ্রমিক আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য নেতা।

সন্ধ্যা চট্টোপাধ্যায় : হুগলী জেলার কমিউনিস্ট নেত্রী। বর্তমানে সি. পি. আই (এম) পরিচালিত মহিলা সংগঠনের বিশিষ্ট নেত্রী।

সমর মুখার্জি : চল্লিশের দশকে কমিউনিস্ট পার্টির হাওড়া জেলা কমিটির সম্পাদক। বর্তমানে সি. পি. আই (এম)-এর পলিটব্যুরোর সদস্য।

সমরেশ বসু। বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক। চল্লিশের দশকে কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত শ্রমিক আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী।

সুবাসসিঞ্চন রায়। শিক্ষাব্রতী। কমিউনিস্ট পার্টির বে-আইনী যুগে প্রাদেশিক কেন্দ্রের কর্মী।

সুনীল মুন্সী : চল্লিশের দশকে সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশনের মুখ-পত্র 'দি স্টুডেন্ট'-এর সম্পাদক। বর্তমানে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সি. পি. আই-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদের সদস্য।

সুনীল চ্যাটার্জি। অগ্নিযুগের বিপ্লবী। পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত কৃষক আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট সংগঠক।

সুবোধ দাশগুপ্ত : শিক্ষাব্রতী। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির কলকাতা জেলা কমিটির সভ্য।

সৈয়দ শাহেদুল্লাহ্ : বর্ধমান জেলার প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা। বর্তমানে সি. পি. আই (এম)-এর সাংস্কৃতিক মুখপত্র 'নন্দন'-এর সম্পাদক।

সোমনাথ লাহিড়ী। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা। চল্লিশের দশকে বাংলা পার্টির মুখপত্র 'দৈনিক স্বাধীনতা'র সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি।

সৌরি ঘটক : লেখক ও সাংবাদিক। কাটোয়ার প্রাক্তন বিশিষ্ট কমিউনিস্ট কর্মী। বর্তমানে সি. পি. আই-এর মুখপত্র 'কালান্তর'-এর সঙ্গে যুক্ত।

সৌরেন বোস। শিলিগুড়ি কমিউনিস্ট পার্টির প্রাক্তন নেতৃস্থানীয় কর্মী। পরবর্তীকালে সি. পি. আই. (এম. এল.)-এর শীর্ষস্থানীয় নেতা।

হররমোহন সিংহ। বর্ধমান জেলার বিশিষ্ট সি. পি. আই (এম) নেতা। কাটোয়ার প্রাক্তন এম. এল. এ।

পরিশিষ্ট ৩

স্বাধীনতা-উত্তর রক্তঝরা দিনগুলি

সন্ত্রাস ও অত্যাচারের খতিয়ান

(১৯৪৭—৫০)

১৯৪৭

১০ অক্টোবর —শ্রীদুর্গা কটন মিলের ৫৭ জন ধর্মঘটী শ্রমিক গ্রেপ্তার।

১৮ অক্টোবর —শ্রীদুর্গার ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপর গুলি চালনা। মোট ২০০ জন ধর্মঘটী গ্রেপ্তার।

২০ অক্টোবর —বাসন্তী কটন মিলে ধর্মঘট। ৫ জন ইউনিয়ন নেতা গ্রেপ্তার।

২১ নভেম্বর —আইনসভা অভিমুখে কৃষক শোভাযাত্রীদের উপর কাঁদুনে গ্যাস।

৯ ডিসেম্বর —কালাকানুন (স্পেশাল পাওয়ার্স বিল) বিরোধী বিক্ষোভ-রত ছাত্রদের উপর পুলিশী হামলা। আইনসভার গেটে ছাত্র সত্যাগ্রহীদের উপর লাঠি ও কাঁদুনে গ্যাস।

১০ ডিসেম্বর —আইনসভার গেটে ছাত্র শোভাযাত্রীদের উপর সর্বাধিক পুলিশী হামলা। লাঠি, কাঁদুনে গ্যাস ও গুলি। পুলিশের গুলিতে অ্যাম্বুলেন্স কর্মী শিশির মণ্ডল নিহত।

১১ ডিসেম্বর —আইনসভার সম্মুখে ছাত্রশোভাযাত্রার উপর লাঠি চালনা।

—গোটা ১৯৪৭ সালে তেভাগা আন্দোলন সূত্রে ২০ জন কৃষক নিহত।

১৯৪৮

৭ ফেব্রুয়ারি —বজবজে বর্মা শেল ময়দানে শ্রমিক-সভার উপর পুলিশের সহায়তাপুষ্ট গুণ্ডাদের হামলা। বহু শ্রমিক গ্রেপ্তার।

—পটারি শ্রমিকদের উপর পুলিশের সহায়তাপুষ্ট গুণ্ডাদের হামলা। বহু শ্রমিক গ্রেপ্তার। পটারি শ্রমিক ইউনিয়ন অফিস তছনছ।

—বাসন্তী ও শ্রীদুর্গা কটন মিলের ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপর পুলিশ ও গুণ্ডার হামলা। শ্রীদুর্গার একজন ধর্মঘটী শ্রমিক নিহত।

২২ ফেব্রুয়ারি —বড়া কমলাপুরে পুলিশী সন্ত্রাস। ১৫০ জন কৃষক গ্রেপ্তার। সান্ধ্য আইন জারি। পুলিশের গুলিতে গুইরাম মণ্ডল ও কার্তিক ধাড়া নিহত এবং ৪ জন মহিলা আহত।

২৬ মার্চ —পশ্চিম বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনী ঘোষিত এবং সর্বত্র কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মীদের গ্রেপ্তার।
—২৪ পরগনা ও মেদিনীপুরে সশস্ত্র পুলিশ আমদানি।

২৬ মে —রাইটার্স বিল্ডিং-এর সম্মুখে মহিলা শোভাযাত্রার উপর কাঁদুনে গ্যাস।

২৭ মে —ওয়েলিংটন স্কোয়ারে রেল শ্রমিক-সভার উপর গুণ্ডাদের হামলা। পুলিশ কর্তৃক প্রতিবাদকারী শ্রমিকদের গ্রেপ্তার।

২৮ মে —ট্রাম শ্রমিক ইউনিয়নের অফিসে গুণ্ডাদের হামলা। বাধাদানকারী ২০ জন শ্রমিক গ্রেপ্তার ও ইউনিয়ন অফিস খানাতল্লাসি।
—কাশীপুরের বস্তি উচ্ছেদ। পুলিশের কাঁদুনে গ্যাসের বলি একটি শিশু।

৬ নভেম্বর —চন্দনপিঁড়িতে পুলিশের গুলিতে ৬ জন মহিলা সহ ১৪ জন নিহত। আহত ২০ জন।

৩১ ডিসেম্বর —বুধাখালিতে পুলিশর গুলিতে ৩ জন নিহত।
—ডোঙ্গাজোড়ে পুলিশের গুলিতে ২ জন কৃষক-বধূ নিহত।
—সাঁখরাইলে পুলিশের গুলিতে ৪ জন কৃষক রমণী নিহত।
—ডুবিরভেরীতে পুলিশের গুলিতে ৬ জন নারী নিহত।
—পণ্ডিত নেহরুর কলকাতা সফর উপলক্ষ্যে বাস্তুহারা শোভাযাত্রার উপর পুলিশের লাঠি।

১৯৪৯

১ জানুয়ারি —কাকদ্বীপে পুলিশের গুলিতে ৩ জন কৃষক নিহত।

১১ জানুয়ারি —ইন্দোনেশিয়া দিবস উপলক্ষ্যে ছাত্র শোভাযাত্রার উপর পুলিশের লাঠি। ৮ জন ছাত্র আহত।

১৪ জানুয়ারি —বাস্তুহারা শোভাযাত্রার উপর কাঁদুনে গ্যাস ও লাঠি। ১ জন মহিলা সহ ৬ জন আহত।

১৮ জানুয়ারি —কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখে ছাত্রদের উপর গুলি। নিহত ৪ ও আহত ৭ জন।

১৯ জানুয়ারি —মর্গের সম্মুখে গুলি। নিহত ৫ ও আহত ৫০ জন।

২৭ ফেব্রুয়ারি —হাওড়ার মাসিলা গ্রামে কৃষকদের উপর গুলি। ৩ জন কৃষক-বধূ নিহত।

৯ মার্চ —তমলুকের চকদুর্গাপুরে কৃষকদের উপর গুলি। নিহত ২ জন।

২২ মার্চ —মাধ্যমিক শিক্ষাবিলের বিরুদ্ধে শোভাযাত্রাকারী ছাত্রদের উপর লাঠি ও কাঁদুনে গ্যাস।
—মালদহে খেতমজুর সম্মেলনের উপর গুলি।

২৭ এপ্রিল —বৌবাজার স্ট্রীটে মহিলা শোভাযাত্রার উপর পুলিশের গুলি। ৪ জন মহিলা ও ৩ জন পুরুষ নিহত।

২৮ এপ্রিল —কলকাতা মেডিকেল কলেজের চত্বরে পুলিশের গুলি। ১ জন নিহত ও ৯ জন আহত।
—বেলুড়ে শ্রমিকদের উপর গুলি। আহত ৬ জন।

১ মে —কলকাতায় মে দিবসের শোভাযাত্রার উপর লাঠি ও কাঁদুনে গ্যাস।

২৯ মে —কলকাতায় ছাত্র শোভাযাত্রার উপর গুলি। ১ জন ছাত্র ও ১ জন পথচারী আহত।

৬ জুন —দক্ষিণ কলকাতায় নির্বাচনী মিছিলের উপর গুলি। ১ জন নিহত ও ১ জন আহত।

৮ জুন —প্রেসিডেন্সি জেলে গুলি। ১ জন নিরাপত্তা বন্দী নিহত ও ১ জন আহত।
—পটারি কারখানার শ্রমিকদের উপর গুলি। ১ জন শ্রমিক নিহত ও ১৫ জন আহত।

৯ জুন —আলিপুর জেলে বন্দীদের উপর লাঠি। ১২ জন আহত।

১০ জুন —দমদম জেলে গুলি। ৩ জন রাজবন্দী নিহত।

২৫ জুন —হাওড়ার ইসলামপুর গ্রামে কৃষকের উপর গুলি। ২ জন নিহত।
—জেলে অনশনরত বন্দী মিহির দাশের মৃত্যু।
—তিলুড়িয়ার ফুটবল মাঠে গুলি। ২ জন নিহত।
—ধর্মঘটী টেক্সম্যাকো শ্রমিকদের উপর গুলি। ২ জন শ্রমিক নিহত।
—বাটপোয়ায় চা বাগানের শ্রমিকদের উপর গুলি। ২ জন নিহত।
—চুঁচুড়ায় ধর্মঘটী মহিলা ধাঙড় শ্রমিকদের উপর লাঠি ও কাঁদুনে গ্যাস।

৭ জুলাই —হাওড়ায় বাইনান গ্রামে কৃষকদের উপর গুলি। নিহত ১ জন।

৩ আগস্ট —জগদ্বল্লভপুরে কৃষকদের উপর গুলি। ৬ জন মহিলা নিহত।
—শিবরামপুরে কৃষকদের উপর গুলি। ১ জন নিহত।

২০ সেপ্টেম্বর —ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বাড়ির সম্মুখে ছাত্র শোভাযাত্রার উপর কাঁদুনে গ্যাস। ৪ জন ছাত্র গ্রেপ্তার।

২৮ সেপ্টেম্বর —সারা ভারত শান্তি সম্মেলনের অফিস খানাতল্লাসি। ২৯ জন গ্রেপ্তার।

১০ নভেম্বর —মাঝেরহাটের নেতাজীনগরে বাস্তুহারাদের গৃহ ধূলিসাৎ। ২০ জন বাস্তুহারা গ্রেপ্তার।
—আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষ্যে মহম্মদ আলি পার্কের সম্মুখে শোভাযাত্রীদের উপর লাঠি।

১২ নভেম্বর —মহম্মদ আলি পার্কে ছাত্রসভার উপর লাঠি চালনা। ১০ জন আহত ও ৪ জন গ্রেপ্তার।

১৫ নভেম্বর —ওয়েলিংটন স্কোয়ারের সম্মুখে মিছিলের উপর লাঠি ও কাঁদুনে গ্যাস। পি. আর. সি-র অ্যাম্বুলেন্স আটক ও ডাক্তার গ্রেপ্তার।

২০ নভেম্বর —ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বাড়ির সম্মুখে শোভাযাত্রার উপর কাঁদুনে গ্যাস। ১২ জন গ্রেপ্তার।

২৭ নভেম্বর —হুগলি জেলে গুলি। ৯ জন আহত।

১৫ ডিসেম্বর —প্রেসিডেন্সি জেলে লাঠি ও গুলি। ১০০ জন আহত।

১৯ ডিসেম্বর —হাজরা রোডে শোভাযাত্রার উপর গুলি।
—আলিপুর জেল গেটে শোভাযাত্রার উপর লাঠি চালনা।

২৫ ডিসেম্বর —আলিপুর ও প্রেসিডেন্সি জেলের সম্মুখে লাঠি ও কাঁদুনে গ্যাস। ৪০ জন আহত। ১০৫ জন গ্রেপ্তার।

২৭ ডিসেম্বর —চিৎপুর রোডে মিছিলের উপর লাঠি ও কাঁদুনে গ্যাস।

২৮ ডিসেম্বর —কলকাতায় প্রিজন ভ্যানে পুলিশের গুলিতে ৪ জন আর. সি. পি. আই বন্দী নিহত।
—হাওড়ায় হাটালগ্রামে ভুখ মিছিলে গুলি। ১টি শিশু ও ১২ জন মহিলা নিহত।

১৯৫০

১ জানুয়ারি —কলকাতায় মৌলালীর মোড়ে শোভাযাত্রায় উপর লাঠি চালনা।

৪ জানুয়ারি —শিলিগুড়িতে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বিরুদ্ধে বিক্ষোভরত ছাত্রদের উপর লাঠি চালনা।

৬ জানুয়ারি —কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত গণসংগঠনগুলি নিষিদ্ধ ঘোষিত।

—ময়দানে বি. পি. টি. ইউ. সি আয়োজিত সভায় লাঠি। ৩৬ জন গ্রেপ্তার।

৯ জানুয়ারি —জেলে অনশনরত বন্দীদের জোর করে খাওয়াতে গেলে ৪ জন গুরুতর আহত।

২৬ জানুয়ারি —দেশপ্রিয় পার্কে 'প্রজাতন্ত্র'-বিরোধী সমাবেশের উপর পুলিশের হামলা। নিখিল ভাদুড়ী সহ ২ জন নিহত। আহত ২০ জন। ৪৫ জন গ্রেপ্তার।

—পুতপুতিয়ায় পুলিশের গুলি।

২০ ফেব্রুয়ারি —মেদিনীপুরের কেয়াপাড়া গ্রামে কৃষকদের উপর গুলি। ১ জন নিহত ও ১ জন আহত।

২৭ ফেব্রুয়ারি —হাইকোর্টের আদেশে ২০০ জন নিরাপত্তা বন্দীকে মুক্তি-দানের পর পুনরায় গ্রেপ্তার।

১৩ মে —কলকাতায় বাস্তুহারা শোভাযাত্রার উপর কাঁদুনে গ্যাস। ১ জন আহত। ৫ জন মহিলাসহ ১৩ জন গ্রেপ্তার।

১০ জুন —বর্ধমানের শালিনপুর গ্রামে ১ জন গুলিতে নিহত।

১৯ জুন —মাহেশের বাস্তুহারা ক্যাম্পে লাঠি ও কাঁদুনে গ্যাস। ২ জন মহিলা সহ ২৫ জন আহত। ৫ জন গ্রেপ্তার।

২৪ জুন —কুপার্স বাস্তুহারা ক্যাম্পে গুলি। ১ জন নিহত।

২৭ ডিসেম্বর —যাদবগড়ে বাস্তুহারা ক্যাম্পে গুলি। গর্ভবতী মহিলা বীণাপাণি মিত্র নিহত।